মানব-কল্যাণে রসায়ন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলা-ভাষায়
বৈজ্ঞানিক শব্দের একমাত্র অভিধান 'বিজ্ঞান-ভারতী',
'কিশোর বিজ্ঞানী' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

প্রকাশ ভবন
15, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা 12

প্রকাশক : শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
49/1 এ, টালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা 26

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, 1964

মুদ্রাকর : শ্রীফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা 9

স্বর্গীয় পিতামাতার পুণ্য স্মৃতির
উদ্দেশ্যে নিবেদিত —

গ্রন্থকার

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শান্তিরঞ্জন পালিত, ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডক্টর শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কানাইলাল রায়, ডক্টর সুর্যেন্দু বিকাশ কর, শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল প্রমুখ সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। রসায়নের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ হিসাবে এঁরা পুস্তকখানার বিশেষ বিশেষ অধ্যায়গুলির পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যবান উপদেশ দান করে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার জন্যে এঁদের সকলের নিকট আমি ঋণী; এঁদের সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার ফলেই গ্রন্থখানার প্রণয়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ-ছাড়া যে সকল সহৃদয় বন্ধু ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'প্রকাশ-ভবন'—পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের প্রকাশন-কার্যে আমাকে সর্বতো-ভাবে সাহায্য করেছেন, এ জন্যে তাঁকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পুস্তক-খানার প্রচার ও পরিবেশন সম্বন্ধে শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতার উপরে আমি বিশেষভাবে নির্ভর করছি।

49/1এ, টালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা-26.

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
গ্রন্থকার-প্রকাশক

: অধ্যায় সূচী :

(137-টি রেখাচিত্র ও আলোকচিত্র সমন্বিত)

।। মানব-কল্যাণে রসায়ন ।।

প্রথম অধ্যায়

রসায়নের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা — আদি প্রস্তর-যুগ, নব্য প্রস্তর-যুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ ও লৌহ-যুগ : সিন্ধু সভ্যতা, মিশর ও ব্যাবিলনীয় নিদর্শন : গ্রীক সভ্যতা — প্রকৃত রসায়ন-বিদ্যার সূত্রপাত, ডিমোক্রিটাস ও অ্যারিস্টটল : পদার্থের গঠন ও উপাদান — দার্শনিক মতবাদ, চতুর্ভূত ও পঞ্চভূত : অণু-পরমাণু তত্ত্ব — লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস : অ্যাল্‌কেমি যুগ— অ্যাল্‌কেমিস্টদের ধারণা ও প্রচেষ্টা, কৃত্রিম সোনা ও জীবন-রসায়ন, অ্যাল্‌কেমি-চর্চার মাধ্যমে বহু রাসায়নিক আবিষ্কার : রসায়নের জনক রবার্ট বয়েল — মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ, মৌলিক পদার্থের তালিকা : পারমাণবিক তত্ত্ব — জন ডালটনের রাসায়নিক সূত্র, মলিকিউল ও অ্যাটম, মৌলের প্রতীক-চিহ্ন ও যৌগের সংকেত : পারমাণবিক ওজন ও আণবিক ওজন : রাসায়নিক সমীকরণ।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় রসায়ন-বিজ্ঞানের মূলও সুদূর অতীতে প্রসারিত। প্রাগৈতিহাসিক আদিম অন্ধকার যুগেই যে রসায়নের গোড়া পত্তন হয়েছিল, সেকথা একটু বিস্তৃত অর্থে যুক্তিসহ বিবেচিত হবে। কেবল ভারতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার প্রাথমিক স্তরেই রাসায়নিক জ্ঞানেরও একটা স্থূল প্রভাব স্বভাবতঃই গড়ে উঠেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তার বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুকঠিন জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনে আদিম মানুষ নিজের নিরাপত্তা ও জীবন ধারণের তাগিদে পার্থিব বিবিধ বস্তু সংগ্রহ করে যে-সব স্থূল শিল্পকলা আয়ত্ত করেছিল তারই মধ্যে রসায়নের জন্ম-কাহিনী নিহিত। আবার সেই আদিম মানুষের মনেও নিশ্চয় প্রকৃতিকে জানবার একটা সহজাত ঔৎসুক্য জাগতো, এবং প্রাকৃতিক বস্তু নিচয়ের স্বরূপ ও কার্যকারিতা বুঝতে ও তাদের কাজে লাগাতে আগ্রহ জন্মাতো। সর্বযুগে সর্বকালেই এটা মানব-মনের শাশ্বত স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তুতঃ জীবন-ধারণ ও জ্ঞান-স্পৃহা, মানব-মনের এই দুই স্বাভাবিক

বৃত্তি কেবল রসায়নই নয়, মানব-জাতির সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই উদ্ভব ও উন্নতির মূল উৎস।

মানব-সভ্যতার কোন এক বিশেষ যুগে কোন বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর দ্বারা রসায়ন-বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছিল, একথা অবশ্য বলা চলে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যে প্রাপ্ত বহুবিধ নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সুদূর অতীতে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে স্থানীয় প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ের রাসায়নিক তৎপরতার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। তবে সর্বত্র তার মূল সূত্র প্রায় একই ছিল — জীবন-সংগ্রামের তাগিদ, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারপর কত মানব-গোষ্ঠীর কত উত্থান-পতন, ভুল-ভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্ম-তৎপরতা, জ্ঞান ও শিল্পকলার আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময়ের ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল ধারা অগ্রগতির পথে এগিয়েছে ধীরে ধীরে, বহু সহস্র বছরে। বস্তুতঃ মানব-সভ্যতার ইতিহাস রসায়ন সহ বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশেরই ইতিহাস। সেই আদিম অন্ধকার যুগের প্রকৃতি-নির্ভর মানুষের হাতে যার সূত্রপাত ঘটেছিল বিবর্তনের ধারায় তা আজ বিকশিত হয়ে প্রায় পূর্ণ পরিণতির দ্বারে পৌঁছেছে। বর্তমান মানব-সভ্যতা আজ একান্তভাবেই বিজ্ঞান-ভিত্তিক, বিশেষতঃ রসায়ন-বিজ্ঞান আজ মানুষকে কল্পনাতীত শক্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী করেছে। রসায়নের ইতিহাস বস্তুতঃ আমাদের আলোচ্য বিষয় না হলেও এর পটভূমি ও ক্রমবিকাশের কিছু আলোচনা হয়তো এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।
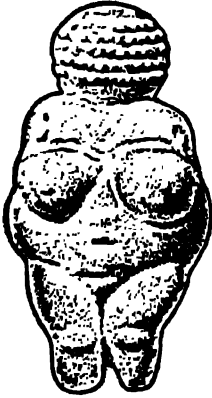
প্রস্তর-যুগের ভাস্কর্যের নমুনা
(নারীমূর্তি)

পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন, **আদি প্রস্তর-যুগের** আদিম মানুষ মোটামুটি ত্রিশ হাজার বছর আগে প্রথম প্রস্তরের ব্যবহার সুরু করে। প্রস্তরের কাঠিন্য ও ঘর্ষ-ক্ষয় লক্ষ্য করে অনিপুণ হাতে তাকে তারা ভেঙ্গে-ঘষে নানা রকম হাতিয়ার, কুঠার, খনিত্র প্রভৃতির আকারে মোটামুটি রূপায়িত করে জীবন-সংগ্রামের কাজে লাগায়। একে বিজ্ঞান বলা না গেলেও প্রাকৃতিক পদার্থের স্বরূপ ও কার্যকারিতার এই সহজ উপলব্ধিকে আদিম মানুষের বস্তুতান্ত্রিক

স্থূল রাসায়নিক জ্ঞানের উন্মেষ বলা যেতে পারে। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে তারাই এক সময় পাথরে-পাথরে ঠুকে, কাঠে-কাঠে ঘসে প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখে। **আগুন** জিনিসটা কি, না বুঝলেও সেই আদিম মানুষের হাতেই প্রথম এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি ঘটেছিল। নরম মাটি আগুনে পোড়ালে শক্ত ও স্থায়ী
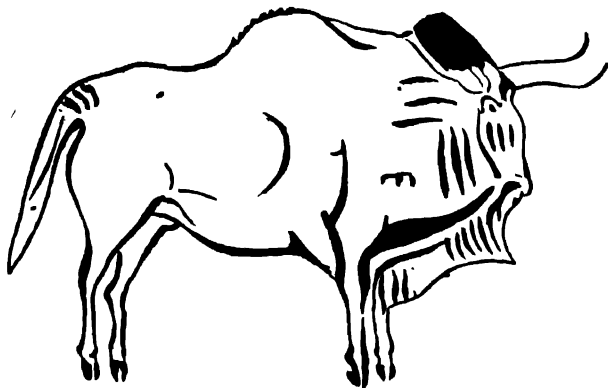
পার্বত্য গুহাগাত্রে অঙ্কিত প্রাচীন যুগের চিত্রকলা
(বাইসন)

হয় দেখে ক্রমে একদিন তারা মাটির পাত্র গড়ে-পুড়িয়ে তাতে তাদের সংগৃহীত খাদ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছিল। এভাবে গড়ে ওঠে **মৃৎশিল্প**। এক সময় সেই বন্য মানুষ প্রাকৃতিক নানা রঙীন বস্তু আহরণ করে বিচিত্র পদ্ধতিতে তাদের মৃৎপাত্রগুলোকে চিত্র-বিচিত্রে সুদৃশ্য করতে সুরু করে, পার্বত্য গুহা-গাত্রে জীব-জন্তুর রঙীন ছবি আঁকে। স্বভাব-ঔৎসুক্য-প্রসূত এই **বর্ণকলা-জ্ঞান** আদিম মানুষের এক রকম রাসায়নিক বুদ্ধির উন্মেষের পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। আদি প্রস্তরযুগের সেই মানব-গোষ্ঠীর শিকার-নির্ভর বন্য জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকে হাজার হাজার বছরে ক্রমে এরূপ কিছু-কিছু রাসায়নিক তৎপরতার উন্মেষ ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আদিম মানব-গোষ্ঠীর এরূপ সব জ্ঞান ও শিল্পকলার নিদর্শন নানাস্থানে মাটির নীচে পাওয়া গেছে।

তারপর পুরা প্রস্তর-যুগের শেষে আজ থেকে আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর-যুগে সেই আদিম মানব-সভ্যতা, তথা বিজ্ঞান-প্রগতি কিছুটা দ্রুত অগ্রসর হয়। শিকার-নির্ভর ও খাদ্য-সংগ্রাহক মানুষ ধীরে ধীরে খাদ্য-উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করতে সুরু করে। **কৃষিকার্য**, পশুপালন, গৃহনির্মাণ

প্রভৃতি জীবন ধারণের কিছুটা উন্নত পদ্ধতি পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে সে-যুগেই কিছু কিছু আরম্ভ হয়। মিশর, প্যালেস্টাইন, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে নব্য প্রস্তর-যুগের কৃষিকার্যে ব্যবহৃত প্রস্তর-নির্মিত কাস্তে, নিড়ানী, কোদালী প্রভৃতি যন্ত্রপাতি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে
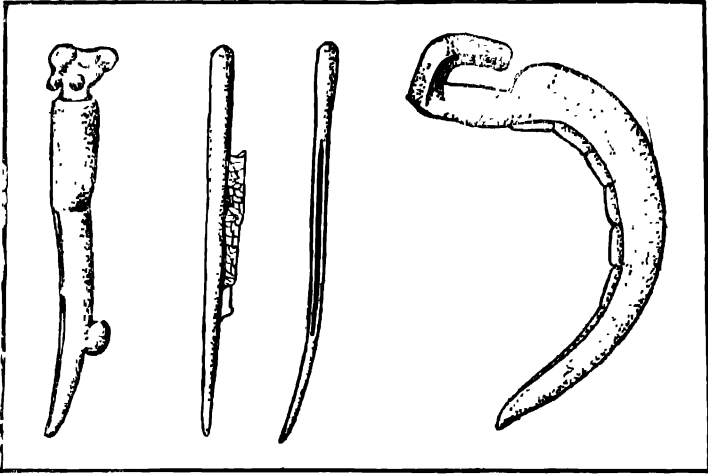
নব্য প্রস্তর-যুগে ব্যবহৃত কৃষিকার্যের উপযোগী হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি

জীবজন্তুর হাড়ে তৈরী যন্ত্রাদিও পাওয়া গেছে। যাহোক, শস্যোৎপাদনের প্রয়োজনে মাটির উর্বরতা-শক্তি, জলসেচ প্রভৃতির অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আদিম মানুষের মনে এই যুগ থেকেই কৃষি-রসায়নের ভিত্তি রচিত হয়েছিল, বলা চলে। **নব্য প্রস্তর-যুগের** মানুষ পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুগঠিত ও রঙীন মৃৎপাত্র তৈরী করতো, তাকে আগের চেয়ে উন্নত ধরণের রঙে চিত্রিত করে সুদৃশ্য করতো, এ-সবের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের তথ্য কিছু না জানলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মাটির বাস্তব গুণাগুণ ও মৃৎপাত্র পোড়ানোর বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করে এ-যুগের মানুষ কিছুটা রাসায়নিক বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিল, এ-কথা স্বীকার করতেই হয়। যাহোক, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, সেই নব্য প্রস্তর-যুগের মাঝামাঝি সময়ে খৃস্ট-পূর্ব আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষিকার্য, পশু-পালন, উন্নত মৃৎশিল্প, বয়ন-শিল্প, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়ে

মানব-সভ্যতাকে অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু তখনও মানুষ পশুর হাড় ও প্রস্তরে নির্মিত **হাতিয়ার** ও যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করতো, ধাতুর ব্যবহার শেখে নি।
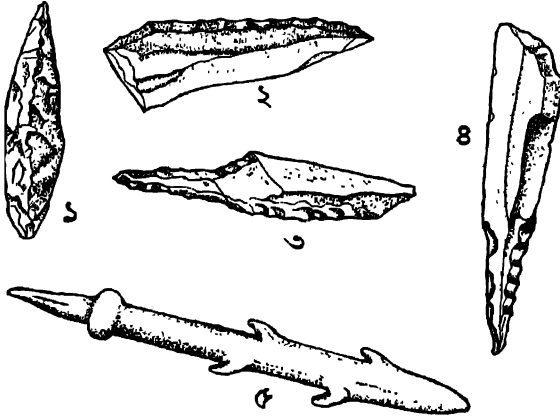
নব্য প্রস্তর-যুগের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি

১। পাথরের সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র; ২। কাটারি বা ছুরি; ৩। তীরের ফলা;
৪। বেধন যন্ত্র (ড্রিল); ৫। হাড়ের তৈরী হার্পুন।

নব্য প্রস্তর-যুগের শেষ দিকে খৃস্ট-পূর্ব মোটামুটি সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ ধাতু আবিষ্কার করে, প্রথমে সোনা ও রূপা দিয়েই তার সুরু। এর কিছুকাল পরে, কোথাও-কোথাও সমসাময়িক কালেই মানুষ তামাও আবিষ্কার করেছিল। মিশর, প্যালেস্টাইন, পারস্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের অনেক ধ্বংসাবশেষ ও প্রাচীন কবর খননে পালিশ-করা পাথরের অনেকটা সুগঠিত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্বর্ণ ও তাম্রের অলঙ্কারাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, নব্য প্রস্তর-যুগের শেষ দিকে স্বর্ণ ও তাম্রের **ধাতুশিল্প** কিছুটা গড়ে উঠেছিল। সে-যুগের তাম্রনির্মিত হাতিয়ার ও তাদের পাথরে-খোদাই ছাঁচও অনেক স্থানের মাটির নীচে পাওয়া গেছে। এ থেকে বুঝা যায়, তামা গলানো ও ঢালাই করার কৌশলও মানুষ নব্য প্রস্তর-যুগেই আয়ত্ত করে থাকবে। এ-যুগের মানুষ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যই অবশ্য ব্যবহার করতো; খনিজ প্রস্তর থেকে ধাতু নিষ্কাশনের

পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় আরও অনেক পরে। অবশ্য তামা নিষ্কাশনের কৌশল এ-যুগের মানুষই মোটামুটি আয়ত্ত করেছিল বলে মনে হয়। যাহোক, সেই প্রাচীন কাল থেকেই রসায়নের বিশেষ শাখা ধাতুবিদ্যা ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে গবেষণার ফলে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

তামা আবিষ্কারের পরবর্তী কালেই ব্রোঞ্জ ও পিতলের তৈরী সামগ্রী ব্যবহারের বহু নিদর্শন নানা স্থানে পাওয়া গেছে। **ব্রোঞ্জ** হলো তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটি সংকর-ধাতু, আর পিতল হলো তাম্র ও দস্তার মিশ্র-ধাতু। এ থেকে বুঝা যায়, ইতিমধ্যে টিন ও দস্তা ধাতুও প্রাচীন যুগের মানুষ আবিষ্কার করে ফেলেছে। ব্রোঞ্জ ও পিতল উভয় সংকর-ধাতুই তাম্র অপেক্ষা কঠিন ও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় গলানো
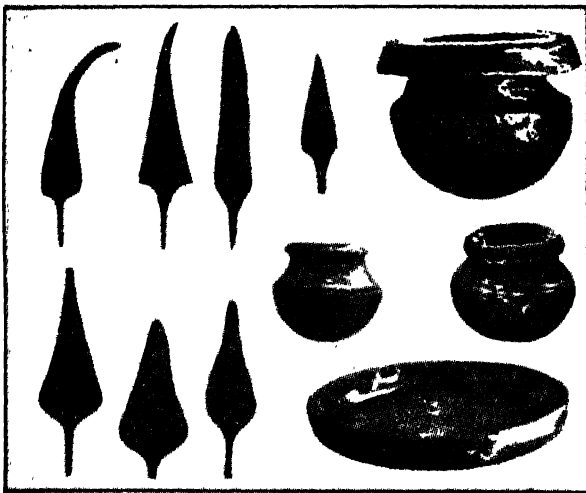
মহেঞ্জোদাবো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জযুগের হাতিয়ার ও তৈজসপত্র

যায়। বিশেষতঃ ঢালাই-এর কাজে ব্রোঞ্জ বিশেষ সুবিধাজনক এবং এর ঢালাই-করা দ্রব্যাদি তামার চেয়ে নিখুঁত, কঠিন ও ঘাতসহ হয়ে থাকে। এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যে সে-যুগে হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অলঙ্কার তৈরীর কাজে ব্রোঞ্জ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। আনুমানিক খৃস্ট-পূর্ব তিন হাজার

থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে মিশর, বোহেমিয়া, পূর্ব ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে ব্রোঞ্জের বহুল ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। কঠিন ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে প্রাচীন মানব-সভ্যতা অগ্রগতির পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মানব-প্রগতির এই যুগ তাই **ব্রোঞ্জযুগ** নামে আখ্যাত হয়েছে। লৌহের ব্যাপক ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ লৌহযুগের সূত্রপাত হয় খৃঃ পূঃ আনুমানিক মাত্র এক হাজার বছর আগে। অবশ্য তৎপূর্বেও লৌহ ব্যবহারের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু তা হয়তো উল্কাপিণ্ড থেকে প্রাপ্ত লৌহই হবে। আনুমানিক 3100 খৃঃ পূর্বাব্দে নির্মিত মিশরীয় পিরামিডের অভ্যন্তরে কিছু লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে লৌহ-নিষ্কাশনবিদ্যা ও লৌহশিল্পের প্রথম প্রসার ঘটে এসিয়া-মাইনর অঞ্চলে; সেখান থেকে লৌহশিল্প ও লৌহের ব্যবহার ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় বৈদিক যুগে লৌহের ব্যবহার সুরু হয়েছে, যজুর্বেদে তার উল্লেখ আছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, খৃঃ পূঃ আনুমানিক এক হাজার বছর পূর্ব থেকে লোহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং লৌহযুগের আবির্ভাবে মানব-সভ্যতা দ্রুত অগ্রসর হয়। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা লৌহেরই দান; **লৌহযুগ** এখনও চলছে। তবে অনেকে বলেন, বর্তমানে আমরা প্লাষ্টিক-যুগে প্রবেশ করেছি।

মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে রাসায়নিক জ্ঞানের ক্রমপরিণতি কেবল প্রস্তরশিল্প, মৃৎশিল্প, বিভিন্ন ধাতু ও সংকর-ধাতু আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। মানুষের রাসায়নিক তৎপরতার একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হলো কাচের আবিষ্কার। **কাচের** আবিষ্কার সুপ্রাচীন; পশ্চিম এশিয়াই এর আদি জন্মস্থান বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। বোগ্দাদের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে আনুমানিক খৃঃ পূঃ 2450 অব্দের একটি প্রাচীন কবরখানা খুঁড়ে রঙ্গীন কাচের অনেকগুলি পুঁতি পাওয়া গেছে। মেসোপটিমিয়া ও মিশরেও বিভিন্ন রং-য়ের কাচের পানপাত্র ও পুঁতি, বালা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণ মনে করেন, মসৃণ মৃৎপাত্র তৈরী করবার প্রচেষ্টায় আকস্মিকভাবে কাচ আবিষ্কৃত হয়েছিল। বালি, সোডা ও চুনঘটিত মৃত্তিকা (সাজিমাটি) আকস্মিকভাবে কোনক্রমে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে কাচের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। যাহোক, পরবর্তীকালে কাচশিল্পের

উন্নতি ও প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর; ফিনিশীয় বণিকদের মাধ্যমে কালক্রমে এই শিল্প নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালে কাচ অবশ্য সবই ছিল রঙ্গীন ও অস্বচ্ছ; আর কাচের দ্রব্যাদি সে-যুগেও ছাঁচে ঢেলেই তৈরী হতো। স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ কাচ তৈরীর রাসায়নিক বিদ্যা অনেক পরবর্তীকালে

মিশরীয় কাচ-শিল্পীদের কর্মশালার প্রাচীন চিত্র

মানুষ আয়ত্ত করেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমিত হয়েছে, ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন প্রকার কাচদ্রব্য তৈরীর কারিগরি-বিদ্যা ফিনিশীয় কাচশিল্পীদের হাতে খৃঃ পূঃ মাত্র 250 থেকে 100 অব্দের মধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিল।

উল্লিখিত সব রাসায়নিক শিল্পবিদ্যা ছাড়াও বনজ লতাপাতা ও শিকড়-বাকড়ের জৈব রাসায়নিক গুণের তথ্যও আদিম যুগের মানুষের জানা ছিল, একথা স্বভাবতঃই অনুমান করা চলে। মানব-দেহে আধি-ব্যাধির প্রকোপ সেকালেও ছিল, আর তার উপশমের জন্যে আদিম যুগের মানুষও বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও লতা-গুল্মের বিশেষ বিশেষ রোগ-নিরাময়কারী গুণের চর্চা করতো। উদ্ভিজ্জ পদার্থের রস, ক্বাথ প্রভৃতি দিয়ে তারা রোগ-চিকিৎসার চেষ্টা করতো, একথা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। পশ্চিম-এসিয়ার কোন কোন স্থানে নব্য প্রস্তর-যুগের পাথুরে খল ও নোড়া আবিষ্কৃত হয়েছে; এগুলি চিকিৎসার কাজে লতা-গুল্মের রস বার করতে ব্যবহৃত হতো বলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত অনুমান করেছেন। এরূপ আদিম প্রয়াস থেকেই ক্রমে **চিকিৎসা-রসায়নের** (Iatro-Chemistry) উদ্ভব হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। রসায়ন-চর্চার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা পাই প্রাচীন মিশরের

মামি-শিল্পে। মিশরের পিরামিডগুলোর অভ্যন্তরে প্রাচীন মিশর-সম্রাটদের কয়েক হাজার বছরের মৃতদেহ অবিকৃত বিশুদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে। যে-সব আরক, ঔষধ প্রভৃতির প্রয়োগে মৃতদেহের এরূপ সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে, তা সেই প্রাচীন যুগের মিশরীয়দের উন্নত রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে, সন্দেহ নেই। এমন কি, এই মামি-শিল্পের প্রকৃত তথ্য বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও রসায়ন-বিজ্ঞানের বিস্ময়।

আদি প্রস্তর-যুগ থেকে ব্রোঞ্জ-যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ধারায় হাজার হাজার বছরে মানব-সভ্যতা, তথা রাসায়নিক তৎপরতার যে সামান্য অগ্রগতি অসম্বদ্ধ ও প্রয়োজন-ভিত্তিকভাবে গড়ে উঠেছে তার কিছু পরিচয় দিতে আমরা এতক্ষণ চেষ্টা করেছি। প্রকৃত বিজ্ঞান বলতে যা এখন আমরা বুঝি, তা এ-সব রাসায়নিক তৎপরতার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই সত্য; তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, রসায়ন-বিজ্ঞানের আদি-পর্ব সুদূর অতীতে প্রসারিত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে এ-কথা বহুলাংশে প্রমাণিত হয়েছে।

আদিম যুগের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন আঞ্চলিক জ্ঞান ও তৎপরতা ক্রমে ব্রোঞ্জ-যুগের খৃঃ পূঃ আনুমানিক 2500 বছরের অনুরূপকালে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এসে অনেকটা সমতা লাভ করেছিল এবং বহুলাংশে মানব-সভ্যতার যুগোপযোগী কিছুটা সুষম বিকাশ ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে উত্তর আফ্রিকার নীল নদের নিম্ন অববাহিকায় মিশর অঞ্চলে, পশ্চিম এশিয়ার ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী সিরিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি ভূ-ভাগে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে সিন্ধু উপত্যকায় **মহেঞ্জোদারো** ও **হরাপ্পা** অঞ্চলে ব্রোঞ্জ-যুগের উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এ-সব নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ওই সব অঞ্চলে খৃঃ পূঃ আনুমানিক 3000 থেকে 2500 বছরের মধ্যে উন্নত নগর-সভ্যতাও গড়ে উঠেছিল। তৎকালের প্রশস্ত রাজপথ, বৃহৎ প্রাসাদ, মন্দির, সমাধিক্ষেত্র সহ বহু প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ ভূ-নিম্নে আবিষ্কৃত হয়েছে। মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলিও এই যুগেরই কীর্তি। নানা রকমের সুগঠিত বিচিত্র মৃন্ময় পাত্র, ব্রোঞ্জনির্মিত যুদ্ধাস্ত্র, স্বর্ণ, পিতল ও তাম্র ধাতুর অলঙ্কার, কৃষিক্ষেত্র ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত তাম্র ও ব্রোঞ্জনির্মিত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত সভ্যতার বহু নিদর্শন নানা স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তৎকালের লৌহনির্মিত কোন দ্রব্যের

নিদর্শন তেমন কিছু পাওয়া যায় নি, কারণ লৌহের ব্যবহার এই যুগে অজ্ঞাত ছিল। এ-থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়, উল্লিখিত মানব-সভ্যতা লৌহযুগের পূর্ববর্তী ব্রোঞ্জযুগের পরিচয় বহন করে। মিশর, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া এবং ভারতের মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা অঞ্চলে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি মোটামুটি সমপর্যায়ের, কাজেই সমকালীন বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমিত হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু-অববাহিকায় মহেঞ্জোদারো ও পাঞ্জাবে হরাপ্পা নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় ব্রোঞ্জযুগের আনুমানিক খৃঃ পূঃ 2500 বছরের পুরাতন সভ্যতার যে-সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে তৎকালীন রাসায়নিক তৎপরতারও যথেষ্ট পরিচয় মিলেছে। নানা বর্ণের ও নানা আকারের যে সব চিত্রবিচিত্র মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তা বেশ উন্নত ধরনের কারিগরি ও রাসায়নিক তৎপরতার পরিচায়ক। মৃন্ময় পাত্রগুলির লাল, কালো ও সবুজ বর্ণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা গেছে, সেগুলি পোড়ানোর ভাটিতে বায়ু-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মৃত্তিকার জারণ ও বিজারণের কার্যকারিতা সে-যুগের কুম্ভকারেরা অবগত ছিল এবং বিভিন্ন মৃত্তিকায় মিশ্রিত বিভিন্ন ধাতব উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তারা অবহিত ছিল। আবার অভ্র, চুন ও বালির সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক রকম প্রলেপ মাখিয়ে সে-যুগের মানুষেরা তাদের মৃন্ময় দ্রব্যাদি মসৃণ ও চক্‌চকে করতে জানতো, আর পোড়ানোর পরে ঠাণ্ডা হতে গিয়ে মৃৎপাত্র ফেটে না যায় তার জন্যে এক ধরনের 'টেম্পারিং' করবার কৌশলও তারা আয়ত্ত করেছিল। মৃৎপাত্রের উপরে নানা বর্ণের কারুচিত্র থেকেও তাদের রাসায়নিক তৎপরতার উল্লেখযোগ্য পরিচয় মেলে।

মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত চিত্রবিচিত্র মৃন্ময় পাত্র

মিশর, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে অস্বচ্ছ ও রঙ্গীন কাচের দ্রব্যাদি পাওয়া গেলেও সিন্ধু উপত্যকার

মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার সমকালীন সভ্যতায় কাচ ব্যবহারের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু কাচের মত চক্‌চকে ও মসৃণ এক রকম **চীনামাটির** পাত্রাদি এই অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক পাওয়া গেছে। এগুলি সে-যুগের উন্নত রাসায়নিক তৎপরতার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। আবার মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে জানা গেছে, ইট পুড়িয়ে চুন ও বালির জলীয় 'প্লাস্টার' দিয়ে গেঁথে বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছিল। কোথাও আবার চুন ও বালির সঙ্গে **জিপ্‌সাম** (ক্যালসিয়াম সাল্‌ফেট) পাথরের চূর্ণ ব্যবহারের নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়েছে। এথেকে জানা যায়, সেই প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জযুগেও মানুষ গৃহ-নির্মাণে ব্যবহার্য বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল।

মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে-কালের ধাতুশিল্পের বহু নিদর্শনও পাওয়া গেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল ও ব্রোঞ্জের নানা প্রকার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু লৌহের ব্যবহার সে-যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যময় অলঙ্কার, তাম্র, পিতল ও ব্রোঞ্জের তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতির গঠন লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, খনিজ পদার্থ থেকে **ধাতু নিষ্কাশন** পদ্ধতি, **সংকর-ধাতু** উৎপাদন ও ধাতু ঢালাইয়ের কৌশল সে-যুগের মানুষ মোটামুটি আয়ত্ত করেছিল। মোটকথা, রসায়নের বিশেষ শাখা ধাতু-বিদ্যায় তৎকালীন মানুষ যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল, বলা চলে। আবার সিন্ধু উপত্যকার সেই
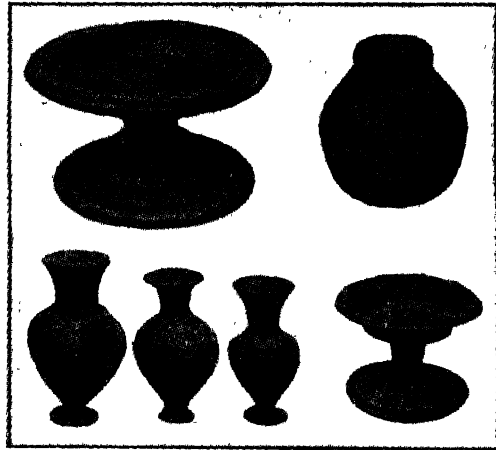
মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরী তৈজসপত্র

প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে রোগ-চিকিৎসায় ঔষধ হিসেবে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক গুণের তথ্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেছে। মাটির পাত্রে সংরক্ষিত অবস্থায় কয়লার মত কালো এক রকম কঠিন পদার্থ মহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। পদার্থটা জলে দ্রবীভূত করলে গাঢ় বাদামী রং-এর দ্রবণ তৈরী হয়। আয়ুর্বেদোক্ত শিলাজতুর সঙ্গে পদার্থটার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। এই শিলাজতু বা শিলাজিৎ পেটের পীড়া, বাত, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের একটি ফলপ্রদ ঔষধ। মুখবন্ধ মাটির পাত্রে রক্ষিত কতকগুলি হাড় হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষের এক জায়গায় পাওয়া গেছে, সেগুলি এক প্রকার মৎস্যজাতীয় সামুদ্রিক জীবের অস্থি বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই হাড় চিবোলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং দেখা গেছে, গলদেশের পীড়ায় এর ঘষিত প্রলেপ বেশ ফলপ্রদ ঔষধরূপে কাজ করে। এ-সব ছাড়া গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি জন্তুর শিঙ্, বিভিন্ন লতা-গুল্ম, প্রবাল ও মুক্তা সে-যুগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতো বলে অনুমান করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এ-সব দ্রব্যাদির ঔষধ-গুণের বহু উল্লেখ আছে। এ-থেকে পুরাতাত্ত্বিকেরা অনেকে মনে করেন, পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদ বা ভারতীয় **চিকিৎসা-রসায়নের** মূল সুদূর অতীতে প্রাচীন ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতা-কাল পর্যন্ত প্রসারিত।

এতক্ষণ আমরা মানব-সভ্যতার ঊষাকাল থেকে ব্রোঞ্জ-যুগীয় সিন্ধু সভ্যতার কাল পর্যন্ত মানুষের রাসায়নিক বুদ্ধি ও তৎপরতার ক্রমবিকাশের কিছু কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন যুগের পুরাতাত্ত্বিক বিবিধ নিদর্শন থেকে মানব-সভ্যতার যে অতীত অলিখিত ইতিহাস নির্ণীত হয়েছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে, মানবজাতির অর্জিত বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথা রাসায়নিক তৎপরতা কোন একটি বিশেষ যুগের কোন একটি বিশেষ জাতির দান নয়। হাজার হাজার বছরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং সুদূর অতীত থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে। কাজেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকের মতানুসারে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর অনুরূপ কালে গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতদের অভ্যুত্থানের পূর্বে রসায়ন-চর্চার অস্তিত্ব ছিল না, একথা কোন মতেই যুক্তিসহ বিবেচিত হয় না। তাদের মতে লিউসিপ্পাস, ডিমোক্রিটাস, **প্লেটো, অ্যারিস্টটল** প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদের

আগে রসায়ন-বিদ্যার উদ্ভব হয়নি। গ্রীক-সভ্যতার অন্ততঃ দু'হাজার বছর, এমন কি, তারও আগে থেকে বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক জাতি তাদের রাসায়নিক তৎপরতা ও মননশীলতার যে-সব স্বাক্ষর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে রেখে
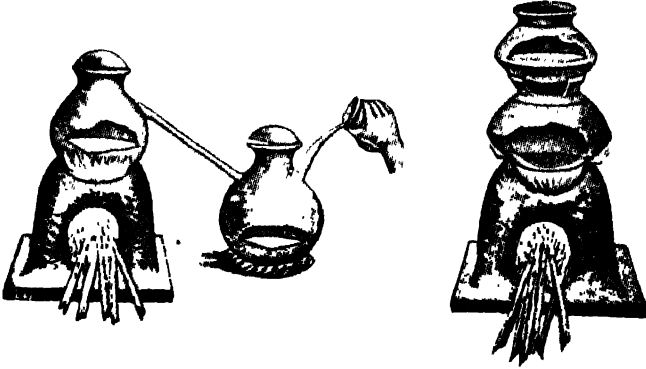
ভারতীয় বৈদিক যুগে চিকিৎসা-রসায়নের চর্চায় ব্যবহৃত কয়েকটি প্রক্রিয়া
--পাতন ও ভাপন পদ্ধতি

গেছে তা অস্বীকার করলে রসায়নের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে হয়। যে-সব প্রাচীন জাতি উন্নত মৃৎশিল্প, চিনামাটি ও কাচের দ্রব্যসম্ভার, নানাবিধ রং প্রভৃতির প্রস্তুতি ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে যে-সব আশ্চর্য রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিল---স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশন, বিগলন ও ঢালাই শিল্প এবং পিতল ও ব্রোঞ্জ সংকর-ধাতুর উৎপাদন ও ব্যবহারের দ্বারা ধাতু-বিদ্যার গোড়াপত্তন করেছিল—মিশরীয় মমি-শিল্পে ব্যবহৃত আরকাদি প্রস্তুতির ভিতর দিয়ে আদিম মানুষ যে বিশেষ রাসায়নিক পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেছে, তাদের কালে রসায়ন-বিদ্যার চর্চা ছিল না, বিভিন্ন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি দৃষ্টে এ-কথা কোন মতেই যুক্তিসহ মনে হয় না। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয়, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের অর্জিত রসায়নের ব্যবহারিক জ্ঞান বরং পরবর্তী গ্রীকদের চেয়ে অনেকাংশে উন্নত ছিল বলেই মনে হয়। প্রাক্‌গ্রীসীয় যুগের রাসায়নিক তৎপরতার কোন লিখিত ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু তার বহু বিচিত্র নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় সে-যুগের আদিম মানুষের রাসায়নিক জ্ঞানের অনেক উল্লেখ-যোগ্য স্বাক্ষর রয়ে গেছে।

তবে এ-কথা সত্য যে, রসায়ন-বিজ্ঞান বলতে আমরা এখন যা বুঝি, সেই পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষালব্ধ রসায়নের সুসম্বদ্ধ তত্ত্বগত জ্ঞানের চর্চা প্রাক্‌গ্রীসীয় যুগে ছিল না। গ্রীক-সভ্যতার পূর্ববর্তী যুগের মানুষ তার জীবন-যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধি ও স্বাভাবিক ঔৎসুক্যবশতঃ কেবল ব্যবহারিক রসায়ন-শিল্পের তৎপরতায় ব্যাপৃত ছিল; রসায়নের তত্ত্বীয় জ্ঞানের চর্চা সে-যুগে ছিল অজ্ঞাত। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর অনুরূপকালে গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতেরা জড় বস্তুর সাংগঠনিক স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত গুণাগুণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বীয় জ্ঞানের চর্চার ভিতর দিয়ে প্রকৃত রসায়ন-বিদ্যার সূচনা করেন। অবশ্য জড় প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধীয় নানা দার্শনিক যুক্তি ও মতবাদের মধ্যেই গ্রীকদের রসায়ন-চর্চা প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল, রসায়ন-বিদ্যার ব্যবহারিক ও বাস্তব উৎকর্ষ গ্রীক-সভ্যতার যুগে তেমন কিছু ঘটেনি। এর কারণ, গ্রীক পণ্ডিতদের রসায়ন-চর্চা প্রধানতঃ ছিল যুক্তিসর্বস্ব, বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে তাঁদের মতবাদের সত্যতা যাচাই করবার প্রয়াস গ্রীকদের অল্পই ছিল। কালক্রমে প্রাচীন জাতিগুলির প্রবর্তিত ব্যবহারিক রসায়নের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে গ্রীকদের তত্ত্বীয় মতবাদের মিলন ঘটে এবং পরবর্তীকালে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারিক ও তত্ত্বীয় জ্ঞানের সমন্বয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রকৃত রসায়ন-বিদ্যার চর্চা সুরু হয়। সংক্ষেপে এই হলো আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের সূত্রপাতের গোড়ার কথা। রসায়নের ক্রমবিকাশের এই সন্ধিক্ষণের বহুমুখী মতবাদ ও তৎপরতা সম্বন্ধে এখন আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

পদার্থের গঠন ও উপাদান

(দার্শনিক মতবাদ)

বিভিন্ন জড় পদার্থের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কারই প্রকৃত রসায়ন-বিদ্যা নয়; পরন্তু সে সব অসংলগ্ন তথ্যসমূহের পশ্চাতে জড় প্রকৃতির যে মূল সাংগঠনিক রহস্য ও কার্যকরী নিয়ম-শৃঙ্খলা ক্রিয়াশীল রয়েছে তার পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করাই হলো রসায়ন-বিদ্যার চরম লক্ষ্য। রাসায়নিক তৎপরতায় এই আদর্শ ও চিন্তাধারা খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিকেরাই প্রথম প্রচার করেন। রসায়নের চর্চা ও গবেষণায় উৎপাদিত পদার্থের চেয়ে সেই উৎপাদন-ক্রিয়ার অন্তরালে জড় বস্তুর যে-সব ধর্ম ও অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে সে-সবের তত্ত্বানুসন্ধানের মধ্যেই রসায়ন-বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা ও অগ্রগতির সম্ভাবনা নিহিত।

গ্রীক দার্শনিকদের এই তত্ত্বভিত্তিক রসায়ন-চর্চার উদ্যম থেকে জড় বস্তুর গঠন সম্পর্কে নানা মতবাদের উদ্ভব হয় এবং তত্ত্বীয় রসায়ন-বিদ্যার সূত্রপাত ঘটে। জড় প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদের মূলে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ যুক্তি ও উন্নত কল্পনার পরিচয় মেলে, কিন্তু বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সে-সব মতবাদের সত্যতা প্রমাণ ও বাস্তব সমাধানের বিশেষ প্রয়াস গ্রীকদের মধ্যে তেমন ছিল না। কাজেই তাঁদের হাতে রসায়ন-বিদ্যার ব্যবহারিক উন্নতি তেমন কিছু হয় নি, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকদের প্রবর্তিত আদর্শ ও চিন্তাধারা প্রকৃত রসায়ন-চর্চার দিঙ্‌নির্ণয় করে দিয়েছে এবং রসায়ন-বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতির সূচনা করেছে। এদিক থেকে গ্রীক-সভ্যতার যুগেই আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, এ-কথা অবশ্য বলা যেতে পারে।

জড় পদার্থের মূলগত গঠন ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের রহস্য সমাধানে কেবল গ্রীক দার্শনিকেরাই নয়, প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের তৎকালীন চিন্তাশীল মনীষীরাও নানারূপ কল্পনা ও মতবাদ প্রচার করেছেন। তবে গ্রীক-সভ্যতার যুগে পদার্থের রাসায়নিক স্বরূপ সম্পর্কীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার একটা উন্নত বিকাশ এবং প্রাকৃতিক রহস্য সমাধানের অনেকটা সুসম্বদ্ধ ও বলিষ্ঠ ধারণার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল। জড় প্রকৃতির মূলগত সত্তা উপলব্ধি ও তার বহুধা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য-সূত্রের সন্ধান করে জড় প্রকৃতিকে জানবার ও বুঝবার প্রয়াস প্রধানতঃ গ্রীক-সভ্যতার যুগেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। কেবল রসায়নই নয়, বিভিন্ন বিজ্ঞানে গ্রীক-দার্শনিকদের চিন্তাধারা ও মননশীলতা ক্রমে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে খৃঃ পূঃ আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে। জড় জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে গ্রীকদের বিভিন্ন মতবাদ পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হলেও তাঁদের এই প্রয়াস উন্নত মননশীলতার পরিচয় বহন করে। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর দার্শনিক **থালেস** নানা যুক্তি দিয়ে প্রচার করেছিলেন, জল থেকেই জড় প্রকৃতির উদ্ভব, অর্থাৎ জলই পার্থিব বিবিধ জড় বস্তুর মূল উপাদান। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অ্যানাক্সিমেনস্ নানা যুক্তিসহকারে বলেন, জড় জগতের মৌলিক উপাদান জল নয়, বায়ু; বায়ু ঘনীভূত হয়ে প্রথমে জল ও পরে মৃত্তিকার সৃষ্টি করেছে। এর পরে খৃস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে দার্শনিক **এম্পিডক্লেস** পদার্থের স্বরূপ ও গঠন-রহস্যের আর এক মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও অগ্নি এই মৌলিক

উপাদান-চতুষ্টয়ের বিভিন্ন সমন্বয়ে জড় জগতের বিভিন্ন বস্তু গঠিত। এ-সব মতবাদের মূলে সৃষ্টি-রহস্যের এক-এক রকম দার্শনিক যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল সত্য, কিন্তু পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব-জনিত বিভ্রান্তিই ক্রিয়াশীল ছিল। জড় জগতের সংগঠনে কল্পিত ঐ-সব উপাদানগুলির কোনটিই যে মৌলিক পদার্থ নয়, সে-যুগে তা প্রমাণ করবার উপায় ছিল না। যাহোক. এ-সব মতবাদের প্রায় সমসাময়িক কালে প্রাচীন আর্য-সভ্যতার যুগে ভারতেও জড় প্রকৃতির মৌলিক উপাদান হিসাবে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই **পঞ্চভূতের** ধারণা প্রসার লাভ করেছিল।

এভাবে গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন যুক্তি-আশ্রয়ী মতবাদের ভিতর দিয়ে জড় বস্তুর গঠন ও উপাদান সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা ক্রমে সুসম্বদ্ধ ও উন্নততর হয়ে ক্রম-পরিণতির পথে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হতে থাকে।

পদার্থের আণবিক তত্ত্ব ঃ অণু-পরমাণু

খৃস্ট-পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস প্রায় সমসাময়িক কালে জড় বস্তুর সংগঠনে অণুর কল্পনা করেন। এঁরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। এই দুই পণ্ডিতের পৃথকভাবে পরিকল্পিত আণবিক মতবাদের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য ও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, এবং এঁদের উভয়ের মতবাদের সমন্বয়ে **গ্রীক আণবিক তত্ত্ব** পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো ঃ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য মূল বস্তু-কণা বা পরমাণুর সংযোগে প্রকৃতির প্রতিটি পদার্থ গঠিত। পরমাণুদের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই, অনন্তকাল ধরে বিভিন্ন অবস্থান-বিপর্যয় ও ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়ে পরমাণুরা বিরাজমান রয়েছে ও থাকবে। আকারে-প্রকারে বিভিন্নতা থাকলেও পরমাণুদের মৌলিক প্রকৃতি ও সার-বস্তু অভিন্ন। অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর পারস্পরিক মিলনে বিভিন্ন যৌগিক জড় বস্তুর উৎপত্তি, আবার প্রস্তর, মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতি সব জড় বস্তুর অভ্যন্তরেই পরমাণুরা নিয়ত স্পন্দিত ও গতিশীল অবস্থায় রয়েছে। এই পারমাণবিক মতবাদ অনুসারে প্রত্যেকটি জড় বস্তুর গঠন ও গুণাবলীর প্রকাশ এক সুসম্বদ্ধ নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ; এবং প্রকৃতির সর্বত্রই একটা কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। জড় প্রকৃতির গঠন-রহস্যের এরূপ তাত্ত্বিক

বিশ্লেষণ গ্রীক-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের অণু-পরমাণু মতবাদের সঙ্গে এর প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এর প্রায় দু'হাজার বছর পরে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডাল্টন, অ্যাভোগেড্রো প্রমুখ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে পদার্থের গঠন সম্পর্কে যে অণু-পরমাণুর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে **লিউপিপ্‌সাস ও ডিমোক্রিটাস** কেবল দার্শনিক যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির বলে প্রায় অনুরূপ মতবাদ উপস্থাপিত করেছিলেন, গ্রীক চিন্তাধারা ও মননশীলতার এটি একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। এই আণবিক মতবাদ অনুসৃত হলে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রসায়ন-বিদ্যার অগ্রগতি অনেক আগেই দ্রুততর হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উক্ত আণবিক মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন এবং তাঁরা তাঁদের আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে এই মতবাদের অকাল-মৃত্যু ঘটান। এর ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বস্তুতঃ দু'হাজার বছরেরও বেশি পিছিয়ে যায় এবং ডালটনীয় যুগে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্লেটো ছিলেন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যমণি। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর চিন্তাধারা ও মননশীলতা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল; কিন্তু লিউপিপ্‌সাস ও ডিমোক্রিটাসের উদ্ভাবিত অণু-পরমাণুবাদের সাহায্যে জড় জগতের গঠন-রহস্যের ব্যাখ্যাকে তিনি একেবারেই আমল দেন নি। পরবর্তী গ্রীক মনীষী অ্যারিস্টটলও ছিলেন অশেষ প্রতিভাধর, প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি ছিলেন গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডারের শিক্ষাগুরু এবং তৎকালীন গ্রীক-সভ্যতার ধারক ও বাহক। বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে তাঁর বিবিধ অবদান সত্ত্বেও তিনি জড় বস্তুর গঠন-রহস্যের সমাধানে যুক্তি-বিরোধীই থেকে যান। অ্যারিস্টটল তাঁর পূর্ব শতাব্দীর দার্শনিক এম্পিডক্লেসের জল-বায়ু-মৃত্তিকা-অগ্নি এই মৌলিক চতুষ্টয়ের মতবাদেই আস্থাবান ছিলেন। তবে তিনি এই মতবাদের পরিপোষক হিসাবে 'ইথার' নামে সর্বব্যাপী এক অপ্রাকৃত পদার্থের অস্তিত্বের কল্পনা করেন, যার মাধ্যমে এম্পিডক্লেসের মৌলিক চতুষ্টয়ের ধারক—শৈত্য, আর্দ্রতা, উত্তাপ ও শুষ্কতা—এই মূল সত্তা-চতুষ্টয়ের পারস্পরিক দ্বি-যুগ্ম সমাবেশে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে বলে প্রচার করেন। আশ্চর্যের কথা, এই মতবাদে মৌলিক চতুষ্টয়কে বাস্তব পদার্থরূপে গণ্য করা হতো না, কেবল তাদের উল্লিখিত বিশিষ্ট গুণ ও সত্তার

বিভিন্ন আনুপাতিক সমাবেশে বিভিন্ন জড় বস্তু গঠিত বলে মনে করা হতো। জড় জগতের গঠনে অ্যারিস্টটলের এই উদ্ভট ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীতে **রবার্ট বয়েলের** সময় পর্যন্ত রসায়ন-চর্চার ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। এমন কি, তার পরেও পাশ্চাত্য জল-বায়ু-মৃত্তিকা-অগ্নি রূপী মৌলিক চতুষ্টয়ের এবং প্রাচ্যে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম নামীয় পঞ্চভূত বা মৌলিকের ধারণা সাধারণ মানুষের মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। যাহোক, আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের আলোকে এ-সব মৌলিকেরা তাদের মৌলিকত্ব সম্যক হারিয়েছে। পদার্থের সংগঠনে অণু-পরমাণু সম্পর্কিত তথ্য, এমন কি, পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্যও বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে আজ সন্দেহাতীতভাবে সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এ-সব কথা পরে 'পদার্থের পারমাণবিক গঠন ও তেজস্ক্রিয়তা' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো।

অ্যাল্‌কেমি যুগ

গ্রীক দার্শনিকদের প্রবর্তিত জড় বস্তুর গঠন-রহস্যের উল্লিখিত বিবিধ তত্ত্বগত চিন্তাধারায় রসায়ন-বিদ্যার প্রকৃত অগ্রগতি তেমন কিছু হয় নি সত্য, কিন্তু রসায়নের মূল সূত্রের একটা অস্পষ্ট ইংগিত তা থেকে মিলেছিল। অ্যারিস্টটলের মতবাদে ছিল, জড় বস্তু মাত্রই বিভিন্ন মুখ্য ধর্ম বা গুণাবলীর বিভিন্ন আনুপাতিক সমাবেশে গঠিত এবং সেই গুণাবলী এক বস্তু থেকে অপসারিত করে অন্য বস্তুতে আরোপ করা যায়। কাজেই তা থেকে পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে। তাহলে তো নিকৃষ্ট ধাতু সীসাকে চেষ্টা করলে উৎকৃষ্ট ধাতু সোনাতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে! এই ধারণা নিয়ে এক শ্রেণীর তথাকথিত রসায়নবিদ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। এরাই পরে **অ্যাল্‌কেমিস্ট** নামে পরিচিত হন, এবং তাঁদের প্রবর্তিত রাসায়নিক ক্রিয়াকাণ্ড 'অ্যালকেমি' নামে অভিহিত হয়। 'কেমিয়া' বা 'কিমিয়া' হলো একটা গ্রীক শব্দ, যার মূলগত অর্থ হলো 'সোনা তৈরীর কৌশল', পরে কালক্রমে এর সঙ্গে আরবদের দেওয়া 'অ্যাল' শব্দটি যুক্ত হয়ে **অ্যাল্‌কেমি** কথাটার উদ্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ নিকৃষ্ট ধাতুগুলিকে সোনায় রূপান্তরিত করবার প্রয়াস থেকেই এই অ্যালকেমি, বা কিমিয়া-বিদ্যার চর্চা সুরু হয়েছিল। খেপার পরশ-পাথর খোঁজার মত অ্যাল্‌কেমিস্টদের সোনা

তৈরীর চেষ্টা সফল হয় নি সত্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে ক্রমে রসায়ন-চর্চার একটা বিধিবদ্ধ ধারা প্রবর্তিত হতে সুরু করেছিল।

খৃস্ট-পূর্ব কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই মিশরীয় শিল্পীরা বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন ও তাদের ব্যবহার, ধাতুর গায়ে উজ্জ্বল রং ধরানো, বিভিন্ন সংকর-ধাতু উৎপাদন প্রভৃতি কাজে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। বিশেষতঃ তাদের উৎপাদিত কোন কোন সংকর-ধাতু নকল সোনার মত দেখাতো। খৃষ্টীয় যুগের

গবেষণাগারে পরীক্ষারত অ্যাল্‌কেমিস্ট

প্রথম ভাগে ধাতু-বিদ্যায় মিশরীয়দের এই কারিগরি-জ্ঞানের সঙ্গে গ্রীক দার্শনিক-দের, বিশেষতঃ পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধীয় অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের একটা ভাব-সমন্বয় ঘটে আলেকজান্দ্রিয়ায়। এর থেকে ক্রমে নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায়

রূপান্তরিত করবার পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা রসায়ন-চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। এই নূতন ভাব-ধারার সঙ্গে আবার কালক্রমে জ্যোতিষী, তুক্-তাক ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাব যুক্ত হয়ে পশ্চিম এসিয়া ও ইউরোপে এক রকম অদ্ভুত ও উদ্ভট জ্ঞান-চর্চার উদ্ভব হয়। এই হলো অ্যালকেমি যুগের উৎপত্তি ও ক্রিয়াকলাপের গোড়ার কথা। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে অ্যালকেমি-চর্চার ধারা ক্রমে সিরিয়া, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এসে আরব দেশে পৌঁছায়।

প্রথম দিকে অ্যালকেমিস্টদের রসায়ন-চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করা। একটা ভুল ধারণার বশে তারা এরূপ অবাস্তব পথে চালিত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, প্রকৃতির বিরাট কর্মশালায় পদার্থ-সৃষ্টির ক্রমধারার শেষ ধাপ হলো সোনা, যা প্রকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশেষ অবদান. নিকৃষ্ট ধাতুগুলি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে রূপান্তরিত হতে হতে শেষে সোনায় পরিণত হয়েছে। তাঁদের ধারণা ছিল, জীব-জগতে যেমন জন্ম, বৃদ্ধি ও শেষ পরিণতি রয়েছে, খনিজ পদার্থগুলিও তেমনি ভূ-গর্ভে জন্মায়, বৃদ্ধি পায় ও সোনায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করে রূপান্তরের ধারায়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় উৎকৃষ্ট ধাতু সোনা ও রূপা প্রায় ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ধাতু তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি ঘটিত খনিজের সঙ্গে মিশ্র অবস্থায় পাওয়া যায়। এ থেকে তাঁদের ধারণা হয়, প্রকৃতির কারিগরি কৌশলে নিকৃষ্ট ধাতুরা ধীরে ধীরে উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ধারণার বশে অ্যালকেমিস্টরা প্রকৃতির এই কৌশলকে ত্বরান্বিত করে সোনা তৈরী করবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁরা বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ, জান্তব ও খনিজ পদার্থ পুড়িয়ে, জলে ফুটিয়ে, আগুনে গলিয়ে যথেচ্ছ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অনুশীলন সুরু করেন। নানা রকম নির্যাস ও আরক তৈরী করেন, সেগুলিকে নানাভাবে পাতিত ও পরিশোধিত করে নানা রকম পরীক্ষা করতে থাকেন। স্বর্ণোৎপাদনের আশায় তাঁরা এ-ভাবে নিকৃষ্ট ধাতুর রূপান্তরকারী রসায়ন ও **পরশ-পাথর** (Philosopher's stone) আবিষ্কারের চেষ্টা ছাড়াও শেষে নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র ও ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডের আশ্রয় নিতেও আরম্ভ করেন। অ্যালকেমিস্টদের কৃত্রিম সোনা তৈরীর এই উদ্যমকে আশ্রয় করে কয়েক শতাব্দী ধরে নানা দেশে এরূপ উদ্ভট রসায়ন, বা কিমিয়া-বিদ্যার চর্চা চলছিল।

অ্যালকেমিস্টরা যদিও নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় রূপান্তরিত করবার চেষ্টায়

সফল হন নি ; কিন্তু তাঁদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাসায়নিক কর্ম-কাণ্ডের ফলে আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার একটা অস্পষ্ট সূচনা গড়ে ওঠে। অ্যাল্‌কেমিস্টদের চেষ্টায়ই প্রকৃত রসায়ন-চর্চার মূল ভিত্তিস্বরূপ **সালফিউরিক, হাইড্রো-ক্লোরিক ও নাইট্রিক** অ্যাসিড প্রভৃতি বিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থগুলি তৈরী হয়েছিল। সে-যুগে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট ধারা প্রবর্তিত হয় নি ; কাজেই মনে হয়, নানা জিনিস নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা করতে করতে সহসা তারা গন্ধক থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড, বা 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল', লবণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, যাকে তাঁরা বলতেন 'স্পিরিট অব সল্ট' এবং সোরা থেকে বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড, বা 'অ্যাকোয়া ফোর্টিস' প্রস্তুতির পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ফেলেছিলেন। আবার সোনা গলাবার একমাত্র দ্রাবক **অ্যাকোয়া রিজিয়া** (এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ) প্রস্তুতির জন্যেও আমরা অ্যালকেমিস্টদের কাছে ঋণী। এ-ভাবে দেখা যায়, পরবর্তীকালে প্রকৃত রসায়ন-চর্চার সহায়ক বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও পদ্ধতি অ্যালকেমিস্টদের নকল সোনা তৈরীর উদ্যমের ফলেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। এ-সব তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মূলতঃ যত অবাস্তবই হোক না কেন, অ্যালকেমি-চর্চাই আধুনিক রসায়ন-চর্চার ভিত্তি রচনা করেছিল।
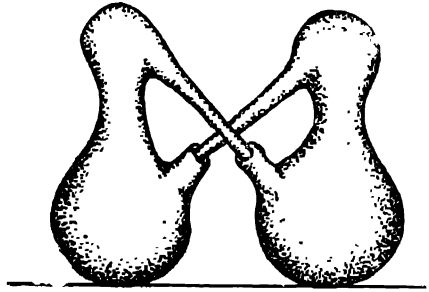
অ্যালকেমি-যুগে ব্যবহৃত যুগ্ম বক-যন্ত্র

সোনা তৈরীর চেষ্টার ভিতর দিয়ে পদার্থের কৃত্রিম রূপান্তর সম্বন্ধে অ্যালকেমিস্টদের ধারণা সে-যুগের পক্ষে যতই অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হোক না কেন, আধুনিক বিজ্ঞানে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ও রূপান্তর সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহের আলোকে ধারণাটাকে আজ আর তেমন আজগুবি মনে করবার কারণ নেই। সে-যুগে পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ ও গঠন সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান ছিল না, তাই অ্যালকেমিস্টরা বিপথে চালিত হয়েছিলেন এবং বৃথাই অন্ধকারে হাতড়েছিলেন। এ-কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, অ্যালবার্টাস ম্যাগ্‌নাস, রোজার বেকন প্রমুখ প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তিরাও অ্যালকেমি-চর্চায় উৎসাহী ছিলেন।

তবে তাঁরা একে তথ্যান্বেষণ ও জ্ঞান-চর্চার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু অধিকাংশ অ্যালকেমিস্ট কেবল স্বর্ণ-লিপ্সার বশেই অ্যালকেমি-চর্চায় মত্ত ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর বিফলতার নৈরাশ্যে শেষে তাঁরা সদসৎ জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। এ-ভাবে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যালকেমি-চর্চা কতকগুলি লোকের বুজরুকী, ছলনা ও প্রতারণার হাতিয়াররূপে দেখা দেয় এবং পাশ্চাত্য দেশগুলি সোনা তৈরীর বাজিকর, প্রবঞ্চক ও প্রতারকে ভরে যায়। আর তখন থেকে অ্যালকেমিস্টদের লোকে সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে।

যাহোক, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অ্যালকেমি-চর্চা বিশেষভাবে প্রতারণাপূর্ণ যাদুবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্রের কবলে পড়ে এবং স্বর্ণোৎপাদনের এই প্রচেষ্টা বুজরুকী বলে সবিশেষ নিন্দিত হয়ে ওঠে। এই সময় অ্যালকেমি-বিদ্যায় এক নূতন ধারার প্রবর্তন হয়। প্যারাসেল্‌সাস নামক এক প্রতিভাবান অ্যালকেমিস্ট প্রচার করেন, অ্যালকেমি-বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বর্ণোৎপাদন নয় ; এর কাজ হলো মানুষের আধি-ব্যাধির প্রতিকারের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করা। এর পরে থেকে জৈব-অজৈব বিভিন্ন বস্তুর রোগ-প্রতিকারক গুণাবলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতির প্রচেষ্টাই অ্যালকেমি-চর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেও চিরযৌবন-দায়ী মৃত্যুঞ্জয়ী **জীবন-রসায়ন** (elixir of life) প্রস্তুতির অবাস্তব প্রচেষ্টাও এক সময় সুরু হয়েছিল। যাহোক, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এভাবে অ্যালকেমি-বিদ্যা চিকিৎসা-রসায়নের পর্যায়ে চলে যায় এবং রসায়ন-চর্চার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বিদ্যা **আয়েট্রো-কেমিস্ট্রি** বা চিকিৎসা-রসায়ন নামে অভিহিত। প্যারা-সেল্‌সাসের প্রবর্তিত এই মতবাদ ও চিকিৎসা-রসায়ন চর্চার ফলে অ্যালকেমির প্রতি লোকের সন্দেহ ও ঘৃণা অনেকটা দূরীভূত হয় এবং রসায়ন-চর্চার এই নূতন ধারায় নবোদ্যমে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। আর এর ফলে রসায়নের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করে।

আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার জন্ম

(মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ)

প্যারাসেল্‌সাসের প্রবর্তিত 'আয়েট্রো' রসায়ন-বিদ্যাকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত অ্যালকেমি-বিদ্যা ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রারব্ধ নব্য রসায়ন-বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ বলা যায়। পদার্থের রাসায়নিক

স্বরূপ ও গঠন সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের চতুর্মৌলিক মতবাদ রসায়ন-চর্চার ক্ষেত্রে বহু শতাব্দী যাবৎ লোকের মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য অ্যারিস্টটলীয় এই মতবাদের অসারতা নিয়ে কথা ওঠে, অনেকে তার বিরোধিতাও করেন ; কিন্তু তা তেমন লোকগ্রাহ্য ও স্থায়ী হয় না। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীতে **রবার্ট বয়েল** অ্যারিস্টটলীয় মতবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন এবং বাস্তব পরীক্ষা-প্রসূত ব্যাখ্যার সাহায্যে তিনি পদার্থের রাসায়নিক স্বরূপ সম্পর্কীয় আধুনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। রবার্ট বয়েল ছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডের অধিবাসী, জন্ম 1627 খৃস্টাব্দ। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানে তাঁর মতবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তিনি 'রসায়নের জনক' বলে অভিহিত হন।

রবার্ট বয়েল বলেন, জড় প্রকৃতি মূলতঃ দুই শ্রেণীর পদার্থে গঠিত, মৌলিক ও যৌগিক। যে-সব পদার্থকে এযাবৎ কাল কোন কৌশলেই বিভাজিত, বা বিশ্লিষ্ট করে তাদের থেকে অপর কোন সরলতর পদার্থ পাওয়া সম্ভব হয় নি, তারা হলো মূল বা **মৌলিক পদার্থ।** সাধারণভাবে বলা যায়, মৌলিক পদার্থের এই সংজ্ঞা আজও গ্রাহ্য, কারণ বয়েল বলেছেন, যাদের এযাবৎ কাল বিশ্লিষ্ট করা যায় নি তারা মৌলিক পদার্থ ; বিশ্লিষ্ট করা যায় না, এ-কথা তিনি তাঁর সংজ্ঞায় বলেন নি। বয়েলের পরে বহু বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রচলিত বিভিন্ন যৌগিককে বিশ্লিষ্ট করে নূতন নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, আর তা বয়েলের সেই মৌলিক-যৌগিক সংজ্ঞার পর্যায়েই পড়েছে : বয়েলের প্রদত্ত সংজ্ঞা অভ্রান্ত রয়েছে। অবশ্য সর্বাধুনিক ইলেক্ট্রন-তত্ত্বের কথা স্বতন্ত্র।

রবার্ট বয়েল

যাহোক, বয়েল পদার্থের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলেছেন সেই পদার্থগুলিকে

কোন-না-কোন উপায়ে যাদের বিশ্লিষ্ট করে দুই বা ততোধিক পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলি হলো **যৌগিক পদার্থ ;** একাধিক মৌলিক পদার্থের মিলনে গঠিত জটিল পদার্থ। বয়েল এর একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী অ্যালকেমিস্টরা উন্মুক্ত পাত্রে পারদ উত্তপ্ত করে এক রকম লাল গুঁড়া পেয়েছিলেন। বয়েল দেখালেন, এটা একটা যৌগিক পদার্থ, কারণ, ঐ গুঁড়া উত্তপ্ত করলে পুনরায় তরল ধাতব পারদ ফিরে পাওয়া যায়, আর একটা বায়বীয় পদার্থ বেরোয়, যার সংস্পর্শে নিভন্ত কাঠের টুকরা তীব্র শিখায় জ্বলে ওঠে। এই বায়বীয় পদার্থটা পরে বায়ুর উপাদান 'অক্সিজেন' বলে পরিচিত হয়েছে। বয়েল বল্লেন, এই লাল গুঁড়া পারদ ও বায়ুর (অক্সিজেনের) মিলনে গঠিত একটা যৌগিক পদার্থ। এখন আমরা জানি, পারদ-ভস্মের এই লাল চূর্ণটা হলো 'রেড অক্সাইড অব মার্কারি'। তখনকার দিনে অক্সিজেন ও অক্সাইড কথাগুলি অবশ্য প্রচলিত ছিল না।

জড় প্রকৃতির স্বরূপ ও গঠন সম্পর্কে মৌলিক-যৌগিক সংক্রান্ত এই তত্ত্ব আজ অবশ্য রসায়নের প্রথম শিক্ষার্থীরাও জানে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে অ্যারিস্টটলীয় মতবাদের ভ্রান্তি অপনোদনের যুগসন্ধি-ক্ষণে রবার্ট বয়েলের মৌলিক-যৌগিক সংক্রান্ত এই তত্ত্বের গুরুত্ব রাসায়নিক চিন্তাধারায় অসাধারণ ছিল। যাহোক, বয়েলের পর থেকে বহু রসায়নবিদ বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন জড় বস্তু বিশ্লিষ্ট ও বিভাজিত করে এযাবৎ মূলতঃ 92-টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানে আরও কতকগুলি মূল কণিকা, বা মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন সংযোগ-বিয়োগেই আমাদের বিশ্ব-প্রকৃতি গঠিত। মৌলিক পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কয়েকটা ধাতু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটা গ্যাস নিয়ে মোটামুটি কুড়িটি মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে মুক্তাবস্থায় পাওয়া যায় ; আর অপর সবগুলিই পাওয়া যায় বিভিন্ন পরিমাণে পারস্পরিক সংযোগে সংযুক্ত অবস্থায় যৌগিকরূপে। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের যাবতীয় মৌলিকের মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকন (বালুকার মুখ্য উপাদান) রয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে, মৌলিক ও যৌগিক অবস্থায় এরা সমগ্র পার্থিব বস্তুর ওজনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দখল করে রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে-সব মৌলিক যেরূপ পরিমাণে (শতকরা) পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল ঃ

অক্সিজেন	··	50·02	লোহা	···	4·18
সিলিকন	···	25·80	ক্যালসিয়াম	···	3·22
অ্যালুমিনিয়াম	··	7·30	সোডিয়াম	···	2·36
পটাসিয়াম	···	2·28	টিটানিয়াম	···	0·43
ম্যাগ্নেসিয়াম	··	2·08	ক্লোরিন	···	0·20
হাইড্রোজেন	···	0·95	কার্বন	···	0·18

বিভিন্ন স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা-স্তরের গঠন মোটামুটি উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী হয়ে থাকে। নানাভাবে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে মৃত্তিকার গঠন বদলে যায়, যত গভীরে যাওয়া যায় মৃত্তিকা-স্তরের গঠনে সিলিকেট বা সিলিকন-ঘটিত পদার্থের পরিমাণ তত কমতে থাকে, আর লৌহ ও লৌহ-ঘটিত পদার্থের পরিমাণ তত বাড়তে থাকে। এ থেকে এরূপ মনে করা হয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীয় প্রদেশ প্রধানতঃ লৌহ ও নিকেল ধাতু-পিণ্ডে গঠিত।

যাহোক, রবার্ট বয়েলের প্রবর্তিত মৌলিক-যৌগিক সংক্রান্ত তত্ত্ব অল্প কালের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানীর অক্লান্ত চেষ্টায় জড় প্রকৃতির সংগঠক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, বা মূল উপাদানগুলি সুনির্দিষ্ট হয়। মৌলিকগুলির কেবল আবিষ্কারই নয়, তাদের পারমাণবিক ওজন ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও ক্রমে নিরূপিত হয়েছে। আমাদের পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য পারমাণবিক ওজন ও প্রতীক-সংকেত সহ মৌলিক পদার্থগুলির একটি তালিকা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো:

মৌলিক পদার্থসমূহের তালিকা

ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন	ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন
1	হাইড্রোজেন	H	1·008	7	নাইট্রোজেন	N	14·008
2	হিলিয়াম	He	4·003	8	অক্সিজেন	O	16·000
3	লিথিয়াম	Li	6·940	9	ফ্লোরিন	F	19·000
4	বেরিলিয়াম	Be	9·020	10	নিয়ন	Ne	20·183
5	বোরন	B	10·820	11	সোডিয়াম	Na	22·997
6	কার্বন	C	12·010	12	ম্যাগ্নেসিয়াম	Mg	24·320

ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন	ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন
13	অ্যালুমিনিয়াম	Al	26·970	44	রুথেনিয়াম	Ru	101·700
14	সিলিকন	Si	28·060	45	রোডিয়াম	Rh	102·910
15	ফস্ফরাস	P	30·980	46	প্যালাডিয়াম	Pd	106·700
16	সালফার	S	32·060	47	সিল্ভার	Ag	107·880
17	ক্লোরিন	Cl	35·457	48	ক্যাড্মিয়াম	Cd	112·410
18	আর্গন	A	39·940	49	ইণ্ডিয়াম	In	114·760
19	পটাসিয়াম	K	39·096	50	টিন	Sn	118·700
20	ক্যালসিয়াম	Ca	40·080	51	এণ্টিমনি	Sb	121·760
21	স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	45·100	52	টেলুরিয়াম	Te	127·610
22	টিটানিয়াম	Ti	47·900	53	আয়োডিন	I	126·920
23	ভ্যানাডিয়াম	V	50·950	54	জেনন	Ze	131·300
24	ক্রোমিয়াম	Cr	52·010	55	সিজিয়াম	Cs	132·910
25	ম্যাঙ্গানিজ	Mn	54·930	56	বেরিয়াম	Ba	137·360
26	আয়রন	Fe	55·850	57	ল্যান্থানাম	La	138·920
27	কোবাল্ট	Co	58·940	58	সিরিয়াম	Ce	140·130
28	নিকেল	Ni	58·690	59	প্রাসিওডিয়াম	Pr	140·920
29	কপার	Cu	63·570	60	নিওডিমিয়াম	Nd	144·270
30	জিঙ্ক	Zn	65·380	61	প্রমিথিয়াম	Pm	145·000
31	গ্যালিয়াম	Ga	69·720	62	সামারিয়াম	Sa	150·430
32	জার্মেনিয়াম	Ge	72·600	63	ইয়োরোপিয়াম	Eu	152·000
33	আর্সেনিক	As	74·910	64	গ্যাডোলিনিয়াম	Gd	156·900
34	সিলিনিয়াম	Se	78·960	65	টার্বিয়াম	Tb	159·200
35	ব্রোমিন	Br	79·920	66	ডিস্প্রোসিয়াম	Dy	162·460
36	ক্রিপ্টন	Kr	83·700	67	হোলমিয়াম	Ho	164·940
37	রুবিডিয়াম	Rb	85·480	68	আর্বিয়াম	Er	167·200
38	ষ্ট্রন্সিয়াম	Sr	87·630	69	থুলিয়াম	Tm	169·400
39	ইট্রিয়াম	Yt	88·920	70	ইটার্বিয়াম	Yb	173·040
40	জির্কোনিয়াম	Zr	91·220	71	লুটেসিয়াম	Lu	174·990
41	নিয়োবিয়াম	Nb	92·910	72	হ্যাপ্নিয়াম	Hf	178·600
42	মলিব্ডিনাম	Mo	95·950	73	ট্যাণ্টালাম	Ta	180·880
43	টেকনিসিয়াম	Tc	99·000	74	টাংস্টেন	W	183·920

ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন	ক্রমাঙ্ক	মৌল	প্রতীক-সংকেত	পারমাণবিক ওজন
75	রেনিয়াম	Re	186·310	84	পোলোনিয়াম	Po	210·000
76	অস্‌মিয়াম	Os	190·200	85	অ্যাস্টাটাইন	At	217·100
77	ইরিডিয়াম	Ir	193·100	86	র‍্যাডন	Rn	222·000
78	প্লাটিনাম	Pt	195·230	87	ফ্রান্সিয়াম	Fr	213·000
79	গোল্ড	Au	197·200	88	রেডিয়াম	Ra	226·050
80	মার্কারি	Hg	200·610	89	অ্যাক্টিনিয়াম	Ac	227·000
81	থ্যালিয়াম	Tl	204·390	90	থোরিয়াম	Th	232·120
82	লেড	Pb	207·210	91	প্রোটোঅ্যাক্টিনিয়াম	Pa	231·000
83	বিস্‌মাথ	Bi	209·000	92	ইউরেনিয়াম	U	238·070

সাম্প্রতিক গবেষণায় উল্লিখিত 92-টি মৌল ছাড়াও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 102 ক্রমাঙ্ক পর্যন্ত আরও মোটামুটি 10-টি মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে ; যদিও সেগুলি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাদের রাসায়নিক সত্তা ও বিশিষ্ট ধর্মাদি নির্ণীত হয়ে স্বতন্ত্র মৌল বলে স্বীকৃত হয়েছে, যেমন—নেপ্‌চুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, ক্যালিফোর্ণিয়াম, কুরিয়াম প্রভৃতি। আইসোটোপ-শ্রেণীর এ-সব মৌল নিতান্তই গবেষণা-লব্ধ বস্তু, প্রকৃতিতে এদের স্বাভাবিক অস্তিত্ব নেই।

আমরা আগেই বলেছি, সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল জড় বস্তুবাজির মৌলিক-যৌগিক সংক্রান্ত তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার গোড়া পত্তন করেন। এর পর থেকেই রসায়নের দ্রুত অগ্রগতি ঘটে ; রসায়নবিদেরা বিভিন্ন জড় বস্তুর বিশ্লেষণাত্মক জটিল পরীক্ষাদির সাহায্যে একে-একে মৌলিক পদার্থগুলি আবিষ্কার করেন এবং তাদের বিভিন্ন ধর্ম ও গুণাবলী নির্ধারণ করেন। কেবল তা-ই নয়, বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক মিলনে যৌগের সৃষ্টি-রহস্যের ভিত্তি-স্বরূপ অণু-পরমাণুর বিবিধ তথ্যও ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয়। কালে রাসায়নিক তৎপরতা এত উন্নত স্তরে ওঠে যে, মৌলের সংগঠক পরমাণুদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যাদি ও তাদের ওজন-পরিমাণও ক্রমে নিরূপিত হয়েছে। পদার্থের অণু-পরমাণু তত্ত্ব ও তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

পারমাণবিক মতবাদ

পার্থিব জড় বস্তুর গঠন সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক লিউপিপ্‌সাস ও ডিমোক্রিটাসের মতবাদ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই (পৃষ্ঠা 16) কিছু আলোচনা

করেছি। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর এই দুই দার্শনিকের মতবাদ যথেষ্ট উন্নত এবং আধুনিক অণু-পরমাণু তত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে-যুগে এই মতবাদ তেমন স্বীকৃতি লাভ করে নি। পক্ষান্তরে অ্যারিস্টটলের চতুর্মৌলিক মতবাদ বহু শতাব্দী যাবৎ রাসায়নিক চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন রেখেছিল। অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে পদার্থ ছিল পরিবর্তনশীল ও চারিটি ভৌত ধর্মের সমন্বয় মাত্র। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রবার্ট বয়েল কর্তৃক এই মতবাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হওয়ার পরে প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন **লিউপিপ্সাস** ও **ডিমোক্রিটাসের** মতবাদের প্রতি রাসায়নিকদের দৃষ্টি নূতন করে আকৃষ্ট হয়। রোমক কবি লুক্রেসিয়াস তাঁর লেখায় এই দার্শনিকদ্বয়ের পদার্থের গঠন সম্পর্কীয় মতবাদকে অমর করে রেখে গেছেন। এঁদের দার্শনিক তত্ত্বের মূল কথা ছিল, পার্থিব পদার্থ অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য বস্তু-কণিকা বা পরমাণুতে গঠিত. পদার্থ-সৃষ্টির এই আদি কণিকাসমূহ অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর, আর তারা অবিরত গতিশীল। এরূপ বিভিন্ন সংখ্যক আদি কণিকা, বা পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে; এবং বিভিন্ন আকার-আয়তনের পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পদার্থের পরমাণু-ঘটিত এই মতবাদ রসায়নের আধুনিক চিন্তাধারায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হলেও সে-যুগের তুলনায় সবিশেষ অগ্রবর্তী ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউটনের (1642-1727) মত মহাবিজ্ঞানীও এই মতবাদের বিশেষ কোন উন্নতি ঘটাতে পারেন নি; তিনি পদার্থের এরূপ পারমাণবিক ধারণাই সমর্থন করে গেছেন।

পদার্থের গঠনে পরমাণু-তত্ত্বের উল্লিখিত দার্শনিক মতবাদ শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নের আধুনিক মতবাদের ভিত্তিতে সংশোধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক মিলনের পরীক্ষামূলক তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং উৎপাদক ও উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণগত ব্যাখ্যার সাহায্যে 1803 খৃস্টাব্দে **জন ডাল্‌টন** রাসায়নিক বিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট সূত্র উদ্ভাবন করেন, যার ফলে পদার্থের পারমাণবিক গঠন প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক মর্যাদা লাভ করে। পার্থিব জড় বস্তুর সংগঠন-তত্ত্ব ডাল্‌টনের প্রবর্তিত রাসায়নিক সূত্রের দ্বারা ব্যাখ্যাত ও পরীক্ষিত হয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনে। রসায়ন-বিদ্যার অগ্রগতিতে ডালটনের রাসায়নিক সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। ডালটন ছিলেন ইংলণ্ডের

একজন স্কুল-মাস্টার ; জন্ম 1766 খৃস্টাব্দ, মৃত্যু 1844 খৃস্টাব্দ। প্রচলিত পারমাণবিক তত্ত্বের জনক জন ডাল্টন ছিলেন একজন সামান্য তাঁতির পুত্র।

পূর্ববর্তী দার্শনিকদের মতে সব পদার্থেরই অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকা বা পরমাণুগুলি ছিল এক বিশেষ ও অভিন্ন আদি বস্তু-কণায় গঠিত, তবে তারা আকার-আয়তনে বিভিন্ন। ডালটন প্রমাণ করেন, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর মূল প্রকৃতিই আলাদা, যে-কোন নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের পরমাণু গুণে, ধর্মে, ওজনে ও বস্তুসত্তায় অবিকল একরূপ, কিন্তু অপর যে-কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণু থেকে সর্বাংশে অন্যরূপ। আবার ডালটনের মতে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট পরমাণুদের রাসায়নিক মিলনে এক-একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং কোন বিশেষ যৌগিকের প্রকৃতি যেহেতু তার সংগঠক পরমাণুদের সংখ্যা ও ধর্মের উপরে নির্ভরশীল, কাজেই নির্দিষ্ট যৌগিকের সংগঠনে তার সংগঠক মৌলগুলির অনুপাত সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে। এটাই হলো রসায়ন-বিদ্যার ভিত্তি-স্থানীয় প্রাথমিক সূত্র, যা আজ ডালটনের **স্থিরানুপাত সূত্র** নামে আখ্যাত।

জন ডাল্টন

ডাল্টনের দ্বিতীয় রাসায়নিক সূত্র হলো 'পূর্ণ - সংখ্যানুপাত' সূত্র। পরমাণু-তত্ত্বের মূল কথাই হলো পরমাণুরা অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকা, যাদের ভেঙ্গে আর কোন ক্ষুদ্রতর কণিকা হয় না। কাজেই কোন নির্দিষ্ট মৌলিক 'ক' অপর কোন মৌলিক 'খ'-এর সঙ্গে মিলে যখন 'ক' ও 'খ'-য়ের বিভিন্ন অনুপাতের মিলনে বিভিন্ন যৌগিক উৎপন্ন করে,

তখন যৌগিকের সংগঠক পরমাণুরা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যার বিভিন্ন সরল অনুপাতে যুক্ত থাকবে। যৌগিকগুলি হতে পারে ক+খ, 2ক+খ, ক+2খ, 2ক+3খ ইত্যাদি অনুপাতের পারস্পরিক মিলনে; এখানে ক ও খ দিয়ে মৌলিক দু'টির এক-একটি পরমাণু বুঝাচ্ছে। আংশিক পরমাণুর রাসায়নিক মিলন কখন হতে পারে না, তারা সর্বদাই মিলবে পূর্ণ সংখ্যায়। এটাই হলো ডাল্টনের পূর্ণ-সংখ্যানুপাত বা **গুণানুপাত সূত্র।**

ডাল্টনের এই সব রাসায়নিক সূত্র বিজ্ঞানী-সমাজে সর্বত্র গৃহীত ও আদৃত হয়। অতঃপর একটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়, প্রথম দিকে ডালটন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকার মধ্যে কোন পার্থক্যের নির্দেশ করেন নি, উভয়কেই পরমাণু বলেছেন। কিন্তু এ তো হতে পারে না; তার কারণ, মৌলিক পদার্থের অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণিকা হলো পরমাণু, তাকে আর ভাগ করা যায় না। কিন্তু যৌগিক পদার্থের পরমাণু তো অবিভাজ্য হতে পারে না; যেহেতু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মিলনেই তার সৃষ্টি হয়। কাজেই যৌগিকের ক্ষুদ্রতম কণিকাকে বিভাজিত করলে অবশ্যই তা থেকে তার সংগঠক বিভিন্ন মৌলিক পরমাণু পাওয়া যাবে; অতএব তাকে পরমাণু বলা অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তি দূর করবার জন্যে 1811 খৃস্টাব্দে ইটালীয় বিজ্ঞানী অ্যাভোগেড্রো যৌগিকের ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম দেন **মলিকিউল** বা অণু। তাহলে দাঁড়ালো, যৌগিক পদার্থের প্রত্যেকটি অণু বা মলিকিউল মৌলিক পদার্থের একাধিক পরমাণু বা অ্যাটমের রাসায়নিক মিলনে গঠিত হয়। অণু-পরমাণুর সংজ্ঞা আবার এভাবেও প্রকাশ করা যায়: পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকা বা **অ্যাটম,** যাদের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা অণু বা 'মলিকিউল' গঠিত। বিভিন্ন মৌলিকের পরমাণুরা মিলে যৌগিকের অণু গঠন করে এবং অণুরাই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার লেন-দেনের ক্ষেত্রে অণুরাই ক্ষুদ্রতম একক। আরও বলা যায়, কোন পদার্থের অণুই তার ক্ষুদ্রতম অংশ, যা নিজস্ব গুণ ও ধর্ম বজায় রেখে মুক্তাবস্থায় থাকতে পারে; তাকে আরও বিভাজিত বা বিশ্লিষ্ট করলে সে-পদার্থ আর থাকে না, বিভিন্ন মৌলের পরমাণুতে ভেঙ্গে গিয়ে বস্তুতঃ পদার্থটার নিজস্ব সত্তার বিলুপ্তি ঘটে।

জড় বস্তুর গঠন নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরাও (চিন্তাশীল পণ্ডিত)

বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। গ্রীক দার্শনিকদের চতুর্মৌলিক মতবাদের স্থলে ভারতীয় দার্শনিকেরা ছিলেন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূত বা মৌলিকের প্রবক্তা; এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। আবার লিউপিপ্‌সাস ও ডিমোক্রিটাসের মত ভারতীয় ঋষি কণাদ-ও পদার্থের সংগঠনে মূল কণিকা বা পরমাণুর (ভূত) অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু-দর্শনে পদার্থের মৌলিক গঠন সম্পর্কে ভূত, মহাভূত, পরিণাম (রূপান্তর) প্রভৃতি নিয়ে বহু উচ্চাঙ্গের তথ্যসমৃদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে। বিশেষতঃ সাংখ্য-পাতঞ্জল সূত্রে জড় বস্তুর উৎপত্তি ও অণু-পরমাণু তত্ত্ব যেরূপ বিধৃত রয়েছে তা ভারতীয় মনীষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতে ধাতু-বিদ্যা, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন, চিকিৎসা-রসায়ন প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে রাসায়নের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু এ-সবই ছিল ব্যবহারিক বা ফলিত রসায়ন-চর্চা ও দার্শনিক চিন্তাধারার ফলশ্রুতি মাত্র; বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মূলগত তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সন্ধান তাঁরা তেমন কিছু পান নি; কাজেই আধুনিক রসায়ন-চর্চার মূল ধারা ভারতে অজ্ঞাত থেকে যায়। আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতি পাশ্চাত্যেরই অবদান; বস্তুতঃ রবার্ট বয়েল, জন ডাল্‌টন, অ্যাভোগেড্রো প্রভৃতি মনীষীরাই নব্য রসায়নী-বিদ্যার সূত্রপাত করেন।

যাহোক, ডাল্‌টনের অণু-পরমাণুর উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে আবার জানা গেল, কোন কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুরাও নিজস্ব সত্তা নিয়ে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে; যেমন, হিলিয়াম ও আর্গনের পরমাণু। এর কারণ, হিলিয়াম, আর্গন প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতা নেই, নিষ্ক্রিয় পদার্থ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মৌলিকের ক্ষেত্রে মুক্ত পরমাণুরা পরস্পর জুড়ে একই মৌলিকের অণু গঠন করে মুক্ত অবস্থায়ও থাকে এবং রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এরূপ বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের নানারূপ রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ডাল্‌টনের অণু-পরমাণুতত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পদার্থের অন্তর্নিহিত রাসায়নিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রকৃতপক্ষে ডাল্‌টনের পারমাণবিক তত্ত্ব ক্রমে আণবিক ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল সূত্রগুলির তাৎপর্য নির্ধারণ ও শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব করেছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় ডাল্‌টনের স্থিরানুপাত ও পূর্ণসংখ্যানুপাত সূত্র

পদার্থের সংগঠক পরমাণুদের রাজ্যে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে এবং রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার একটা সুসম্বদ্ধ ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। বস্তুতঃ এই তত্ত্বের উপরেই আধুনিক রসায়নের ক্রমবর্ধমান সৌধ দিনে-দিনে রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

মৌলের প্রতীক ও যৌগের রাসায়নিক সংকেত

আমরা আগেই বলেছি, রবার্ট বয়েলের মৌলিক-যৌগিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রসায়নবিদের অক্লান্ত চেষ্টায় এ-যাবৎ মোট 92-টি মৌলিক পদার্থ বা মৌলের অস্তিত্ব নির্ণীত হয়েছে ; এ-গুলির পারস্পরিক মিলনে পৃথিবীর যাবতীয় জড় বস্তু গঠিত। এই মৌলগুলির প্রত্যেকটিকে সংক্ষেপে বুঝাবার জন্যে এক-একটি আক্ষরিক প্রতীক-সংকেত নির্দিষ্ট হয়েছে ; যেমন, অক্সিজেন O, কার্বন C, ক্লোরিন Cl, সোডিয়াম Na ইত্যাদি। আমরা 25 পৃষ্ঠায় মৌলগুলির যে তালিকা দিয়েছি তাতে প্রত্যেকটি মৌলের পাশে তার প্রতীক-পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুইডেনের রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস এই প্রতীক-পরিচয়ের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। প্রত্যেকটি মৌলের ল্যাটিন নামের অক্ষর, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি অক্ষর দিয়ে এই সব প্রতীক নির্দিষ্ট করা হয়েছে ; যেমন, আয়রন বা লোহার প্রতীক তার ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'ফেরাম' থেকে Fe করা হয়েছে, ইংরেজী আয়রন থেকে I নয় ; লেড (প্লাম্বাম) Pb, কপার (কুপ্রাম) Cu, পটাসিয়াম (ক্যালিয়াম) K ইত্যাদি। এ-ভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রতীকগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং রসায়নের আলোচনায় সব দেশে সব ভাষায় এই একই প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

যে-কোন মৌলের প্রতীকটি দিয়ে তার একটি পরমাণু, বা তার পারমাণবিক ওজন-অনুপাত বুঝানো হয়। আবার যেহেতু কোন যৌগিক পদার্থ বা যৌগ তার সংগঠক মৌলগুলির পরমাণুদের মিলনে গঠিত হয়, কাজেই সেই মৌল-পরমাণুদের প্রতীকগুলি পাশাপাশি লিখে সহজেই যৌগের অণুটিকে প্রকাশ করা যায় ; যেমন, NaCl হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন মৌলের মিলনে গঠিত 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' যৌগের একটি অণু ; HCl হলো হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের যৌগ 'হাইড্রোক্লোরিক' অ্যাসিড-অণু ; CO হলো কার্বন ও অক্সিজেনের যৌগ 'কার্বন মনক্সাইড' অণু ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু সংগঠক মৌলগুলির সম-অনুপাতের মিলনে

যৌগ সৃষ্টি হয় না, হয় কোন-কোনটির একাধিক পারমাণবিক অনুপাতে। তখন যৌগের আণবিক সংকেত লেখা হয় মৌলের সেই অনুপাত-সংখ্যা সহ; যেমন, একটি কার্বন-পরমাণু ও দু'টি অক্সিজেন-পরমাণুর মিলনে গঠিত যৌগের আণবিক সংকেত হলো CO_2 (কার্বন-ডাইঅক্সাইড), জল বা ওয়াটারের আণবিক সংকেত হলো H_2O, অর্থাৎ দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন-পরমাণুর মিলনে জলের একটি অণু গঠিত। আবার অ্যামোনিয়া যৌগের আণবিক সংকেত হলো NH_3; এ থেকে বুঝতে হবে, অ্যামোনিয়ার একটি অণু গঠিত হয় একটি নাইট্রোজেন-পরমাণু ও তিনটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে। কেবল তাই নয়, যৌগের আণবিক ওজনও তার সংগঠক বিভিন্ন পরমাণুদের পারমাণবিক ওজনের সমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়ে থাকে এই সংকেত থেকেই।

যাহোক, মৌলের প্রতীক ও যৌগের আণবিক সংকেত এভাবে প্রকাশ করা বিশেষ সুবিধাজনক; আর এর সাহায্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের পক্ষে বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন ও বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রকাশ করা ও বুঝানো বিশেষ সহজসাধ্য হয়েছে।

পারমাণবিক ওজন

বিভিন্ন মৌলের উল্লিখিত প্রতীকগুলি দিয়ে তাদের এক-একটি পরমাণু বুঝায়, কেবল তাই নয়, পরমাণুদের ওজনের অনুপাতও তা-থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ডালটনের পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে আমরা জানি, কোন একটি মৌলের সব পরমাণুই সর্বাংশে অনুরূপ, কিন্তু অপর কোন মৌলের পরমাণু থেকে আলাদা; আবার পরমাণু বিশেষের গুণ ও ধর্মও সুনির্দিষ্ট। কাজেই যে-কোন মৌলের প্রত্যেকটি পরমাণুর ওজন পরিমাণও অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হবে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ওজন হিসাব করে স্থির করা হয়েছে। পরমাণু এমনই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু-কণা যে তাকে দেখা, বা ধরা-ছোঁয়া যায় না; একটি আল্‌পিনের সূক্ষ্মাগ্রভাগেও লক্ষ লক্ষ পরমাণুর সমাবেশ। অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না, এমন যে পরমাণু তাকে কোন তুলা-দণ্ডে ওজন করার কথাই ওঠে না। তাই পরমাণুর ওজন তুলনামূলকভাবে হিসাব করা হয়; তার প্রকৃত ওজন নয়, আপেক্ষিক ওজন। অক্সিজেন মৌলের পারমাণবিক ওজন 16·00 ধরে নিয়ে

তার বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের প্রকৃত ওজন থেকে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মৌলের পারমাণবিক ওজন হিসাব করে স্থির করা হয়। এটা একটা আপেক্ষিক সংখ্যা মাত্র,—অক্সিজেন-পরমাণুর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট ওজনের একটি গুণিতক সংখ্যা। একথা মনে রাখতে হবে যে, সংখ্যাটি দিয়ে পরমাণুর ওজনের পারস্পরিক অনুপাত মাত্র বুঝায়, প্রকৃত ওজন বুঝায় না।

যাহোক, ডালটনের পরমাণু-তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণের ফলে মৌলগুলির পারমাণবিক ওজন সম্পর্কিত এই যে অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে রসায়ন-বিজ্ঞানে তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি মৌলের এরূপ পারমাণবিক ওজন নির্দিষ্ট হওয়ায় তাদের রাসায়নিক প্রতীক ও যৌগের সংকেতগুলির অর্থ আরও ব্যাপক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশের অধিকতর উপযোগী হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ক্লোরিন-মৌলের প্রতীক হলো Cl ; কিন্তু Cl লিখলে কেবল একটি ক্লোরিন পরমাণুই বুঝায় না, ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন, অর্থাৎ 35·457 ভাগ ওজন-পরিমাণও বুঝায়। অনুরূপভাবে, Na-প্রতীক দিয়ে বুঝায়, একটি সোডিয়াম-পরমাণু বা সোডিয়ামের 22·997 ভাগ ওজন-পরিমাণ। এখন NaCl হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলনে গঠিত সোডিয়াম-ক্লোরাইড (খাদ্য-লবণ) যৌগের রাসায়নিক সংকেত। এটা শুধু যৌগটির সহজ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই নয়, অধিকন্তু এই সংকেত থেকে যৌগটির আণবিক ওজন-অনুপাতও বুঝায় ; যেমন, $22.997 + 35.457 = 58.454$ হলো সেডিয়াম-ক্লোরাইডের আণবিক ওজন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, কোন যৌগের আণবিক ওজন হলো তার সংগঠক পরমাণুদের পারমাণবিক ওজনের সমষ্টি-বোধক একটি আনুপাতিক সংখ্যা।

রাসায়নিক সমীকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এক বা একাধিক বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির পরমাণুসমূহের পূর্বাপর সমতা নির্দেশক যে সাধারণ বিবরণমূলক সমীকরণ দাঁড় করা যায়, তাকেই বলা হয় রাসায়নিক সমীকরণ **(chemical equation)**। আমরা জানি, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের বিনাশ হয় না, রূপান্তর ঘটে মাত্র ; একেই বলে 'পদার্থের অবিনশ্বরতা' সূত্র **(indestructibility of matter)**। রাসায়নিক বিক্রিয়ার পূর্বে যে-যে পদার্থ যতটা ছিল পরেও সেই-সেই পদার্থ রূপান্তরিত হয়ে ততটাই থাকবে ; রাসায়নিক সমীকরণের এই হলো মূল কথা। যেমন :

(ক) $2H_2O = 2H_2 + O_2$ (খ) $H_2 + Cl_2 = 2HCl$
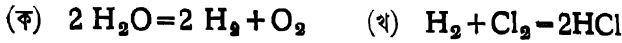
প্রথম সমীকরণটিতে জল বা হাইড্রোজেন-অক্সাইডের **বিশ্লেষণ** ও দ্বিতীয় সমীকরণে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন মৌল দুটির **সংশ্লেষণ** বিক্রিয়া নির্দেশিত হয়েছে। সামান্য অম্লযুক্ত জলের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে জলের অণুগুলি ভেঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, আর তার সংগঠক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের অণুরা বুদ্‌বুদের আকারে বিমুক্ত হয়,—জল রূপান্তরিত হয় ওই দুটি গ্যাসে। এই রাসায়নিক বিশ্লেষণ-ক্রিয়াটিকে প্রথম সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে; জলের প্রতি দু'টি অণু ভেঙ্গে হাইড্রোজেনের দুটি অণু ও অক্সিজেনের একটি অণুর উদ্ভব ঘটেছে, সমীকরণটি থেকে এ-সব তথ্য জানা যায়। এমন কি, পারমাণবিক ওজনের হিসেবেও পূর্বাপর সমতা রক্ষিত হয়েছে, দেখা যায়। বিক্রিয়ক জলের দুটি অণুতে হাইড্রোজেনের চারটি ও অক্সিজেনের দুটি, মোট ছ'টি পরমাণু রয়েছে এবং উৎপন্ন গ্যাসের মধ্যেও হাইড্রোজেনের চারটি ও অক্সিজেনের দু'টি মোট ছ'টি পরমাণুই আবার বিমুক্ত হয়ে পড়েছে।

আবার, দ্বিতীয় সমীকরণটিতে অনুরূপ তথ্যাদিই সংযোজনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিক্রিয়ক হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের রাসায়নিক মিলন বা সংযোজনে উৎপন্ন হয়েছে হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড, অর্থাৎ HCl, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। একটি হাইড্রোজেন-অণু (H_2, যা দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু নিয়ে গঠিত) ও একটি ক্লোরিন-অণুর (Cl_2) রাসায়নিক মিলনে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দু'টি অণু গঠিত হয়েছে, যার এক-একটি অণু একটি করে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন পরমাণু নিয়ে গঠিত। কাজেই এই সমীকরণটিতেও উভয় দিকের মোট পরমাণু সংখ্যার সমতা ঠিকই বজায় আছে; পারমাণবিক ওজনের সমষ্টিও বিক্রিয়ার আগে-পরে, অর্থাৎ সমীকরণের দু'দিকে সমান-সমান রয়েছে।

রসায়ন-শাস্ত্রে রাসায়নিক সমীকরণের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ; সব রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাৎপর্য ও ফলাফল সমীকরণের সাহায্যে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার আনুসঙ্গিক হিসেবে তাপ ও তড়িৎ শক্তির আদান-প্রদানও বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন পদার্থগুলির মধ্যে ঘটে থাকে, সমীকরণের বিশেষ ধারায় তা-ও প্রকাশ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ুর উপাদান ও তথ্যাদি

পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল : বায়ুর স্বরূপ — জন মেয়োর পরীক্ষা : প্রিস্টলি ও ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষা — অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও বিভিন্ন উপাদান : অক্সিজেন ও দহনক্রিয়া নাইট্রোজেনের আবশ্যকতা : কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জীবজগৎ ; ফোটোসিন্থেসিস ; ড্রাই-আইস ও মিনারেল ওয়াটার : জলীয় বাষ্প : বায়ুর বিরল গ্যাসসমূহ আবিষ্কারের কাহিনী : আর্গন গ্যাস — পরিমাণ ও পরিচয় : হিলিয়ামের আবিষ্কার ও ব্যবহার : নিয়ন, ক্রিপ্টন ও জেনন : তরল বায়ু — বায়ুর তরলীকরণ; ক্রিটিকাল টেম্পারেচার ও প্রেসার : তরল বায়ুর ব্যবহার : ভ্যাকুয়াম পাত্র।

পৃথিবীকে চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে বায়ুর একটা বিরাট সমুদ্র। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে এই বায়ু-সমুদ্রের গভীরতা আনুমানিক 300 মাইল, বা তারও বেশি। এই বিশাল বায়ুরাশি নিয়েই পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে, এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ বা কোন জীব-জগতের অস্তিত্ব থাকতো না, পৃথিবী হতো নির্জীব, উষর, মরুময়। বায়ু আছে বলেই শ্বাস-ক্রিয়ায় জীবের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, উদ্ভিদ জন্মায়, ফল-শস্য হয়, বৃষ্টিপাত ঘটে, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত থাকে। তাই বলতে হয়, বায়ুই জীবের জীবন। প্রাচীন ঋষিরা তাই দেবতা-জ্ঞানে বায়ুর স্তবস্তুতি করেছেন— 'বায়ুরূপেন সংস্থিতা'। জড় প্রকৃতির বিভিন্ন বিভূতিতে দেবত্ব আরোপ করলে বায়ুই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ দেবতা, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যাহোক, বায়ুর বিবিধ কার্যকরী বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের এ-সব কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আওতায় পড়ে না ; আমরা এখানে কেবল রসায়নের দৃষ্টিতে বায়ুর স্বরূপ ও তথ্যাদি পর্যালোচনা করবো।

প্রাচীন যুগের মানুষ জানতো, বায়ু একটি মৌলিক গ্যাসীয় পদার্থ, পঞ্চ ভূতের অন্যতম। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পঞ্চভৌতিক মতবাদ ও গ্রীক দার্শনিকদের চতুর্মৌলিক মতবাদ (পৃষ্ঠা 16) উভয়তঃই বায়ু একটি একক মৌলিক পদার্থ বলে গৃহীত ছিল। বায়ু যে মৌলিক পদার্থ নয়, পরন্তু একাধিক গ্যাসের মিশ্রণ—এ-কথা প্রথম প্রমাণ করেন জন মেয়ো নামক জনৈক ইংরেজ চিকিৎসক। 1674 খৃষ্টাব্দে তিনি একটি সামান্য পরীক্ষার

সাহায্যে বায়ুর মিশ্র রূপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে যুগ-প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেন। জন মেয়ো দেখালেন, কোন পাত্রের জলের উপরে একটা কাচ-পাত্র চাপা দিয়ে তার ভিতরের আবদ্ধ বায়ুতে কোন জিনিস পোড়ালে কিছুক্ষণ জ্বলে জিনিসটা নিভে যায়; আর ঐ আবদ্ধ বায়ুর পরিমাণ কমে যায়। ঐ চাপা-দেওয়া কাচ-পাত্রের মধ্যে জলের স্তর কিছু উপরে উঠে এ-কথা প্রমাণ করে। আরও দেখা গেল, আবদ্ধ বায়ুর ঐ অবশিষ্টাংশে কোন জিনিস আর জ্বলে না। জন মেয়োর এই পরীক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বায়ু কোন একক মৌলিক পদার্থ নয়, তার মধ্যে অন্ততঃ তু'রকম গ্যাস মিশ্রিত রয়েছে; যার একটির মধ্যে দাহ্য পদার্থ জ্বলে, অপরটির মধ্যে জ্বলে না। বায়ুর মৌলিকত্বের প্রাচীন মতবাদ এভাবে প্রথম ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু এই পরীক্ষা-কার্যে জন মেয়ো আর বেশি দূর অগ্রসর হন নি।

অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিলি, প্রিস্টলি, ল্যাভয়সিয়ে, ক্যাভেণ্ডিস প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বায়ুর মিশ্র রূপের বিশদ তথ্যাবলী নির্ধারণ ও তার বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কার করে বায়ুর মৌলিকত্বের ভ্রান্ত মতবাদ একেবারে ধূলিসাৎ করে দেন। এঁদের বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা গেছে, অনেকগুলি মৌলিক গ্যাস বিভিন্ন অনুপাতে মিশে বায়ু গঠিত হয়েছে, আর তাদের অনুপাত পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় একই। শিলি ও প্রিস্টলি উভয়েই অন্য নিরপেক্ষভাবে পারদের দহনে উৎপন্ন লাল পারদ-ভস্ম (রেড অক্সাইড অব মার্কারি) উত্তপ্ত করে বায়ুর সক্রিয় অংশের অনুরূপ একটা গ্যাস পৃথক করেন। প্রিস্টলির এই পরীক্ষার কথা শুনে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে বুঝলেন, পারদের দহনে বায়ুর সক্রিয় উপাদানটি তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে-মিশে পারদ-ভস্ম সৃষ্টি করেছিল, সেই পারদ-ভস্ম উত্তপ্ত করতে আবার তা থেকে সেই উপাদানটি মুক্ত হয়ে এল। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত করে ল্যাভয়সিয়ে বায়ুর সক্রিয় অংশের তাৎপর্য ও পদার্থের দহন-ক্রিয়ার মূল সূত্র ব্যাখ্যা করেন। এ-সব কথা আমরা এই পুস্তকের 'দহন-ক্রিয়া ও অগ্নি-উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো। যাহোক, দহন-ক্রিয়ায় বায়ুর সক্রিয় উপাদানটির নাম দেওয়া হলো 'অক্সিজেন'; আর নিষ্ক্রিয় অংশটি 'নাইট্রোজেন' নামে পরিচিত হলো। অবশ্য প্রথম দিকে নাইট্রোজেনকে বলা হতো 'অ্যাজোট' গ্যাস; অ্যাজোট একটা গ্রীক শব্দ, যার মূলগত অর্থ হলো নিষ্ক্রিয় বা অকেজো।

বায়ুতে তার প্রধান উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস ছাড়া আরও কয়েকটি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত আছে বলে পরে প্রমাণিত হয়েছে ; এগুলি 'বিরল গ্যাস' নামে পরিচিত, যাদের মধ্যে আর্গন নামক গ্যাসটির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। এ-সব ছাড়া বায়ুতে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস, ধূম-ধূলি ও অন্যান্য বহিরাগত পদার্থ কিছু মিশ্রিত থাকে ; কিন্তু এ-সব বায়ুর নিজস্ব উপাদান নয়,—স্থানীয় অবস্থার গতিকে ও নানা বাহ্যিক কারণে এগুলি বায়ুতে মিশে যায়। এগুলিকে বায়ুর মালিন্য বা আবর্জনা বলা যায় ; তাই এগুলির অনুপাতও বিভিন্ন স্থানের বায়ুতে বিভিন্ন রকম। পক্ষান্তরে বায়ুর নিজস্ব উপাদান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও বিরল গ্যাসগুলির অনুপাত পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় একই। যাহোক, বাহ্যিক কারণে মিশ্রিত উল্লিখিত পদার্থগুলি থেকে বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে নিয়ে বিভিন্ন স্থানের বায়ু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তার গঠন মোটামুটি এরূপ :

		শতকরা আয়তন		শতকরা ওজন
অক্সিজেন	...	21·00	...	23·20
নাইট্রোজেন	...	78·06	...	75·50
বিরল গ্যাস	...	0·94	...	1·30

বিভিন্ন স্থানের বায়ুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তার গঠন সর্বত্র মোটামুটি এরূপই পাওয়া গেছে। এ থেকে দেখা যায়, আয়তনের হিসেবে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন, আর বাকী চার-পঞ্চমাংশ হলো নাইট্রোজেন ; বিরল গ্যাস সবগুলি মিলে বায়ুর আয়তনের প্রায় এক-শতাংশ মাত্র। যাহোক, এখন বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানগুলির গুণ, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা যাক্।

অক্সিজেন

বায়ুতে দহন-ক্রিয়ায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় দু'রকম গ্যাসের অস্তিত্বের কথা 1674 খৃষ্টাব্দে জন মেয়োর পরীক্ষার পর থেকেই লোকে সাধারণভাবে জেনেছে ; কিন্তু বায়ুর সক্রিয় উপাদান অক্সিজেনকে পৃথক করে পাওয়া যায় নি পরবর্তী এক শত বছরের মধ্যেও। জন মেয়োর পরীক্ষার পূর্ণ এক শতাব্দী

পরে 1774 খৃষ্টাব্দে দু'দেশের দু'জন বিজ্ঞানী প্রায় একই সময়ে অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন করেন ; অবশ্য তাঁরা এই গ্যাসটাকে বায়ুর উপাদান বলে বুঝতে পারেন নি, আবিষ্কারের কৃতিত্বটা অর্জন করেন ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়সিয়ে। এ সব কথা আমরা আগেই বলেছি। যাহোক, রসায়ন বিজ্ঞানে উক্ত দু'জন বিজ্ঞানীর দানও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এঁদের একজন হলেন স্থইডেনবাসী জনৈক ঔষধ প্রস্তুতকারক উইলহেল্‌ম শিলি, আর অপর জন ইংলণ্ডের এক জন ধর্মযাজক **জোসেফ প্রিস্টলি**। এঁরা নিয়মিত রসায়ন-বিজ্ঞানী না হলেও তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা ও রসায়ন-চর্চায় নিরলস উদ্যমের জন্যে সে-যুগে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। আশ্চর্যের কথা, তাঁরা দু'জনেই লাল পারদ-ভস্ম (রেড অক্সাইড অব মার্কারি) উত্তপ্ত করে একটা গ্যাস পান, আর সেটা বায়ুর সক্রিয় অংশের অনুরূপ বলে লক্ষ্য করেন ; —গ্যাসটা নিজে জ্বলে না, কিন্তু তার মধ্যে অন্য জিনিস তীব্র ভাবে জ্বলে, জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বচ্ছন্দে চলে। যাহোক, এই গ্যাসটাই যে বায়ুর সক্রিয় উপাদান অক্সিজেন, এ-কথা কিন্তু শিলি বা প্রিস্টলি কেউই বুঝতে পারেন নি। ব্যাপারটা হলো, বায়ুর মধ্যে পারদ উত্তপ্ত করলে লাল পারদভস্ম উৎপন্ন হয় ; কয়েক শতাব্দী আগে প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের আমলেই তৈরি হয়েছিল। বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে পারদের রাসায়নিক মিলনে গঠিত হয়েছিল ঐ যৌগিক পারদ-ভস্ম বা 'রেড অক্সাইড অব মার্কারি' ;
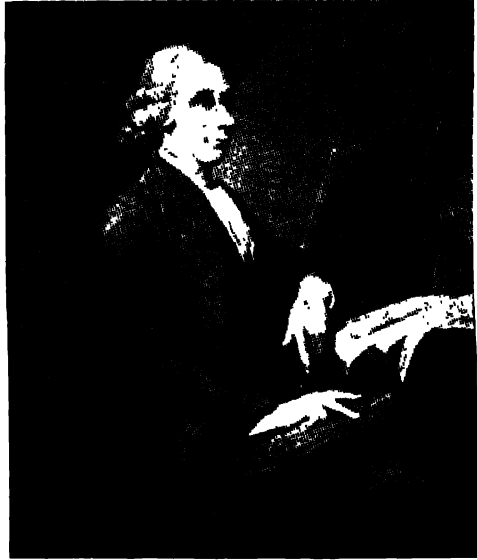
জোসেফ প্রিস্টলি

আর শিলি ও প্রিস্টলি পদার্থ টাকে আবার উত্তপ্ত করতে তার থেকে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়সিয়ে এই রাসায়নিক তাৎপর্যটা ব্যাখ্যা করেন এবং ঐ গ্যাসটাকে বায়ুরই একটি উপাদান 'অক্সিজেন' বলে প্রমাণ করেন। এ সব কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো। যাহোক, এভাবে হাতে পেয়েও শিলি বা প্রিস্টলি এই আবিষ্কারের পূর্ণ কৃতিত্বভাগী হতে পারেন নি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে এরূপই হয়ে থাকে; কৃতিত্ব হাতের মধ্যে এসেও ফস্‌কে যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।
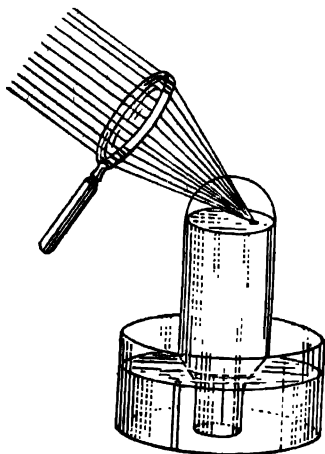
প্রিস্টলির পরীক্ষা
(পারদভস্ম উত্তপ্ত করে অক্সিজেন উদ্ধার)

যাহোক, প্রিস্টলি ও শিলি লাল পারদ-ভস্ম বা 'রেড অক্সাইড অব মার্কারি' উত্তপ্ত করে সামান্য কিছু অক্সিজেন গ্যাস পেয়েছিলেন; কিন্তু এ উপায়ে গ্যাসটা উৎপাদন করার কোন সার্থকতা নেই। পরবর্তীকালে অক্সিজেন-বহুল বিভিন্ন যৌগিক (অক্সাইড) উত্তপ্ত করে সহজেই অক্সিজেন তৈরি করবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। পটাসিয়াম-ক্লোরেট নামক রাসায়নিক পদার্থ উত্তপ্ত করলে যৌগিকটা বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়। পটাসিয়াম-ক্লোরেটের সঙ্গে কতকটা ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইড অনুঘটক হিসেবে মিশিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প তাপাংকে উতপ্ত করলেও সহজেই অক্সিজেন পাওয়া যায়; আর এই উপায়েই আজকাল সাধারণতঃ অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করা হয়ে থাকে। শিল্প-প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনের জন্যে তরল বায়ুর আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়। তরল বায়ুর কথা আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো। অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস তৈরী করতে আজকাল কস্টিক সোডার (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) 'ইলেক্‌ট্রোলিসিস, অর্থাৎ তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি বিশেষ সুবিধাজনক রাসায়নিক কৌশল বলে সর্বত্র স্বীকৃত। এ বিষয়ে

আমরা পরবর্তী 'রসায়ন ও তড়িৎশক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করবো।

অক্সিজেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার দাহিকা-শক্তি। গ্যাসটা নিজে জ্বলে না, কিন্তু অপর বস্তুর প্রজ্জ্বলন-ক্রিয়া সম্ভব করে; আর সেই প্রজ্জ্বলন বা দহনে বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটে বস্তুটার অক্সাইড যৌগিকের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ অক্সিজেন না পেলে কোন জিনিস জ্বলেই না। বায়ুতে অক্সিজেন না থাকলে প্রকৃতিতে আগুন বা প্রজ্বলন বলে কোন ব্যাপারই থাকতো না; রান্না-বান্না চলতো না, রেল-ষ্টীমার, কল-কারখানা কিছুই সম্ভব হতো না। এসব তো পরের কথা, অক্সিজেনের অভাবে পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না, জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস চলতো না। অক্সিজেনের দাহিকা-শক্তির পরীক্ষা সহজেই করে দেখা যায়; সদ্য-নেভানো একটা পাট-কাঠি অক্সিজেন গ্যাসের পাত্রে প্রবেশ করালে নিভন্ত কাঠিটা দপ্ করে তীব্র শিখায় জ্বলে ওঠে। অক্সিজেনের মধ্যে ফস্‌ফরাস তীব্র তেজে জ্বলে দৃশ্যতঃ নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পদার্থের তো বিনাশ নেই, আছে রূপান্তর। ফস্‌ফরাস অদৃশ্য গ্যাসীয় অক্সাইডের আকারে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। বস্তুতঃ 'কোন জিনিস জ্বলে' মানে তার সঙ্গে অক্সি-জেনের রাসায়নিক মিলন ঘটে, আর সেই জিনিসটার অক্সাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। অক্সাইডটা যদি কঠিন অবস্থায় থাকে, তাহলে তা দেখা যায়; আর গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হলে তা অদৃশ্যভাবে বায়ুতে মিশে থাকে, তাই নিঃশেষ হয়ে গেল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়।
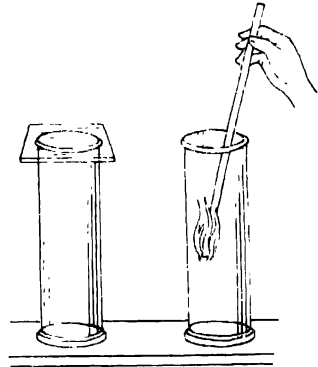
অক্সিজেনের মধ্যে সদ্য-নেভানো পাটকাঠি তীব্রভাবে জ্বলছে।

বায়ুতে অক্সিজেন আছে বলেই জীব-জগৎ রক্ষা পাচ্ছে। কেবল তাই নয়, কঠিন রোগে রোগীর শ্বাস-কষ্টের সময় আরামদায়ক প্রক্রিয়া হিসাবে তার শ্বাস-ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশুদ্ধ অক্সিজেন উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়।

তা ছাড়া বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনে এবং ওয়েল্ডিং-এর কাজে অক্সি-হাইড্রোজেন ও অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করবার জন্যে বর্তমান শিল্প-যুগে অক্সিজেনের ব্যবহার অপরিহার্য ও অপরিসীম। অক্সিজেনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা 'দহন ও অগ্নি উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

নাইট্রোজেন

জন মেয়োর পরীক্ষায় আবদ্ধ বায়ুতে দহনের পরে যে গ্যাস অবশিষ্ট ছিল, যার মধ্যে কিছু আর জ্বলছিল না, সেই গ্যাসটাই ছিল নাইট্রোজেন। কিন্তু তাঁর পরীক্ষায় বায়ু যে কোন মৌলিক গ্যাস নয়, গ্যাসীয় মিশ্র পদার্থ, তাই মাত্র প্রমাণিত হয়েছিল; বায়ুর উপাদান নিয়ে তিনি আর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। মৌলিক গ্যাস হিসেবে নাইট্রোজেন আবিষ্কার করেন 1772 খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডেনিয়াল রাদারফোর্ড। তিনি একটি পাত্রের আবদ্ধ বায়ুতে বিশুদ্ধ ফস্‌ফরাস পোড়ান; ফসফরাস জ্বলবার ফলে আবদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন সম্যক নিঃশেষ হয়ে যায়, আর সেই পাত্রে অবশিষ্ট থাকে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস; যেটা নিজে জ্বলে না, অপর কোন পদার্থকেও জ্বালায় না। এটা একটা নিষ্ক্রিয় মৌলিক গ্যাস বলে শেষে প্রমাণিত হয় এবং তার নাম দেওয়া হয় নাইট্রোজেন, প্রথমে অবশ্য এর নাম ছিল 'অ্যাজোট'।
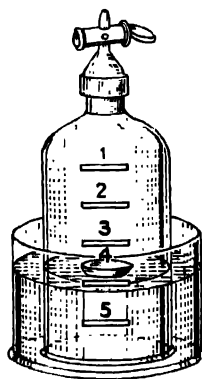
বায়ুর চার-পঞ্চমাংশ নাইট্রোজেন

বায়ুর আয়তনের চার-পঞ্চমাংশই নাইট্রোজেন; আর তা অদৃশ্যভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে বায়ুতে মিশে আছে। নিষ্ক্রিয় গ্যাস নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে মিশে থাকায় অক্সিজেনের দাহিকা-শক্তি যথেষ্ট কমে গিয়ে বায়ু জীব-জগতের ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। তা না হলে সতত তীব্র দহনের ফলে জীব-জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। সাধারণ উত্তাপে নাইট্রোজেন গ্যাস কোন পদার্থের সঙ্গেই রাসায়নিক মিলনে যুক্ত হয় না, নিষ্ক্রিয় থাকে; কিন্তু প্রাকৃতিক

বিধি-ব্যবস্থায় নাইট্রোজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এ বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো। নাইট্রোজেনের বিভিন্ন যৌগিক প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়; অথচ মৌলিক গ্যাসীয় আকারে জীবদেহে সরাসরি এর কোন উপযোগিতাই নেই। বিভিন্ন যৌগিক উৎপাদন ও অন্যান্য প্রয়োজনে তরল বায়ুর আংশিক বাষ্পীকরণ পদ্ধতিতে আজকাল প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন উৎপাদিত হয়ে থাকে। নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক জমির সার হিসেবে ইদানিং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে; কৃষি-রসায়ন অধ্যায়ে এবিষয়ে আমরা আলোচনা করবো।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস অবশ্য বায়ুর কোন নিজস্ব স্বাভাবিক উপাদান নয়, কিন্তু সর্বত্রই বায়ুতে এটা কিছু-না-কিছু আছে। কাজেই এর কথাও বায়ুর উপাদান প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

মানুষ ও জীব-জন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং কাঠ-কয়লা-তেল প্রভৃতি বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মেশে। এ জন্যে সহর ও কলকারখানা-বহুল অঞ্চলের বায়ুতেই এ-গ্যাসটা অনুপাতে বেশি থাকে। জীবজন্তুর দেহ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটিতে পচেও গ্যাসটা জন্মায়। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলের পার্বত্য গুহা ও ফাটল থেকে অনেক সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয়; ভূ-গর্ভের উত্তাপে ভূ-প্রোথিত জৈব পদার্থাদির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এটা এক রকম প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষ। যবদ্বীপের একটা পার্বত্য উপত্যকা এরূপ প্রাকৃতিক কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আধিক্য-হেতু 'মৃত্যু-উপত্যকা' নামে পরিচিত; সেখানে গ্যাসটা এত বেশি সঞ্চিত রয়েছে যে, তার মধ্যে কোন জীব বাঁচে না,—প্রবেশ করলে অল্প সময়ের মধ্যেই দম আটকে মরে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রকৃতপক্ষে বিষাক্ত গ্যাস নয়, কিন্তু জীবের শ্বাস-কার্য এতে চলে না। কাজেই বায়ুতে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটলে অক্সিজেনের স্বল্পতা-হেতু জীবের মৃত্যু ঘটে। গ্যাসটা বায়ুর চেয়ে ভারী বলে আবদ্ধ কোন নিম্নস্থানের কার্বন-ডাইঅক্সাইড উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে পারে না। সাধারণতঃ বায়ুতে এর পরিমাণ অতি কম থাকে বলেই আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন অসুবিধা হয় না। অনেক প্রস্রবণের জলেও কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবিত থাকে, এ-জল বরং জীবের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। এরূপ প্রস্রবণের উত্তপ্ত জল

থেকেও গ্যাসটা কিছু কিছু উত্থিত হয়ে বাতাসে মেশে। জীবের শ্বাস-ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড তো অহরহ বায়ুতে মিশে যাচ্ছে।

দেখা গেল, নানাভাবে কার্বন-ডাইঅক্সাইড জন্মাচ্ছে, আর বাতাসে মিশছে; কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তার পরিমাণ তো কই বাড়ছে না। বায়ুতে এর পরিমাণ যদি ক্রমে বেড়ে যেত, আর সেই অনুপাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতো, তাহলে পৃথিবী এতদিনে জীবশূন্য হয়ে যেত। বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিভিন্ন জৈব পদার্থের কার্বন-উপাদানের রাসায়নিক মিলনেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। কাজেই এ গ্যাসটা নানাভাবে যত জন্মাতো, বায়ুর অক্সিজেনের পরিমাণ তত কমে যেত, তারপর এক সময় জীবের শ্বাসক্রিয়া অচল হয়ে পৃথিবী জীবশূন্য হতো। কিন্তু প্রকৃতির হিসাব-নিকাশের সামঞ্জস্য বিধানের ফলে এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে না;—এক দিকে নানাভাবে জন্মাচ্ছে, অপর দিকে প্রকৃতি তাকে সুকৌশলে তাড়াচ্ছে। এটা কিভাবে হচ্ছে দেখা যাক।

প্রকৃতি তার সৃষ্টি রক্ষার তাগিদেই যেন নানা কৌশলে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত-বৃদ্ধির হাত থেকে বায়ুমণ্ডলকে রক্ষা করছে। প্রথমতঃ, গ্যাসটা জলে সবিশেষ দ্রাব্য বলে বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টির জলে দ্রবিত হয়ে নীচে নেমে আসে, আবার সমুদ্র ও নদী-নালার জলেও গ্যাসটা দ্রবিত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, সবুজ গাছপালা, তৃণগুল্ম, সব রকম উদ্ভিদই তাদের দেহ-গঠনের জন্যে বিশেষ জৈব প্রক্রিয়ায় বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে এবং তার কার্বন উপাদান নিয়ে উদ্ভিদ-দেহে বিভিন্ন শর্করা, শ্বেতসার, উদ্ভিজ্জ তন্তু (সেলুলোজ) প্রভৃতি তৈরি হয়, যা থেকে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। সূর্যালোকের প্রভাবে পাতার 'সবুজ কণিকা' বা ক্লোরোফিলের আশ্চর্য কার্যকারিতায় উদ্ভিদেরা এভাবে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের কার্বন উপাদানটি নিজদেহে আত্মস্থ করে নেয়, অক্সিজেন অংশ পুনরায় বায়ুতে ছেড়ে দেয়। উদ্ভিদ-দেহের এই জৈব প্রক্রিয়াকে বলে **ফোটোসিন্থেসিস,** বাংলায় বলা যায় উদ্ভিদের 'অঙ্গার-আত্মীকরণ' প্রক্রিয়া। প্রধানতঃ প্রকৃতির এই ব্যবস্থার ফলেই বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে না। বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে ও জীবজন্তুর শ্বাস-ক্রিয়ায় যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বায়ুতে মিশছে উদ্ভিদ-জগৎ তাকেও ভেঙ্গে কার্বনাংশ নিজে আত্মস্থ করে অক্সিজেন-অংশ বায়ুকে ফিরিয়ে দিচ্ছে; আর এভাবেই বায়ুমণ্ডলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সাম্য বজায় থাকছে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বেশি ভারী ; কাজেই গ্যাসটা বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরেই থাকে, উপরের দিকে তেমন ওঠে না। গ্যাসটা যে বায়ুর চেয়ে ভারী তা সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। একটা খালি (অর্থাৎ স্বভাবতঃ বায়ুপূর্ণ) গ্যাস-জারের মুখে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস-ভরতি আর একটা গ্যাস-জার উল্‌টে কাত্‌ করে ধরলে উপরের গ্যাসটা নিচের জারের বায়ুকে সরিয়ে দিয়ে তার মধ্যে গিয়ে ভরতি হয়। এ যেন জলের মত এক জার থেকে অন্য জারে ঢেলে দেওয়া হলো ; কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুর চেয়ে ভারী বলেই এটা সম্ভব হয়। নীচের জারে নেমে এসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সেখানকার জলন্ত মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবে, কারণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মধ্যে কোন জিনিস জলে না। জারটার ভিতরে পরিষ্কার চুনের জল কিছু দিয়ে ঝাঁকালে তা সাদা হয়ে যায়, এথেকেও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চুনের জলে দ্রবিত থাকে ক্যালসিয়াম-হাইড্রক্সাইড, তার সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলে-অদ্রাব্য সাদা ক্যালসিয়াম-কার্বনেট যৌগিকের কণা উৎপন্ন হয়ে জলটাকে ঘোলাটে-সাদা করে তোলে। বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব আর এক ভাবেও প্রমাণ করা যায়, পরিষ্কার চুনের জল উন্মুক্ত বায়ুতে রাখলে তার উপরে একটা সাদা সর পড়ে, এ জিনিসটা হলো ওই ক্যালসিয়াম-কার্বনেট, অর্থাৎ খড়ি, বা চুনা-পাথরের সূক্ষ্ম কণিকার আস্তরণ। বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অস্তিত্ব নির্ধারণের এটি একটি বিশেষ সমর্থনমূলক পরীক্ষা।
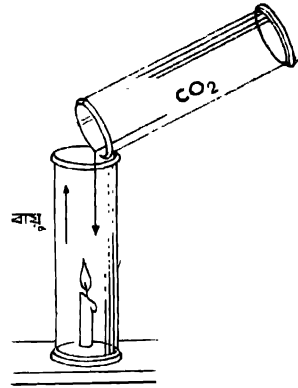
কার্বন-ডাইঅক্সাইড বায়ুর চেয়ে ভারী

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের মধ্যে জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন চলে না, আগুনও তেমন জ্বলে না ; কারণ, এর উভয় কাজেই অক্সিজেন চাই। গ্যাসটা দাহ্যও নয়, দাহকও নয় ; পরন্তু গ্যাসটা বায়ুর চেয়ে ভারী। এ সব বৈশিষ্ট্যের জন্যে জ্বলন্ত জিনিসের উপরে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিলে

তার উপরে ভারী গ্যাসটার একটা আবরণ সৃষ্টি হয়, তার ফলে বায়ুর সংস্রবশূন্য হয়ে (অক্সিজেন না পেয়ে) আগুন নিভে যায়। এই কৌশল অবলম্বন করে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র, বা 'ফায়ার একৃস্টিংগুইসার' তৈরি করা হয়েছে। এ যন্ত্রে একটা ধাতব খোলের মধ্যে সোডিয়াম-বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবণ ভরতি থাকে, আর থাকে একটা কাচ-নলে ভরতি কিছু সালফিউরিক অ্যাসিড। এই কাচ-নলটার গায়ে সংলগ্ন অবস্থায় একটা ধাতব দণ্ড সংযুক্ত থাকে, যার এক প্রান্ত থাকে খোলের বাইরে। দরকারের সময় এই প্রান্তটা চেপে দিলে অন্য প্রান্তের চাপে কাচের নলটা ভেঙে সোডিয়াম-বাইকার্বনেটের জলে অ্যাসিডটা মিশে যায়; আর এই দু'টা পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় খোলের মধ্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে। এখন যন্ত্রের খোলের গায়ে বাঁকানো নল-মুখটা খুলে দিলে ভিতরের চাপে গ্যাসটা জল নিয়ে সজোরে গিয়ে জ্বলন্ত জিনিসের উপরে ছিট্‌কে পড়ে।
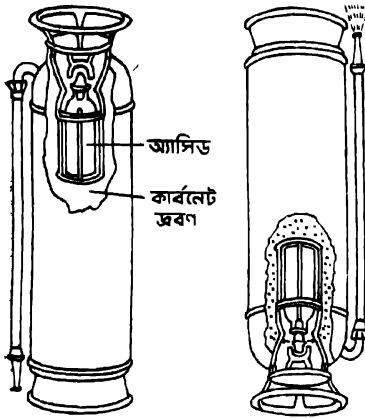
অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র
(ভিতরের ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে)

জলেও অবশ্য কিছুটা কাজ হয়; আবার ভারী গ্যাসটা জ্বলন্ত জিনিসটার উপরে একটা আবরণের সৃষ্টি করে, আর তার ফলে বায়ু অর্থাৎ অক্সিজেন না পেয়ে আগুনটা নিভে যায়। মোটামুটি এই কৌশলে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে ফেনাযুক্ত জল ছিটানোর ব্যবস্থা করে 'ফোমাইট ফায়ার-ফোম' প্রভৃতি নানারকম যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো হিমায়নের (refrigeration) কাজে। উপযুক্ত চাপ ও তাপে গ্যাসটাকে অনায়াসে তরল করা যায়; অবশ্য গ্যাসটার চাপ প্রয়োজনানুরূপ বাড়াতে ও তাপ কমাতে নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যাহোক, এই তরল কার্বন-ডাইঅক্সাইড লোহার সিলিণ্ডারে পুরে শিল্পক্ষেত্রে বিক্রয় হয়। সিলিণ্ডারের মুখ খুলে দিলে

ভিতরের তরল পদার্থ আবার গ্যাসীভূত হয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসে, আর এই অবস্থান্তরের ফলে নির্গত গ্যাসের তাপ অত্যধিক কমে যায়। এখন ঐ সিলিণ্ডারের মুখে মোটা ক্যান্‌ভাসের একটা থলে বেঁধে দিলে অবস্থান্তরের ফলে উদ্ভূত অত্যধিক শীতলতায় থলের মধ্যে গ্যাসটা জমে সরাসরি কঠিন হয়ে পড়ে। এই কঠিন কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে বলে **'ড্রাই আইস'** বা শুষ্ক বরফ। এটা সাধারণ (জল-জমা) বরফের চেয়েও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। পদার্থটার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উত্তাপ পেলে এটা সাধারণ বরফের মত গলে তরল হয় না। কঠিন অবস্থা থেকেই সরাসরি আবার গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণতঃ সব কঠিন পদার্থই উত্তাপে (পুড়ে না গেলে) তরল হয়ে যায়, আরও উত্তপ্ত করলে গ্যাসীয় রূপ ধারণ করে। কঠিন কার্বন-ডাইঅক্সাইড বা 'ড্রাই আইস'-এর ক্ষেত্রে পদার্থের অবস্থান্তরের এই সাধারণ নিয়মের আশ্চর্য ব্যতিক্রম ঘটে। কাজেই পদার্থটার অত্যধিক শীতলতার প্রভাবে কাছাকাছি জিনিস বিশেষ ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু বরফের মত গলে কিছু ভিজে যায় না।
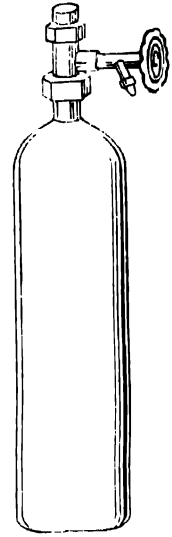
কার্বন-ডাইঅক্সাইড সিলিণ্ডার

কঠিন 'ড্রাই আইস' গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সময়ে তার তাপ বরফের চেয়েও 79° ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেড কমে যায়; জল জমে বরফ হয় 0° ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেডে, আর ড্রাই-আইসের তাপ বা শীতলতা হলো—79° ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেড (—110·2° ডিগ্রি-ফারেনহাইট)। এরূপ অত্যধিক শৈত্যের জন্যে পদার্থটা গায়ে চেপে ধরলে চামড়া 'পুড়ে' ফোস্কা পড়ে। এরূপ নিম্নতাপ-মাত্রার জন্যে কোন কোন হিমায়ক-যন্ত্রে (রিফ্রিজারেটর) ড্রাই-আইস ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ 'আইসক্রিম' তৈরি করবার জন্যে ড্রাই-আইসের হিম-কক্ষই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কোন দেশে মাল-গাড়ীর মধ্যে ড্রাই-আইসের বড় বড় চাঁই রেখে তার শীতলতায় তাজা রেখে বিভিন্ন কাঁচা মাল রপ্তানী করবার ব্যবস্থা আছে; কামরার ভিতরের মালপত্র এতে শুকনোই থাকে, কিন্তু এর ঠাণ্ডায় কয়েক দিন তা বেশ টাট্‌কা ও অবিকৃত থাকে।

অবশ্য কামরায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ভরতি থাকায় তার মধ্যে মানুষের প্রবেশ বিপজ্জনক বলে এ-ব্যবস্থার তেমন বহুল প্রচলন নেই। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আরও অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। আমরা যে সোডা-লিমোনেড খাই তা বস্তুতঃ এই গ্যাসেরই জলীয় দ্রবণ। যান্ত্রিক ব্যবস্থার চাপ-প্রয়োগে বোতলের জলকে এই গ্যাসে সম্পৃক্ত করা হয়, ছিপি খুললে চাপ কমে গিয়ে দ্রবিত গ্যাস জলের ফেনা নিয়ে বেরিয়ে আসে। বোতলের জলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর থাকে কিছু সোডা (সোডিয়াম বাই-কার্বনেট), স্যাকারিন ও কিছু সুগন্ধি। শ্বাসের পক্ষে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত ও অনুপযোগী; কিন্তু পেটে গেলে কোন ক্ষতি করে না, বরং বেশ সুস্থ বোধ হয়, পেটের উদ্বেগ কমে। আমরা আগেই বলেছি, কোন কোন স্থানের পার্বত্য প্রস্রবণের জলে কিছু কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও খনিজ পদার্থাদি দ্রবিত থাকে; একে বলা হয় বাতান্বিত (খনিজ) জল; ইংরেজীতে বলে 'মিনারেল ওয়াটার'। এরূপ প্রাকৃতিক বাতান্বিত জল যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর ও আন্ত্রিক রোগের পক্ষে হিতকারী।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস অতি সহজে ও সস্তায় উৎপাদিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরের মুখ্য উপাদান হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট; রাসায়নিক বিচারে যা কার্বন-ডাইঅক্সাইড বা কার্বনিক অ্যাসিডের একটা ক্যালসিয়াম-যৌগিক। কাজেই প্রস্তরের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অতি সহজেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বিমুক্ত হয় এবং প্রকাণ্ড আধারে বায়ুর ঊর্ধ্বাপসারণ পদ্ধতিতে আহরণ করা হয়।

জলীয় বাষ্প

বায়ুতে জলীয় বাষ্প সর্বত্র সব সময়েই কিছু না কিছু থাকে; বায়ুর প্রকৃত উপাদান না হলেও এটা বায়ুর নিত্য সহচর। কাজেই বায়ুর উপাদান প্রসঙ্গে এর কথাও কিছু বলা যেতে পারে। সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠের জল অহরহঃ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। বাষ্পমিশ্রিত বায়ু শুষ্ক বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা বলে তা ক্রমাগত উপরে ওঠে। ঊর্ধ্বাকাশের বায়ু স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা থাকে, তাই নীচের বাষ্পমিশ্রিত বায়ু সেখানে উঠে কতকটা স্থিতি লাভ করে। আবার ঊর্ধ্বাকাশের বায়ু অনেকটা ঠাণ্ডা বলে জলীয় বাষ্প সেখানে ঘনীভূত হয়ে অতি সূক্ষ্ম জল-কণায় পরিণত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে।

নানা নৈসর্গিক কারণে ঐ সূক্ষ্ম জল-কণাগুলি পরস্পর মিলে আকারে বড় হলে তারা বৃষ্টির ধারায় নীচে নামে। মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা প্রভৃতি সবই বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বায়ুতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত অবস্থার বিভিন্ন রূপ। বায়ুর আর্দ্রতা ও শুষ্কতা বলতে উষ্ণতার তারতম্যানুসারে বায়ুতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের আনুপাতিক পরিমাণ বুঝায়; আর এর উপরেই আব-হাওয়ার বিভিন্ন বৈচিত্র্য নির্ভর করে। এ-সব হলো আবহ-বিজ্ঞানের কথা।

সমুদ্র, নদী, বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতির নিকটবর্তী অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ থাকে বেশি। মরুভূমি অঞ্চলের বায়ু থাকে শুষ্ক, জলীয় বাষ্প প্রায় থাকে না; কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ শুষ্ক বায়ু প্রকৃতিতে কোথাও নেই। আবার বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ে, শীতকালে কমে। কম হোক, বেশি হোক, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। একটা কাচের গ্লাসে কিছু ঠাণ্ডা বরফ-জল রাখলে দেখা যাবে, অল্প সময় পরেই গ্লাসটার বাইরের শুষ্ক গাত্রে বিন্দু-বিন্দু জল জমেছে, গ্লাসটা যেন ঘেমে উঠেছে।

বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে জমেছে

ব্যাপারটা হলো, গ্লাসটার চারদিকের বায়ুতে মিশ্রিত অদৃশ্য জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে স্বভাবতঃই ঘনীভূত হয়ে জমে দৃশ্যমান জল-কণায় পরিণত হয়।

বিরল গ্যাসসমূহ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বায়ু অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের একটা মিশ্রণ মাত্র; বিশুদ্ধ বায়ুতে আর কিছু নেই। জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য কোন-কোন গ্যাস, ধূলা-ময়লা প্রভৃতি আর যা-সব বায়ুতে পাওয়া যায় সেগুলি স্থানীয় কারণে বাইরে থেকে বায়ুতে মেশে, বায়ুর নিজস্ব উপাদান নয়। তাই পরিমাণে এগুলি নানা জায়গার বায়ুতে নানা অনুপাতে মিশ্রিত থাকে মালিন্য হিসেবে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জানা যায়, বিশুদ্ধ বায়ুতে আর্গন, নিয়ন, ক্রিপ্টন প্রভৃতি আরও পাঁচটি মৌলিক গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত রয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই বায়ুতে এগুলি আছে,

পরিমাণ সামান্য হলেও সর্বত্র এদের অনুপাত প্রায় সুনির্দিষ্ট ; কাজেই বুঝা গেল, এগুলি বায়ুরই নিজস্ব উপাদান। এই গ্যাস পাঁচটি বায়ুর অতি নগণ্য অংশ ও দুর্লভ বলে এদের বলা হয় 'বিরল গ্যাস'। বিরল গ্যাসগুলি যেমন একেবারে নিষ্ক্রিয়, তেমন আবার পরিমাণে এত সামান্য যে কোন-কোনটা হয়তো বায়ুর লক্ষ ভাগে একভাগ মাত্র।

বায়ুর এই সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে খুঁজে বার করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, এরা সবাই পৃথক পৃথক গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট স্বতন্ত্র মৌলিক গ্যাস — হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন। সবগুলি মিলে বিরল গ্যাসের পরিমাণ বায়ুর এক-শতাংশ মাত্র। এ-সব মৌলিক গ্যাসের আবিষ্কার ও তাদের বৈশিষ্ট্যের বিশদ পরিচয় লাভের ইতিবৃত্ত রাসায়নিক গবেষণার ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায় ; যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনই বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও যুক্তির অপূর্ব নিদর্শন।

আবিষ্কার কাহিনী ঃ বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ছাড়াও এক রকম অজ্ঞাত গ্যাসের সন্ধান অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। বৃটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস 1765 খৃষ্টাব্দে বায়ুতে এক রকম অজ্ঞাত গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা-ই ছিল বায়ুর বিরল গ্যাস ; কিন্তু তিনি তার প্রকৃত তাৎপর্য ধরতে পারেন নি। এর শতাধিক বছর পরে 1894 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে ও উইলিয়াম র‍্যামজে ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার সূত্র ধরেই ঐ অজ্ঞাত গ্যাসকে বায়ুর সূক্ষ্ম উপাদান বিভিন্ন 'বিরল গ্যাস' বলে প্রমাণ করেন ; প্রথম সন্ধান ক্যাভেণ্ডিস পেলেও তাই এঁরা দু'জনই বায়ুর বিরল গ্যাসগুলির আবিষ্কারক বলে খ্যাত হন।

বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস তাঁর পরীক্ষায় একটা প্রকাণ্ড কাচ-গোলকে আবদ্ধ বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে উচ্চ বিভবের তড়িৎ ক্ষরণ করেন। ক্রমাগত তড়িৎ-ক্ষরণের ফলে আবদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে নাইট্রোজেন-অক্সাইড যৌগিক উৎপন্ন হয়। গোলকটার মধ্যে ক্যাভেণ্ডিস আগে থেকেই কতকটা কষ্টিক পটাসের জলীয় দ্রবণ নিয়েছিলেন ; এর সঙ্গে তড়িৎ-ক্ষরণে উৎপন্ন নাইট্রোজেন-অক্সাইড গ্যাসটা যুক্ত হয়ে শুষে গেল। এখন গোলকটার মধ্যে রইল কেবল বায়ুর অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ; কারণ, বায়ুতে অক্সিজেনের চেয়ে নাইট্রোজেন থাকে অনেক বেশি। **ক্যাভেণ্ডিস** গোলকের ঐ অবশিষ্ট নাইট্রোজেনের সঙ্গে বাইরে থেকে কিছু অক্সিজেন মিশিয়ে আবার

তড়িৎ-ক্ষরণ করেন। আবার নাইট্রোজেন ও আক্সিজেন মিলে নাইট্রোজেন-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে কষ্টিক-পটাসের দ্রবণে [illegible] গেল। এভাবে বার-বার প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যখন গোলকের সবটা নাইট্রোজেন একেবারে নিঃশেষ হলো, আর নাইট্রোজেন নেই বুঝা গেল, তখন অতিরিক্ত অক্সিজেন ভিতরে যা-কিছু ছিল তা-ও দূর করা হলো। এর জন্যে ক্যাভেণ্ডিস গোলকটার মধ্যে কিছু পটাসিয়াম-সালফাইডের জলীয় দ্রবণ প্রবেশ করিয়ে ছিলেন। পটাসিয়াম-সালফাইডের অপর নাম 'লিভার-অব-সালফার'; জিনিসটা অতি দ্রুত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করে নেয়। গোলকটার মধ্যে তখন অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন কোন গ্যাসই থাকবার কথা নয়; কিন্তু তার মধ্যে জল পুরে ক্যাভেণ্ডিস দেখলেন—একটা বুদ্‌বুদ পরিমাণ গ্যাস ভিতরে রয়ে গেছে।

বৃটিশ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেণ্ডিস

ক্যাভেণ্ডিস অতি সাবধানে পরীক্ষাটি করেছেন, বার বার করলেন; কিন্তু ফল ঐ একই হলো — সামান্য একটু গ্যাস প্রতি বারেই ভিতরে রয়ে যায়। তড়িৎ-ক্ষরণে কিছুতেই এ-গ্যাসটুকু অক্সিজেনের সঙ্গে মিললো না, অথবা কষ্টিক-পটাস বা পটাসিয়াম-সালফাইডের দ্রবণেও শুষে গেল না। এথেকে বুঝা গেল, এটা অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন নয়। তাহলে এটা কি? গ্যাসটুকুর পরিমাণ হিসাব করে দেখা গেল, গোলকে আবদ্ধ বায়ুর প্রায় এক-শতাংশ মাত্র। এই পরীক্ষার ফল ক্যাভেণ্ডিস বিজ্ঞানী-মহলে প্রচার করলেন, কিন্তু কেউই এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝলেন না; সকলেই ধরে নিলেন, হয়তো একটু

নাইট্রোজেন কোন ক্রমে রয়ে গেছে। এটা যে বায়ুরই উপাদান কোন রকম অজ্ঞাত গ্যাস, একথা সে-যুগে কারুর মাথায়ই আসে নি। এভাবে হাতে পেয়েও বায়ুর বিরল গ্যাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব ক্যাভেণ্ডিস পেলেন না। পরীক্ষার ফলাফলের তাৎপর্য বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে। যাহোক, পরীক্ষাটা তখনকার মত ব্যর্থ হয়ে গেল।

এ ঘটনার শতাধিক বছর পরে 1894 খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে বিভিন্ন গ্যাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করছিলেন। বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন বিদূরিত করে তিনি তার অবশিষ্টাংশ নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব (অর্থাৎ সমায়তন হাইড্রোজেনের চেয়ে কতগুণ ভারী) বার করলেন। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন যৌগিক থেকে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তিনি তারও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করলেন। দেখা গেল, বায়ু থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব যৌগিক থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্বের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। সামান্য বেশি হলেও তা হবে কেন? একই গ্যাস যে ভাবেই পাওয়া যাক না কেন, বিশুদ্ধ ও একক হলে গুরুত্ব তার অবশ্যই সব সময়ে সমান হবে। লর্ড র‍্যালে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানালেন।

এই সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে বিশুদ্ধ বায়ু থেকে তার অক্সিজেন নিঃশেষে অপসারিত করে নাইট্রোজেন নিয়ে আর একভাবে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি একটা বায়ুশূন্য কাচ-নলের ভিতরকার উত্তপ্ত ম্যাগ্নেসিয়ামের উপরে সেই নাইট্রোজেনকে পর্যায়ক্রমে কয়েক বার প্রবেশ করান। এর ফলে উত্তপ্ত ম্যাগ্নেসিয়ামের সঙ্গে নাইট্রোজেন মিলে ম্যাগ্নেসিয়াম নাইট্রাইড নামক একটা কঠিন যৌগিক উৎপন্ন হলো; ভিতরে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন আর থাকবার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল, সামান্য একটু গ্যাস অবশিষ্ট থেকে গেল, কিছুতেই ম্যাগ্নেসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হলো না। র‍্যামজে বুঝলেন, এটা কখনো নাইট্রোজেন নয়, নিশ্চয়ই কোন একটা অজ্ঞাত নূতন গ্যাস হবে।

এদিকে লর্ড র‍্যালে আবার ক্যাভেণ্ডিসের সেই পুরানো পরীক্ষাটা বিরাট আকারে করে তাঁর সেই অজ্ঞাত গ্যাসটা প্রায় দু'লিটার পরিমাণ সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই গ্যাসটা ও র‍্যামজের পাওয়া অজ্ঞাত গ্যাসটা একই রকম আচরণ করে; উভয়েই নিষ্ক্রিয় এবং উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব

একই, প্রায় 20 (হাইড্রোজেন=1)। কোন যৌগিক থেকে বিশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো 14 : এ থেকে বুঝা গেল, বায়ু থেকে পাওয়া ঐ অজানা গ্যাসটা নাইট্রোজেন নয়, নাইট্রোজেন হলে তার আপেক্ষিক গুরুত্ব অবশ্যই 14 হতো। এ সব যুক্তি থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, বায়ু থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি হয়, কারণ তাতে বায়ুর অন্য কোন অজ্ঞাত গ্যাসীয় উপাদান মিশে থাকে। এভাবে ক্যাভেণ্ডিসের সেই অজানা গ্যাসটা এবং র‍্যামজে ও র‍্যালের সংগৃহীত গ্যাস বায়ুরই একটা উপাদান বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বায়ুর এই নূতন উপাদানই 'বিরল গ্যাস' বলে পরিচিত হলো এবং র‍্যামজে ও র‍্যালে যুগ্মভাবে এর আবিষ্কারক বলে খ্যাতি লাভ করলেন।

বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে

এই নূতন গ্যাসটা নিয়ে অতঃপর নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। দেখা গেল, এটা কোন পদার্থের সঙ্গেই যুক্ত হয় না, কোন রকমেই এর কোন রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে না, একেবারে নিষ্ক্রিয়। আবার পরিচিত কোন গ্যাসের সঙ্গেই এর কোন রকম সাদৃশ্যও দেখা গেল না। কাজেই এটি একটি মৌলিক গ্যাস, বায়ুর একটি নূতন দুর্লভ গ্যাসীয় উপাদান বলে বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃত হলো। প্রথমে এর নাম দেওয়া হলো **আর্গন** ; 'আর্গন' একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ হলো কর্মহীন বা নিষ্ক্রিয়।

পরিমাণ ও পরিচয় : বায়ুর এই নবাবিষ্কৃত দুর্লভ উপাদানটি আর্গন নামে পরিচিত হলেও ক্রমে জানা গেল, এটাও একক গ্যাস নয় ; বস্তুতঃ এটা

পাঁচটি বিভিন্ন মৌলিক গ্যাসের সংমিশ্রণ। প্রধানতঃ তরল বায়ুর আংশিক বাষ্পীকরণ (ফ্রাক্‌সন্যাল ডিষ্টিলেশন) প্রক্রিয়ার সাহায্যেই উক্ত গ্যাস পাঁচটির পৃথক সত্তা ধরা পড়েছে। এগুলির প্রত্যেকটিই পরিমাণে অতি সামান্য, বায়ুর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র — যেন সমুদ্রে বারি-বিন্দুবৎ। এগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হলো ; যেটির পরিমাণ বায়ুতে আনুপাতিক হিসাবে সর্বাধিক তার নাম আর্গন-ই রইল ; অপরগুলির নাম হলো **নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপ্টন ও জেনন।** বিরল গ্যাসগুলি সব মিলে বায়ুর আয়তনের এক-শতাংশ মাত্র, সূক্ষ্ম হিসাবে শতকরা 0·94 ভাগ। বিভিন্ন বিরল গ্যাসের মধ্যে আয়তনে আর্গনই সর্বাধিক রয়েছে, শতকরা 0·93 ভাগ ; নিয়ন গ্যাস রয়েছে 0·0018 ভাগ হিলিয়াম 0·00005 ভাগ, ক্রিপ্টন 0·0001 ভাগ এবং জেনন রয়েছে 0·00001 ভাগ মাত্র। শতকরা 0·00001 ভাগ মানে এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এই আবার বিরল গ্যাসগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং তাদের ওজনের শতাংশ পরিমাণও স্থির করা হয়েছে। বায়ুর ওজনের শতকরা 1·8 ভাগ আর্গন, 0·00086 ভাগ নিয়ন, 0·000056 ভাগ হিলিয়াম, 0·028 ভাগ ক্রিপ্টন এবং 0·005 ভাগ জেনন। বায়ুর এই বিরল গ্যাসগুলির পরিমাণ নির্ধারণ ও উল্লিখিত সূক্ষ্ম হিসাবের ব্যাপার ধারণা করাও কঠিন। আবার এগুলির বিভিন্ন গুণ ও ধর্ম নিরূপণ করে মানুষের নানা প্রয়োজনে তাদের ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করা মানব-কল্যাণে রসায়নের বিবিধ বিস্ময়কর দানগুলির অন্যতম , তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক, এখন এই বিরল গ্যাসগুলির বিভিন্ন ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্যসমূহের কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। বায়ুর অতি সূক্ষ্ম উপাদান হিসাবে বিরল গ্যাসগুলির বিবিধ তথ্য বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বহু দিনের গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম দিকে এটা একটা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব বলেই খ্যাতি পেল ; মানুষের জ্ঞানের গণ্ডী বাড়লো মাত্র, কাজে কিছু এল না। এত বিপুল ব্যয় ও পরিশ্রমে বায়ু থেকে বিরল গ্যাস পৃথক করে কি লাভ হলো ? পরে অবশ্য তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন বিরল গ্যাস আলাদা করে পাওয়া গেল। এটা কি করে সম্ভব হলো তা পরে 'তরল বায়ু' প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাবে।

আর্গন ঃ বিরল গ্যাসগুলির মধ্যে আর্গন গ্যাসই বেশি, আয়তনে প্রায় 0·93 ভাগ, একথা আমরা আগেই বলেছি। কেবল আর্গনই নয়, সবগুলি

বিরল গ্যাসই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়; কোনটারই কোন যৌগিক সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। আর্গন গ্যাস নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে এর একটা চমৎকার ব্যবহারের কথা ক্রমে জানা গেছে। বিজলী বাতির বাল্‌বের মধ্যে আর্গন গ্যাস ভরতি করে জ্বালালে বৈদ্যুতিক আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, বাল্‌বের ফিলামেণ্ট (বাতির দীপ্তিমান তার-কুণ্ডলী) সহজে নষ্ট হয় না, আর বাল্‌বের কাচে ময়লা ধরে না। আজকাল এরূপ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়ে থাকে। আবার বায়ুশূন্য কাচ-নলে সামান্য পরিমাণ আর্গন গ্যাস ও কিছু পারদ-বাষ্প (মার্কারি ভেপার) পুরে নলের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে উজ্জ্বল নীলাভ আলো ছড়ায়। বিভিন্ন বিরল গ্যাস পুরে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক বাতির আলো সুদৃশ্য ও বর্ণোজ্জ্বল হয় বলে আধুনিক যুগে এরূপ বাতি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
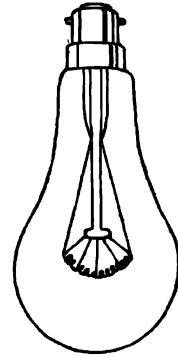
আর্গন টিউব-লাইট ও বিজলী বাতির বাল্‌ব

হিলিয়াম: ফরাসী জ্যোতির্বিদ জ্যানসেন ও বৃটিশ জ্যোতির্বিদ নর্‌ম্যান লকার একবার সূর্য-গ্রহণের সময় সূর্যের বহির্পৃষ্ঠের বর্ণ-মণ্ডলের (ক্রোমোস্ফিয়ার) বর্ণালী বিশ্লেষণ করে একটা হল্‌দে রেখা লক্ষ্য করেন। স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রদীপ্ত গ্যাসের আলোক-রশ্মির বর্ণালীতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট বর্ণের রেখা দেখা যায়। বিভিন্ন গ্যাসের আলো থেকে উদ্ভূত এরূপ বর্ণালী-রেখার ধরন হয় আলাদা; তাই এদের বর্ণ ও ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করে উৎপাদক গ্যাসের পরিচয় জানা যায়। যাহোক, সূর্যালোকের বর্ণালীতে দৃষ্ট এরূপ হল্‌দে রেখা পার্থিব কোন মৌলিক গ্যাসের ক্ষেত্রে আগে আর দেখা যায় নি। ঘটনাটা ঘটে 1864 খৃষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী লকার এ থেকে সূর্যমণ্ডলে একটা অজ্ঞাত গ্যাসের অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং সেই অজানা গ্যাসের নাম দেন হিলিয়াম। **হিলিয়াম** একটা গ্রীক শব্দ, মানে 'সূর্যসম্বন্ধীয়'। তখন পর্যন্ত কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ কোন গ্যাসের সন্ধান মেলে নি।

এর কয়েক বছর পরে 1895 খৃষ্টাব্দে রসায়ন-বিজ্ঞানী র‍্যামজে পৃথিবীতে *ঐ হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেন,* যার বর্ণালীতে সৌর বর্ণালীর অনুরূপ হল্‌দে রেখা পাওয়া গেল। ক্লিভাইট নামক এক রকম ইউরেনিয়াম-খনিজ থেকে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় র‍্যামজে ঐ গ্যাসটা পান এবং তার বর্ণালী পরীক্ষার পরে তিনি একে অধ্যাপক লকারের সৌর বর্ণালীতে দৃষ্ট সেই অপার্থিব হিলিয়াম গ্যাস বলে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানের কি আশ্চর্য মহিমা! একটা জিনিস প্রথমে দেখা গেল সূর্যে, তারপরে পৃথিবীতে। বর্ণালী-বিশ্লেষণে নূতন এই গ্যাসের মৌলিক প্রকৃতি জানা গেল এবং র‍্যামজে গ্যাসটা নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, গ্যাসটা একটা মৌলিক পদার্থ, আর্গন গ্যাসের মতই নিষ্ক্রিয় ; — কোন পদার্থের সঙ্গেই এর রাসায়নিক মিলন ঘটে না। ক্রমে জানা গেল, এর পারমাণবিক ওজন হলো 4 ; আর একে তরল করা দুঃসাধ্য।

বায়ুর নিষ্ক্রিয় উপাদান বিরল গ্যাসে হিলিয়াম আছে, বর্ণালী-বিশ্লেষণে এটা পরে প্রমাণিত হলো। বায়ুর বিরল গ্যাস থেকে হিলিয়াম পৃথক করা প্রথম দিকে সম্ভব হয় নি। বায়ুতে হিলিয়াম আছে প্রায় লক্ষ ভাগে এক ভাগ মাত্র। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলে ভূগর্ভ থেকে নির্গত এক রকম প্রাকৃতিক গ্যাসে হিলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশেষ কৌশলে হিলিয়াম পৃথক করে নিয়ে এই প্রাকৃতিক গ্যাসটা আলো জ্বালাতে ও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক হিলিয়ামের এটাই প্রধান উৎস। আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায়ও তরল বায়ু থেকে গ্যাসটা যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক করা যেতে পারে। কোন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণেও এ-গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে নির্গত হয়। আবার কোন কোন প্রস্রবণের স্বাভাবিক বাতান্বিত জল থেকেও হিলিয়াম গ্যাস কিছু কিছু উদ্‌গত হয়ে থাকে।

হিলিয়ামের ব্যবহার ঃ আকাশ-যানের প্রথম যুগে বেলুন ও জেপেলিন নামক উড়ো-জাহাজে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি করে তাকে বায়ুর চেয়ে হালকা করা হতো। হাইড্রোজেন বায়ুর চেয়ে হালকা বটে, কিন্তু বিশেষ দাহ্য গ্যাস ; কাজেই এর ব্যবহার নিরাপদ ছিল না। সামান্য আগুনের সংস্পর্শে এ-সব আকাশ-যানে অনেক সময় আগুন লেগে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরে এরূপ উড়ো-জাহাজে হিলিয়াম গ্যাস ভরতি করবার ব্যবস্থা

হয়েছিল। গ্যাসটা জ্বলে না, তাই নিরাপদ। হাইড্রোজেনের চেয়ে হিলিয়াম দ্বিগুণ ভারী হলেও বায়ুর চেয়ে যথেষ্ট হাল্‌কা; কাজেই এর সাহায্যে জেপেলিনের উপরে উঠতে ও বাতাসে ভেসে থাকতে অসুবিধা হতো না।

হিলিয়ামের আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো, গভীর সমুদ্রে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে নাইট্রোজেনের বদলে হিলিয়াম-মেশানো অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। সমুদ্রতলে জলের উচ্চ চাপে সাধারণ বায়ুর নাইট্রোজেন গ্যাস ডুবুরীদের রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে শোষিত হয়; আর তাদের উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ চাপে ঐ শোষিত নাইট্রোজেন অতি দ্রুত ডুবুরীদের রক্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। এর ফলে, রক্ত জমাট বেঁধে তাদের অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। অবশ্য এর প্রতিকারের অন্য উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে; তবে অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের বদলে হিলিয়াম মিশিয়ে সেই কৃত্রিম বায়ু সমুদ্রতলে ডুবুরীদের সরবরাহ করলে উল্লিখিত মারাত্মক অসুবিধা আর থাকে না। মানুষের রক্তে উচ্চ চাপের নাইট্রোজেনের চেয়ে হিলিয়াম অনেক কম শোষিত হয়। হিলিয়ামের আর একটা ব্যবহার হলো, গ্যাসটার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে এক রকম সুদৃশ্য হল্‌দে আলো বিকিরিত হয়; এজন্যে বৈদ্যুতিক বাতিতে এর ব্যবহার আছে।

নিয়ন, ক্রিপ্টন ও জেনন: 1894 খৃষ্টাব্দে বায়ুর বিরল গ্যাস আর্গন ও 1895 খৃষ্টাব্দে হিলিয়াম আবিষ্কারের পরে অধ্যাপক র‍্যামজে পরবর্তী বছরেই বায়ুতে আরও তিনটি বিরল গ্যাসের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং তাদের নাম দেন নিয়ন, ক্রিপ্টন ও জেনন। তিনি প্রমাণ করেন, এদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র মৌলিক গ্যাস এবং সেগুলি বায়ুর বিরল গ্যাসের এক-একটি অতি সূক্ষ্ম উপাদান। প্রধানতঃ, বর্ণালী বিশ্লেষণেই এগুলির অস্তিত্ব ধরা পড়ে; তারপরে তরল বায়ুর থেকে আংশিক বাষ্পীকরণ (ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন) প্রক্রিয়ায় এদের একে একে পৃথক করা হয়েছে। বায়ুতে এই বিরল গ্যাসগুলির অতি সূক্ষ্ম আনুপাতিক পরিমাণের হিসাব আগেই দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান যুগে নিয়ন-বাতির সঙ্গে সবাই পরিচিত; সহরাঞ্চলের দোকানে, সিনেমায় ও প্রচার লিপিতে সুদৃশ্য রঙীন নিয়ন-বাতির আলোকসজ্জা ও বর্ণোজ্জ্বল বিজ্ঞাপনের আজকাল ছড়াছড়ি। বায়ুশূন্য কাচের নলে অল্প চাপে আবদ্ধ নিয়ন গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে গ্যাসটা প্রদীপ্ত হয়ে উজ্জ্বল গোলাপী আলোক ছড়ায়। কুয়াসা-কুজ্ঝটিকা ভেদ করে এই আলো বহু দূর

থেকেও দেখা যায় বলে সমুদ্রের আলোক-স্তম্ভে (লাইট হাউসে) ও বিমান-বন্দরের আলোক-সংকেতে আজকাল বিশেষতঃ এই আলো ব্যবহার করা হয়।

বৈদ্যুতিক বাতির বাল্‌বে অনেক সময় আর্গনের বদলে ক্রিপ্টন বা জেনন গ্যাসও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর্গনের চেয়ে এতে আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে। এখন কথা হলো, এ-সব বিরল গ্যাস এত পাওয়া যায় কি করে? ক্রিপ্টন আছে বায়ুর দশ লক্ষ ভাগে এক ভাগ, জেনন গ্যাস তো এক কোটি ভাগে এক ভাগ মাত্র। কাজেই গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ু থেকে এদের পৃথক করা দুঃসাধ্য; সাহারার বুকে হারানো বিশেষ এক কণা বালুকা খোঁজার মত। আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানা জটিল পদ্ধতিতে ও অতি সতর্কতায় তরল বায়ু থেকে বিরল গ্যাসগুলি পৃথক করা সম্ভব হয়েছে এবং শিল্প-প্রয়োজনের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে এ-সব বিরল ও দুর্লভ গ্যাসও সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হয়েছে। কেবল তাই-ই নয়, তরল বায়ুর প্রয়োজন ও বিভিন্ন কাজে তার ব্যবহার এত বেশি যে বায়ু-তরলীকরণ পদ্ধতিকে মানব-কল্যাণে রসায়নের অজস্র দানের অন্যতম বলে গণ্য করা যায়।

তরল বায়ু

বিজ্ঞানের বাহাদুরির অন্ত নেই। দেখা যায় না, ধরা যায় না, এমন যে বায়ু বিজ্ঞানী তাকে জলের মত তরল করে ফেলেছেন; এক ঘর-ভরতি বায়ুকে তরল করে হয়তো একটা বোতলে পুরেছেন। এমন কি, দরকার হলে তাকে ইটের মত কঠিন করেও ফেলতে পারেন। পদার্থের এরূপ অবস্থান্তর প্রধানতঃ তার উপরে প্রযুক্ত তাপ ও চাপের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। তাপ ও চাপের প্রভাবে পদার্থের সংগঠক অণুরা তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে সমষ্টিগতভাবে প্রসারিত বা সংকুচিত হয় এবং তারই ফলস্বরূপ পদার্থটার অবস্থান্তর ঘটে। কোন পদার্থকে আমরা স্বভাবতঃ যে অবস্থায় দেখি সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপ ও চাপে সেটা সেই অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, যে-হেতু তার সংগঠক অণুদের পারস্পরিক আকর্ষণ তদনুযায়ী থাকে। তাপ ও চাপের উপযুক্ত পরিবর্তন ঘটাতে পারলে পদার্থটার আভ্যন্তরীণ আণবিক আকর্ষণ বদলে যায়; ফলে তার আকার-আয়তন বদলে গিয়ে অবস্থান্তরিত হয়ে পড়ে। পদার্থের অবস্থান্তরের এটা হলো মূলগত সাধারণ তথ্য।

সাধারণতঃ দেখা যায়, পদার্থের তাপ প্রয়োজনানুরূপ বাড়িয়ে ক্রমে কঠিনকে

তরল এবং তরলকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত করা যায়। আবার পক্ষান্তরে গ্যাসীয় পদার্থের তাপ প্রয়োজনানুরূপ কমালে তা তরল হয়, আরও কমালে (ঠাণ্ডা করলে) তরল পদার্থ জমে কঠিন হয়ে পড়ে। তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পদার্থেব এরূপ অবস্থান্তরের সাধারণ দৃষ্টান্ত হলো বাষ্প, জল ও বরফ। এ-কথা আমরা সবাই জানি; কিন্তু সব পদার্থের বেলায় আমরা তার তাপ প্রয়োজন মত যথেষ্ট বাড়াতে বা কমাতে পারি না, কেননা তা সহজসাধ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি চাপও কমানো-বাড়ানো যায় তাহলে পদার্থের অবস্থান্তরের কাজটা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যাহোক, কঠিন ও তরল পদার্থের অবস্থান্তরের কথা আমাদের আলোচ্য নয়; আমরা এখানে কেবল গ্যাসীয় পদার্থের তরলীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সহজেই বুঝা যায়, গ্যাসীয পদার্থের সাংগঠনিক আণবিক আকর্ষণ অতি সামান্য; তাই তার অণুগুলি সহজেই পরস্পরকে ছেড়ে দূরে দূরে সরে যেতে চায়। গ্যাস তাই ছড়িয়ে পড়ে, আয়তনে যথেষ্ট বাড়ে। গ্যাসের অণুগুলিকে ঘনসন্নিবিষ্ট করে তার আয়তন কমাতে হলে কেবল চাপ বাড়ালেই অনেকটা কাজ হয়। কিন্তু কেবল চাপ বৃদ্ধি করেই গ্যাসকে সব ক্ষেত্রে তরল করা সম্ভব হয় না, চাপের সঙ্গে সঙ্গে তার তাপ কমালে তরলীকরণের কাজ সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। কথাটা হলো এই যে, একই সঙ্গে তাপ কমিয়ে ও চাপ বাড়িয়ে দিলে গ্যাস সহজেই তরল হয়। অবশ্য এর মধ্যে একটা কথা আছে: যে-কোন তাপ ও চাপে গ্যাস তরল হয় না। প্রত্যেক গ্যাসের একটা নির্দিষ্ট নিম্ন-তাপমাত্রা আছে যাতে পৌছালে তখন তাকে কেবল চাপ দিয়েই তরল করা সম্ভব হয়। এই নির্দিষ্ট নিম্নতম তাপ-মাত্রাকে বলা হয় সেই গ্যাসের **ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার** বা মোক্ষম তাপমাত্রা; আর, কোন গ্যাসকে ঠাণ্ডা করে এই ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে এনে তার উপরে যতটা চাপ প্রয়োগ করলে গ্যাসটা তরল হয়, সেই চাপকে ঐ গ্যাসের **ক্রিটিক্যাল প্রেসার** বা 'মোক্ষম চাপ' বলে।

কোন গ্যাসের, বা যে-কোন বস্তুর স্বাভাবিক উষ্ণতা বা তাপমাত্রা হলো তার চারদিকের বায়ুর উষ্ণতার সমান। কোন গ্যাসের এই সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা যদি তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে আগে তার তাপ কমিয়ে (ঠাণ্ডা করে) তাকে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে নামিয়ে আনতে হবে; তারপরে তার উপরে উপযুক্ত চাপ প্রয়োগ করে তরল করা যাবে। একথা আমরা আগেই বলেছি। এ থেকে সহজেই বুঝা যায়, কোন গ্যাসের স্বাভাবিক

তাপমাত্রা যদি তার নির্দিষ্ট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের কমই থাকে, তাহলে আর তার তাপ কমাবার প্রশ্নই থাকে না, কেবল চাপ বাড়িয়েই তাকে সহজে তরল করা যায়। অবশ্য যে-কোন অবস্থায়ই কেবল তাপ কমিয়ে, অথবা কেবল চাপ বাড়িয়েই গ্যাসকে তরল করা যেতে পারে ; কিন্তু এটা কেবল যুক্তির কথা। প্রকৃতপক্ষে এজন্যে যতটা দরকার ততটা তাপ কমানো বা চাপ বাড়ানো অধিকাংশ গ্যাসের ক্ষেত্রেই বস্তুতঃ সম্ভব হয় না। মোট কথা, বাস্তব ক্ষেত্রে গ্যাসকে তরল করবার মত তাপ-মাত্রা অত্যধিক কমানো বা প্রচণ্ডভাবে চাপ বাড়ানো সম্ভব নয় ; সব ব্যাপারেরই একটা সীমা আছে। কাজেই গ্যাসকে তরল করতে হলে তার তাপ-হ্রাস ও চাপ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা একই সঙ্গে করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। গ্যাসকে তরল করবার বৈজ্ঞানিক তথ্য মোটামুটি এই।

বায়ু তরলীকরণ : বায়ু একটা গ্যাসীয় মিশ্রণ ; এর প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার যথাক্রমে —147° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও —118° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলে জানা গেছে। এই নিম্ন তাপ-মাত্রা, বা শীতলতার একটা মোটামুটি ধারণা করবার জন্যে বলা যায় যে, গ্যাস দু'টার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার (অর্থাৎ যে নিম্ন-উষ্ণতায় কেবল চাপ বৃদ্ধি করেই তাদের তরল করা সম্ভব) তা বরফের শীতলতার চেয়েও যথাক্রমে 147 ডিগ্রি ও 118 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম। কোন গ্যাসকে এতটা ঠাণ্ডা করবার কৌশল মাত্র বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই উদ্ভাবনের কৃতিত্ব প্রধানতঃ জনৈক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ভন লিন্‌ডে ও ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ডব্লু হ্যাম্পসনের প্রাপ্য। কৌশলটা হলো, অধিক চাপে সঙ্কুচিত করে যদি কোন গ্যাসকে সূক্ষ্ম রন্ধ্রের পথে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ চাপিত গ্যাস সহসা সম্প্রসারিত হয়ে যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। বায়ুকে তরল করবার বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজকাল এই কৌশলই অবলম্বিত হচ্ছে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ধূলা-ময়লা প্রভৃতি দূর করে বিশুদ্ধ বায়ুকে যন্ত্রের সাহায্যে ধাপে-ধাপে চাপ বাড়িয়ে সংকোচিত করা হয়। এভাবে যখন সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় 150 গুণ চাপ বৃদ্ধি পায় তখন সেই চাপিত বায়ুকে তামার-তৈরী সরু ও কুণ্ডলীকৃত নল-মুখে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটা বড় ট্যাঙ্কের ঠাণ্ডা জলে ঐ নল-কুণ্ডলী নিমজ্জিত রাখা হয়, এর ফলে চাপ-বৃদ্ধিতে বায়ু স্বভাবতঃই যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঐ বিশেষ ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে তা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়। এভাবে নলের অভ্যন্তরস্থ চাপিত বায়ু প্রায় 15° ডিগ্রি

সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। এই নল-পথে চাপিত বায়ুকে আবার একটা কুণ্ডলীকৃত নলের ভিতর দিয়ে চালিত করে নিয়ে তার ভাল্‌বযুক্ত নির্গম-পথে ছেড়ে দেওয়া হয় একটা বড় ট্যাঙ্কের ভিতরে। এই ট্যাঙ্কের বায়বীয় চাপ থাকে বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ চাপের সমান। কাজেই সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের
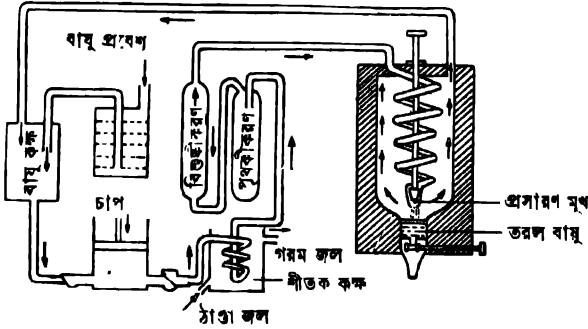
বায়ু তরলীকরণ পদ্ধতির যান্ত্রিক নক্সা

150 গুণ চাপিত বায়ু ট্যাঙ্কের মধ্যে সহসা বেরিয়ে দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, আর সেই সহসা সম্প্রসারণের ফলে অত্যধিক ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এই ঠাণ্ডা বায়ুকে নলপথে নিয়ে আবার আগের ঐ কুণ্ডলীকৃত নলের ভিতরকার নূতন চাপিত বায়ুকে ঠাণ্ডা করবার কাজে লাগানো হয় এবং এভাবে বিশেষ শীতল ও চাপিত বায়ুকে আবার ঐ পূর্বোক্ত ট্যাঙ্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে সহসা সম্প্রসারিত করা হয়। এবারে ঐ সম্প্রসারিত বায়ু আগের চেয়েও অধিকতর শীতল হয়ে পড়ে। এই পদ্ধতিতে একই বায়ুকে পর্যায়ক্রমে কয়েক বার ঘুরিয়ে ধাপে ধাপে ঠাণ্ডা করে আনলে এক সময় ঐ চাপিত বায়ুর শীতলতা তার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নীচে নেমে যায় এবং তখন তা স্বতঃই তরল হয়ে ট্যাঙ্কের তলায় জমতে থাকে। বায়ু তরলীকরণের এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে, আর ট্যাঙ্কের নীচের দিকের নির্গম-নলের ট্যাপ খুলে মাঝে মাঝে তরল বায়ু বার করে নিয়ে বিশেষ আধারে সঞ্চয় করা হয়।

তরল বায়ুর ব্যবহার ঃ আজকাল বিভিন্ন উৎপাদন-শিল্পে তরল বায়ুর যথেষ্ট চাহিদা। বিশেষতঃ অল্প ব্যয়ে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও আর্গন, হিলিয়াম প্রভৃতি বিরল গ্যাসগুলি আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তরল বায়ু থেকেই পৃথক করা হয়। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার

অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রভৃতি তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া (NH_3) লাগে; এই অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সরাসরি মিলনে তৈরি করা হয়ে থাকে। তরল বায়ু থেকে এই নাইট্রোজেন সস্তায় ও সহজে পাওয়া যায়; আর হাইড্রোজেন পাওয়া যায় জল বিশ্লিষ্ট করে। আবার তরল বায়ুর আংশিক বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাসও প্রচুর পরিমাণে পৃথক করা হচ্ছে। এভাবে কৃত্রিম সার উৎপাদন ও ওয়েল্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত অক্সি-হাইড্রোজেন ও অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার উচ্চতাপ উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-কাজে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন তরল বায়ু থেকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, তরল বায়ু থেকে আর্গন, হিলিয়াম প্রভৃতি বিরল গ্যাসগুলি সহজে পৃথক করবার ব্যবস্থা হয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের সুখ-সুবিধা বেড়েছে।

তরল বায়ুতে তার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এবং বিরল গ্যাসগুলি নিজ নিজ অনুপাতে তরল অবস্থায় মিশে থাকে। আমরা জানি, প্রত্যেক তরল পদার্থ, তা সে মৌলিকই হোক, বা যৌগিকই হোক, একটা নির্দিষ্ট স্ফুটনাংক উষ্ণতায় পৌছালে গ্যাসীভূত হয়ে যায়। তরল নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের এই স্ফুটনাংক উষ্ণতা হলো যথাক্রমে -196° ডিগ্রি-সেণ্টিগ্রেড ও -183° ডিগ্রি-সেণ্টিগ্রেড, অর্থাৎ সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা থেকে অনেক নিম্ন-তাপাংকে (বিশেষ ঠাণ্ডা অবস্থায়) গ্যাস দু'টা তরল থেকে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। তরল বায়ুর গ্যাসীয় উপাদানগুলিকে আংশিক বাষ্পীকরণ (ফ্রাক্সন্যাল ডিষ্টিলেসন) পদ্ধতিতে তাদের নিজ নিজ স্ফুটনাংক উষ্ণতায় নিয়ে একে একে পৃথক করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতেই খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকেও তার বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন উপাদান পৃথক করা হয়, এ বিষয় জ্বালানী প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো। যাহোক, তরল অক্সিজেনের চেয়ে তরল নাইট্রোজেন অপেক্ষাকৃত নিম্ন-উষ্ণতায় (-196° ডিগ্রি সেঃ) ফুটে গ্যাসে পরিণত হয়, অর্থাৎ তরল বায়ু থেকে অক্সিজেনের চেয়ে নাইট্রোজেন আগে গ্যাসীভূত হয়ে পৃথক হয়; আর অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয় পরে, অর্থাৎ প্রায় 13° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অধিক তাপাংকে। কাজেই উপযুক্ত ব্যবস্থায় তরল বায়ুর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে গ্যাস দু'টাকে পৃথক করা সম্ভব হয়ে থাকে। বিরল গ্যাসগুলিরও নিজ নিজ পৃথক স্ফুটনাংক

উষ্ণতা আছে ; এগুলিও এই পদ্ধতির বিশেষ বিধি-ব্যবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা শুনতে বেশ সহজ ; কিন্তু মিশ্র তরল পদার্থের আংশিক বাষ্পীকরণ পদ্ধতিতে নানা সূক্ষ্ম ও জটিল বিধি-ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন উষ্ণতার বিভিন্ন পৃথকীকরণ-স্তম্ভ (fractionating column) ব্যবহার করতে হয়, বাস্তব জটিলতাও অনেক। তবে মিশ্র তরল পদার্থ থেকে তার বিভিন্ন উপাদান এই পদ্ধতির সাহায্যে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব। বিভিন্ন পদার্থের শিল্প-উৎপাদনে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয় এবং অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে মিশ্র তরল পদার্থ থেকে তার বিভিন্ন উপাদান বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটা রসায়ন-বিজ্ঞানের একটা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং মানুষের বিশেষ কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক অবদান।

বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনে বায়ুর বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান পৃথক করবার জন্যেই তরল বায়ু প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এর আরও কিছু কিছু ব্যবহার আছে; যে-সব প্রক্রিয়ায় বিশেষ শীতলতার প্রয়োজন সেখানেই তরল বায়ু চাই। বিশেষ নিম্ন-উষ্ণতায় করণীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে তরল বায়ুর ব্যবহার অপরিহার্য। তরল বায়ুর উষ্ণতা (শীতলতা) প্রায় $-200°$ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ বরফের চেয়েও প্রায় 200 ডিগ্রি কম। এর সান্নিধ্যে-সংস্পর্শে অধিকাংশ তরল পদার্থ জমে কঠিন হয়ে পড়ে। মনুষ্য-সৃষ্ট নিম্ন-তাপাংকবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে তরল বায়ুই প্রধান ; এর শৈত্য এত অধিক যে, মানুষের গায়ে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে, ক্ষত হয়।

ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক, বা ডিউয়ার পাত্র ঃ আজকাল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সহজেই প্রচুর পরিমাণে তরল বায়ু উৎপাদিত হচ্ছে। তরল বায়ু কেবল বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনেই নয়, নানারকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজেও এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত নিম্ন-উষ্ণতায়, অর্থাৎ অত্যধিক ঠাণ্ডা অবস্থায় তরল বায়ু সঞ্চয় ও সরবরাহ করা কঠিন ব্যাপার। বাইরের উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে পাত্র গরম হয়ে ভিতরের তরল বায়ু গ্যাসে পরিণত হয়, আর সেই গ্যাসের অত্যধিক চাপে পাত্র ফেটে গিয়ে বিপদ ঘটাতেও পারে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য ডিউয়ার নামক এক বিজ্ঞানী এক প্রকার তাপ-অপরিবাহী পাত্র তৈরি করবার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। এরূপ পাত্র 'ডিউয়ার্স ভেসল' বা ডিউয়ারের 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক' নামে পরিচিত। আজকাল এ-ধরনের ছোট ছোট পাত্র

সচরাচর **থার্মো-ফ্ল্যাস্ক** নামে পরিচিত, যা গরম চা, দুধ প্রভৃতি বহুক্ষণ গরম রাখবার জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সিলিণ্ডারের আকারে তৈরী এরূপ ডিউয়ার-পাত্রের বাইরের দেয়াল থাকে দু'টা, মাঝখানটা ফাঁকা ; এই দুই দেয়ালের মাঝের ফাঁকা জায়গার আবদ্ধ বায়ু পাম্পের সাহায্যে যথাসম্ভব নিষ্কাশিত করে বায়ুশূন্য করা হয়। এর ফলে এরূপ পাত্রে রক্ষিত তরল পদার্থ বাইরের বায়ু থেকে সংশ্রবশূন্য হয়ে পড়ে ; কাজেই বাইরের তাপ বিকিরিত বা পরিবাহিত হয়ে সহজে ভিতরে পৌছায় না। বায়ুশূন্য তাপ-নিরোধক আবরণ থাকায় এই পাত্রে তরল বায়ু রাখলে তার তাপ বাইরের বায়ুর চেয়ে শতাধিক ডিগ্রি কম হলেও বাইরের তাপ সহজে ভিতরে পৌছে উষ্ণতা-বৃদ্ধি ঘটায় না, ভিতরের তরল বায়ু তরলই থাকে। এরূপ পাত্রে রক্ষিত তরল বায়ু মোটামুটি আট-দশ ঘণ্টা তরল রাখা যায়, আর এই সময়ের মধ্যে এর সরবরাহ ও কাজে লাগানো সম্ভবপর হয়।
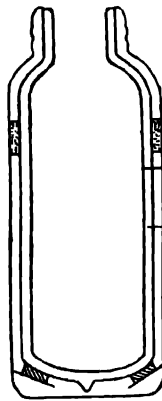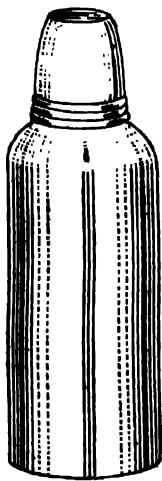
সাধারণ থার্মোফ্ল্যাস্ক, বা ডিউয়ার ফ্লাস্কের গঠন

এরূপ ভ্যাকুয়াম পাত্রের ভিতর দিকের দেয়ালে পারদ বা রৌপ্যের একটা চকচকে আস্তরণ দিয়ে দিলে তার তাপ-রোধক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই উপায়ে তাপ চলাচলের পথ অধিকতর কার্যকরীভাবে রুদ্ধ হয়ে ডিউয়ার-পাত্রের কার্যকারিতা আরও বাড়ে। তরল বায়ু সংরক্ষণ ও পরিবহনের জন্যে লোহার সিলিণ্ডার-আকৃতির পাত্রে এ-সব কৌশল ও বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ ব্যবহৃত থার্মো-ফ্ল্যাস্কও মোটামুটি এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

দহন-ক্রিয়া ও অগ্নি-উৎপাদন

অগ্নির উদ্ভব ও উপযোগিতা : দহনে ফ্লোজিস্টন মতবাদ : দহন-ক্রিয়ার মূল তথ্য — প্রিস্টলি, শিলি ও ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষা ; পদার্থের অবিনশ্বরতা সূত্র : ল্যাভয়সিয়ের পরীক্ষার ফল — অক্সিডেসন ও দহন : জারণ, বিজারণ ও অগ্নিনির্বাপন : উদ্বোধনী তাপ ও জ্বলনাংক উষ্ণতা — তার-জালির পরীক্ষা : ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প — ফায়ার ড্যাম্প : মৃদু দহন — মৃদু দহনে বিভিন্ন ধাতুর অক্সিডেসন, জীবদেহে মৃদু দহন, জৈব পদার্থের পচন-ক্রিয়া : গ্যাসীয় অক্সিজেনহীন দহন — সণ্টপিটার, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন : দহনে উচ্চ তাপমাত্রা — থার্মিট পদ্ধতি, আগুনে-বোমা ও বিস্ফোরক অ্যামানল, টি-এন-টি : অগ্নি-উৎপাদনে দেশলাই উদ্ভাবন — বিভিন্ন আবিষ্কার কাহিনী, লুসিফার, কন্‌গ্রিভ ও ফসফরাস দেশলাই : আধুনিক ঘর্ষ-দেশলাই বা সুইডিশ সেফ্‌টি ম্যাচ : পেট্রল-দেশলাই বা লাইটার।

প্রাচীন যুগের দার্শনিক চিন্তাধারায় অগ্নি ছিল পঞ্চভূতের অন্যতম,—জড় পদার্থের গঠনে বস্তু-সত্তাসম্পন্ন একটি মৌলিক উপাদান স্বরূপ। আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার অগ্রগতির ফলে জানা গেছে, আগুন কোন ভূতই নয়, শক্তির একটা বিকাশ মাত্র। খোলা বাতাসে কোন পদার্থের দহন বা জ্বলনের ব্যাপারটা হলো জিনিসটার কার্বন উপাদানের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের আনুসঙ্গিক ফল ; আর এই রাসায়নিক মিলন-ক্রিয়ার তীব্রতার ফলেই অগ্নির উদ্ভব হয়ে থাকে। জাগতিক বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে মানুষের সর্বাধিক পরিচিত, প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ এই যে দহন-ক্রিয়া, যার ফলে অগ্নির উদ্ভব, তার মূলগত তথ্যটি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত ছিল। এর প্রকৃত রহস্য 1774 খৃষ্টাব্দে উদ্‌ঘাটন করেন ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যাণ্টোনাইন লরেণ্ট **ল্যাভয়সিয়ে।** এর ফলেই আসে রসায়ন-বিদ্যার নব যুগ।

অগ্নির উদ্ভব ও উপযোগিতা : পৃথিবীতে কখন কি ভাবে প্রথম এই দহন-ক্রিয়া ও অগ্নির বিকাশ ঘটেছিল তার ইতিহাস জানবার উপায় নেই। হয়তো পৃথিবীতে প্রথম আগুনের সৃষ্টি হয়েছিল মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলকে ও বজ্রপাতে ; হয়তো বা কোন প্রাকৃতিক কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্তপ্ত হয়ে কোন দাহ্য পদার্থের সহসা জ্বলে ওঠার ফলে, যেমন হয় দাবানলে। এ-সব ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই ; কিন্তু আদিম মানুষ আগুন দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত

ও ভীত হয়েছে। ক্রমে অবশ্য তারা তার উপযোগিতা বুঝেছে ও তাকে কাজে লাগিয়েছে। তার পরে আদিম মানুষ সহসা হয়তো একদিন আগুন জ্বেলেছিল পাথরে-পাথরে ঠুকে, বা শুষ্ক কাঠে-কাঠে ঘসে। আপন শক্তিতে সৃষ্ট সে-আগুন দেখেও তখনকার মানুষ বিস্মিত হয়েছে; কিন্তু বোঝে নি আগুন জিনিসটা কি, কেন ও কিভাবে জ্বলে। যাহোক, পৃথিবীতে যে-ভাবেই আগুন প্রথম জ্বলুক না কেন, আর মানুষ তার সৃষ্টি-রহস্য না-ই বা বুঝুক, মানুষ কিন্তু সেই আদিম যুগ থেকেই আগুনের শক্তি, কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন গাঁথা ও পৌরানিক কাহিনীতে আগুনকে দেবতার পবিত্র দান ও আশীর্বাদ স্বরূপ বলে উল্লেখ আছে। এমন কি, কৃতজ্ঞ চিত্তে মানুষ অগ্নিতে দেবত্ব আরোপ করেছে, পুজা করেছে অগ্নি-দেবতার।

সেই প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে বর্তমান সভ্যযুগেও আগুনের কার্য-কারিতার নিকট মানুষ যে অশেষ প্রকারে ঋণী ও কৃতজ্ঞ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আজ আর মানুষ আগুন দেখে বিস্মিত বা হতবুদ্ধি হয় না; কারণ সে জানে, আগুন একটা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল মাত্র। মানুষ আজ জীবনের নানাকাজে আগুনকে অহরহঃ অবলীলাক্রমে কাজে লাগাচ্ছে; আগুন মানুষের এখন দৈনন্দিন প্রয়োজনের অঙ্গীভূত। একটা দেশলাই-কাঠি ঠুকে মানুষ মুহূর্তে এখন আগুন জ্বালে। সহজলভ্য হলেও আগুন বা দহন-ক্রিয়ার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা তাতে কিছুমাত্র লাঘব হয় নি; যদি ভেবে দেখি, বর্তমান মানব-সভ্যতা বহুলাংশে আগুনের উপরেই নির্ভরশীল, দহন-ক্রিয়ার পরোক্ষ দান। বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের কল-কারখানা ও চলাচল ব্যবস্থায় রেল-স্টীমার-মোটর-প্লেন প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার বিবিধ দান বিভিন্ন জ্বালানীর দহন-ক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। জ্বালানীর দহনে বাতি জ্বলে আলো দেয়, কাঠ ও কয়লা পুড়ে উত্তাপ যোগায়। আধুনিক সভ্যতার চাবি-কাঠি যে তড়িৎ-শক্তি তার মূলেও অনেক ক্ষেত্রেই দহন-ক্রিয়াই কাজ করে, যাকে বলা হয় তাপ-বিদ্যুৎ। এক কথায় বলা যায়, মানব-সভ্যতার অগ্রগতির মূলে বিভিন্ন জ্বালানীর দহন-ক্রিয়ার দান অপরিমেয় ও অপরিসীম। বিভিন্ন জ্বালানী সম্বন্ধে আমরা পৃথক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো; এখন কেবল দহন-ক্রিয়ার তাৎপর্য অনুধাবন করা যাক্।

দহনে ফ্লোজিস্টন মতবাদঃ দহন বা জ্বলনের মূল তথ্যটা কি? সব

জিনিস জ্বলে না ; পাথর, মাটি, লোহা প্রভৃতি বহু জিনিস জ্বলে না, এ-সব অদাহ্য। আবার কাঠ, কয়লা, মোম, তেল প্রভৃতি জ্বলে, এরা দাহ্য পদার্থ। ল্যাভয়সিয়ের পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিজ্ঞানীরা দহন-ক্রিয়ায় দাহ্য ও অদাহ্য পদার্থের প্রভেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা মতবাদ খাঁড়া করেছিলেন। এটাকে বলা হতো 'ফ্লোজিস্টন বাদ' ; এর মূল কথা হলো, প্রত্যেকটি দাহ্য পদার্থ জ্বলে তার ভিতরকার 'ফ্লোজিস্টন' বা এক রকম দাহ্য-কণিকার উপস্থিতির জন্যে। কোন জিনিস যখন জ্বলে তার ভিতরকার এই ফ্লোজিস্টন কণিকাগুলি তখন পদার্থটা থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়, আর পড়ে থাকে তার ফ্লোজিস্টনহীন অংশ, অর্থাৎ তার ভস্ম বা ছাই। কয়লা পুড়ে অবশিষ্ট থাকে তার কিছুটা ছাই, তাই এরূপ দাহ্য পদার্থের সর্বাধিক উপাদানই **ফ্লোজিস্টন** বলে মনে করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অবধি এই ছিল দহন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যা। পরীক্ষামূলক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে এরূপ ভ্রান্ত ধারণাও পূর্ণ মর্যাদায় কয়েক শতাব্দী যাবৎ চলছিল। এর কারণ, রসায়ন-বিদ্যা সে-যুগে পদার্থের দৃশ্য গুণাবলী ও অবস্থান্তরের উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল। পদার্থের অবস্থান্তরে তার ওজনের তারতম্য সম্পর্কে তখনও রসায়নবিদ্‌রা তেমন অবহিত হন নি। তুলাযন্ত্র ছিল, আর তা ব্যবহৃতও হতো ; কিন্তু দহনক্রিয়ায় পদার্থের ওজনের তারতম্যের প্রতি তাঁরা বিশেষ কোন গুরুত্ব দেন নি। কাজেই যখন দেখা গেল, কোন দাহ্য পদার্থের দহনে উৎপন্ন ভস্মের ওজন মূল পদার্থের ওজনের চেয়ে বেশি হয় ; তখন আবার ফ্লোজিস্টন মতবাদের সমর্থনে বলা হয় যে, ফ্লোজিস্টন কণিকার এক রকম লঘু-সত্তা (principle of levity) বিদ্যমান রয়েছে। তাই পদার্থের দহন-কালে তা থেকে ফ্লোজিস্টনের সেই লঘু-ধর্মিতাটুকু বেরিয়ে যায়, আর এর ফলে দগ্ধ পদার্থটা ক্রমে ভারী হয়ে ওঠে।

দহন-ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় উল্লিখিত যুক্তি বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে যতই নৈরাশ্যজনক ও হাস্যোদ্দীপক বলে আজ বিবেচিত হোক না কেন, একথা মনে রাখতে হবে, সে-যুগে এই ফ্লোজিস্টন মতবাদের দ্বারাই কালোপযোগী বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে চলছিল। দহন-ক্রিয়ার এই ব্যাখ্যায় সে-যুগের রসায়নবিদেরা সন্তুষ্ট ছিলেন ; এমন কি, এরই ভিত্তিতে রাসায়নিক তথ্যানুসন্ধানের কাজ যথেষ্ট অগ্রসরও হয়েছিল। ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হওয়ার পরেও **ফ্লোজিস্টন** মতবাদের প্রতি দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর আস্থা

বৈজ্ঞানিকদের মন থেকে সম্পূর্ণ দূরীভূত হতে সময় লেগেছিল। এরূপই হয়ে থাকে। আজ কে বলতে পারে, বর্তমান কালের সর্বজনগ্রাহ্য কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ শতবর্ষ পরে অনুরূপভাবে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে কি না। ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলেও পুরাতনের প্রতি আস্থা মন থেকে সহজে যায় না; ফ্লোজিস্টন মতবাদ এর একটা শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত। এই অন্ধ আস্থার কবলে পড়ে বহু খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ নূতন তথ্যের আবিষ্কারে ব্যর্থকাম হয়েছেন। পরীক্ষা-সিদ্ধ নূতন তথ্য ও নূতন মতবাদকে দ্বিধামুক্ত চিত্তে গ্রহণ করা এবং পুরাতনকে বর্জন করা বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক।

দহন-ক্রিয়ার মূল তথ্য: সে যাই হোক, পদার্থের দহনে ফ্লোজিস্টন মতবাদ ক্রমে দুর্বল হতে থাকে; পরীক্ষালব্ধ নানা তথ্যের চাপে এই মতবাদের শেষে মৃত্যু ঘটে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ের হাতে। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানী প্রিস্টলি ও শিলি অন্য-নিরপেক্ষভাবে বায়ুর সক্রিয় অংশ আবিষ্কার করেছেন এবং তাকে সক্রিয় একটি বায়বীয় মৌলিক পদার্থ বলে **অক্সিজেন** নাম দিয়েছেন। মূলতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাভয়সিয়ে খোলা বাতাসে কোন দাহ্য পদার্থের দহন-ক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্যের এক নূতন ব্যাখ্যা দেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে অভ্রান্তভাবে তা প্রমাণ করেন 1774 খৃস্টাব্দে। এই ব্যাখ্যার উপরেই আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বলা যায়, এর পর থেকেই নব্য রসায়নী বিদ্যা জন্ম লাভ করেছে।

লরেন্ট ল্যাভয়সিয়ে

পদার্থের দহন-ক্রিয়ার এই নূতন ব্যাখ্যা বা তথ্য ল্যাঁভয়সিয়ে পেয়ে যান সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। 1774 খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিজ্ঞানী প্রিস্টলি ফরাসী দেশে বেড়াতে গিয়ে প্যারিসে তাঁর বিজ্ঞানী-বন্ধু ল্যাঁভয়সিয়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এক দিন কথা-প্রসঙ্গে পারদ-ভস্ম থেকে তাঁর অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কারের পরীক্ষাটার কথা বলেন। এই গ্যাসটা বায়ুর সক্রিয় অংশের অনুরূপ এবং তার মধ্যে মোমবাতি সাধারণ বাতাসের চেয়ে তীব্রতর শিখায় জ্বলে, জীবের শ্বাসক্রিয়াও চলে। একথা শুনে **ল্যাঁভয়সিয়ে** সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করেন, বায়ুর সংস্পর্শে পারদ উত্তপ্ত করলে যে লাল গুঁড়ার সৃষ্টি হয় তা নিশ্চয় বায়ুর অক্সিজেন উপাদানের সঙ্গে পারদের রাসায়নিক মিলনের ফলেই হয়ে থাকে। তিনি বুঝলেন, দগ্ধ পদার্থের সঙ্গে বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের মধ্যেই পদার্থের দহন-ক্রিয়ার প্রকৃত তথ্য নিহিত রয়েছে। দাহ্য পদার্থ ও তার সংলগ্ন বায়ুর ওজন দহন-ক্রিয়ার পুর্বে ও পরে নিপুণভাবে নির্ণয় করে ল্যাঁভয়সিয়ে দহনে পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়ার এই ধারণাটার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন।

প্রিস্টলির অক্সিজেন আবিষ্কারের তথ্যটা জেনে নিয়ে ল্যাঁভয়সিয়ে পদার্থের দহন-সম্পর্কিত রাসায়নিক মিলনের তথ্য উদ্ভাবন করেন বলে তাঁর কৃতিত্বকে লঘু করার কারণ নেই। রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার এবং দহনক্রিয়ায় **ফ্লোজিস্টন** মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ল্যাঁভয়সিয়ের ব্যাখ্যার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। ল্যাঁভয়সিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষায় পদার্থের দৃশ্য অবস্থান্তরের চেয়ে তার ওজন-পরিমাণের উপরেই সমধিক গুরুত্ব দিতেন এবং পরীক্ষার প্রতি ক্ষেত্রে তুলা-যন্ত্রের ব্যবহার করতেন। এর ফলেই তিনি ভৌত বিজ্ঞানের আর একটা যুগান্তকারী তথ্য 'পদার্থের **অবিনশ্বরতা-সূত্র**' (indestructivity of matter) প্রবর্তন ও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তথ্যটি হইল এই যে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তরই মাত্র ঘটতে পারে, পদার্থের সৃষ্টি বা বিনাশ কখন সম্ভব নয়। কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার পুর্বে তাতে অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলির পরিমাণ যা ছিল বিক্রিয়ার পরে রূপান্তরিত অবস্থায়ও তাদের পরিমাণ সর্বদা একই থাকে।

ল্যাঁভয়সিয়ের পরীক্ষা : দহন-ক্রিয়ায় পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের তথ্যটা প্রমাণ করবার জন্যে ল্যাঁভয়সিয়ে প্রথম যে পরীক্ষাটি করেছিলেন তার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। একটি বক-যন্ত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট

ওজনের খানিকটা পারদ নিয়ে তিনি উত্তপ্ত করতে থাকেন। বক-যন্ত্রের সরু নল-মুখটা একটি পাত্রে রক্ষিত পারদের উপরে একটি বেল-জারে আবদ্ধ নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট ছিল। কাঠ-কয়লার একটা চুল্লীর উপরে বক-যন্ত্রের পারদকে বারো দিন ধরে ক্রমাগত উত্তপ্ত করা হয়েছিল এবং উত্তাপের তাপাংক পারদের স্ফুটনাংকের প্রায় কাছাকাছি ছিল। এভাবে উত্তপ্ত করবার পরে বক-যন্ত্রের পারদের উপরি-ভাগে পারদ-ভস্মের যে লাল গুঁড়া পাওয়া গেল তাকে সাবধানে মেপে ল্যাঁভয়সিয়ে 45 গ্রেন পারদ-ভস্ম (রেড অক্সাইড অব মার্কারি) পেয়েছিলেন। তিনি মেপে দেখলেন, সংলগ্ন ওই বেল-জারে আবদ্ধ বায়ুর আয়তন সাত-আট বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। বায়ুর যে অবশিষ্টাংশ বেল-জারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাতে দেখা গেল, জ্বলন্ত মোম-বাতি প্রবেশ করালে নিভে যায়, জ্যান্ত ইঁদুর দিলে অল্প সময়েই ছট্‌ফট্ করে মরে যায়। কথাটা হলো, বায়ুর ওই অংশে আর দহন-ক্রিয়া চলে না, বা জীবের জীবন রক্ষা পায় না; কাজেই ওটা বায়ুর নিষ্ক্রিয় অংশ নাইট্রোজেন বলে বুঝা গেল।
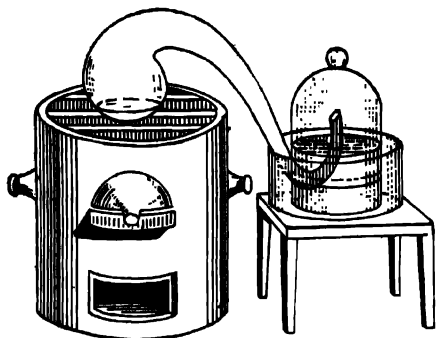
ল্যাঁভয়সিয়েরের পরীক্ষা

এর পরে ল্যাঁভয়সিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থায় ওই 45 গ্রেন পারদ ভস্ম সংগ্রহ করে আবার উত্তপ্ত করেন এবং তা থেকে 41 গ্রেন ধাতব পারদ ও সেই সাত-আট বর্গ ইঞ্চি আয়তনের গ্যাস পুনরায় পান। দেখা গেল, গ্যাসটা বায়ুর সক্রিয় অংশ অক্সিজেন, যা পারদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই পরীক্ষা থেকে ল্যাঁভয়সিয়ে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন, কোন ধাতু বা কোন পদার্থ বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত করলে বা পোড়ালে বায়ুর অক্সিজেন সেই ধাতু বা পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটা যৌগের সৃষ্টি করে। অন্য ভাবে বলা যায়, দহন-ক্রিয়া হলো বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে দগ্ধ পদার্থের রাসায়নিক মিলন; আর এই মিলনের ফলে আনুসঙ্গিক হিসাবে উত্তাপ, কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকের উদ্ভব হয়। দহন-ক্রিয়ার তাপমাত্রায় দাহ্য

পদার্থটা যদি গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় তবে সেই গ্যাসটা জ্বলে অগ্নি-শিখার সৃষ্টি করে; মোমবাতি বা তেলের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে। বায়ুর নাইট্রোজেন অংশ পদার্থের দহন-ক্রিয়ায় কোন অংশ গ্রহণ করে না, এটা কেবল বায়ুতে মিশে থেকে অক্সিজেনের দাহিকা-শক্তি নিয়ন্ত্রিত ও মন্দীভূত রাখে।

অক্সিডেসন ও দহন

দহন-ক্রিয়ায় ল্যাভয়সিয়ের প্রদত্ত রাসায়নিক ব্যাখ্যা অল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজে অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত ও আদৃত হয় এবং রসায়নের নানা তথ্য এর থেকে নির্ধারিত হতে থাকে। বায়ুর মধ্যে পদার্থের দহন যখন দগ্ধ পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন, কাজেই সেই মিলিত পদার্থ টা হলো একটা অক্সিজেন-যৌগ বা অক্সাইড। পদার্থের দহন-ক্রিয়াকে তাই অক্সাইড-যৌগ তৈরির প্রক্রিয়া বা **অক্সিডেসন** বলা হয়। এই অক্সিডেসন বা দহন-ক্রিয়ার তীব্রতা দগ্ধ পদার্থের চার ধারে অক্সিজেন সরবরাহের পরিমাণের উপরে নির্ভরশীল। কয়লার প্রজ্জ্বলন বা দহন দ্রুততর ও তীব্রতর করবার জন্যেই আমরা উনুন জ্বালাতে পাখার হাওয়া করি, কামারেরা হাপর টেনে আগুনে হাওয়া যোগায়। যত হাওয়া পায় ততই তার অক্সিজেন জ্বলন্ত পদার্থের সংগঠক কার্বন উপাদানের সঙ্গে অধিকতর পরিমাণে মিলে দহন বা অক্সিডেসন ক্রিয়াকে তীব্রতর করে। কয়লা, মোম, তেল প্রভৃতি জ্বলে, মানে এদের কার্বন-উপাদানের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন বা অক্সিডেসন ঘটে, যার ফলে আগুন জ্বলে; আর সঙ্গে সঙ্গে কার্বনের **অক্সাইড,** অর্থাৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়ে অদৃশ্যভাবে বাইরের বায়ুতে মিশে যায়।

বায়ু বা অক্সিজেন পেলে দাহ্য পদার্থ যেমন জ্বলে, বিপরীত পক্ষে আবার বায়ুর সরবরাহ বন্ধ হলে অক্সিজেনের অভাবে জ্বলন্ত আগুন নিভে যায়, দহন-ক্রিয়া বন্ধ হয়। প্রজ্বলিত মোমবাতির উপরে কাচের গ্লাস বা বেল-জার চাপা দিলে ভিতরে দেখা যায়, আবদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেই মোমবাতিটা নিভে যায়। অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রও অনুরূপ কাজ করে; যন্ত্রটা থেকে সফেন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস, বা **পাইরিন** থেকে উৎপন্ন কার্বন-টেট্রাক্লোরাইডের জলীয় মিশ্রণ ছিট্‌কে গিয়ে জ্বলন্ত জিনিসের উপরে পড়ে, আর ওই পদার্থগুলির একটা ভারী আবরণে আগুনকে ঢেকে ফেলে, যার ফলে জ্বলন্ত জিনিসটা বায়ুর সম্পর্কশূন্য হয়ে অক্সিজেনের অভাবে নিভে যায়।

জলন্ত পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের এই রাসায়নিক মিলনকে বলে অক্সিডেসন, বাংলায় বলে **জারন** ক্রিয়া। উত্তাপে পদার্থ জারিত হয়ে পদার্থ টার অক্সাইড যৌগ সৃষ্টি করে; উত্তপ্ত পারদের উপরে যে লাল গুঁড়া সৃষ্টি হয় সেটা হলো জারিত পারদ, অর্থাৎ অক্সাইড অব মার্কারি। আবার কোন পদার্থের অক্সাইড বা অপর কোন অক্সিজেন-যৌগ থেকে অক্সিজেন বিদূরিত করার প্রক্রিয়াকে বলে 'রিডাকসন', বাংলায় বলে **বিজারণ** ক্রিয়া। সহজেই বুঝা যায়, রিডাকসন হলো অক্সিডেসনের বিপরীত ক্রিয়া।

উদ্বোধনী তাপ ও জ্বলনাংক

দহন-ক্রিয়ার উল্লিখিত ব্যাখ্যা, অর্থাৎ দাহ্য পদার্থের উপাদানের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়াই হলো পদার্থ টার দহন। এ যদি সত্য হয়, তাহলে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন ওঠে। কয়লা, কাঠ, খড়, তেল প্রভৃতি কত দাহ্য পদার্থ ই তো বায়ুর মধ্যে বা সংস্পর্শে থাকে, কিন্তু কই, জ্বলে তো ওঠে না। লেবরেটরির বার্ণার থেকে কোল-গ্যাস বেরুচ্ছে, মোমবাতি বা কয়লা খোলা বাতাসে পড়ে আছে। এমন কি, যদি বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যেও এসব পদার্থ রাখা যায়, তাহলেও তারা জ্বলে না, অক্সিজেনের সঙ্গে মিলবার লক্ষণই দেখা যায় না। কথাটা হলো, দাহ্য পদার্থের দহন-ক্রিয়া সুরু হওয়ার, অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে তার মিলনের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপযোগী উত্তপ্ত অবস্থায় তাকে প্রথমে আনতে হবে; অর্থাৎ পদার্থ টাকে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে দহন-ক্রিয়ার কাজ প্রথমে সুরু করিয়ে দিতে হবে। এর পরে দহন-ক্রিয়া আপনা-আপনি চলতে থাকবে। প্রত্যেক দাহ্য পদার্থেরই এরূপ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে যাতে পৌঁছালে তবেই সেটা জ্বলে। এই নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে বলে পদার্থ টার **জ্বলনাংক** (ignition point); জ্বলন বা দহনের উদ্বোধন বা সুরু করাবার জন্যে প্রয়োজনীয় এই তাপমাত্রাকে সাধারণ কথায় উদ্বোধনী-তাপও বলা যায়।

পদার্থের দহনের জন্যে এই উদ্বোধনী তাপ প্রয়োগের আবশ্যকতার ব্যাখ্যা এই যে, যে-কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার তীব্রতা তাপ-বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় তাপে কয়লা, মোমবাতি প্রভৃতির অক্সিডেসন বা অক্সিজেনের সঙ্গে তাদের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া এত মৃদু যে দীর্ঘ দিনেও তার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় না, জ্বলে তো না-ই। কোনক্রমে তাপ ধীরে

ধীরে বাড়াতে পারলে দাহ্য পদার্থটার সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়ার তীব্রতার হারও ধীরে ধীরে বাড়ে; অবশেষে এক সময় পদার্থটার পারিপার্শ্বিক তাপ যখন তার জ্বলনাংক উষ্ণতায় পৌঁছায় তখন ওই রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া এমন দ্রুততর হয় যে, তাতে উদ্ভূত তাপ জ্বলনাংকের উপরে উঠে যায়, তার ফলে পদার্থ টার অক্সিডেসন বা দহন-ক্রিয়া চলতে থাকে। কয়লা, কাঠ, মোম প্রভৃতির বেলায় এরূপ **উদ্বোধনী-তাপ** প্রয়োগের প্রয়োজন হয়; আবার ফস্‌ফরাস, সোডিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি অতি-দাহ্য পদার্থ আছে, সাধারণ উষ্ণতায়ই তারা বায়ুর সংস্পর্শে সঙ্গে-সঙ্গেই জ্বলে ওঠে, কোন উদ্বোধনী তাপের প্রয়োজন হয় না। এর কারণ, এগুলির জ্বলনাংক উষ্ণতা আবহাওয়ার সাধারণ উষ্ণতার চেয়ে কম। তাহলে মোট কথা হলো এই যে, কোন দাহ্য পদার্থকে জ্বলতে হলে, যে-কোন ভাবেই হোক, আগে তাকে তার জ্বলনাংকে পৌঁছাতে হবে।

পক্ষান্তরে কোন জ্বলন্ত জিনিসের তাপ যদি কোন উপায়ে তার জ্বলনাংকের নিচে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে তার দহন-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ যথেষ্ট ঠাণ্ডা করলে জ্বলন্ত জিনিস নিভে যায়। এই তথ্যটা সামান্য একটা পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যায়। রসায়নাগারে বুন্‌সেন-বার্ণারের নল-মুখে কোল-গ্যাস জ্বালানো হয়; সামান্য উদ্বোধনী-তাপ প্রয়োগেই গ্যাসটা তীব্র শিখায় জ্বলে ওঠে। বার্ণারের নল-মুখের ইঞ্চিখানেক উপরে একখানা লোহার তার-জালি বা 'ওয়্যার-গেজ' ধরলে গ্যাসটা তার-জালি ভেদ করে উপরে উঠবে। এখন ওই জালির উপরে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বেলে ধরলে জালির উপরের গ্যাসটাই জ্বলবে, নিচের গ্যাস জ্বলবে না; আবার জালির নিচের গ্যাস জ্বালালে নিচেই জ্বলবে, উপরের গ্যাস জ্বলবে না। লোহার জালিটা গ্যাসের দহন-ক্রিয়া আটকে ফেলে, একদিক থেকে অপর দিকে যেতে দেয় না। এর কারণ, জালিটার
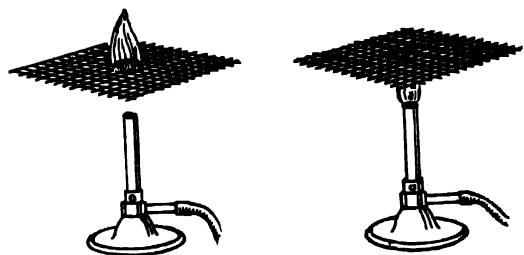
গ্যাসের দহন-ক্রিয়ায় তার-জালির পরীক্ষা

লোহা উৎকৃষ্ট তাপ-পরিবাহী ধাতু বলে তা প্রজ্বলিত গ্যাসের তাপ অতি দ্রুত শোষণ করে টেনে নেয়, আর তার ফলে অপর পাশের অদগ্ধ গ্যাসের উষ্ণতা তার জ্বলনাংকের নিচেই থাকে, জ্বলবার আর সুযোগ পায় না। লোহার জালিটা ক্রমে যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে আর তার তাপ-শোষণের ক্ষমতা থাকে না; কাজেই তখন জালির এক দিকে জ্বালালে অপর দিকের গ্যাসেও দহন-ক্রিয়া সংক্রামিত বা পরিবাহিত হয়ে যায়। ব্যাপারটা তার-জালির লোহার তাপ পরিবহন-ক্ষমতার জন্যে ঘটে থাকে; জ্বলনাংকের কম উষ্ণতায় কোন পদার্থেরই দহন-ক্রিয়া সম্ভব হয় না।

ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প: ধাতব তার-জালির এরূপ তাপ রোধ করবার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে স্যার হামফ্রি ডেভি কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা নিবারক এক রকম নিরাপদ-বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। একটা সাধারণ তেলের বাতির শিখার চারদিক ঘিরে তার-জালির একটা চিমনীর মত তৈরি করা হয়েছিল। অতি সামান্য ব্যবস্থা; কিন্তু ডেভির এই সেফ্‌টি-ল্যাম্প আবিষ্কারের ফলে কয়লা খনির অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা বহুলাংশে নিবারিত হয়েছিল এবং হাজার হাজার খনি-শ্রমিকের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। কয়লা-খনির ভিতরে প্রায়ই এক রকম গ্যাস বেরোয়, যাকে বলে **'ফায়ার-ড্যাম্প'**; প্রধানতঃ এটা অতি-দাহ্য মিথেন গ্যাসের একটা বায়বীয় মিশ্রণ। খনির ভিতর-কার বায়ুর সঙ্গে মিশে মিথেন গ্যাস একটা দাহ্য গ্যাসীয় মিশ্রণের সৃষ্টি করে এবং সামান্য আগুনের সংস্পর্শেই সারা খনিতে মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। ডেভির নিরাপদ-বাতি ব্যবহারে খনি-গর্ভে এরূপ বিস্ফোরণ নিবারিত হয়েছে। ফায়ার-ড্যাম্পের মিশ্রণ বাতির তার-জালির ভিতরে ঢুকে নীলাভ শিখায় জলে, কিন্তু সে-শিখা উপরোক্ত কারণে সহসা বাইরে ছড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। ঐরূপ নীলাভ শিখা দেখলেই শ্রমিকেরা সাবধান হয়ে বাতিটা নিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। যাহোক, এই নিরাপদ-বাতির উদ্ভাবন মানব-কল্যাণে বিজ্ঞানের একটা অতুলনীয় দান বলে এক সময় পরিগণিত হয়েছিল। পরে অবশ্য এই বাতির গঠন-পদ্ধতির অনেক উন্নতি সাধিত হয়। বাতির সবটা তার-জালিতে ঘেরা থাকায় আলো
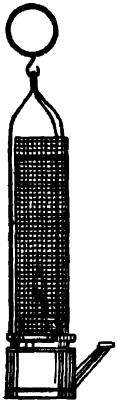
ডেভির নিরাপদ বাতি

ব্যাহত হতো; কাজেই নিচের দিকে কাচের চিমনি দিয়ে উপরে তার-জালির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরে অবশ্য খনির কাজে ইলেক্‌ট্রিক বাতির ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় ডেভির ঐ সেফ্‌টি ল্যাম্পের প্রচলনই বন্ধ হয়ে যায়।

মৃদু দহন

দাহ্য পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ও তার ফলে উত্তাপ ও কোন-কোন ক্ষেত্রে আলোকের সৃষ্টি হয়; আর এই প্রক্রিয়াকেই বলে পদার্থ টার দহন বা অক্সিডেসন, একথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু অনেক সময় কোন-কোন পদার্থের দহনে উত্তাপ ও আলোকের উদ্ভব কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না; অথচ দীর্ঘ সময় পরে দেখা যায়, দহনের যে অবশ্যম্ভাবী ফল অক্সিডেসন পদার্থ টাতে তা ফলেছে, অর্থাৎ পদার্থ টার **অক্সাইড** সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ দহন বা অক্সিডেসনে পদার্থের জ্বলনাংকে পৌছানোর প্রয়োজন হয় না; সাধারণ তাপ-মাত্রায়ই অতি মৃদুভাবে অলক্ষিতে দহন-ক্রিয়া চলে। যেমন, একখণ্ড লোহা খোলা বাতাসে পড়ে থাকলে কিছু দিন পরে দেখা যায় তার উপরে 'মরিচা' ধরেছে;—'মরিচা' হলো লোহার অক্সাইড, লোহা ও অক্সিজেনের একটা যৌগিক। লোহার এই অক্সিডেসন প্রক্রিয়া মৃদু দহনের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ধাতব অ্যালুমিনিয়ামেরও এরূপ মৃদু দহন হয়ে থাকে; খোলা বাতাসে কয়েক দিন পড়ে থাকলে এর উপরে অক্সাইডের একটা পাত্‌লা আবরণ পড়ে, যার ফলে ভিতরের অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অবিকৃত থাকে। বস্তুতঃপক্ষে লোহার চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের **অক্সিডেসন** বা দহন-ক্রিয়া সমধিক তীব্র হয়ে থাকে। এটা আমরা সকলেই জানি যে, লোহার তার আগুনে ধরলে জ্বলে না; কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়া বা তার জ্বালালে অতি উজ্জ্বল সাদা আলোক ছড়িয়ে জ্বলে ওঠে।

অ্যালুমিনিয়ামের মৃদু দহন বা অক্সিডেসন সম্পর্কে একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, খোলা বাতাসে অ্যালুমিনিয়ামের উপরে অক্সাইডের একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে, আর তারপরে অক্সিডেসন ক্রিয়া আর চলে না এবং দৃশ্যতঃ ধাতুটার অক্সিডেসন-জনিত কোন পরিবর্তন ধরা পড়ে না। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের উপরে পারদ লাগিয়ে দিলে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায়। ধাতুখণ্ডের এক জায়গা শিরিষ-কাগজ দিয়ে ঘসে বেশ পরিষ্কার করে সেখানটায় কিছু পারদ বা **কুইক সিলভার** ঘসে দিলে পারদ ও অ্যালু-

মিনিয়ামের 'অ্যামালগাম' অর্থাৎ একটা তরল ধাতু-সংকরের সৃষ্টি হয়। এর ফলে অ্যালুমিনিয়ামের মৃদু দহনে তার অক্সাইডের যে পাত্‌লা আস্তরণ সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা আর হয় না। পক্ষান্তরে পারদের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সূক্ষ্ম অ্যালুমিনিয়াম - কণিকাগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিত হয়ে অক্সাইড সৃষ্টি করতে থাকে। এভাবে ক্রমাগত উৎপন্ন অ্যালু-মিনিয়াম-অক্সাইডের কণিকাগুলি ধাতুখণ্ডের উপরে সরু সরু কাঁটার মত উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইডের এই ক্রম-বর্ধমান কাঁটাগুলি জেগে উঠে পারদ-লাগানো জায়গাটা ঢেকে ফেলে; এর কোন-কোনটা আধ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠতে পারে। এভাবে **অ্যামাল্‌গাম** অবস্থায় অ্যালুমিনিয়াম-কণিকার মৃদু দহন বা অক্সিডেসন প্রক্রিয়ার ফলাফল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে অক্সিডেসন-ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হলেও তাতে উদ্ভূত তাপ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়; এবং তার ফলে ধাতুখণ্ড যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে জ্বলনাংকে পৌছাতে পারে না। কাজেই এরূপ দহনে ঔজ্জ্বল্য বা আলোক প্রকাশ পায় না; প্রক্রিয়াটা মৃদু দহনের পর্যায়েই থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের মৃদু দহনের এটা একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষ দৃষ্টান্ত।

অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইডের ক্রমবৃদ্ধি
(বহুগুণ বর্ধিত আকারে দেখানো হয়েছে)

জীবদেহে মৃদু দহন : পদার্থের মৃদু দহনের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত আমরা আমাদের দেহমধ্যে অহরহঃ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, যার ফলে আমাদের দেহে স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষার উপযোগী স্বাভাবিক উষ্ণতা নিয়ত বজায় রয়েছে। জীবের প্রশ্বাস-বায়ু ফুসফুসে যায়, সেখানে তার অক্সিজেন অংশ রক্তকোষের সূক্ষ্ম পর্দা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। রক্তের লোহিত-কণিকার মুখ্য উপাদান হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে এই অক্সিজেন মিশে **অক্সি-হিমোগ্লোবিন** আকারে রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে সারা দেহে ছড়িয়ে যায়। এই অক্সি-হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী-তন্তু ও ভুক্ত খাদ্যের সূক্ষ্ম উপাদান-গুলিকে নানা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অতি মৃদু দহনে ধীরে ধীরে দগ্ধ করে, অর্থাৎ তাদের অক্সিডেসন-ক্রিয়া চলতে থাকে। এই অক্সিডেসন প্রক্রিয়ায় জৈব

পদার্থাদির মৃদু-দহনে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ; আর তা রক্তস্রোতের সঙ্গে ধমনীর পথে বাহিত হয়ে ফিরে গিয়ে ফুসফুসে পৌঁছায়। সেখান থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাইরের বাতাসে বেরিয়ে যায়। এভাবে প্রশ্বাসে ও নিঃশ্বাসে দেহাভ্যন্তরে অক্সিজেনের প্রবেশ ও ভিতরের জৈব পদার্থাদির মৃদু-দহনে উদ্ভূত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের নির্গমন পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। বাইরে খোলা বাতাসে পদার্থের দহনে যেমন অক্সিজেন দরকার, দেহের আভ্যন্তরীণ দহনের জন্যেও তেমনই অক্সিজেন চাই। দেহাভ্যন্তরের এই দহন বা অক্সিডেসন-ক্রিয়া অতি মৃদুভাবে চলে। প্রশ্বাস-বায়ুর প্রায় চার-পঞ্চমাংশই নাইট্রোজেন, কাজেই অক্সিজেনের পরিমাণ (এক-পঞ্চমাংশ) থাকে কম। প্রশ্বাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিলে দেহাভ্যন্তরের অক্সিডেসন-ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে দেহের ক্ষতি সাধন করে ; কিন্তু নিমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুস-ঘটিত রোগে শ্বাস-ক্রিয়ার অসুবিধা ঘটলে অনেক সময় রোগীকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানে প্রয়োজন মত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়, যাতে বেশী অক্সিজেন পেয়ে ভিতরের দহন-ক্রিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে না পড়ে।

মৃদুই হোক, তীব্রই হোক, জৈব পদার্থের দহনে সর্বদাই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হয়ে থাকে। ঐ একই ভাবে জীবের দেহাভ্যন্তরেও যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরোয়, তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটা নলমুখে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার চুন-জলের মধ্যে নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবেশ করালে অল্প ক্ষণের মধ্যেই পরিষ্কার চুন-জলটা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা হলো, ঐ জলে দ্রবীভূত চুনের (ক্যালসিয়াম-হাইড্রক্সাইড) সঙ্গে মুখ-নিঃসৃত কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের (খড়িমাটি) সৃষ্টি হয়, তার সূক্ষ্ম সাদা কণিকাগুলো জলে ভেসে বেড়ায় এবং তাই জলটা ঘোলা দেখায়। কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এটা একটা সহজ ও বিশেষ নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা।
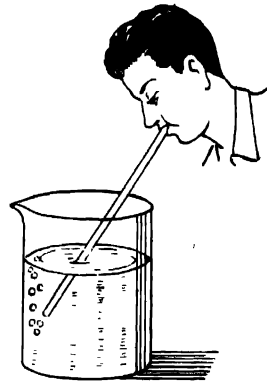
নিঃশ্বাস-বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড

যাহোক, বায়ুর সংস্পর্শে জৈব পদার্থের বিশেষ এক রকম মৃদু-দহনও লক্ষিত হয় বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের **পচন-ক্রিয়ায়।** খোলা হাওয়ায় গাছপালা বা জীবজন্তুর মৃতদেহ যখন পচে তখন পরীক্ষা করে দেখলে বুঝা যায়, পচনশীল পদার্থের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নানা রকম জীবাণুর প্রভাবে পদার্থটার জৈব উপাদানগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে ধীরে ধীরে তাদের অক্সিডেসন-ক্রিয়া চলে, অর্থাৎ বিশেষ এক রকম মৃদু-দহন সুরু হয়। এর ফলে জৈব পদার্থের দহনের সাধারণ নিয়মানুসারে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হতে থাকে ; আর তার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুদের ক্রিয়ায় পদার্থটা ক্রমে পচে-গলে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। জলাভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন জৈব বস্তুর পচনে অনেক সময় মিথেন গ্যাসও সৃষ্টি হয়, আর এই রূপান্তরের আনুসঙ্গিক **অক্সিডেসন** ক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপে ঐ দাহ্য গ্যাসটা অনেক সময় জ্বলে ওঠে। পচনশীল পদার্থের উপরে যথেষ্ট হাওয়া প্রবাহিত হলে পচন-ক্রিয়ার হারও যথেষ্ট হ্রাস পায়। বিভিন্ন জৈব পদার্থ ও জীবাণু সংক্রমণের ফলে দূষিত আবদ্ধ জলের ভিতরে বায়ু-প্রবাহ চালালে জলটা তাই শীঘ্র পচে না। এজন্যে দেখা যায়, নানা দূষিত পদার্থ থাকা সত্ত্বেও মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে বেগবতী স্রোতস্বিনীর জল সহজে পচে দূষিত হয় না।

মৃদু দহন-ক্রিয়া অনেক সময় বিশেষ অবস্থায় তীব্র দহনের পর্যায়ে চলে যেতে পারে ! মৃদু দহনে দাহ্য পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলনে স্বভাবতঃ যে সামান্য তাপের উদ্ভব হয় তা যদি হাওয়ায় ছড়িয়ে যেতে না পারে, তাহলে তার তাপ ক্রমে বাড়তে থাকে। তাপ-বৃদ্ধির ফলে অক্সিডেসনের রাসায়নিক ক্রিয়ার তীব্রতাও ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং এক সময় দাহ্য পদার্থটা তার নির্দিষ্ট **জ্বলনাংকে** পৌঁছে গিয়ে সহসা দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে। মৃদু দহন এভাবে অনেক সময় স্বতঃই তীব্র দহনে পরিণত হয়, তার জন্যে বাইরে থেকে কোন উদ্বোধনী তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এভাবে কয়লা সংরক্ষণের আবদ্ধ স্থানে বায়ু প্রবাহের অভাবে অনেক সময় আগুন জ্বলে উঠতে পারে ; কয়লা সরিয়ে নিলে কয়লার গুঁড়ো ও কুঁচো কয়লা যা পড়ে থাকে তার মৃদু দহন সহসা হয়তো এক সময় তীব্র দহনে পরিণত হয়ে জ্বলে ওঠে। আমরা আগেই বলেছি, দাহ্য পদার্থের মৃদু দহন অলক্ষিতে সর্বদাই চলে ; উল্লিখিত বিশেষ অবস্থায় কোন কোন সময় সেই মৃদু দহন সহসা তীব্র দহনে প্রকাশ পায়। কল-কারখানায় যন্ত্রাদি মুছে তৈলসিক্ত তুলা, সুতা প্রভৃতি বায়ু-চলাচলহীন আবদ্ধ খুপ্রিতে রেখে

দিলেও অনুরূপ কারণে কখন কখন জ্বলে ওঠে। ফস্‌ফরাস প্রভৃতি নিম্ন-জ্বলনাংকের দাহ্য পদার্থ অনুরূপ কারণে স্বভাবতঃই আরও দ্রুত জ্বলে। **কার্বন-ডাইসালফাইড** নামক তরল পদার্থে ফসফরাস দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণে ব্লটিং-পেপার বা পাত্‌লা কোন কাগজ ডুবিয়ে তুলে নিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্বায়ী কার্বন-ডাইসালফাইড উবে গিয়ে কাগজখানা শুকিয়ে যায়। কাগজখানার উপরে তখন ফস্‌ফরাসের অতি সূক্ষ্ম কণিকা লেগে থাকে, আর সেগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে সুরু করে। এই অক্সিডেসন-ক্রিয়ায় যে তাপের উদ্ভব হয় তা ঐ সূক্ষ্ম ফসফরাস-কণিকাগুলোকে অতি দ্রুত জ্বলনাংকে পৌঁছে দেয় এবং ফস্‌ফরাসের তীব্র দহন সুরু হয়ে গিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কাগজখানাও সহসা দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে।

(গ্যাসীয়) অক্সিজেনহীন দহন

বায়ুর সংস্পর্শে তার গ্যাসীয় উপাদান অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক মিলন বা অক্সিডেসনের ফলে পদার্থের দহন-ক্রিয়া সম্ভব হয়, কথাটা ঠিকই। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে বায়ু বা গ্যাসীয় অক্সিজেনের সংস্পর্শে না থেকেও পদার্থের দহন-ক্রিয়া চলতে পারে ; দহনের জন্যে গ্যাসীয় আকারেই অক্সিজেন থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। অক্সিজেন-বহুল কোন কোন কঠিন যৌগের উপস্থিতিতেও দহন-ক্রিয়া চলে, আর সেই যৌগ থেকেই দহনের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যথাসময়ে সরবরাহ হয়। এরূপ অক্সিজেন-সরবরাহকারী যৌগের মধ্যে পটাসিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$, ক্লোরেট অব পটাস), পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3, সল্ট-পিটার) প্রভৃতি অক্সিজেন-বহুল যৌগিকগুলি আকস্মিক তীব্র দহন বা বিস্ফোরণের জন্যে বহুকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কামান-বন্দুকের বারুদ হিসেবে সল্ট-পিটারের ব্যবহার সুপ্রাচীন।

এখন বায়ু বা গ্যাসীয় অক্সিজেন ছাড়াই দহন-ক্রিয়ার ব্যাপারটা কিরূপ দেখা যাক। তীব্র বিস্ফোরক কোন বারুদে একটু সময় নিয়ে যাতে আগুন ধরে তার জন্যে ধীর-জ্বলনক্ষম এক রকম কাগজের পল্‌তে ব্যবহৃত হয়, যাকে ইংরেজীতে বলে 'টাচ্‌-পেপার' (touch paper)। **সল্ট-পিটার** বা পটাসিয়াম নাইট্রেটের দ্রবণে কাগজ ভিজিয়ে তাকে শুকিয়ে নিলে কাগজের তন্তুর মধ্যে অক্সিজেন-বহুল ঐ যৌগটার সূক্ষ্ম কণিকাগুলি লেগে থাকে। ঐ কণাগুলি থেকে স্বাভাবিক উষ্ণতায়ই ধীরে ধীরে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়, আর

সেই রাসায়নিক বিয়োজন-ক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপের সংস্পর্শে কাগজখানা স্বয়ং-দাহ্য হয়ে এক সময় জ্বলে ওঠে। এর জন্যে বায়ুর গ্যাসীয় অক্সিজেনের দরকার হয় না, বায়ুহীন আবদ্ধ স্থানেও জ্বলতে পারে; এমন কি, এরূপ কাগজ নাইট্রোজেন বা অপর কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মধ্যেও জ্বলতে পারে।

পদার্থের দহন বলতে সাধারণতঃ অবশ্য বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে তার মিলন বা অক্সিডেসনই বুঝায়, কিন্তু দহনের প্রকৃত রাসায়নিক তাৎপর্য এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে দহন-ক্রিয়া হলো এমন একটি রাসায়নিক ক্রিয়া যাতে পদার্থের রাসায়নিক মিলন ঘটে তাপ উদ্ভূত হবে। এরূপ দহন বা রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়ার জন্যে বায়ু বা অক্সিজেনের উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে না থাকলেও চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, **হাইড্রোজেন** গ্যাস বাতাসের মধ্যে জ্বলে, আর অক্সিজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক মিলনে, অর্থাৎ অক্সিডেসনের ফলে উৎপন্ন হয় জল। দাহ্য গ্যাস হাইড্রোজেনের এরূপ অক্সিডেসন সাধারণ দহন-ক্রিয়ারই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু **ক্লোরিন** গ্যাসের মধ্যেও হাইড্রোজেন গ্যাস অনুরূপভাবেই জ্বলতে পারে; আর তার ফলে গ্যাস দু'টার রাসায়নিক মিলন ঘটে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড বা **হাইড্রোক্লোরিক** অ্যাসিড নামক একটা যৌগিক পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে এ-ও হাইড্রোজেন গ্যাসের দহন; কিন্তু অক্সিডেসন নয়। লক্ষ্য করলে এরূপ আরও অনেক দহনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাতে অক্সিজেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না।

দহনে উচ্চ তাপমাত্রা

পদার্থের দহনে তাপের উদ্ভব হয়; কিন্তু সাধারণ দহনে উদ্ভূত তাপ তেমন উচ্চ মাত্রায় পৌঁছায় না। মোমবাতি জ্বলে, কাঠ পোড়ে; এমন কি, কয়লা জ্বালালেও এমন উত্তাপ পাওয়া যায় না, যাতে লোহা দিলে সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে অতি উচ্চ তাপ-মাত্রা সৃষ্টি করবার নানারকম ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

আগেই বলেছি, গ্যাসীয় অক্সিজেনের মধ্যে যেমন পদার্থের দহন সম্ভব, তেমনই অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেন-যৌগের সংস্পর্শেও দহন-ক্রিয়া সম্ভবপর হয়; আর তাতে কখন-কখন অত্যধিক উচ্চ তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অক্সিজেন-যৌগের সাহায্যে দহন-ক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করবার ও কোন-কোন ধাতুর অক্সাইড থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাষণের উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা

বলেছি, ধাতব অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিডেসন বা দহন-শক্তি অতি প্রবল ; ধাতুটা অতি দ্রুত অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে (দগ্ধ হয়ে) যেমন তীব্র আলোক ছড়ায়, তেমন উচ্চ তাপমাত্রারও সৃষ্টি করে। কেবল গ্যাসীয় অক্সিজেনেই নয়, অক্সিজেন-যৌগের সংস্পর্শেও অ্যালুমিনিয়াম অতি তীব্রভাবে জ্বলে। মরচে-ধরা কুঁচো লোহার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়া মিশিয়ে যথেষ্ট উত্তপ্ত করলে ঐ মরচে-ধরা লোহার (লোহার অক্সাইড যৌগের) অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের রাসায়নিক মিলন বা দহন ঘটে, আর এই প্রক্রিয়ায় তাপ-মাত্রা প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (মোটামুটি 5400° ডিগ্রি ফারেনহিট) পৌঁছায়। এই উচ্চ তাপে লৌহ-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন সম্যক বিমুক্ত হয়ে যায়, আর গলিত বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। মরচে-ধরা লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের এরূপ মিশ্রণের এক অংশে বিশেষ ব্যবস্থায় অগ্নি-সংযোগ করলেও এই প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্তূপের লৌহ-অক্সাইড অক্সিজেন-বিমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ লৌহে পরিণত হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের দহনে অত্যুচ্চ তাপ উৎপাদনের এই কৌশলকে সাধারণতঃ **'থার্মিট'** পদ্ধতি বলা হয়।

উচ্চ তাপ উৎপাদনের এই 'থার্মিট' পদ্ধতি লোহা গলিয়ে জোড়া লাগানোর অর্থাৎ 'ওয়েল্ডিং'-এর কাজে যথেষ্ট প্রচলিত। ঢালাই-লোহার যন্ত্রাংশ, ট্রাম ও ট্রেনের রেলের পাটি প্রভৃতি জোড়া দিতে ও মেরামতির কাজে অনেক সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। লৌহ-অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণের মিশ্রণ জোড়া লাগানোর জায়গায় রেখে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় ; এর ফলে অত্যুচ্চ তাপ সৃষ্টি হয়ে মিশ্রণের লৌহ-অক্সাইড অক্সিজেন বিমুক্ত হয় এবং গলিত লোহা বয়ে গিয়ে ভাঙ্গা জায়গাটা জুড়ে দেয়। 'থার্মিট' পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়ামের দহনে যে অতি উচ্চ তাপ ও অগ্নিশিখার উদ্ভব হয় তাকে এক রকম **'আগুনে-বোমা' (incendiary bomb)** তৈরির কাজেও লাগানো হয়। শত্রুর বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাবার জন্যে এরূপ বোমা এরোপ্লেন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর বোমার সঙ্গে এক রকম বিশেষ ধরনের স্বয়ং-দাহ্য পদার্থের যান্ত্রিক ব্যবস্থা সংলগ্ন থাকে ; উপর থেকে পতনকালে বায়ুর সংঘর্ষে উৎপন্ন তাপে ঐ পদার্থটা জ্বলে ওঠে, আর তা থেকে বোমায় আগুন ধরে যায় এবং নিচে পড়ে তীব্র আগুন ছড়ায়।

অ্যালুমিনিয়ামের অক্সিডেসনে উৎপন্ন অত্যুচ্চ তাপশক্তিকে যুদ্ধে ব্যবহৃত কোন কোন বিস্ফোরক তৈরির কাজেও লাগানো হয়। এর মধ্যে **অ্যামানল**

নামক বিস্ফোরকটি সমধিক প্রচলিত। এটা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও ট্রাই-নাইট্রোটলুইনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ মিশিয়ে তৈরি করা হয়। ট্রাই-নাইট্রোটলুইন নিজেও একটা বিস্ফোরক পদার্থ; সাধারণতঃ সংক্ষেপে এটা **'টি-এন-টি'** নামে পরিচিত। অ্যামানল মিশ্রণের বিস্ফোরণ-কালে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে অক্সিজেন দ্রুত বিমুক্ত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণের তীব্র **অক্সিডেসন** বা দহন-ক্রিয়া সম্ভব করে তোলে; আর তাতে টি-এন-টির বিস্ফোরণ দ্রুততর ও তীব্রতর হয়।

দহন-ক্রিয়ায় উচ্চ তাপ সৃষ্টির আরও নানারকম কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, হাইড্রোজেন একটা দাহ্য গ্যাস; বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালালে উভয়ের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় জল, যা বাষ্পীয় আকারে উড়ে যায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও অতি উচ্চ তাপের উদ্ভব হয়। অক্সিজেন ও হাইড্রোজন গ্যাসের মিশ্রণে অগ্নি সংযোগ করলে বিস্ফোরণ ঘটে; কাজেই উপযুক্ত ব্যবস্থায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালাতে হয়, আর তার তীব্র শিখায় অতি উচ্চ তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শিখাকে বলে **অক্সি-হাইড্রোজেন ফ্লেম**; এর তাপমাত্রা প্রায় 2000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (3632° ডিগ্রি ফারেনহিট) পর্যন্ত হতে পারে। এক বিশেষ ব্যবস্থায় একটা নল-মুখে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালানো হয়, আর ঐ নলের অভ্যন্তরস্থ আর একটা নলের ভিতর দিয়ে অক্সিজেন সবেগে গিয়ে একসঙ্গে মিশে হাইড্রোজেনের শিখার তীব্র দহনে সাহায্য করে। এই অক্সি-হাইড্রোজেন-শিখার উচ্চ তাপমাত্রায় লোহা পর্যন্ত গলে যায় এবং একে **ওয়েল্ডিং**-এর কাজে ব্যবহার করা হয়। **অ্যাসিটিলিন** গ্যাসকেও অনুরূপ ব্যবস্থায় অক্সিজেনের মধ্যে জ্বালালে অনুরূপ উচ্চ তাপ-মাত্রার অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়; একে বলে **অক্সি-অ্যাসিটিলিন** শিখা।

অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার সাহায্যে ওয়েল্ডিং ব্যবস্থা

অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার উচ্চ তাপ ওয়েল্ডিং ছাড়া আরও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রত্ন বা মূল্যবান প্রস্তর, যেমন—রুবি, স্যাফায়ার

প্রভৃতির বিকল্প তৈরি করতে এই শিখার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক রত্ন-প্রস্তরগুলি প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইডে (অ্যালুমিনা) গঠিত। এই খনিজ ধাতব অক্সাইডটি বিশুদ্ধ অবস্থায় **'কোরাণ্ডাম'** এবং অবিশুদ্ধ অবস্থায় **'এমারি'** নামে পরিচিত, উভয়ই অত্যন্ত কঠিন পদার্থ, কিন্তু এগুলিও অক্সি-হাইড্রোজেন শিখায় গলে যায়। বিশেষ ব্যবস্থায় 97·5 ভাগ অ্যালুমিনা, (অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড) ও 2·5 ভাগ ক্রোমিয়াম-অক্সাইডের মিশ্রণকে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার উত্তাপে গলিয়ে সাবধানে ঠাণ্ডা করলে রুবির অনুরূপ রক্তিম পাথরের আকারে তা জমে যায়। পদার্থটার ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী স্বভাবজ রত্ন-প্রস্তরের প্রায় অনুরূপ হয়ে থাকে। অত্যধিক কাঠিন্যের জন্যে ঘড়ির সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির বেয়ারিং এরূপ কৃত্রিম প্রস্তর দিয়ে প্রস্তুত হয়, যাকে সাধারণতঃ আমরা ঘড়ির 'জুয়েল' বলি। এরূপ নানা কাজের জন্যে এই উপায়ে আজকাল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। অলংকারাদিতেও এরূপ কৃত্রিম পাথরের বহুল ব্যবহার আছে।

অগ্নি-উৎপাদনের সহজ উপায় : দেশলাই উদ্ভাবন

পদার্থের দহন ও অগ্নি-উৎপাদন সম্পর্কিত রাসায়নিক তথ্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ধারণ করেন ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ে। ক্রমে জানা গেছে, দাহ্য পদার্থের উত্তাপ কোনক্রমে তার নির্দিষ্ট জ্বলনাংককে পৌঁছে দিলে পদার্থটার অক্সিডেসন বা দহন সুরু হয় এবং আগুন হলো তারই ফলশ্রুতি। আজ আমরা একটি দেশলাই-কাঠি ঘসে ইচ্ছামত যখন-তখন আগুন জ্বালি; ন্যূনতম পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে এভাবে এখন আমরা মুহূর্তে আগুন পাই। প্রাচীনকালের মানুষ শুকনো কাঠে-কাঠে ঘসে, চকমকি পাথর ঠুকে বহু পরিশ্রমে আগুন জ্বালতো, আর আজ সেই আগুন কতই না অনায়াস-লভ্য হয়েছে রসায়নের কল্যাণে। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে রসায়ন-বিজ্ঞানের এ দানের মূল্য অপরিসীম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে দহন ও অগ্নির রাসায়নিক তাৎপর্য জানা গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের আগে যথেচ্ছ অগ্নি উৎপাদনের কোন কার্যকরী সহজ উপায় উদ্ভাবিত হয় নি। এদিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চ্যান্সেল নামক একজন ফরাসী বিজ্ঞানীর চেষ্টার উল্লেখ করা যেতে পারে। 1810 খৃষ্টাব্দে ইনি ছোট ছোট কাঠির মাথায় চিনি ও পটাসিয়াম-ক্লোরেটের

মিশ্রণকে গদের আঠার সাহায্যে লাগিয়ে শুকিয়ে নেন। আগুন জ্বালবার জন্যে তিনি কাঠির মাথায় লাগানো ঐ মিশ্রণকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের (অয়েল অব ভিট্রিয়ল) মধ্যে ডুবিয়ে তুলে নেন; এভাবে অ্যাসিডের সংস্পর্শে মিশ্রণের চিনির দানা জ্বলে ওঠে এবং পটাসিয়াম-ক্লোরেট থেকে বিমুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তা জ্বলতে থাকে। এই দহন-ক্রিয়া শেষে শুক্‌নো কাঠিতে সংক্রামিত হয়ে তাতে আগুন ধরায়। এরূপ দেশলাই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তও লোকে ব্যবহার করেছে; কিন্তু এর ঝঞ্ঝাট অনেক, অ্যাসিডের প্রয়োজনে তা বিপজ্জনকও ছিল। এর পরে জন ওয়াকার নামক একজন ইংরেজ ঔষধ-প্রস্তুতকারক 1827 খৃষ্টাব্দে এক রকম **ঘর্ষ-দেশলাই** উদ্ভাবন করেন। এই দেশলাইর কাঠির মাথায় পটাসিয়াম-ক্লোরেটের সঙ্গে চিনির বদলে এন্টিমনি-সালফাইডের মিশ্রণ লাগানো হতো; আর গদের আঠার সাহায্যে সূক্ষ্ম কাচের গুঁড়া লাগানো-কাগজের উপরে এই কাঠির মাথার মিশ্রণটা ঘসলে জ্বলে উঠতো। এই দেশলাইকে বলা হতো **লুসিফার**। এই হলো প্রথম ঘর্ষ-দেশলাই বাতির উদ্ভাবন।

সহজ-দাহ্য মৌলিক পদার্থ ফস্‌ফরাস সপ্তদশ শতাব্দীতে (1669 খৃষ্টাব্দে) আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথমে একটা জটিল কষ্টসাধ্য পদ্ধতিতে খনিজ ফস্‌ফেট-যৌগিক থেকে পদার্থ টা পাওয়া যেত। এর অনেক পরে ক্যালসিয়াম-ফস্‌ফেট, সিলিকা (বালি) ও কোক-কয়লার মিশ্রণকে বৈদ্যুতিক চুল্লীর অত্যুচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে অপেক্ষাকৃত সহজে ফস্‌ফরাস নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবিত হয়। যাহোক, সহজ-দাহ্যতার জন্যে অগ্নি-উৎপাদনের দেশলাই প্রস্তুতিতে ফসফরাস ব্যবহারের কথা অনেকের মনেই উঠেছে এবং চেষ্টাও চলেছে নানাভাবে। এই প্রচেষ্টা অবশেষে ফলবতী হয় এবং **কন্‌গ্রিভ** নামে ফস্‌ফরাস-লাগানো এক রকম দেশলাই-কাঠি উদ্ভাবিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে তার বহুল প্রচলন ঘটে। এই দেশলাই-কাঠির মাথায় প্রধানতঃ ফস্‌ফরাসের সঙ্গে পটাসিয়াম-ক্লোরেট, লেড-অক্সাইড (রেড লেড) প্রভৃতি যে-কোন একটা অক্সিজেন-বহুল যৌগের মিশ্রণ গদের আঠায় জড়িয়ে লাগানো হতো; শেষে ঐ মিশ্রণকে বিভিন্ন রং মিশিয়ে রঙীনও করা হতো। এটাও ছিল এক রকম ঘর্ষ-দেশলাই; আর এটা পূর্বোক্ত দেশলাইগুলির চেয়ে অনেক সহজে জ্বালানো যেত। অগ্নি উৎপাদনের প্রচেষ্টায় **ফস্‌ফরাস-দেশলাই** বস্তুতঃ যথেষ্ট অগ্রগতির সূচনা করেছিল, কিন্তু এই অগ্রগতির মাশুল হিসেবে মানুষকে যথেষ্ট মূল্য দিতে

হয়েছে নানা বিপদ ও জীবনহানির ভিতর দিয়ে। ফস্‌ফরাসের সহজ-দাহ্যতার জন্যে অনেক সময় অসাবধানে সামান্য ঘসা লেগে সহসা আকস্মিকভাবে আগুন জ্বলে উঠে বিপদ ঘটাতো। আবার ফস্‌ফরাসের এক রকম বিষ-ক্রিয়ায় লোকের স্বাস্থ্যহানি, এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে লাগলো। বিশেষতঃ এই দেশলাই তৈরির কারখানায় শ্রমিকদের চোয়ালের হাড় ও দাঁতের মাড়ি ফস্‌করাসের বিষ-ক্রিয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই আক্রান্ত হয়ে দাঁতগুলি পড়ে যেত, হাড়ে পচন ধরতো। এই ভয়ংকর রোগে স্বাস্থ্যহীন ও অকর্মণ্য হয়ে শ্রমিকেরা শেষে মৃত্যু বরণ করছিল ব্যাপক হারে। এই শোচনীয় পরিণামের জন্যে সব সভ্য দেশেই শেষে আইন করে সাধারণ (হল্‌দে ও সাদা) ফস্‌ফরাসের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফস্‌ফরাস-দেশলাই তৈরির প্রথম প্রচেষ্টা এভাবে কিছু কালের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল।

আধুনিক ঘর্ষ-দেশলাই ঃ বিশুদ্ধ সাধারণ ফস্‌ফরাস অনেকটা স্বচ্ছ, সাদা ও মোমের মত নরম পদার্থ। বাইরের আলোতে জিনিসটা ক্রমে হল্‌দে হয়ে পড়ে, এমন কি শেষে অনেক সময় লালও হয়ে যায়; তবে এই বর্ণ পরিবর্তনটা হয় কেবল উপরিভাগের আস্তরণে। রাসায়নিক গবেষণার ফলে অতঃপর সাদা বা হলদে ফস্‌ফরাসকে সম্যক লাল ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। শ্বেত ফস্‌ফরাসকে কোন আবদ্ধ পাত্রে মোটামুটি 240° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে গাঢ় লাল রঙের গুঁড়ার আকারে এক রকম ফস্‌ফরাস পাওয়া যায়। এটা ফস্‌ফরাসের একটা প্রতিরূপ; সাধারণ ফস্‌ফরাসের মত এটা তেমন সহজ-দাহ্য নয়, বিষ-ক্রিয়াও নেই। দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হলেও রাসায়নিক বিচারে এটা একই ফস্‌ফরাস। একই মৌলিক পদার্থের এরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন আকারের প্রতিরূপকে বলা হয় মৌলটার **অ্যালোট্রপি** অবস্থা। ফস্‌ফরাসের এই রক্তবর্ণ প্রতিরূপ পদার্থটা তেমন সহজ-দাহ্য ও বিষাক্ত নয় বলে অনেকেই একে দেশলাই তৈরির কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 1844 খৃষ্টাব্দে পাস্‌ক নামক একজন জার্মান বিজ্ঞানী লাল ফস্‌ফরাস ব্যবহার করে এক রকম বিপদহীন দেশলাই উদ্ভাবন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি সর্বপ্রথম সুইডেন দেশে প্রবর্তিত হয় এবং তাই এই আধুনিক দেশলাই সুইডিশ **সেফ্‌টি ম্যাচ** নামে পরিচিত হয়। মোটামুটি এই পদ্ধতি আজও চলছে।

এই দেশলাইয়ে লাল ফস্‌ফরাস কাঠির মাথায় দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কাঠির বারুদ যেখানে ঘষা হবে বাক্সের গায়ের সেখানকার আস্তরণের

মশলার মিশ্রণে। কাঠির মাথায় থাকে অ্যান্টিমনি সালফাইডের সঙ্গে পটাসিয়াম-ক্লোরেট, লেড অক্সাইড (রেড লেড), পটাসিয়াম-ডাইক্রোমেট প্রভৃতির যে-কোন একটা অক্সিজেন-বহুল যৌগ; কখনো কখনো আবার এর সঙ্গে গন্ধক ও কাঠ-কয়লার গুঁড়াও মেশানো হয়। কাঠির মাথার এই মশলার মিশ্রণটা পূর্বেকার 'লুসিফার' দেশলাইর মত কাচের গুঁড়া-মাখানো কাগজ, বা কোন খস্‌খসে জিনিসে ঘষলে জ্বলে না; জ্বলে কেবল বিশেষভাবে তৈরী এক রকম মশলা-মাখানো জিনিসের উপরে ঘসলে। দেশলাই-বাক্সের এই ঘর্ষ-তলের মশলায় থাকে লাল ফস্‌ফরাসের সঙ্গে কিছু অ্যান্টিমনি-সালফাইড ও মিহি কাচের গুঁড়া। কাঠির মাথায় ও বাক্সের গায়ে-লাগানো মশলা সবই গদের আঠায় জড়িয়ে লাগানো হয়।

দেশলাই-কাঠির মশলা জ্বলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাঠির কাঠও জ্বলে উঠে অগ্নি-শিখা কিছুটা স্থায়িত্ব লাভ করে, তার জন্যে কাঠিগুলিকে গলিত মোমের মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। কখনো কখনো এজন্যে গন্ধকের দ্রবণও ব্যবহার করা হয়। আবার দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির আগুন যাতে বেশী ক্ষণ জ্বলে না থাকে (নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত কাঠির আগুনে কোন কিছু ধরে গিয়ে বিপদ না ঘটায়) তার জন্যে কাঠিগুলিকে অনেক সময় ফিট্‌কিরি, সোডিয়াম ফস্‌ফেট প্রভৃতি কোন-একটা যৌগিকের দ্রবণে ডুবিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়ে দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের আগুনও নির্বাপিত হয়ে যায়। যাহোক, প্রাথমিক পর্যায়ে যে দেশলাই-শিল্প এত বিপজ্জনক ছিল সব দিক দিয়ে তাকে নিরাপদ করতে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে। পরে যন্ত্রবিদদের কল্যাণে এই শিল্পের এত উন্নতি হয়েছে যে, শ্রমিকদের হাতে করে তেমন কিছু আর করতে হয় না, যন্ত্রের সাহায্যেই সব কাজ হয়। যন্ত্র কাঠ চিড়ে সমান মাপের কাঠি বানায়, তাদের মাথায় দাহ্য মশলা লাগায়, বাক্স তৈরি করে, কাঠি ভর্তি করে, লেবেল লাগায়। সব কাজ শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানে যন্ত্রই করে দেয়। আজকাল একটা মাত্র যন্ত্রে প্রতিদিন হাজার হাজার বাক্স দেশলাই তৈরি হচ্ছে।

শ্বেত ফস্‌ফরাসের দেশলাই তৈরি নিষিদ্ধ হওয়ার পরে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তার বিকল্প কিছু উদ্ভাবনের জন্যে বিশেষভাবে তৎপর হন, এ-কথা আগেই বলেছি। সুইডিস সেফ্‌টি ম্যাচ ছাড়াও আর এক রকম বিষ-ক্রিয়াহীন দেশলাই তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হয়েছিল, যা পূর্ববর্তী ফস্‌ফরাস-দেশলাই

'কন্‌গ্রিভ'-এর চেয়ে অনেকটা সুবিধাজনক হয়েছিল ; যে-কোন খস্‌খসে জিনিসের উপরে ঘসলেই জ্বলতো। এর কাঠির মাথায় ফস্‌ফরাসের বদলে ফসফরাসের সালফাইড যৌগের সঙ্গে পটাসিয়াম-ক্লোরেট, অথবা অপর কোন অক্সিজেন-বহুল যৌগের মিশ্রণ গদের আঠায় জড়িয়ে লাগানো হতো। কখনো কখনো ঐ মিশ্রণের সঙ্গে কাচের গুঁড়োও মেশনো হতো, যাতে তার ঘর্ষ-শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ঘসলেই কাঠির বারুদ জ্বলে ওঠে। এই শ্রেণীর দেশলাইও এক সময় বহুল প্রচলিত হয়েছিল ; কিন্তু সুইডেনের সেফ্‌টি-ম্যাচ সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক ও নিরাপদ হওয়ায় তার প্রচলনই কাল-জয়ী হয়েছে।

পেট্রল-দেশলাই

সাধারণ দেশলাই যদিও আগুন ও আলোক উৎপাদনের সহজতম উপায় এবং তা-ই আজকাল সমধিক প্রচলিত ; তথাপি আধুনিক পেট্রল-দেশলাই বা 'পেট্রল লাইটার'-এর উল্লেখ না করলে এতদ্বিষয়ক আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর প্রচলন এ-যুগে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনকও বটে। পেট্রল, স্পিরিট প্রভৃতি অতি-দাহ্য তরল উদ্বায়ী জ্বালানীগুলি সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শেই জ্বলে ওঠে এবং কৌশলে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রয়োজনানুরূপ অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়। ছোট ধাতব আধারে সামান্য পেট্রল বা স্পিরিট নিয়ে তাতে একটা সরু পল্‌তে দিয়ে এক রকম ছোট্ট বাতির মত তৈরি করা হয়। পল্‌তের মাথার কাছে এক টুকরা বিশেষ ধাতু-খণ্ড দৃঢ় সংবদ্ধ থাকে, আর থাকে ঘূর্ণনক্ষম ছোট একটা ইস্পাতে-তৈরী চাকার ব্যবস্থা। ঐ ধাতব খণ্ডটি তৈরি হয় **লোহা ও সিরিয়াম** ধাতুর অক্সাইডের সংমিশ্রণে প্রস্তুত এক রকম সংকর-ধাতু (মিন্‌চ মেটাল) দিয়ে। ব্যবহারকারী আঙুল দিয়ে ইস্পাতের

পেট্রল লাইটার

চাকাটি ঘুরালে সংলগ্ন ঐ সংকর-ধাতুর খণ্ডটির সঙ্গে ঘষা লেগে তার ক্ষুদ্র কণা কিছু কিছু বেরিয়ে যায় এবং ঘর্ষণের সামান্য উত্তাপে ঐ কণাগুলি বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। এর সংস্পর্শে পল্‌তে দিয়ে চুঁইয়ে-ওঠা পেট্রল বা স্পিরিটের বাষ্পে আগুন ধরে পল্‌তেটা জ্বলে ওঠে। উদ্বায়ী তরল পদার্থের বাষ্পকে এভাবে কৌশলে জ্বালাতে
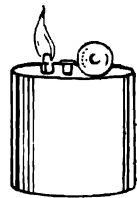
এরূপ লাইটার-যন্ত্রে যে ঘর্ষণ-জনিত স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, তা মূলতঃ আদিম যুগের লোহা ও চক্‌মকি পাথরের বা পাথরে-পাথরে ঘর্ষণেরই একটা উন্নত সংস্করণ মাত্র।

পেট্রল-লাইটারের উল্লিখিত ধাতু-সংকরে ব্যবহৃত সিরিয়াম-অক্সাইড (বা সিরিয়া) আজকাল দীপ্তিমান **গ্যাস-ম্যান্টেল** প্রস্তুতি-শিল্পের উপজাত পদার্থ হিসেবে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্যাস-ম্যান্টেল শিল্পে (এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচনা করবো) উপজাত এই সিরিয়াম-অক্সাইডের উপযুক্ত ব্যবহারের চেষ্টা এক সময় সুরু হয়। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শেষে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত লৌহ-সিরিয়া ধাতু-সংকর তৈরি হয়েছে। তারপর ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়াবার এর বিশেষ গুণ লক্ষ্য করে **পেট্রল-লাইটার** তৈরির কাজে তাকে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়।

প্রয়োজন অনুসারে যখন-তখন অগ্নি উৎপাদনের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ দিন ধরে যে-সব চেষ্টা করেছেন এবং ক্রমে যে সাফল্য লাভ করেছেন, তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া হলো মাত্র। যা আজ অতি সাধারণ ও সহজসাধ্য কাজ বলে আমরা দেখছি, তার পশ্চাতে খ্যাত-অখ্যাত বহু বিজ্ঞানীর বহুবিধ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যার অধিকাংশই অজ্ঞাত। 1786 খৃষ্টাব্দে জনৈক ইটালিয়ান বিজ্ঞানী অগ্নি উৎপাদনের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে প্যারিসে এনেছিলেন। তাঁর কৌশলটা ছিল অতি সহজ,—একটা বড় মুখের বোতলের ভিতর-দিকটাতে শ্বেত ফস্‌ফরাসের একটা প্রলেপ মাখানো ছিল, আর কাঠির মাথায় ছিল গন্ধক লাগানো। এই কাঠির মাথাটা বোতলের ভিতরকার গায়ে একটু ঘষলে খানিকটা ফস্‌ফরাস তাতে লেগে যেত, আর কাঠিটা বাইরে আনলে বাতাসের সংস্পর্শে সেই ফসফরাসটুকু জ্বলে উঠে গন্ধকসহ কাঠির মাথায় আগুন ধরতো। এই দেশলাইয়ের ব্যবহার প্যারিসে বহু বছর যাবৎ প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে 1827 খৃষ্টাব্দেও এই দেশলাই ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। লেবরেটরিতে এই দেশলাই ব্যবহার করেই ফ্যারাডে বিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন। কিন্তু অগ্নি উৎপাদনের এই পদ্ধতি আজ লুপ্ত হয়েছে, এমন কি, এর আবিষ্কারকের নাম পর্যন্ত জানা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি-রসায়ন ও রাসায়নিক সার

কৃষি-রসায়নের উদ্ভব : উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির রহস্য — হেলমণ্টের পরীক্ষা : উদ্ভিদের কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া : মাটির অজৈব উপাদান ও উদ্ভিদের প্রয়োজন — লিবিগের পরীক্ষা : জৈব সার ও অজৈব সার : কৃত্রিম বা রাসায়নিক সারের প্রয়োজন : পটাস-সার, ফস্‌ফেট-সার ও সুপার-ফস্‌ফেট সারের ব্যবহার ও উৎপাদন পদ্ধতি : বেসিক স্ল্যাগ ও ডাই-অ্যামন-ফস্ : নাইট্রোজেন সারের উপযোগিতা ও উৎপাদন : বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংবন্ধন — বার্কল্যাণ্ড-আইড পদ্ধতি : নাইট্রেট অব লাইম : নাইট্রো-কার্বাইড ও ক্যালসিয়াম-সায়েনামাইড : অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ ও হাবের পদ্ধতি : বিভিন্ন অ্যামোনিয়াম সার ও নাইট্রো-চক : কৃত্রিম সার হিসেবে অন্যান্য পদার্থ : নাইট্রোজেন সংবন্ধনের বহুমুখী ব্যবহার।

স্মরণাতীত কাল থেকে যদিও মানুষ খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্যে কৃষি-কার্য করে আসছে, তথাপি কৃষি-কার্যের মূল তথ্য : মাটির উর্বরতা-শক্তি ও শস্য উৎপাদনের উপরে তার প্রভাব, সম্বন্ধে মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্ত মানুষের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। উদ্ভিদেরও যে উপযুক্ত খাদ্য চাই, আর মাটিই তা যোগান দেয়, তার অভাব হলে উদ্ভিদ বাড়ে না, শস্যাদি ভাল জন্মায় না — এ-সব কথা সে-যুগে মানুষের জানা ছিল না; অবশ্য জানবার তাদের আবশ্যকও হয় নি। পৃথিবীর লোকসংখ্যা সে-যুগে ছিল কম, আর স্বাভাবিক উর্বর জমিরও অভাব ছিল না; মানুষ যেন-তেন ভাবে জমি চাষ করতো, বীজ ছড়াতো, অনায়াসেই প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত শস্য পেত। তাই মাটির অবস্থা বা উদ্ভিদের প্রয়োজনের দিকে মানুষের বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনই হয় নি। ক্রমে পৃথিবীর লোক-সংখ্যা বেড়েছে, আবার একই জমিতে ক্রমাগত চাষের ফলে মাটির উর্বরতা-শক্তি ধীরে ধীরে কমে গিয়ে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে; ক্রমে তাই মানুষের খাদ্য-সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর ফলে মানুষকে মাটির অবস্থা, উপাদান ও উর্বরতা সম্বন্ধে এবং উদ্ভিদের অধিকতর পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে অবহিত ও তৎপর হতে হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ আধুনিক কৃষি-রসায়নের উৎপত্তি। মানব-কল্যাণে রসায়নের বিবিধ অবদানের মধ্যে খাদ্য-শস্যের

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে উদ্ভিদের প্রয়োজন বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন সারের উপযোগিতা নির্ধারণে কৃষি-রসায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অথচ এমন এক দিন ছিল, যখন শস্য-উৎপাদনে উদ্ভিদের প্রয়োজন ও মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। জমিতে গোবর দিলে মাটির উর্বরতা-শক্তি কিছু বাড়ে, উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয়, অধিক শস্য জন্মায়—এ-সব তথ্য আমাদের দেশের লোকে কবে থেকে জেনেছে, তা সঠিক জানা নেই। তবে জমিতে গোবর-সারের প্রচলন এদেশে বহু শতাব্দী আগে থেকেই চলছে। পাশ্চাত্য দেশে এর প্রথম উল্লেখ করেন **বার্ণার্ড পেলিসি** নামক জনৈক ফরাসী কুম্ভকার (বিজ্ঞানীও বটেন) মাত্র খৃষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীতে। 1563 খৃষ্টাব্দে লিখিত তাঁর পুস্তকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, উদ্ভিদ মাটি থেকে কোন-কিছু শুষে নেয়; আর জমিতে গোবর দিলে তা থেকে মাটি সেই জিনিস আবার ফিরে পায় এবং পরিপুষ্ট হয়ে উদ্ভিদ ভাল ফল-শস্য দেয়। কৃষিকার্য ও ভূমির উর্বরতা সম্পর্কে এই মোটামুটি কথাটা পেলিসি নিশ্চয় নিছক অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন; তাঁর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি এর মধ্যে কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

যাহোক, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, আর তার ফলে শস্যাদির অধিক উৎপাদনের জন্যে মাটিতে গোবর জাতীয় কিছু দেওয়া দরকার, পেলিসির এই উক্তির পরেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে **ভ্যান হেলমণ্ট** নামে বেলজিয়ামবাসী এক রসায়ন-বিজ্ঞানী এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে একমাত্র জলই প্রয়োজন, আর কিছু নয়। কথাটা আজ আমাদের কাছে অদ্ভুত শোনায় বটে, কিন্তু তত্ত্বগত ভুল-ত্রুটি থাকলেও হেলমণ্ট তাঁর পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতেই অভিমতটা প্রকাশ করেছিলেন। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির প্রকৃত রহস্য সম্বন্ধে সে-যুগের অজ্ঞতাবশতঃ বিজ্ঞানী হয়েও তিনি তার পরীক্ষার ভ্রান্তি ধরতে পারেন নি। হেলমণ্টের পরীক্ষাটা ছিল এই:

তিনি একটা মাটির পাত্রে 200 পাউণ্ড সম্পূর্ণ জলহীন বিশুষ্ক মাটি নিয়ে তাকে বৃষ্টির জলে ভিজিয়ে নিলেন। তারপরে পাত্রের ঐ ভেজা মাটির মধ্যে তিনি ঠিক 5 পাউণ্ড ওজনের একটি উইলো গাছের চারা পুঁতে দেন। বাইরে থেকে কোন ধুলা-বালি যাতে পাত্রের মাটিতে মিশতে না পারে তার জন্যে ছিদ্রযুক্ত টিনের পাতে গাছের গোড়ার মাটি তিনি সম্পূর্ণ ঢেকে দিয়েছিলেন; আর ঐ ছিদ্র দিয়ে মাঝে-মাঝে বৃষ্টির জল বা

পরিস্রুত বিশুদ্ধ জল দিয়ে পাত্রের মাটি ভিজিয়ে দিতেন। জল ছাড়া আর কিছুই তিনি গাছের গোড়ার মাটিতে দেন নি, কিন্তু গাছটা বেশ বাড়তে থাকে। এভাবে ঠিক 5 বছর পরে তিনি গাছটাকে ডালপালা ও শিকড় শুদ্ধ তুলে নিয়ে ওজন করে 169 পাউণ্ড 3 আউন্স ওজন পান। বছর বছর যে-সব পাতা ঝরে পড়েছিল তার ওজন অবশ্য তিনি হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। এ থেকে তিনি দেখলেন, কেবলমাত্র জল পেয়েই গাছটা আকারে-অবয়বে যথেষ্ট বেড়েছে, আর সব সমেত 164 পাউণ্ড 3 আউন্স ওজন বৃদ্ধি হয়েছে। আবার পাত্রের সবটা মাটিকে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিয়ে তিনি ওজন করে দেখলেন, প্রথমে যে 200 পাউণ্ড মাটি তিনি নিয়েছিলেন এখনও তা-ই আছে, কিছুমাত্র কমে নি। এ থেকে হেলমণ্ট সিদ্ধান্ত করেছিলেন, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে কেবল জলই দরকার, আর কিছু নয়।

সামান্য সহজ পরীক্ষা, আপাতদৃষ্টিতে নির্ভুল বলেই মনে হয়। কিন্তু এ পরীক্ষায় উদ্ভিদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় প্রকৃত রাসায়নিক তথ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নি; তথ্যটা হেলমণ্টের অবশ্য জানাও ছিল না। কাজেই সিদ্ধান্তটা হয়েছিল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কারণ, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে জল অপরিহার্য হলেও আরও দু'টি মুখ্য ব্যাপারই এ পরীক্ষায় বাদ পড়েছে। গাছটা তার সবুজ পত্রের মাধ্যমে বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে কার্বন (বা অঙ্গার) আত্মসাৎ করেছে এবং মাটি থেকেও কিছু কিছু অজৈব লবণ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে গ্রহণ করেছে। পরীক্ষার পরে হেলমণ্ট মাটিটাকে যে ওজন করেছিলেন তাতে অতি সূক্ষ্ম ওজন-হ্রাস অবশ্যই সে-যুগের তৌল-যন্ত্রে (ব্যালান্স) ধরা পড়ে নি। আমরা আজ জানি, উদ্ভিদের সবুজ পাতাগুলি বায়ু থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্প ভিতরে টেনে নিয়ে পাতার সবুজ-কণা বা ক্লোরোফিলের মাধ্যমে ও সূর্যালোকের তেজঃশক্তির প্রভাবে কার্বন আত্মসাৎ করে; আর প্রকৃতির বিচিত্র কৌশলে উদ্ভিদ-দেহের অভ্যন্তরে সেই কার্বন ও জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে শর্করা, শ্বেতসার ও সেলুলোজ (উদ্ভিদ-তন্তু) তৈরি হয়। বস্তুতঃ এ-সব পদার্থই উদ্ভিদের দেহ গঠনের উপাদানরূপে কাজ করে, আর উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়। উদ্ভিদ-দেহে বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের এই বিচিত্র রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে বলে **ফোটোসিন্থেসিস** (সালোক-সংশ্লেষণ), বা কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া; এ বিষয় আমরা 'বায়ুর উপাদান

ও তথ্যাদি' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করেছি। যাহোক, হেলমণ্টের এই পরীক্ষা ও তা থেকে তাঁর একটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টান্তটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির অভাবের একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সর্বদিকে সূক্ষ্ম তত্ত্বীয় দৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন, নয়তো এরূপ মারাত্মক ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং অধিকতর শস্যোৎপাদনের ক্ষমতা সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্রমে নানা তথ্য জানা গেছে। ফোটো-সিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় বায়ু থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প নিয়ে উদ্ভিদেরা বিচিত্র কৌশলে এক দিকে যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ও রূপান্তর ঘটিয়ে নিজ দেহে শর্করা, শ্বেতসার, সেলুলোজ প্রভৃতি জৈব পদার্থ সৃষ্টি করে, অপর পক্ষে আর্দ্র মাটিতে দ্রবিত নানা রকম অজৈব লবণ শিকড়ের মাধ্যমে টেনে নিয়েও উদ্ভিদেরা তাদের দেহ গঠনে সাহায্য করে। পরিমাণে অতি সামান্য হলেও পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এরূপ বিভিন্ন অজৈব লবণ উদ্ভিদের চাই-ই; আর দ্রবিত অবস্থায়ই কেবল এ-সব লবণ উদ্ভিদেরা শিকড়ের মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে টেনে নিতে পারে। এ-জন্যেই গাছের গোড়ার মাটিতে জল চাই,—শুষ্ক মাটিতে উদ্ভিদ জন্মায় না, কোনক্রমে জন্মালেও পরিপুষ্ট হয় না।

উদ্ভিদ-দেহে বিভিন্ন অজৈব লবণের অস্তিত্বের কথা ধীরে ধীরে জানা গেছে। উদ্ভিদের ডালপালা ও কাঠ পোড়ালে তার যে ভস্ম হয় তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা অনেক দিন আগেই তার মধ্যে পটাসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি অজৈব মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। তারপর 1840 খৃষ্টাব্দে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী ভন লিবিগ এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে, বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং মাটি থেকে জল শোষণ করেই কেবল উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটতে পারে না, তাদের দেহ-গঠনের জন্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থও অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদের চাই। পরীক্ষার সাহায্যে লিবিগ তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণ করেন। তিনি দেখান যে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে মোটামুটি 13-টা মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন হয়। এগুলির মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও প্রধান হলো নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়াম; আর তাই এগুলির দ্রবণীয় বিভিন্ন অজৈব লবণ বা যৌগ উপযুক্ত পরিমাণে মাটিতে থাকা দরকার। মাটি থেকে এ-সব যৌগের জলীয়

দ্রবণ খাদ্যরূপে শিকড়ের মাধ্যমে উদ্ভিদেরা দেহাভ্যন্তরে টেনে নেয়। এরূপ প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন জৈব ও অজৈব উপাদান বিশেষতঃ তার ফল-শস্যে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এভাবে এক টন গম মাটি থেকে টেনে নেয় প্রায় 47 পাউণ্ড নাইট্রোজেন, 18 পাউণ্ড ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ও 12 পাউণ্ড পটাস বা পটাসিয়াম কার্বনেট। পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে এ-সব অজৈব বা খনিজ পদার্থ এককভাবে উদ্ভিদের প্রয়োজন হয় অতি সামান্য; কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে তাদের পরিমাণ অনেক। প্রতি বছর একই জমিতে শস্য উৎপাদিত হতে হতে মাটি এ-সব অজৈব পদার্থ হারিয়ে ক্রমে অনুর্বর হয়ে পড়ে; তাই মাটিকে যথোপযুক্ত শস্যদায়িনী উর্বর রাখতে হলে জমিতে ঐ সব জৈব ও অজৈব পদার্থ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে যোগান দেওয়া একান্ত দরকার। এই সব পদার্থই **জমির সার** হিসাবে তাই ব্যবহার করা প্রয়োজন।

জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী ভন লিবিগ

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কৃষি-জমির পরিমাণ ক্রমে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে; তারপর আবার একই জমিতে ক্রমাগত শস্যোৎপাদনের ফলে মাটির উর্বরতা-শক্তি হ্রাস পেয়ে স্বভাবতঃই উৎপাদিত শস্যের পরিমাণও কমতে থাকে। তাই খাদ্যাভাবের বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন। এর ফলে কৃষি-জমির ভূ-প্রকৃতি

ও তার রাসায়নিক উপাদান নির্ধারণ এবং শস্যোৎপাদনের ফলে মাটি তার কোন্ কোন্ উপাদান কতটা হারায়, আর কি ভাবে তা পূরণ করা যায়—এ-সব তথ্য বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে ধীরে ধীরে নির্ণীত হয়েছে। এভাবে কৃষি-রসায়নের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা হয় এবং অধিকতর শস্যোৎপাদনের জন্যে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপযোগী সার হিসাবে জমিতে বিভিন্ন অজৈব লবণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে মাটির উর্বরতা-শক্তি বাড়ে। অবশ্য বহুকাল আগে থেকেই মানুষ সাধারণ অভিজ্ঞতায় কৃষি-জমিতে গোবর ও পচা লতাপাতা প্রভৃতির **জৈব সার** প্রয়োগ করে ফল পেয়েছে। আবার প্রাকৃতিক বিধানে মেঘের তড়িৎস্ফুরণে উৎপন্ন নাইট্রোজেন-অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে এসে মাটির নাইট্রোজেনঘটিত অজৈব সারের অভাব আপনা থেকেই কিছুটা পূরণ করে, কিন্তু তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ও অনিশ্চিত। কাজেই অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্যে কৃষি-জমিতে কৃত্রিম **অজৈব সার** প্রয়োগ করবার প্রয়োজন এ যুগে একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই কৃষিকার্যে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রসায়ন-বিজ্ঞানের অবদান আজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্তৃত ও সফল কৃষিকার্যের জন্যে যে-সব অজৈব সার (উদ্ভিদের খাদ্যোপ-যোগী অজৈব রাসায়নিক লবণ) কৃষি-জমিতে প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন তাদের কোন-কোনটি প্রকৃতিতে আকরিক অবস্থায়ও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। কিন্তু এক দিকে যেমন এ-সব খনিজ লবণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং সর্বত্র সুলভও নয়, তেমন আবার এ-সব অজৈব যৌগিকগুলিতে নানা প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করে তুলতে হয়। এরূপ সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং অপেক্ষাকৃত সস্তায় প্রচুর পরিমাণে নূতন-নূতন কৃত্রিম সার উৎপাদনের প্রচেষ্টায় রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বের তুলনা নেই; মানব-কল্যাণে রসায়নের শ্রেষ্ঠ দানগুলির মধ্যে এটা আজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার কেবল যথেচ্ছ সার প্রয়োগ করলেই উদ্ভিদের সম্যক পুষ্টি বিধান ও অধিকতর শস্যোৎপাদন সম্ভব হয় না। কিরূপ মাটিতে কোন্ সার কতটা পরিমাণে প্রয়োগ করলে কোন্ উদ্ভিদ অধিকতর পুষ্টি লাভ করবে, উন্নত কৃষিকার্যের জন্যে তার সম্যক রাসায়নিক জ্ঞান ও বিচার-বোধ থাকাও একান্ত দরকার। মোট কথা, মাটির রাসায়নিক অবস্থা, স্থানীয় জলবায়ু, কোন্ উদ্ভিদের পক্ষে কোন্ কৃত্রিম সার কতটা প্রয়োগ

করা প্রয়োজন, এ-সব তথ্যের সম্যক জ্ঞান কৃষি-বিশারদদের থাকা সফল কৃষিকার্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও অধিকতর ফলনের জন্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে সুষম **কৃত্রিম সার** প্রয়োগ করা আবশ্যক সত্য, কিন্তু কৃষি-বিশারদদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ক্রমাগত কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে কৃষি-জমির মাটির স্বাভাবিক গঠন-বিন্যাসের অবনতি ঘটে, হিতে বিপরীত হয়ে তাতে মাটির শস্যোৎপাদন-শক্তি বরং হ্রাস পায়। তাই মাটির জৈব প্রকৃতি বজায় রাখবার জন্যে কৃষি-জমিতে মাঝে মাঝে উদ্ভিজ্জ জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। বস্তুতঃ অজৈব রাসায়নিক সারের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে পচা পাতা, পাঁক মাটি, উদ্ভিজ্জ আবর্জনা, গোবর প্রভৃতি **জৈব সার** প্রয়োগ করাও সমভাবে প্রয়োজন। জমিতে প্রয়োগের আগে এ-সব জৈব পদার্থকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় পচিয়ে নিতে হয়, যাতে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে তা উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী জৈব সারের অবস্থায় আসে ; একে বলা হয় **কম্পোস্ট সার**। নিম্ন জমিতে নদীর জলের পলি-মাটি পড়ে ও ফসলের পরিত্যক্ত খড়-পাতা পচে মাটির জৈব প্রকৃতি স্বভাবতঃই কিছুটা বজায় থাকে। কচুরীপানা, শ্যাওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ পচেও এ-কাজ কিছুটা হয়। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক তথ্য না জেনেও বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীরা জুম্-চাষ প্রভৃত পদ্ধতিতে গাছপালা পুড়িয়ে ও জলে পচিয়ে কতকটা এই কাজই করে থাকে। কৃষি-জমিতে বছর বছর শস্যোৎপাদনের ফলে মাটির জৈব প্রকৃতি বিপর্যস্ত হলে এবং কেবল কৃত্রিম রাসায়নিক সার দিয়ে তখন ফসল ফলাতে গেলে মাটির স্বাভাবিক গঠন-প্রকৃতি নষ্ট হয়ে জমি আরও অনুর্বর হয়ে ওঠে, আর ফসলের পরিমাণ ও পুষ্টি-গুণ হ্রাস পায়। এর ফলে আবার জমির ভূমি-ক্ষয় দেখা দেয়। এই অবস্থায় মাটিতে জল শোষে কম, আর বৃষ্টির জলে উপরকার মাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায়। জমির এরূপ সব গুরুতর পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জমিতে মাঝে-মাঝে জৈব সার প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ মাটির অবস্থা বুঝে কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষি-বিশারদদের বিশেষ জ্ঞান ও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, অধিক শস্য ফলাতে গিয়ে মাটিই কৃষিকার্যের অনুপযোগী হয়ে না পড়ে।

পটাস সার

যাহোক, এখন শস্যোৎপাদনে বিভিন্ন অজৈব সারের উপযোগিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। কৃষি-জমির মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে

পটাসিয়াম-লবণ থাকা কোন-কোন উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; কারণ, পটাসিয়াম-ঘটিত বিভিন্ন লবণ এক দিকে যেমন উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক, অপর পক্ষে তেমনি এদের প্রভাবে উদ্ভিদের পাতাগুলি সৌর শক্তির সাহায্যে অধিকতর পরিমাণে কার্বন-আত্তীকরণে সক্ষম হয়। এর ফলে উদ্ভিদ-দেহে শর্করা ও শ্বেতসার সহজে প্রস্তুত হয়ে থাকে। এজন্যে বিশেষতঃ আলু, কচু প্রভৃতি মূলজ ফসলে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত হয়ে তাদের মূলগুলি পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হয়। পটাস-সার দিলে আলু, কচু, মূলা প্রভৃতি মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ফসলগুলি যেমন ভাল হয়, তেমনি বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ, বিশেষতঃ কলাগাছ, আশ্চর্যজনকভাবে পরিপুষ্ট ও ফলবান হয়ে ওঠে।

গাছপালা পোড়ালে উদ্ভিদ-দেহের পটাসিয়াম সবটাই কার্বনেট যৌগের (K_2CO_3) আকারে ছাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। এই ছাইয়ে জল দিয়ে ঘাটালে লবণটা জলে দ্রবীভূত হয় : তাকে ছেঁকে নিয়ে পরিস্রুত দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে পাত্রে জলশূন্য কার্বনেট লবণটা পাওয়া যায়। এজন্যে পটাসিয়াম কার্বনেটকে কখন-কখন বলে পট-অ্যাশ (pot-ash)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গাছপালা পুড়িয়ে এভাবে প্রাপ্ত পটাসিয়াম কার্বনেটই প্রধানতঃ জমির পটাস-সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো ; আর এর বেশির ভাগই কানাডা থেকে বিভিন্ন দেশে আমদানী হতো। পরবর্তীকালে জমির সার হিসেবে প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম-ঘটিত লবণ সবটাই প্রাকৃতিক আকরিক ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত হতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ বহু আকরিক সঞ্চয় রয়েছে। এগুলির মধ্যে পটাসিয়াম-ক্লোরাইড (সিল্‌ভাইন), পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের যুগ্ম সাল্‌ফেট (কায়ানাইট), পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের যুগ্ম ক্লোরাইড (কার্নেলাইট) প্রভৃতি প্রধান। এ-সব অবিশুদ্ধ স্বাভাবিক লবণগুলিকেই **পটাস-সার** হিসেবে কৃষি-জমিতে দেওয়া যায় ;

মূলজ ফসলের বৃদ্ধিতে পটাস সারের উপযোগিতা

আবার এ-সব খনিজ-সঞ্চয় থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ পটাসিয়াম-লবণ নিষ্কাশিত করে সার হিসেবে ও ব্যবহৃত হয়। কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্যে পটাসিয়াম-লবণগুলি কিভাবে অধিকতর কার্যকরী সাররূপে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানী সুদীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। এ কাজে প্রখ্যাত ডাচ্‌ বিজ্ঞানী ভ্যাণ্ট হফের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও আজকাল বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে আব্‌ বা অভ্র জাতীয় আকরিক থেকে পটাস সার উৎপাদনের চেষ্টা অনেকটা সফল হয়েছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ দিনের বহু শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে সামুদ্রিক লবণাক্ত জল থেকেও বিভিন্ন পটাসিয়াম-লবণ নিষ্কাশিত করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এভাবে মধ্যপ্রাচ্যের ডেড্‌-সি ও ক্যালিফোর্নিয়ার সার্লেস হ্রদের লবণাক্ত জল থেকে পটাসিয়াম-লবণ প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা হচ্ছে। আমেরিকার টেক্সাস, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলে ও রাশিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন পটাসিয়াম যৌগের প্রাকৃতিক আকরিক ভাণ্ডার রয়েছে। প্রাচ্য দেশগুলিতে, বিশেষতঃ ভারতে প্রাকৃতিক পটাসিয়াম যৌগের আকর তেমন নেই; কাজেই এর অভাব অন্যান্য কৃত্রিম সার দিয়ে পূরণ করা ব্যতীত উপায় নেই। আজকাল অবশ্য ভবনগরের লবণ-গবেষণাগারে সমুদ্র-জলের পটাসিয়াম উদ্ধার করবার চেষ্টা অনেকটা এগিয়েছে। যাহোক, কৃষি-জমিতে বিশেষতঃ কন্দ জাতীয় শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে পটাস সারের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বহুবিধ কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক পটাসিয়াম-সার কৃষিকার্যে প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়ে অধিকতর ফল-শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টা বহু দেশেই সফল হয়েছে।

ফস্‌ফেট সার

কৃষি-রসায়ন বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কৃষিকার্যে ফস্‌ফেট লবণের উপযোগিতার কথা ধীরে ধীরে জানা গেছে। জমিতে ফস্‌ফেট-ঘটিত সার প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ বিশেষভাবে সতেজ ও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে; আর ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে কৃষি-কার্যে বিভিন্ন ফস্‌ফেট-সারের উপযোগিতার নানা তথ্য মানুষ জেনেছে। যে সব দেশে বৃষ্টিপাত কম, প্রধানতঃ সেচের

সাহায্যেই কৃষিকাজ চলে সে-সব অঞ্চলে ফস্‌ফেট সার বিশেষ উপযোগী। একদিকে যেমন এতে উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি বাড়ে, অধিকতর শস্য ফলে, অপর পক্ষে আবার ফল-শস্য তাড়াতাড়ি পুষ্ট হয় ও পাকে। ফস্‌ফেট সার প্রয়োগে শুষ্ক ও অনুর্বর জমিতে ঘাস-জাতীয় তৃণশস্যও অতি দ্রুত বেড়ে যায়, তাই পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্যেও এর উপযোগিতা সমধিক। কৃষি-রসায়নের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন ফস্‌ফেট সারের কার্যকারিতা ও প্রয়োগ-প্রণালীর অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে।

জীব-জন্তুর হাড়ে ফস্‌ফেট যৌগিক প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। বস্তুতঃ প্রাণীদের অস্থি-ভস্ম হলো প্রধানতঃ **ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট**, ফস্‌ফরাসের ক্যালসিয়াম যৌগিক। কৃষিকার্যে ফস্‌ফেট বা ফস্‌ফরাসের উপযোগিতা ও জীবজন্তুর হাড়ে তার আধিক্যের কথা জেনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কৃষিবিদেরা জমিতে প্রধানতঃ হাড়ের গুঁড়াই মেশাতো। এর ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বেড়ে শস্যাদির ফলন অনেকটা বাড়তো বটে, কিন্তু হাড়ের গুঁড়া থেকে উদ্ভিদেরা তাদের দেহ গঠন ও শস্যোৎপাদনের উপাদান হিসেবে প্রয়োজনীয় সবটা ফস্‌ফরাস গ্রহণ করতে পারতো না, তার অনেকটা অপচয় হতো। হাড়ে রয়েছে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট যৌগিক, যা থেকে সম্যক ফস্‌ফেট জলে সহজে দ্রবীভূত হয় না এবং তাই উদ্ভিদেরাও তা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। তারপর 1850 খৃষ্টাব্দে জন বেনেট নামক জনৈক ইংরেজ কৃষি-রাসায়নিক দেখান যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জান্তব হাড়ের ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটকে এমন অবস্থায় আনা যায় যাতে মাটির জলে তা সহজে দ্রবীভূত হবে, আর তা উদ্ভিদেরা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। এর জন্যে তিনি অস্থি-চূর্ণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটান, যাতে হাড়ের ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, $Ca_3(PO_4)_2$, রূপান্তরিত হয়ে ক্যালসিয়ামের হাইড্রোজেন-ফস্‌ফেট, বা অ্যাসিড-ফস্‌ফেট, $CaH_4(PO_4)_2$, উৎপন্ন হয় এবং একই সঙ্গে পাওয়া যায় জলের অণুযুক্ত (হাইড্রেটেড) স্ফটিকাকার ক্যালসিয়াম সালফেট যৌগিক $CaSO_4.2HO_2$, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'জিপ্‌সাম'।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারগুলির মধ্যে আজকাল **ফস্‌ফেট সার** বলতে সাধারণতঃ এই 'ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন-ফস্‌ফেট' বুঝায়। এটা আর্দ্র মাটিতে সহজে গলে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী হয়; আবার উল্লিখিত জিপ্‌সাম বা

ক্যালসিয়াম-সালফেটও সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এই দু'রকম ক্যালসিয়াম লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে যে রাসায়নিক সার তৈরি হয় তাকে বলে **সুপার-ফস্‌ফেট সার**। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এই ফস্‌ফেট ও সুপার-ফস্‌ফেট সার জীবজন্তুর হাড় থেকেই উৎপাদিত হতো। তারপর বিভিন্ন দেশে এক শ্রেণীর খনিজ প্রস্তরের সন্ধান মেলে, যার মধ্যে খনিজ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট রয়েছে। এই ফস্‌ফেট-প্রস্তরকে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে বিক্রিয়া ঘটিয়ে পরবর্তীকালে ফস্‌ফেট ও সুপার ফস্‌ফেট সার উৎপাদিত হতে থাকে। এই প্রাকৃতিক ফস্‌ফেট প্রস্তরের বিশাল খনিজ সম্পদ রয়েছে উত্তর আফ্রিকা ও আমেরিকায়। পৃথিবীর খনিজ ফস্‌ফেট সারের চাহিদা এই দুই দেশ থেকেই অধিকাংশ মেটে। অবশ্য সার হিসেবে হাড়ের গুঁড়া এবং তা থেকে উৎপাদিত ফস্‌ফেট ও সুপার-ফস্‌ফেট সারের ব্যবহারও যথেষ্ট চলছে।

কৃষিকার্যে ফসফেট সারের চাহিদা মেটাতে লৌহ নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধিকরণ পদ্ধতির এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় উপজাত **'বেসিক স্ল্যাগ'** নামক ধাতুমলের ব্যবহারও আজকাল সমধিক প্রচলিত। বিভিন্ন লৌহ-খনিজে যুক্ত প্রাকৃতিক ফস্‌ফরাস লৌহ-নিষ্কাশনের বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজে সংযুক্ত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের সংযোগে ফসফেট যৌগিকে রূপান্তরিত হয় এবং তা-ই জমির সারের কাজ করে। এ-বিষয় আমরা 'ধাতু ও ধাতু-সংকর' শীর্ষক অধ্যায়ে লৌহ-নিষ্কাশন সম্পর্কে যথোচিত আলোচনা করবো।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট আজকাল একটি উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটা কৃষিজমিতে সুপার-ফস্‌ফেট সারের চেয়েও অধিকতর কার্যকরী ; কারণ, এর থেকে উদ্ভিদেরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসেবে ফস্‌ফরাসের সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেনও পায়। কৃষি-রসায়নে তাই এটি মিশ্র সারের পর্যায়ভুক্ত। অতি উচ্চ তাপে জলীয় বাষ্পের মধ্যে ফস্‌ফরাস্ উত্তপ্ত করলে ফস্‌ফরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, আর জলীয় বাষ্পের থেকে হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয়ে যায়। এই হাইড্রোজেন নিয়ে বায়ুর নাইট্রোজেনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপাদন করা যেতে পারে। গবেষণার দিক থেকে এই সংশ্লেষণ পদ্ধতি রসায়নের এক গুরুত্বপুর্ণ কৃতিত্ব ; কিন্তু শিল্প হিসাবে তেমন লাভজনক নয়। যাহোক, পুর্বোক্ত উপায়ে উৎপন্ন ফস্‌ফরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এই সংশ্লেষিত অ্যামোনিয়ার রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে **অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট** যৌগিক ; যাকে

সাধারণতঃ বলা হয় 'ডাই-অ্যামন-ফস'। এই রাসায়নিক পদার্থটা উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও অধিকতর শস্যোৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সার; কারণ এটাতে ফসফেট-সার ও নাইট্রোজেন-সার উভয়ই বর্তমান।

নাইট্রোজেন সার

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যে সব অজৈব উপাদানের প্রয়োজন তাদের মধ্যে নাইট্রোজেনই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু বায়ুতে যে অফুরন্ত নাইট্রোজেন রয়েছে উদ্ভিদেরা তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। তাই উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ সার হিসেবে মাটিতে থাকা বা দেওয়া দরকার, যা থেকে উদ্ভিদেরা শিকড়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ কৃষিকার্যে যে সব কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে সেই সব সারই উৎকৃষ্ট যেগুলি থেকে উদ্ভিদেরা যথোপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন পায়। বিশেষতঃ গম, যব, ধান প্রভৃতি শস্যের ফলন নাইট্রোজেন-সারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়; তবে এই সারের পক্ষে জমিতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা জল-সেচের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যে সব দেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপ 20

বীজ-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন-সারের উপযোগিতা
(1 নং বিনা সারে, 2 নং বিঘাপ্রতি 200 পাঃ, 3 নং 400 পাঃ
এবং 4 নং বিঘাপ্রতি 600 পাঃ নাইট্রোজেন-সার দিলে)

ইঞ্চির কম সেখানকার জমিতে নাইট্রোজেন-সারে ফলন তেমন বাড়ে না; এরূপ ক্ষেত্রে ফস্‌ফেট-সারই অধিকতর উপযোগী। অবশ্য বৃষ্টিপাত বা জল-সেচের

প্রয়োজন কম-বেশি কৃষিকার্যের সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য; যে কোন সারই দেওয়া যাক্ না কেন, উপযুক্ত পরিমাণে জল না পেলে উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হয় না। যদিও উদ্ভিদেরা বায়ু থেকে নাইট্রাজেন গ্যাস সরাসরি টেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারে না, যার জন্যে নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে থাকা চাই; তথাপি এরূপ জানা গেছে যে, সিম, কলাই, বরবটি শ্রেণীর কোন কোন উদ্ভিদ বিশেষ এক শ্রেণীর জীবাণুর (নডিউল ব্যাক্টেরিয়া) প্রভাবে শিকড়ের গায়ে গুঁটির আকারে নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ কিছু কিছু তৈরি করে রাখে, এবং তা অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রোজেন-সারের কাজ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-সার হিসেবে নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন খনিজ যৌগের প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের উপরেই মানুষ নির্ভর করেছে, এবং তা তৎকালীন প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্টই ছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক সঞ্চয় ক্রমে ফুরিয়ে আসে। কাজেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর শস্যোৎপাদনের জন্যে নাইট্রোজেন-সারের অভাব দেখা দেয়। কৃষি-রাসায়নিকরা এই সমস্যা সমাধানের জন্যে তৎপর হলেও প্রথম দিকে বিশেষ কোন ফল হয় না; কারণ, প্রকৃতিতে গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও তার সঙ্গে অন্য কোন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলন ঘটানো তৎকালে দুঃসাধ্য ছিল। সাধারণ বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা একাজে প্রবল বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স তাই 1898 খৃষ্টাব্দে এরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, 'কৃত্রিম নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন-সার নিঃশেষ হতে চলেছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পাশ্চাত্যের প্রধান খাদ্য-শস্য গমের উৎপাদন বাড়াতে কৃত্রিম উপায়ে নাইট্রোজেন-সার উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন।' এই সতর্ক-বাণীর ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে রাসায়নিক সংবন্ধন প্রক্রিয়ায় (fixation of nitrogen) হাইড্রোজেনের সঙ্গে সংযোজিত করে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। মানব-কল্যাণে রাসায়নিক তৎপরতার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কৃষি-জমির নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও প্রাণীদের মল-মূত্র সহ দেহাবশেষের আবর্জনা ব্যবহার করলে অনেকটা কাজ হয় সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ-সব পদার্থ সামান্যই পাওয়া যায়।

পূর্বে কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন মেটাতে প্রধানতঃ সোডিয়াম নাইট্রেট (চিলি সল্টপিটার) এবং কয়লার অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত অ্যামোনিয়া ব্যবহৃত হতো। এই অ্যামোনিয়াকে সাল্ফেট যৌগিকের (অ্যামোনিয়াম সাল্ফেট) আকারে জমিতে সার হিসেবে প্রয়োগ করা হতো। নাইট্রোজেন-যৌগিকের এই দুই প্রাকৃতিক সঞ্চয় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়ে নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন মেটাচ্ছিল; কিন্তু চিলি সল্টপিটারের অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। কেবল সার হিসেবেই তার প্রাকৃতিক সঞ্চয় নিঃশেষ হতে চলেছিল। আবার সমস্ত খনিজ কয়লা অ্যামোনিয়া সংগ্রহের জন্যে পাতিত করাও চলে না; কাজেই দেখা গেল, এভাবে প্রয়োজনানুযায়ী ক্রমবর্ধমান নাইট্রোজেন-সারের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর নয়। এই অবস্থায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উইলিয়াম ক্রুক্স প্রমুখ ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা নাইট্রোজেন-যৌগের প্রাকৃতিক সঞ্চয়ের উপর নির্ভর না করে কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন-সার উৎপাদনের নূতন ও কৃত্রিম উপায় উদ্ভাবনের জন্যে রাসায়নিক সমাজের নিকট উল্লিখিত আবেদন জানান এবং ভবিষ্যতে নাইট্রোজেন-সারের অভাবে পৃথিবীতে ঘোর খাদ্য-সংকটের আশঙ্কার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

এই সম্ভাব্য সংকট মোচনের জন্যে নাইট্রোজেন-যৌগিক উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কারের বিশেষ তাগিদ রসায়ন-বিজ্ঞানীদের উপরে এসে পড়ে। এমন উপায় আবিষ্কার করতে হবে যাতে বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত নাইট্রোজেনকে রাসায়নিক যৌগে সংবদ্ধ করা যায় এবং তা উদ্ভিদেরা সহজে আত্মসাৎ করে নাইট্রোজেন-সারের অভাব মেটাতে পারে। বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের এরূপ সংবন্ধন-পদ্ধতির আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক আবিষ্কারগুলির অন্যতম; আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এর জন্যে একাধিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। 1915 খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় যে, বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের সঙ্গে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন-যৌগিক কৃষি-জমির সার হিসেবে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এভাবে নাইট্রোজেন-সারের অফুরন্ত ভাণ্ডার মানুষের করায়ত্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন শস্য, বিশেষতঃ গমের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় হয়ে পৃথিবীতে খাদ্য-সংকটের আশংকা আপাততঃ দূর হয়েছে। এখন নাইট্রোজেন-সংবন্ধনের এই উপায়গুলির কথা কিছু বলছি।

(ক) অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ

'বায়ুর উপাদান ও তথ্যাদি' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা আগেই বলেছি, 1785 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিস তড়িৎ-স্ফুরণের প্রভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে বায়ুতে বিরল গ্যাসের সন্ধান দিয়েছিলেন, যদিও তিনি তার তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। বিশাল বায়ুরাশির চার-পঞ্চমাংশই নাইট্রোজেন এবং এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন। বায়ুর এই দু'টি মুখ্য গ্যাসের মিলন ঘটাবার কোন বাস্তব শিল্প-প্রচেষ্টা ক্যাভেণ্ডিসের পরে শতাধিক বছরের মধ্যেও সফল হয় নি। ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা এই প্রক্রিয়ার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছিল মাত্র।

বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন সাধনের বিরাটাকার শিল্প-প্রচেষ্টা প্রথম সফল করেন বার্কল্যাণ্ড ও আইড নামক দু'জন নরওয়েবাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী। 1903 খৃষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের শিল্প-উৎপাদন স্বরু করেন; এঁদের নামানুসারে তাই এই পদ্ধতিটি 'বার্কল্যাণ্ড-আইড পদ্ধতি' নামে খ্যাত। বায়ুর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ সাধনের জন্যে যে অত্যুচ্চ তাপ সৃষ্টির প্রয়োজন তার জন্যে বিজ্ঞানীদ্বয় 'ইলেক্ট্রিক আর্ক' অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক তাপ-চক্র' ব্যবহার করেন। একমাত্র এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই নাইট্রোজেন ও
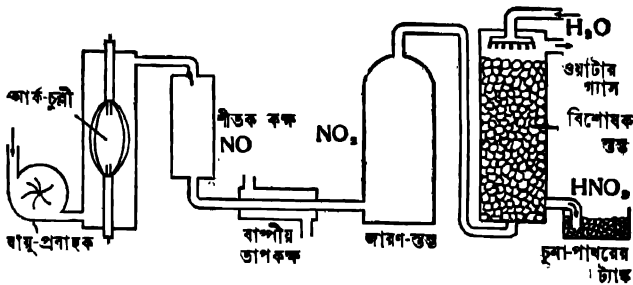
বায়ু থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে 'বার্কল্যাণ্ড-আইড' পদ্ধতির যান্ত্রিক নক্সা

অক্সিজেনের সংযোগ সাধনের উপযোগী (2500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত) তাপমাত্রা স্বল্পব্যয়ে ও স্থিরভাবে পাওয়া সম্ভব। উপযুক্ত ব্যবস্থায় ইলেক্ট্রিক আর্কের এই উচ্চ তাপ-প্রভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন

অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে (অর্থাৎ নাইট্রোজেনের দহনে) তার অক্সাইড উৎপন্ন করে, যাকে বলে নাইট্রিক-অক্সাইড (NO)। এই নাইট্রিক-অক্সাইড গ্যাসকে ঠাণ্ডা করে তার সঙ্গে আবার বায়ু মিশিয়ে অ্যাসিড-রোধক প্রস্তরে ভরতি বিশোষক স্তম্ভে চালনা করা হয়। নাইট্রিক অক্সাইড (বা নাইট্রোজেন-মনক্সাইড) ঐ স্তম্ভের মধ্যে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিশ্রিত বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাদামী রঙের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড (NO_2) যৌগিকে পরিণত হয়। বিশোষক-স্তম্ভের মধ্যে এই গ্যাসীয় পদার্থ টার উপরে উপযুক্ত ব্যবস্থায় জল সিঞ্চন করলে উৎপন্ন হয় **নাইট্রিক অ্যাসিড ;** উপজাত পদার্থ হিসেবে পাওয়া যায় **ওয়াটার গ্যাস।** তীব্র জারক ও তরল এই অ্যাসিডটাকে স্থানান্তরে প্রেরণের সুবিধার জন্যে চুনা-পাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে তার বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রশমিত করা হয়: এর ফলে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম নাইট্রেট লবণ। একে **'নাইট্রেট অব লাইম'** বা নাইট্রো-লাইমও বলা হয়। এই পদার্থ টা কৃষি-জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী উৎকৃষ্ট নাইট্রোজেন-সারের কাজ করে। নরওয়েতে প্রথম প্রস্তুত হয় বলে এই ক্যালসিয়াম-নাইট্রেট সারকে এক সময় বলা হতো 'নরওয়েজিয়ান সল্টপিটার'; যেমন চিলির খনিজ সোডিয়াম-নাইট্রেটকে বলা হয় চিলি সল্টপিটার।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং তা থেকে ক্যালসিয়াম-নাইট্রেট উৎপাদন করা নরওয়েতেই ছিল সুবিধাজনক ; কারণ ওদেশে সুলভ জল-শক্তির সাহায্যে এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক আর্ক সৃষ্টির জন্যে সস্তায় প্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল। কৃষিকার্যে ব্যবহারোপযোগী নাইট্রোজেন-সার উৎপাদনের জন্যে বার্কল্যাণ্ড-আইড পদ্ধতিতে নাইট্রেট প্রস্তুতি তাই ওদেশে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ণোদ্যমে চলেছিল, এবং ক্রমে অন্যান্য দেশেও এর প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু পরে রসায়ন-শিল্পের আরও অগ্রগতির ফলে নাইট্রোজেন-যৌগিক উৎপাদনের আর একটা উন্নততর ও সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় 'বার্কল্যাণ্ড আইড পদ্ধতি' ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। আজকাল এই পদ্ধতির আর প্রচলনই নেই। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সরাসরি মিলনে **অ্যামোনিয়া (NH_3)** উৎপাদনের সহজতর সংশ্লেষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়ে ক্রমে নাইট্রোজেন সার হিসেবে নাইট্রেট-লবণের বদলে অ্যামোনিয়াম-লবণের ব্যবহার সুরু হয়।

অপেক্ষাকৃত অল্প তড়িৎ-শক্তি ব্যয়ে জল বিশ্লিষ্ট করে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন, আর সেই হাইড্রোজেনের সঙ্গে বায়ুর নাইট্রোজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে সহজে ও সস্তায় অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির উপায় 1912 খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবিত হয়।

অ্যামোনিয়ার এই সংশ্লেষণ-পদ্ধতি আলোচনার আগে নাইট্রোজেন-সার হিসেবে ব্যবহৃত বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের সংবন্ধনে প্রস্তুত আর একটা যৌগিকের কথা বলা প্রয়োজন।

(খ) নাইট্রোজেন-সংবদ্ধ কার্বাইড

ক্যালসিয়াম-কার্বাইড নামক যৌগিকের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়, আর এই দাহ্য গ্যাসটা জ্বালালে উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যায়। এই 'কার্বাইড-লাইট' বহুল প্রচলিত বলে ক্যালসিয়াম-কার্বাইড প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়ে থাকে। বিশেষ ব্যবস্থায় উত্তপ্ত চুনা পাথরের (ক্যালসিয়াম কার্বনেটের) সঙ্গে কয়লার বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বাইড উৎপন্ন হয়। এই ক্যালসিয়াম-কার্বাইডের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে নাইট্রোজেন-সার হিসেবে ব্যবহারোপযোগী একটা যৌগিক পদার্থ উৎপাদনের রাসায়নিক পদ্ধতি 1906 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিরাটাকার বক-যন্ত্রে উত্তপ্ত ক্যালসিয়াম-কার্বাইডের উপরে নাইট্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে উভয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে **ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড** নামক একটা যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্বাইড থেকে বিমুক্ত কিছু পরিমাণ কার্বন তার সঙ্গে মিলে বকযন্ত্রে গাঢ় ধূসর বর্ণের একটা মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে। এই মিশ্রণের প্রায় শতকরা 60 ভাগ ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড, আর বাকীটা কার্বন বা কয়লা। এই মিশ্রণটা সাধারণতঃ **নাইট্রোলাইম** বা 'লাইম-নাইট্রোজেন' নামে বাজারে বিক্রয় হয়, বস্তুতঃ এটা কয়লা মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম-সায়েন্যামাইড।

ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড যৌগিকের নানারকম ব্যবহার আছে; তার মধ্যে কৃষি-জমিতে নাইট্রোজেন-সার হিসেবে জিনিসটার ব্যবহারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ বিবেচনা ও দক্ষতার সঙ্গে কৃষিজমিতে প্রয়োগ করলে ক্যালসিয়াম-সায়েন্যামাইড ধান, গম, যব প্রভৃতি বিভিন্ন ফসলের পক্ষে প্রায় অ্যামোনিয়াম-সারের মতই কাজ করে মাটির উর্বরতা-শক্তি বাড়ায়। কিন্তু ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইডের অবিশুদ্ধ মিশ্রণটা কিছুটা নোংরা ও ধূলোর মত

বলে সার হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে তেমন জনপ্রিয় হয় নি। এর অধিকাংশই অ্যামোনিয়াম লবণে রূপান্তরিত করে অ্যামোনিয়াম-সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই রাসায়নিক রূপান্তর-প্রক্রিয়াও সহজসাধ্য; ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইডের উপরে অত্যুত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়, আর তাকে কোন লবণের আকারে নিয়ে ব্যবহার করা যায়।

(গ) অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ পদ্ধতি

নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপাদনের কোন সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করবার জন্যে রাসায়নিকদের বহু শ্রমসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস দু'টা পরস্পরের প্রতি নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন; কেবল মাত্র ওদের মিশ্রণের মধ্যে তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটালে তার অত্যুচ্চ তাপে গ্যাস দু'টার কিছুটা সংযোগ ঘটে ও সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। উৎপন্ন এই অ্যামোনিয়া গ্যাস তড়িৎ-স্ফুরণের ফলে আবার আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পৃথক হয়ে পড়ে। এ থেকে বুঝা যায়, তড়িৎ-স্ফুরণে গ্যাস দু'টার সংযোজন ও বিয়োজন উভয়ই হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়াটা দ্বি-মুখী। কাজেই এদের সরাসরি সংযোগে অ্যামোনিয়া উৎপাদনে আংশিক সাফল্য মাত্র সম্ভব; অ্যামোনিয়ার শিল্প-উৎপাদন এভাবে সম্ভব নয়। দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রথম দিকে এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তথাপি কিন্তু অ্যামোনিয়ার কোন কার্যকরী সংশ্লেষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে তাঁদের তৎপরতা থেকে বিরত হন নি। সহজে ও সস্তায় প্রচুর পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপাদন করা একান্ত প্রয়োজন। রাসায়নিক শিল্পে অ্যামোনিয়ার বহুবিধ ব্যবহার তো আছেই, বিশেষতঃ কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-সারের অভাব মেটাবার জন্যেও অ্যামোনিয়াম-লবণের প্রভূত প্রয়োজন রয়েছে। নাইট্রোজেন-সার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে নাইট্রেট ও সায়েন্যামাইড লবণ উৎপাদনের জন্যে পূর্বোক্ত রাসায়নিক পদ্ধতি দু'টি যতই কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, উভয় পদ্ধতিই তড়িৎশক্তির উপরে নির্ভরশীল; আর এই নির্ভরতার জন্যে এ-সব পদ্ধতি সর্বত্র সুবিধাজনক ও সহজসাধ্য হয় না। খাদ্য-শস্যের উৎপাদনে নাইট্রোজেন-সারের ক্রমবর্ধমান বিপুল চাহিদা মেটাতে আরও সহজসাধ্য পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া

উৎপাদন করবার প্রচেষ্টা অবশেষে 1912 খৃষ্টাব্দে সফল হয়। অ্যামোনিয়ার এই সংশ্লেষণ পদ্ধতি রসায়ন-শিল্পের ক্ষেত্রে এক কৃতিত্বপুর্ণ সাফল্য বলে বিবেচিত হয়।

এ-কথা অবশ্য আগেই জানা ছিল যে, তড়িৎ-স্ফুরণের উচ্চ তাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সরাসরি মিলনে গ্যাসীয় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়; কিন্তু তাতে গ্যাস দু'টার পরিমাণের তুলনায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার পরিমাণ পাওয়া যায় অতি সামান্য। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, গ্যাসীয় পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাধারণ নিয়মে অত্যধিক চাপিত অবস্থায় নাইট্রোজন ও হাইড্রোজেন মিশ্রণের যদি মিলন ঘটানো যায় তাহলে অ্যামোনিয়ার আনুপাতিক পরিমাণ বাড়ে, অধিকতর অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে আর একটা অন্তরায় হলো, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিলনে তাপের উদ্ভব হয়; কারণ, এই রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়াটা তাপোদ্গারী (exothermic)। পক্ষান্তরে আবার অধিক উত্তপ্ত অবস্থায় গ্যাস দু'টার মিলনে বাধা পড়ে, কাজেই যথেষ্ট অ্যামোনিয়া পেতে হলে তাপ কম রাখা চাই। পরীক্ষায় দেখা গেল, গ্যাসীয় মিশ্রণের চাপ বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ চাপের 100 গুণ করলে 800° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে শতকরা যতটা অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়, তাপ 500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হলে উৎপন্ন অ্যামোনিয়ার পরিমাণ দশ গুণ বেড়ে যায়। মোট কথা, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সরাসরি রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের বিরাটাকার শিল্প-পদ্ধতিতে গ্যাস দু'টাকে বিশেষ উচ্চ চাপে রাখতে হবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাপ যথাসম্ভব কম রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের পক্ষে সময়ের প্রশ্নও বিচার করতে হয়েছিল। মোটামুটি 500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে ও উপযুক্ত চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সরাসরি মিলনে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু এই রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া এত ধীরগতি ও সময়সাপেক্ষ যে, তাতে অ্যামোনিয়ার শিল্প-উৎপাদন লাভজনক হয় না। প্রকৃতপক্ষে রসায়নাগারের পরীক্ষায় কোন পদ্ধতির সাফল্য, আর কারখানায় ব্যাপকভাবে শিল্প-উৎপাদনের সাফল্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। কম সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব না হলে শিল্প-প্রচেষ্টা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্রুততা সম্পাদন শিল্প-উৎপাদনের এক গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে উপযুক্ত অনুঘটকের (catalyst) সন্ধানে বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শেষে জানা যায়, অসমিয়াম, ইউরেনিয়াম, লৌহ প্রভৃতি কয়েকটা

বদলে ক্যালসিয়াম-সালফেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া ঘটানো হয়। জিপ্‌সাম নামক খনিজ ক্যালসিয়াম-সালফেটের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পর্যাপ্ত জল দিয়ে আবদ্ধ পাত্রে রক্ষিত সেই জলীয় মিশ্রণের মধ্যে অ্যামোনিয়া ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করা হয় এবং পদার্থগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম-সালফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$CaSO_4+H_2O+2NH_3+CO_2=CaCO_3+(NH_4)_2SO_4$$

(অ্যামোনিয়াম সালফেট)

এই **অ্যামোনিয়াম সালফেট** এককভাবে জমির কৃত্রিম সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আবার উক্ত বিক্রিয়ায় উপজাত ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়ও এর ব্যবহার আছে। কখন কখন অ্যামোনিয়াকে নাইট্রেট লবণে রূপান্তরিত করে ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের সহযোগেও রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাকে বলা হয় **নাইট্রো-চক**। এই সার ব্যবহারে কৃষি-জমির মাটি অধিকতর নাইট্রোজেনের সঙ্গে সঙ্গে আবার কিছু চুন বা ক্যালসিয়াম-অক্সাইডও পায়।

রসায়ন-বিজ্ঞানের বাহাদুরির শেষ নেই। উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের আনুষঙ্গিক হিসেবে যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট উপজাত হয় তাকে সিমেন্টের উৎপাদন-শিল্পে কোন কোন দেশে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও এ-সি-সি প্রভৃতি কোন কোন সিমেন্ট কারখানায় এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। যাহোক, রসায়ন-শিল্পে কোন পদার্থেরই অপচয় বা অপব্যয়ের পথ নেই ; উপজাত পদার্থ-মাত্রকেই রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন। অ্যামো-নিয়ার সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন আহরিত হয় বায়ু থেকে ; আর সস্তায় হাইড্রোজেন সংগৃহীত হয় ওয়াটার-গ্যাসের (গ্যাসীয় জ্বালানী) বিক্রিয়ায়। প্রায় 500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত ওয়াটার-গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণকে লৌহ-অক্সাইডের (অনুঘটক) উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যামোনিয়ার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়; আর কার্বন-ডাইঅক্সাইড (বিনা ব্যয়ে উপজাত) গ্যাসকে পূর্বোল্লিখিত বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম-সালফেট সার উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পোৎপাদনে ওয়াটার-

গ্যাসের বহু মূল্যবান বিক্রিয়ার কথা আমরা 'বিভিন্ন জ্বালানী : তাপ ও আলোক' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

রাসায়নিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, নাইট্রোজেন-বহুল অ্যামোনিয়াম সার হিসেবে জৈব রাসায়নিক পদার্থ ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] কৃষি-জমিতে একটি উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। প্রাণী-দেহের আভ্যন্তরীণ জৈব বিক্রিয়ায় পদার্থটা উৎপন্ন হয় এবং জীব-জন্তুর মূত্রের সঙ্গে নির্গত হয়; এ-কথা আগে থেকেই রাসায়নিকদের জানা ছিল। আর জীব-জন্তুর মল-মূত্রে মাটির উর্বরতা বাড়ে, এ-কথাও কিছু নূতন নয়; কিন্তু জমির নাইট্রোজেন-সার হিসেবে ইউরিয়ার কার্যকারিতা বিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে সবিশেষ জানা গেছে। কেবল সার হিসেবেই নয়, ইউরিয়া আধুনিক প্লাস্টিক শিল্পেরও একটি প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ; এ বিষয় আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো। যাহোক, রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম ইউরিয়াও শিল্পগতভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন কতকাংশে মিটিয়েছে। অ্যামোনিয়া ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সরাসরি সংযোগে কৃত্রিম **ইউরিয়া** উৎপাদিত হয়। সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের প্রায় 70 গুণ অধিক চাপে চাপিত অবস্থায় এবং মোটামুটি 150° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপাংকে উত্তপ্ত এই গ্যাসীয় মিশ্রণকে উপযুক্ত অনুঘটকের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে গ্যাস দু'টার পারস্পরিক বিক্রিয়ায় ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$CO_2 + 2\,NH_3 = [CO(NH_2)]_2 + H_2O$$

মানব-কল্যাণে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেনের সংবন্ধন-পদ্ধতির এরূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে যথেচ্ছ পরিমাণে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া প্রভৃতি উৎপাদন করে রাসায়নিকরা অশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন।

কৃত্রিম সার হিসেবে অন্যান্য উপাদান

উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন ও কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে পটাসিয়াম, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন-ঘটিত বিভিন্ন কৃত্রিম রাসায়নিক সারের উপযোগিতা ও উৎপাদন সম্পর্কে আমরা এখানে সামান্য কিছু আলোচনা করেছি মাত্র। উল্লিখিত তিনটি মৌলিক উপাদান ব্যতীত আরও যে-সব পদার্থ অধিকতর শস্যোৎপাদনের জন্যে মাটিতে থাকা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে ক্যালসিয়াম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষি-জমিতে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করতে প্রধানতঃ চুনা-পাথর ও খড়িমাটির আকারে

ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা কলি-চুন (স্লেক্‌ড লাইম) রূপে ক্যালসিয়াম হাই-ড্রক্সাইড প্রয়োগ করা হয়। ক্যালসিয়াম-সার হিসেবে মাটিতে কিছু পরিমাণ চুন প্রয়োগ করা নানাভাবে হিতকর ; প্রথমতঃ এর কার্যকারিতায় মাটির অম্লতা-দোষ (অ্যাসিডিটি) দূর হয়। মাটি অতিরিক্ত অ্যাসিড-ভাবাপন্ন হলে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, তথা শস্যোৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। তারপর আবার চুনজাতীয় ক্যালসিয়াম-লবণের একটা বিশেষ গুণ হলো এই যে, এর প্রভাবে মাটি তেমন জমাট বাঁধতে পারে না। ফলে উদ্ভিদেরা তাদের মূলদেশে কিছুটা বায়ু পায়। ক্যালসিয়াম-লবণের আর একটা সার্থকতা হলো, এর ব্যবহারে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদানগুলি দ্রবিত অবস্থায় মাটিতে এমনভাবে থাকে যাতে উদ্ভিদেরা শিকড়ের মাধ্যমে সহজেই সেগুলি শোষণ করে নিতে পারে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ক্যালসিয়ামের এ-সব উপযোগিতা কিন্তু তার সমগোত্রীয় ম্যাগ্নেসিয়ামের নেই ; যদিও মাটিতে সামান্য কিছু ম্যাগ্নেসিয়াম থাকাও প্রয়োজন। উদ্ভিদের কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় যে সবুজ-কণিকা, বা **ক্লোরোফিল** উদ্ভিদ-পত্রে থাকে তার একটা আবশ্যকীয় উপাদান হলো ম্যাগ্নেসিয়াম। কাজেই কৃষি-জমিতে যথোপযুক্ত পরিমাণে ম্যাগ্নেসিয়াম-লবণও থাকা চাই ; যদি না থাকে, তাহলে দেওয়া দরকার।

উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যে-সব অজৈব মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন লবণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলো সেগুলি উপযুক্ত পরিমাণে ও উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগীভাবে কৃষি-জমিতে সরবরাহ করতে হবে ; আর তাহলেই প্রয়োজনীয় খাদ্য পেয়ে উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হবে এবং অধিকতর ফল-শস্য দেবে। কিন্তু কৃষি-রসায়নের উন্নততর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, উদ্ভিদের সম্যক পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে মাটিতে আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকা দরকার। এ-গুলির প্রয়োজন অবশ্য নামমাত্র, অতি সামান্য। কিন্তু উদ্ভিদের প্রয়োজন হিসেবে এ-গুলির কার্যকারিতা দেখে মনে হয়, এরা উদ্ভিদ-দেহের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের মত কাজ করে এবং জীব-দেহে **হর্মোন** বা জৈব উত্তেজক-রসের কার্যকারিতার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এ সম্পর্কে লৌহের উল্লেখ করা যায় ; মাটিতে সামান্য পরিমাণে লৌহ-যৌগিক থাকলে উদ্ভিদ-পত্রে **ক্লোরোফিল** গঠনের সহায়ক হয়, যদিও গবেষণায় দেখা গেছে, ক্লোরোফিলের মধ্যে উপাদান হিসেবে লৌহের অস্তিত্ব নেই। এরূপ : আরও কয়েকটি অজৈব মৌলিকের সন্ধান পাওয়া গেছে,

যেগুলি মাটিতে বেশি থাকলে উদ্ভিদের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকলে উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়ে ওঠে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, অজৈব মৌলিক পদার্থ বোরন ও ম্যাঙ্গানিজ উদ্ভিদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়ক ; যদিও মাটিতে এদের অস্তিত্ব নামমাত্র অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকলেই চলে। মনে হয়, উদ্ভিদ-দেহের আভ্যন্তরীণ বিপাক-ক্রিয়ায় (মেটাবলিজ্‌ম) ও দ্রুত বৃদ্ধির পক্ষে ম্যাঙ্গানিজ বিশেষ সাহায্য করে। পদার্থটা উদ্ভিদ-মূলে বিভিন্ন জীবাণু বা এন্‌জাইমের বিক্রিয়ায় হয়তো অনুঘটকের কাজ করে। দেখা গেছে, কোন কোন উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে বোরনও বিশেষ কার্যকরী ; কিন্তু মাটিতে এর পরিমাণ বেশি হলে আবার উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। এর পরিমাণ অসম্ভব রকম সূক্ষ্ম হতে হবে ; মোটামুটি দশ লক্ষ ভাগ জলে এক ভাগ মাত্র **বোরিক-অ্যাসিড** মিশিয়ে দিলে মাটিতে বোরনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। মাটিতে বোরনের অভাব থাকলে কোন কোন উদ্ভিদের দেহে বিশেষ এক ধরনের অপুষ্টি-রোগ দেখা দেয়। বোরনের অভাব-জনিত এরূপ রোগের প্রতিকারের জন্যে কৃষি-জমিতে সোহাগা বা **বোরাক্স** (সোডিয়াম বাই-বোরেট) অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োগ করলে ফল পাওয়া যায়। জিঙ্ক বা দস্তার অভাবেও কোন কোন উদ্ভিদ বিশেষ বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়। উদ্ভিদের পুষ্টিহীনতা ও রোগাক্রমণের কারণ হিসেবে মাটিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অতি সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ফলাফল সম্পর্কে কৃষি-বিজ্ঞানীরা অদ্যাপি পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন কয়েকটি রাসায়নিক শিল্প

সোডা শিল্প : প্রাকৃতিক সোডা—সাজিমাটি; আকরীয় সোডা, উদ্ভিজ্জ সোডা : বেরিলা প্রভৃতি ; সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেটের রাসায়নিক প্রস্তুতি—লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি, ব্ল্যাক অ্যাশ ও সোডা অ্যাশ ; অ্যামোনিয়া-সোডা বা সলভে পদ্ধতি—বেকিং সোডা ও ওয়াশিং সোডা ; মিউরিটিক অ্যাসিড ও ক্লোরিন ; ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতি ; ব্লিচিং পাউডার ও স্লেক্‌ড লাইম। **সাবান শিল্প :** কস্টিক সোডা ও কস্টিক পটাস—স্যাপনিফিকেসন ; তেল ও চর্বির হাইড্রোলিসিস, গ্লিসারিন ; নরম সাবান, ওয়াটার গ্লাস ও স্বচ্ছ সাবান ; সাবানের পরিষ্করণ ক্ষমতা—খর জল ও মৃদু জল, অস্থায়ী খরতা ও স্থায়ী খরতা, পারমুটিট ও জিওলাইট ; জল বিশুদ্ধিকরণ, সমুদ্র-জলকে পানীয় জলে রূপান্তর। **কাচ শিল্প :** আবিষ্কার ও প্রাচীনত্ব, কাচের রাসায়নিক পরিচয়, সিলিকা বা কোয়ার্টজ-কাচ, জল-কাচ বা ওয়াটার গ্লাস, বিভিন্ন রাসায়নিক গঠনের কাচ—জেনা, পাইরেক্স, বোরো প্রভৃতি ; কাচের শিল্প-প্রস্তুতি ; পেটেন্ট কাচ ও সিল্‌ভারিং, কাচের অ্যানিলিং ; রুপার্ট ড্রপ, অতি-কঠিন অভঙ্গুর কাচ, বিভিন্ন রঙীন কাচ ও নকল মণি ; ফেন-কাচ, গ্লাস-উল ও কাচ-বস্ত্র ; মিনা-কাচ।

মানব-কল্যাণে রসায়নের অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বর্তমান যুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছে। আধুনিক মানব-সভ্যতায় রসায়নের দান অপরিসীম ; মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নত জীবনযাত্রার অজস্র উপকরণ আজ রাসায়নিক পদ্ধতিতে শিল্প-পর্যায়ে উৎপাদিত হয়ে মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এরূপ আধুনিক রসায়ন-শিল্পগুলির মধ্যে অ্যামোনিয়ার সংশ্লেষণ ও তা থেকে বিভিন্ন কৃত্রিম রাসায়নিক সার উৎপাদন মানব-কল্যাণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'কৃষি-রসায়ন ও রাসায়নিক সার' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ-বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু, কৃত্রিম রাবার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্পগুলির আলোচনা পরে যথাস্থানে করা হবে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সোডা, সাবান, কাচ প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন রাসায়নিক শিল্পের আলোচনা করবো। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির প্রস্তুতি ও ব্যবহার বহু দিন থেকেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রয়েছে ; কিন্তু এ-গুলির প্রয়োজন ও সার্থকতা মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে এতই অপরিহার্য যে, আধুনিক যুগেও এ-সব রাসায়নিক শিল্প মানব-সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান

অধিকার করে রয়েছে। এ-গুলির মধ্যে সোডা-শিল্পের আলোচনাই আমরা প্রথমে করছি।

সোডা, বা সোডিয়াম কার্বনেট

সোডা, বা সোডিয়াম কার্বনেট একটি ক্ষারধর্মী রাসায়নিক পদার্থ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ পরোক্ষভাবে এর কার্যকারিতা জেনে নানা কাজে এটা ব্যবহার করে আসছে। সে-যুগে অবশ্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোডার উৎপাদন সম্ভব হয় নি; কোন কোন দেশে প্রাকৃতিক সোডা অবিশুদ্ধ আকারে যথেষ্ট পাওয়া যেত। আমাদের দেশেও 'সাজিমাটি' নামে প্রাকৃতিক সোডা-মিশ্রিত এক রকম ক্ষার-মাটির বহুল ব্যবহার ছিল, যা দিয়ে সে-কালে লোকে বস্ত্রাদি পরিষ্কার করতো। সেই অতীত যুগে মিশর দেশের কোন কোন হ্রদের তলদেশে ও তীরবর্তী স্থানে প্রাকৃতিক অবিশুদ্ধ সোডার স্তর সঞ্চিত ছিল বলে জানা যায়। সে-যুগের ফিনিসীয় বণিকেরা দেশ-দেশান্তরে সেই সোডা নিয়ে ব্যবসা করতো, আর ঘটনাক্রমে সোডা ও বালি উত্তাপে একসঙ্গে গলে-মিশে সেই বণিকদের দ্বারাই এক দিন কাচ তৈরির রাসায়নিক পদ্ধতি সহসা উদ্ভাবিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। এ-সব কথা আমরা পরে যথাস্থানে বলব। ফিনিসীয়েরা প্রধানতঃ মিশরের ঐ প্রাকৃতিক সোডা নিয়েই নানা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। পরবর্তীকালে আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন হ্রদেও প্রাকৃতিক সোডার স্তর পাওয়া যায়। প্রকৃতিজাত সোডার উৎস কেবল এই-ই নয়; কোন কোন উদ্ভিদ-দেহেও সোডা ও পটাস শ্রেণীর প্রাকৃতিক ক্ষার পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কলাগাছের কাণ্ড শুকিয়ে ও পরে পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে কাপড়-চোপড় কাচা হতো; কারণ এই ছাই-এর মধ্যে কিছু সোডা-জাতীয় ক্ষার পদার্থ রয়েছে। প্রাচীন উপকথায় আছে — রাজার মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ যাবেন রাজবাড়ী; ব্রাহ্মণী তাই তাড়াতাড়ি কলার বাস্না পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে ব্রাহ্মণের বস্ত্র-উত্তরীয় সাফ করে দিলেন। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দেশে আরও নানা রকম উদ্ভিজ্জ পদার্থে প্রাকৃতিক সোডার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়েছে। স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সমুদ্রতীরবর্তী ভূ-ভাগে সল্ট-ওর্ট (salt-wort) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মাতো; এমন কি, সে-যুগে এর চাষও করা হতো। এই উদ্ভিদের ছাইয়ে শতকরা 15 থেকে 20 ভাগ

সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট পাওয়া যেত। এই উদ্ভিজ্জ সোডা **বেরিলা** নামে সেকালে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় হতো। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সোডার প্রয়োজন বহুলাংশে এ-থেকেই মিটতো।

সোডা, বা সোডিয়াম কার্বনেটের প্রয়োজন কেবল বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার কাজেই নয়, সাবান ও কাচের উৎপাদন-শিল্পেও এর প্রয়োজন বস্তুতঃ অপরিহার্য, চাহিদাও প্রচুর। সাবান ও কাচশিল্পের কথা আমরা এই অধ্যায়েই পরে আলোচনা করবো। এই শিল্প দু'টিও মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; তা ছাড়া বহু শতাব্দী আগে থেকেই বিভিন্ন দেশে এ দুটি শিল্প প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সাবান ও কাচ-শিল্পের অপরিহার্য উপাদান সোডা, বা সোডিয়াম কার্বনেটের সরবরাহ সে-কালে ছিল একেবারেই সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক সোডা দিয়ে চাহিদা পূরণ হতো না, আর সে-সোডার দামও ছিল শিল্প-প্রসারের পক্ষে অত্যধিক। এ-জন্যে সুলভে প্রচুর পরিমাণে সোডা উৎপাদনের প্রয়োজন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে; তারই ফলে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সোডা উৎপাদনের প্রচেষ্টা সুরু হয় খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।

সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড, অর্থাৎ সাধারণ খাদ্য-লবণ অফুরন্ত পরিমাণে দ্রবিত রয়েছে। সোডিয়াম ক্লোরাইডের এই সুলভ প্রাকৃতিক ভাণ্ডারকে কাজে লাগিয়ে তাকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম কার্বনেটে রূপান্তরিত করবার একটা সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবনের পরিকল্পনা করা হয়। এর জন্যে ফরাসী দেশের বিজ্ঞান ও শিল্প সমিতি (অ্যাকাডেমি অব প্যারিস) একটা পুরস্কার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী নিকোলাস লেব্ল্যাঙ্ক 1791 খৃষ্টাব্দে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে সোডায় রূপান্তরিত করবার একটি সহজ রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সোডা উৎপাদনের প্রথম শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয় ফ্রান্সের সেণ্ট ডেভিস নামক স্থানে। মাত্র বছর তিনেকের মধ্যেই জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনায় লেব্ল্যাঙ্কের এই কারখানা 1793 খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। পরিতাপের কথা, এই উদ্ভাবনের জন্যে ঘোষিত পুরস্কার থেকেও লেব্ল্যাঙ্ক বঞ্চিত হন। গভীর হতাশা ও ক্ষোভে অবশেষে 1806 খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক সোডার এই প্রথম উদ্ভাবক আত্মহত্যা করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এভাবে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে সোডা উৎপাদনের প্রথম প্রচেষ্টা, যার ফলে কাচ-ও সাবান শিল্পের প্রসার ঘটে মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার পথ সুগম হতে

চলেছিল, তার সম্ভাবনা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। যাহোক, কিছু কাল পরে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লেব্ল্যাঙ্কের পদ্ধতিতে সোডা উৎপাদিত হতে থাকে এবং অনেক দিন পর্যন্ত সোডা উৎপাদনে এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল।

লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি : সোডা উৎপাদনে লেব্ল্যাঙ্কের উদ্ভাবিত রাসায়নিক পদ্ধতিটি তেমন কিছু জটিল বা ব্যয়সাধ্য ছিল না। পদ্ধতিটির মোটামুটি তথ্য হলো : খাদ্য-লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে এক সঙ্গে উত্তপ্ত করলে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় পাওয়া যায় সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4) ; আর বিমুক্ত হয়ে যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস। এই সোডিয়াম সালফেটের পিণ্ডকে সাধারণ কথায় বলা হয় **সল্ট কেক্‌**। এই সালফেট-পিণ্ডের সঙ্গে কোক্ কয়লা ও চুনা পাথর ($CaCO_3$ ক্যালসিয়াম কার্বনেট) মিশিয়ে এক সঙ্গে গুঁড়িয়ে নিয়ে প্রায় 1000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে মিশ্রিত কয়লার দ্বারা সোডিয়াম সালফেট বিজারিত হয়ে প্রথমে সোডিয়াম সাইফাইডে (Na_2S) পরিণত হয়, পরে সেই সালফাইড ও চুনা-পাথরের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সোডিয়াম কার্বনেট, বা সোডা ($Na_2 CO_3$)। প্রথম অবস্থায় এই সোডার সঙ্গে অপরিবর্তিত ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কয়লা ও অন্যান্য উপজাত পদার্থের সংমিশ্রণে একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পাওয়া যায়, যার মধ্যে বিশুদ্ধ সোডিয়াম কার্বনেট থাকে শতকরা প্রায় 45 ভাগ। এই জমাট-বাঁধা কালো পদার্থটাকে চূর্ণ করলে যে গুঁড়া পাওয়া যায় তাকে সাধারণতঃ বলা হয় কৃষ্ণভস্ম, বা **ব্ল্যাক অ্যাশ**। এর সঙ্গে জল মিশিয়ে নাড়লে সোডিয়াম কার্বনেট জলে দ্রবিত হয়ে যায়, অন্যান্য অদ্রাব্য পদার্থগুলি ট্যাঙ্কের তলদেশে থিতিয়ে পড়ে। সোডার এই জলীয় দ্রবণকে উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত ও ঘনীভূত করে ক্রমে ঠাণ্ডা করলে কেলাসিত (জলের অণুযুক্ত) সোডা ($Na_2CO_3.10H_2O$) পাওয়া যায়। এই কেলাসিত সোডাকে আবার উত্তপ্ত করলে কেলাসের জল বিমুক্ত হয়ে গিয়ে নির্জল বিশুদ্ধ সোডা চূর্ণাকারে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় **সোডা অ্যাশ** (Na_2CO_3)।

লেব্ল্যাঙ্কের এই পদ্ধতিতে উপকরণগুলি সবই ছিল সুলভ ও সস্তা ; কাজেই সোডার উৎপাদন-ব্যয় কম হতো ও সস্তায় সোডা পাওয়া যেত সত্য, কিন্তু এর বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছিল কিছু সময়সাপেক্ষ। তাই অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের শিল্প-ভিত্তিক প্রয়োজনে পরবর্তীকালে আরও উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় লেব্ল্যাঙ্ক-পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। কালক্রমে সোডার শিল্প-উৎপাদনে

বেলজিয়ামবাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী আর্নেস্ট সল্‌ভে প্রবর্তিত 'অ্যামোনিয়া সোডা পদ্ধতি' প্রাধান্য লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবশ্য লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতিই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল।

বস্তুতঃ অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি ও লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতি একই সময়ে উদ্ভাবিত হয়ে প্যারিস অ্যাকাডেমির বিবেচনার জন্যে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সোডা উৎপাদনে অ্যামোনিয়া পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অ্যামোনিয়ার অপচয় ঘটবে আশঙ্কা করে অ্যাকাডেমি তখন লেব্ল্যাঙ্ক পদ্ধতিকেই অধিকতর উপযোগী বলে স্বীকৃতি দিয়ে সল্‌ভের অ্যামোনিয়া-পদ্ধতির প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল। তার কিছুকাল পরে 1838 খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান অবশ্য অ্যামোনিয়া-পদ্ধতির পেটেণ্ট নিয়ে সোডা উৎপাদন স্রুরু করেছিল; কিন্তু লাভজনক না হওয়ায় সে প্রচেষ্টা তখন বিফল হয়। যাহোক, পরবর্তী কালে সোডা-শিল্পে এই পদ্ধতিই উন্নততর প্রক্রিয়ায় সর্বত্র প্রচলিত হয়ে ওঠে।

সল্‌ভে পদ্ধতি: সোডার উৎপাদন-শিল্পে ইদানিং অ্যামোনিয়া-সোডা পদ্ধতি 'সল্‌ভে-পদ্ধতি' নামেই সমধিক পরিচিত। এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা খাদ্য-লবণের গাঢ় জলীয় দ্রবণের ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করা হয়, আর যখন দ্রবণটা অ্যামোনিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে তখন তার ভিতরে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) লবণ উৎপাদিত হয়ে পাত্রের তলদেশে থিতিয়ে পড়ে; পাত্রে থাকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ। এই পদ্ধতিতে উক্ত বাই-কার্বনেট সোডা প্রস্তুতির বিরাটাকার যান্ত্রিক ব্যবস্থা চিত্রে দেখানো হলো। উৎপন্ন ওই সোডিয়াম বাইকার্বনেট পৃথক করে নিয়ে উত্তপ্ত করলে তা থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প বেরিয়ে
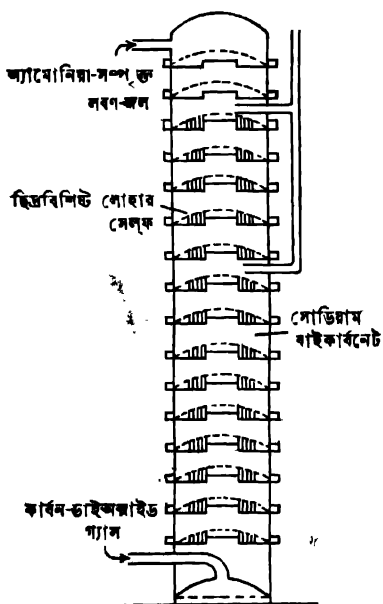
সল্‌ভে পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল (আংশিক)

যায়, পড়ে থাকে সাধারণ সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3)। এর রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$2\,NaHCO_3 = Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$$

এভাবে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্‌গত হয় তাকে নিয়ে পুনরায় প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়! আবার পাত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের যে জলীয় দ্রবণ পড়ে থাকে তার সঙ্গে চুনা-পাথর দিয়ে উত্তপ্ত করলে পুর্ব-ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া সবটাই ফিরে পাওয়া যায় এবং পুনরায় এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সল্‌ভে পদ্ধতিতে কোন কিছুরই অপচয় হয় না ; আর তাই উৎপন্ন সোডার উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে।

সোডিয়াম বাইকার্বনেট সাধারণতঃ **বেকিং সোডা** নামে পরিচিত। পেটের পীড়ায় লোকে ঔষধ হিসেবে এই সোডা খায় এবং ময়দার ডেলাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে পাঁউরুটি তৈরি করতে ময়দার সঙ্গে এই সোডাই ব্যবহৃত হয়। আজকাল পাউরুটি তৈরির জন্যে অবশ্য কেবল একক বেকিং সোডার বদলে **বেকিং পাউডার** ব্যবহার করা হয়, যাতে সোডিয়াম বাইকার্বনেটের সঙ্গে কিছু সাইট্রিক বা টার্টারিক অ্যাসিডও মেশানো থাকে। শুষ্ক অবস্থায় এই মিশ্রণে কোন বিক্রিয়া ঘটে না ; কিন্তু জলের সংস্পর্শে আনলেই মিশ্রিত অ্যাসিডের সঙ্গে বাইকার্বনেটের বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্‌গত হয় ; আর ভিতরে এরূপ প্রচুর গ্যাসোদ্‌গমের ফলে পাঁউরুটির জলমিশ্রিত ময়দার ডেলাটা ঝাঁজরা ও হাল্‌কা হয়ে ফেঁপে-ফুলে ওঠে।

সল্‌ভে পদ্ধতিতে উৎপন্ন সোডিয়াম বাইকার্বনেটকে ($NaHCO_3$) উত্তপ্ত করলে সাধারণ সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) পাওয়া যায়, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সোডার জলীয় দ্রবণকে উত্তাপে ঘনীভূত করে ঠাণ্ডা হতে দিলে সোডার বর্ণহীন স্বচ্ছ দানা বা কেলাস পাওয়া যায়। সোডার এক-একটি অণুর সঙ্গে জলের দশটি অণু যুক্ত হয়ে সোডার কেলাস গঠিত হয় ($Na_2CO_3.10H_2O$)। একে বলা হয় **ওয়াশিং সোডা,** যা দিয়ে আমরা সাধারণতঃ কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি।

বর্তমান যুগে লেব্ল্যাঙ্ক-পদ্ধতিতে যদিও সোডা আর তৈরি হয় না ; কিন্তু পদ্ধতিটির প্রাথমিক পর্যায়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা সাধারণ খাদ্য-লবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটানোর পদ্ধতিটি আজও প্রচলিত আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে **মিউরিটিক**

অ্যাসিড, বা 'স্পিরিট অব সল্ট'ও বলা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম-ক্লোরাইড সোডিয়াম-সালফেটে রূপান্তরিত হয়, আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড (হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড) গ্যাস (HCl) উদ্ভূত হয়ে থাকে। গ্যাসটা জলে অত্যধিক দ্রবণীয় ; কাজেই জলের ভিতরে এই গ্যাস প্রবাহিত করলে সাধারণ ব্যবহারের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিক্রিয়ায় যে সোডিয়াম সালফেট বা 'সল্ট কেক' উৎপন্ন হয় কাচ-শিল্পে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উৎপাদন-শিল্পের রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয় ; বস্তুতঃ এটা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় অ্যাসিডগুলির অন্যতম। বিশেষতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে সহজেই **ক্লোরিন** গ্যাস বিমুক্ত করা যায়।

ক্লোরিন হলো একটি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ (Cl) ; বিরঞ্জক ও জীবাণু-নাশক পদার্থ হিসেবে এটি অতি মূল্যবান। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে সাধারণতঃ যে পদ্ধতিতে ক্লোরিন উৎপাদিত হয় তা **ডেকন-পদ্ধতি** নামে খ্যাত। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বা হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড গ্যাসের সঙ্গে বায়ু মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে উত্তপ্ত পিউমিস পাথরের উপর দিয়ে প্রবাহিত করলে বায়ুর অক্সিজেন হাইড্রোজেন-ক্লোরাইডকে জারিত (অক্সিডাইজ) করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে উৎপন্ন হয় জল (বাষ্প), আর সেই সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাস বিমুক্ত হয়ে যায়। এই বিক্রিয়ায় পিউমিস প্রস্তরের টুকরাগুলিকে কপার-ক্লোরাইডের দ্রবণ মাখিয়ে নেওয়া হয়, যা এখানে অনুঘটকের কাজ করে, অর্থাৎ কপার-ক্লোরাইড হাইড্রোজেন-ক্লোরাইডের জারণ-ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে দ্রুত ক্লোরিন গ্যাস বিমুক্ত করে দেয়। আজকাল অবশ্য ক্লোরিন উৎপাদনে এই ডেকন-পদ্ধতি আর তেমন প্রচলিত নেই ; সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য-লবণ থেকে **ইলেক্‌ট্রোলিসিস** বা তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সরাসরি ক্লোরিন ও সেই সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (কস্টিক সোডা, NaOH) সহজেই উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা 'রসায়ন ও তড়িৎশক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করবো।

ক্লোরিন কেবল বীজবারক ও জীবাণুনাশকই নয়, বিরঞ্জক পদার্থ হিসেবেও বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার অপরিহার্য। বস্ত্র ও কাগজশিল্পে প্রাথমিক কাচা মালকে বর্ণহীন ও পরিষ্কার করতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। গ্যাসীয় বা জলে-দ্রবিত ক্লোরিন সরবরাহ ও সংরক্ষণের পক্ষে তেমন সুবিধাজনক

নয় বলে চুনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয় **ব্লিচিং পাউডার।** পাথুরে চুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় প্রস্তুত হয় ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, বা **স্লেক্‌ড লাইম,** তার ভিতরে ক্লোরিন গ্যাস প্রবাহিত করলে চুনের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় এই ব্লিচিং পাউডার, যাকে 'ক্লোরাইড অব লাইম'ও বলা যেতে পারে। ব্যবহারের সময়ে পদার্থটা থেকে ক্লোরিন গ্যাসীয় আকারে উদ্ভূত হয়। আজকাল বিরঞ্জক ও বীজবারক পদার্থ হিসেবে ব্লিচিং পাউডারই সমধিক প্রচলিত; বিভিন্ন শিল্পে এর চাহিদাও প্রচুর। কাগজ ও বস্ত্রশিল্প ছাড়াও কীটনাশক ঔষধ, রঞ্জক দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন-শিল্পে ক্লোরিনের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লেব্ল্যাঙ্ক-পদ্ধতিতে সোডা উৎপাদনে উপজাত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে ডেকন-পদ্ধতিতে ক্লোরিন উৎপাদনের শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং তা থেকে উৎপাদিত হয়েছিল বহুল ব্যবহৃত 'ব্লিচিং পাউডার'। রাসায়নিক শিল্পের এরূপ ক্রমবিস্তারের কিছু পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই সোডা-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লোরিনের কথাও কিছু আলোচিত হলো।

সাবান

বর্তমান যুগে সাবান মানুষের একটি নিত্য ব্যবহার্য পদার্থ; ধনী-দরিদ্র সকলেরই কিছু-না-কিছু সাবানের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে তাই আজ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টন বিভিন্ন শ্রেণীর সাবান তৈরি হয়ে থাকে; ফলে, সাবান তৈরি এখন একটা বিরাট রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে।

সাবান তৈরির মোটামুটি তথ্য প্রাচীন যুগেও মানুষের জানা ছিল। প্রায় দু' হাজার বছর আগেও মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে জান্তব চর্বির সঙ্গে উদ্ভিজ্জ ক্ষার (পটাস) ও জল দিয়ে ফুটিয়ে এক রকম সাবান-জাতীয় নরম জিনিস তৈরি করা হতো; জিনিসটা আধুনিক 'সফ্‌ট সোপ' বা নরম সাবানের প্রায় অনুরূপ ছিল। এ দিয়ে সে-কালের ধনী ও বিলাসী লোকেরা গাত্র মার্জনা করতো। তারপরে ধীরে ধীরে সাবান উৎপাদনের কিছু কিছু উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম সাবান তৈরি হয়েছে সত্য, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক ভিত্তিতে সাবান-শিল্প গড়ে ওঠে নি। প্রতিটি উপাদানের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের নিখুঁত বিচার-সাপেক্ষে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহার করে সাবান উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় মাত্র গত শতাব্দীর

গোড়ার দিকে। বস্তুতঃ এর পর থেকেই হাতে-তৈরি ক্ষুদ্রশিল্পের স্তর অতিক্রম করে সাবান-শিল্প এক বিরাট রাসায়নিক শিল্পের স্তরে পৌঁছেছে।

সাবান-শিল্প সোডা-শিল্পের উপরে নির্ভরশীল, আর সোডাই মূলতঃ সাবানের মুখ্য রাসায়নিক উপাদান, এ-কথা অবশ্য সত্য ; কিন্তু সাবান উৎপাদনে সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3), অথবা পটাসিয়াম কার্বনেট (K_2CO_3) সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। সাবানের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কষ্টিক সোডা ($NaOH$) বা কষ্টিক পটাস (KOH) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সোডিয়াম কার্বনেট, বা পটাসিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণের সঙ্গে জলীয়-চুন, যাকে বলে 'স্লেক্‌ড লাইম' অর্থাৎ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, $Ca(OH)_2$, মিশিয়ে উত্তাপে ফুটালে **কস্টিক সোডা**, বা **কস্টিক পটাস** পাওয়া যায়। উত্তাপে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সোডিয়াম, বা পটাসিয়াম কার্বনেটের পারস্পরিক সংযোগ-বিয়োগের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের হাইড্রক্সাইড ($NaOH$, বা KOH) এবং ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$)। ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনা-পাথর জলে অদ্রাব্য বলে পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে, আর পাওয়া যায় সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ। সাবান-শিল্পে কষ্টিক ক্ষারের এই জলীয় দ্রবণকে প্রয়োজনানুরূপ ঘনীভূত করে ব্যবহার করা হয় ; সাবান-শিল্পে একে বলে **কস্টিক লাই**। আজকাল অবশ্য কষ্টিক সোডা, বা কষ্টিক পটাস উৎপাদনে এই পদ্ধতি আর সাধারণতঃ অবলম্বিত হয় না ; সোডিয়াম ক্লোরাইড (খাদ্য-লবণ, $NaCl$) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের (KCl) দ্রবণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ (ইলেক্‌ট্রোলিসিস) করে সহজেই বিশুদ্ধতর কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাস পাওয়া যায়। কেবল তাই নয়, এই পদ্ধতিতে সঙ্গে সঙ্গে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় উপজাত পদার্থ হিসেবে। কাজেই সহজ ও লাভজনক বলে কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাসের শিল্প-উৎপাদনে আজকাল সোডিয়াম-ক্লোরাইডের **ইলেক্‌ট্রোলিসিস** পদ্ধতিই সচরাচর অবলম্বিত হয়ে থাকে।

জান্তব চর্বি, বা উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কষ্টিক সোডা, বা কষ্টিক পটাসের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (স্যাপনিফিকেসন) যদিও উভয় ক্ষেত্রেই **সাবান** তৈরি হয়, কিন্তু ক্ষারের বিভিন্নতায় দুই ক্ষেত্রে দু'রকম সাবান পাওয়া যায়। কষ্টিক সোডার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন সাবান হয় অপেক্ষাকৃত কঠিন, আর কষ্টিক পটাসের সাবান হয় কতকটা নরম।

ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী সেভ্রয়েল প্রথম প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিজ্জই হোক, আর জান্তবই হোক, যে-কোন তেল বা চর্বি হলো স্টিয়ারিক, পামিটিক প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত যৌগিক পদার্থ, বা **গ্লিসারাইড।** তেল বা চর্বির সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু জলীয় দ্রবণ মিশিয়ে ফুটালে, অথবা তেল বা চর্বির মধ্যে অত্যুত্তপ্ত জলীয় বাষ্প চালালে পদার্থ দু'টা বিশ্লিষ্ট হয়ে তাদের সংগঠক উপাদানে, অর্থাৎ অ্যাসিড ও গ্লিসারিনে পৃথক হয়ে পড়ে। জলের প্রভাবে যৌগিকের এরূপ রাসায়নিক বিভাজন-পদ্ধতিকে বলা হয় **হাইড্রোলিসিস**, বা জল-বিশ্লেষণ। তেল ও চর্বির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে মৃদু সালফিউরিক অ্যাসিড এই হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। আবার কস্টিক সোডা (NaOH), বা কস্টিক পটাসের (KOH) জলীয় দ্রবণও তেল ও চর্বির এই উপাদানিক বিভাজন-ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দ্রুততর করে। তেল ও চর্বি এভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে তাদের অ্যাসিডের ভাগ কস্টিক সোডা বা পটাসের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে সেই অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ উৎপন্ন করে, যাকে আমরা বলি **সাবান**। বস্তুতঃ সাবান হলো তেল ও চর্বির সংগঠক উপাদান পামিটিক, স্টিয়ারিক প্রভৃতি জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ, অর্থাৎ অ্যাসিড ও ক্ষারের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় তেল ও চর্বিকে বিশ্লিষ্ট করে তাদের অ্যাসিডাংশের সঙ্গে ঐ দু'টি কস্টিক ক্ষারের (অ্যাল্‌কালি) বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাবান শ্রেণীর লবণে রূপান্তরিত করবার এই পদ্ধতিকে বলা হয় **স্যাপনি-ফিকেসন**, বাংলায় বলা যেতে পারে 'সাবানীকরণ' প্রক্রিয়া।

হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় তেল ও চর্বির গ্লিসারিনের ভাগ পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু স্যাপনিফিকেসন প্রক্রিয়ায় গ্লিসারিন অংশ গ্রহণ করে না, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। সাবান-শিল্পে তাই **গ্লিসারিন** একটি মূল্যবান উপজাত পদার্থ হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। গ্লিসারিন, বা গ্লিসারল একটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ—সুমিষ্ট, বর্ণহীন, ঘন তরল বস্তু। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে গ্লিসারিনের চাহিদা প্রচুর; বিশেষতঃ ডিনামাইট ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থের উৎপাদন-শিল্পে নাইট্রোগ্লিসারিনের প্রয়োজন। কোন কোন ঔষধ-পত্রে, মলম প্রভৃতি তৈরি করতে গ্লিসারিন যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রজনের উৎপাদন-শিল্পেও গ্লিসারিন দরকার; 'গ্লিপ্‌টল' শ্রেণীর এই সংশ্লেষিত রাসায়নিক রজনের (যেমন, গ্লিসারাইল থ্যালেট) একটি উপাদান হলো গ্লিসারিন। আবার রেয়ন,

সেলোফোন প্রভৃতির রাসায়নিক শিল্পেও গ্লিসারিনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। বিভিন্ন শিল্পে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ এই গ্লিসারিন সাবানের উৎপাদন-শিল্পে উপজাত পদার্থ হিসেবে নিঃখরচায় পাওয়া যায়। সাবান-শিল্পে জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল থেকে হাইড্রোলিসিস, বা স্যাপনিফিকেসন প্রক্রিয়ায়ই প্রধানতঃ গ্লিসারিন পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু ইদানিং রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতেও গ্লিসারিন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। সাবান-শিল্পে এক সময় গ্লিসারিনের মত এরূপ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ পদার্থটির অপচয় ঘটতো, তাকে উদ্ধার করবার কোন ব্যবস্থাই আগে ছিল না।

সোডা-সাবান উৎপাদনে চর্বি বা তেলের ভিতরে কস্টিক সোডার দ্রবণ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে মেশনো হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প চালিয়ে সমগ্র মিশ্রণটাকে গলিয়ে-মিশিয়ে নাড়া-চাড়া করবার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে হাইড্রোলিসিস বা স্যাপনিফিকেসন প্রক্রিয়ায় চর্বি বা তেলের অ্যাসিডাংশ কস্টিক সোডার সোডিয়ামের সঙ্গে মিলে সোডিয়াম-লবণ, যেমন সোডিয়াম স্টিয়ারেট, অর্থাৎ সাবান উৎপন্ন হয়; আর তার সঙ্গে জল, অতিরিক্ত কস্টিক সোডা ও গ্লিসারিন মিলে-মিশে থাকে। এই মিশ্রণের ভিতরে তখন সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য-লবণ নিক্ষেপ করা হয়, যার ফলে উৎপন্ন সাবানের নরম পিণ্ড জলীয় দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে উপরে ভেসে ওঠে। সাবান তৈরির বড় বড় 'ভ্যাট' বা পাত্রের তলদেশের ঐ জলীয় দ্রবণে থাকে নিক্ষিপ্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড, অতিরিক্ত কস্টিক সোডা ও নানা রকম ময়লার গাদের সঙ্গে তেল ও চর্বি থেকে বিশ্লিষ্ট গ্লিসারিন। উপর থেকে সাবানের পিণ্ড তুলে নিয়ে আগের দিনে পাত্রের ঐ দ্রবণ ফেলে দেওয়া হতো; পরে অবশ্য সাবান-শিল্পের এই অপচয় নিবারিত হয়েছে। বিশেষ ধরনের বায়ুশূন্য আধারে ঐ মিশ্র দ্রবণ নিয়ে পাতন-ক্রিয়ার (ডিস্টিলেসন) সাহায্যে তা থেকে আজকাল সবটা

আধুনিক সাবান কারখানা
(বড় বড় ট্যাঙ্কে স্যাপনিফিকেসন প্রক্রিয়া চলছে)

গ্লিসারিন উদ্ধার করা হয়। এভাবে সাবান-শিল্প থেকে এই গুরুত্বপুর্ণ রাসায়নিক পদার্থ টি এক রকম বিনামূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সাবান-শিল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর চর্বি ও তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আগেকার দিনে উৎকৃষ্ট সাবান তৈরির জন্যে বিশুদ্ধ জান্তব চর্বি ও জলপাইর তেলই (অলিভ অয়েল) প্রধানতঃ ব্যবহার করা হতো ; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মানুষের খাদ্য হিসেবে মাখনের বিকল্প-পদার্থ **মার্গারিন** প্রভৃতি বিভিন্ন স্নেহ-পদার্থ উৎপাদনে বিশুদ্ধ চর্বি ও অলিভ অয়েল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকায় ক্রমে সাবান-শিল্পে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের ব্যবহার সুরু হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চর্বি ও তেল স্বাভাবিক অবস্থায়ই আজকাল ব্যবহার করা হয় নরম সাবান **(পটাস সোপ)** তৈরি করতে ; অথবা অনুঘটন প্রক্রিয়ায় **হাইড্রোজেনেসন** পদ্ধতিতে তাদের প্রথমে ঘনীভূত করে নিয়ে তারপরে তাকে কঠিন সাবান **(সোডা সোপ)** উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। যে-কোন উদ্ভিজ্জ তেল বা তরল জান্তব চর্বিকে ঘনীভূত করবার হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা 'রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটন' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করবো।

নরম সাবান বা 'পটাস-সোপ' উৎপাদনে যে-কোন জান্তব চর্বি বা উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করা চলে। তুলা-বীজের তেল, তিসির তেল, সয়াবিনের তেল প্রভৃতির সঙ্গে কষ্টিক পটাসের জলীয় দ্রবণ মিশিয়ে জাল দিয়ে ফুটালে তরল, বা নরম সাবান উৎপন্ন হয়। কষ্টিক ক্ষারের বিক্রিয়ায় তেলের গ্লিসারিন ও জৈব অ্যাসিড পৃথক হয়ে পড়ে ; আর সেই অ্যাসিডের সঙ্গে পটাসের রাসায়নিক সংযোগে সাবান তৈরি হয়। এই সাবান হয় এক রকম থক্‌থকে নরম পদার্থ। তেলের গ্লিসারিন অংশ এর সঙ্গে মিশে থাকে বলে এই সাবান শুকালেও শক্ত হয় না। এর সঙ্গে সোডিয়াম সিলিকেট (Na_2SiO_3) বা পটাসিয়াম সিলিকেট (K_2SiO_3) মিশিয়ে, কখন-কখন চুনা-পাথরের চূর্ণ, কেয়োলিন প্রভৃতি দিয়ে এই নরম সাবানকে ব্যবহারোপযোগী শক্ত করা হয়। এভাবে সাধারণতঃ স্বল্প মূল্যের কাপড়-কাচা সাবানই তৈরি হয়ে থাকে। মিশ্রিত ঐ সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেট **'ওয়াটার গ্লাস'** নামে পরিচিত ; জিনিসটা কিছুটা ক্ষারধর্মী, অর্থাৎ কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করবার ক্ষমতা এর-ও কিছু আছে।

আগে যে শক্ত সোডা-সাবানের উৎপাদন-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তাতে উৎপন্ন সাবানের পিণ্ডকে ভ্যাটের তরল দ্রবণের উপর থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার

করা হয়। এই সাবান জল দিয়ে ফুটালে তার সঙ্গে মিশ্রিত ধুলা-ময়লা সব থিতিয়ে নিচে পড়ে; তারপরে এই সাবানের ঘন দ্রবণের মধ্যে আবার লবণ ছিটিয়ে দিলে সাবান আবার জমাট বাঁধে। এই জমানো সাবান তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে পড়ে। এই শুষ্ক কঠিন সাবানকে যন্ত্রের সাহায্যে কুঁচিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ রং ও সুগন্ধ মিশিয়ে অল্প তাপে আবার গালিয়ে ফেলা হয়। এই গলিত সাবান ঠাণ্ডা করলে অনেকটা শক্ত হয়; তারপরে একে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমান সাইজে খণ্ড খণ্ড করে ছাঁচে দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী আকারের সাবান প্রস্তুত করা হয়। এই হলো বিশুদ্ধ গায়ে-মাখা সাবান। এর মধ্যেও অনেক সময় পরিপূরক পদার্থের ভেজাল, যেমন সোডিয়াম কার্বনেট, ওয়াটার-গ্লাস প্রভৃতি কিছু কিছু মেশানো হয়। এর ফলে সাবানের কাঠিন্য কিছুটা বাড়ে সত্য, কিন্তু ঐ মিশ্রিত লবণগুলি সাবান ব্যবহারের সময় জলকে কিছুটা কোমলায়িত (খর জলকে মৃদু) করে এবং তার ফলেও সাবানের পারঙ্করণ-ক্ষমতা বা ক্ষারধর্মিতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
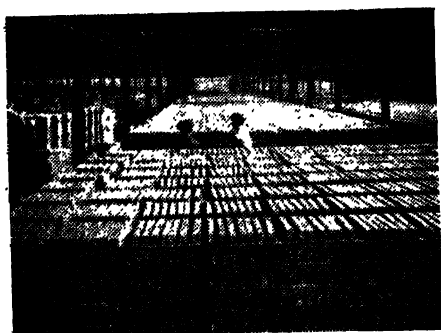
যন্ত্রের সাহায্যে সাইজ মত কেটে সাবান শুকানো হচ্ছে

বর্তমান যুগে বর্ণে, গন্ধে, চেহারায় ও গুণে কত বিভিন্ন ধরনের সাবান যে বাজারে প্রচলিত হয়েছে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। বিশুদ্ধ সাবানের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ পদার্থ মিশিয়েও বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন সাবান তৈরি করা হয়; যেমন—**কার্বলিক সাবান,** নিম-সাবান, চালমুগরা সাবান প্রভৃতি। সাবানের সঙ্গে নানা রকম চর্মরোগের ঔষধ মিশিয়ে এগুলি তৈরি করা হয়; মূল সাবান অবশ্য ঐ একই। বর্ণ ও গন্ধের বিভিন্নতা তো স্বতন্ত্র কথা। কোন কোন সাবানে সোডিয়াম পারবোরেট প্রভৃতি বিরঞ্জক লবণও মেশানো হয়। বাজারে যে এক রকম **স্বচ্ছ** গায়ে-মাখা সাবান রয়েছে তার উৎপাদনে এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। বিশুদ্ধ সাবানকে অ্যাল্‌কোহলের ভিতরে

দ্রবীভূত করে কিছু সময় পরে সেই অ্যালকোহল বাষ্পীভূত করে উড়িয়ে দিলে চক্‌চকে **স্বচ্ছ সাবান** পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগে সাবান-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির ফলে তরল, গুঁড়া, তুলার মত হাল্‌কা, মাছের আঁশের মত পাত্‌লা, নানা রকম গঠনের সাবান তৈরি হয়ে থাকে। এ-সবই মূলতঃ মোটামুটি একই সাবান; উৎপাদনের রাসায়নিক পদ্ধতি ও কৌশলের বিভিন্নতায় এদের বাহ্য প্রকৃতিতে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতাঃ সাবানে কি করে ময়লা কাটে তার মূল তথ্য সাবানের ভৌত ও রাসায়নিক উভয়বিধ ধর্মের উপরেই নির্ভরশীল। আমরা জানি, কোন তেল-চিটে জিনিসের উপরে জল দিয়ে ঘষলে জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, জিনিসটা ভেজে না। সাবানের ক্রিয়ায় তৈলাক্ত জিনিসের উপরে জলের এরূপ বিন্দু গঠনের প্রবণতা দূর হয়, আর তার ফলে তেলের আস্তরণ ভেদ করে জল ঢুকে জিনিসটাকে ভেজাতে পারে। বস্তুতঃ মানুষের গায়ে বা কাপড়-চোপড়ে নানাভাবে তৈলাক্ত পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকা লেগে একটা তেল-চিটে ভাব আসে, যার সঙ্গে বাতাসের ধুলা-ময়লা এঁটে গিয়ে অপরিষ্কার ও মলিন করে তোলে। সাবানের উল্লিখিত ভৌত ক্রিয়ায় সাবান-দ্রবিত জল তেলের আস্তরণটা ভেদ করে ভিতরে যায় এবং জিনিসটাকে ভিজিয়ে তেল ও ময়লার আস্তরণটাকে আল্‌গা করে দেয়। আবার অনেক সময় সাবানের সঙ্গে অবিকৃত কিছু কিছু ক্ষারীয় পদার্থ থাকলে তার সঙ্গে ময়লার চর্বি ও তেলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটেও সাবানের মত দ্রাব্য যৌগিক সৃষ্টি করে, যার ফলে ময়লার তৈলাক্ত পদার্থের সঙ্গে-সঙ্গে ময়লাও কেটে যায়।

সাবানের পরিষ্করণ-ক্ষমতা প্রধানতঃ কার্যকরী হয় ময়লার তেল ও চর্বির সঙ্গে জলের অবদ্রব (ইমালসন) গঠনের ফলে। বস্তুতঃ সাবানের উপস্থিতিতে তেল ও জলের একটা স্থায়ী ইমালসন সহজেই গঠিত হয়ে থাকে। আমরা জানি, তেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে বিশেষভাবে ঝাঁকালে বা ফেটালে তেল ও জলের এক রকম সাদাটে মিশ্রণ বা **ইমালসন** তৈরি হয়। প্রকৃতপক্ষে তেলে ও জলে মেশে না; দ্রুত ঝাঁকানোর ফলে তেল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হয়ে জল-কণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে এরূপ সাদা ইমালসনের সৃষ্টি করে। তেলের এই অবস্থাটা কিন্তু স্থায়ী নয়; কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রেখে দিলে তেলের ক্ষুদ্র কণিকাগুলি পরস্পর মিলে ধীরে ধীরে সবটা তেল আবার জলের উপরে ভেসে ওঠে, তেল ও জল পৃথক হয়ে ইমালসনের সাদা ভাবটা কেটে যায়।

পক্ষান্তরে তেল ও জলের সঙ্গে কিছু সাবান মিশিয়ে ঝাঁকালে দেখা যায়, উৎপন্ন ইমালসনটা স্থায়ী হয়, তেল ও জল আর পৃথক হয় না। সাবান ব্যবহারের সময় এই ব্যাপারটাই ঘটে ; ময়লা জিনিস সাবান মেখে জল দিয়ে রগড়ালে সাবানের উপস্থিতিতে জিনিসটাতে লেগে-থাকা তৈলাক্ত পদার্থের সঙ্গে জলের অবদ্রব বা ইমালসন সৃষ্টি হয়। আর তার ফলে জিনিসটা থেকে তেল ও সঙ্গে সঙ্গে তাতে জড়িত ময়লাও বিমুক্ত হয়ে জলে ধুয়ে যায়। আবার অপরিষ্কার জিনিসের ধুলা-ময়লা অপসারণে সাবান-জলের ফেনাও ভৌত পদ্ধতিতে অনেকটা কার্যকরী হয়,—সাবানের ফেনার সঙ্গে সহজে জামা-কাপড়ের ধুলা-ময়লা বিমুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

বিশুদ্ধ জলে সাবান সহজেই দ্রবীভূত হয় ; জলের সঙ্গে সাবানের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। আগেই বলা হয়েছে, সাবান হলো পামিটিক, স্টিয়ারিক প্রভৃতি জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ, অর্থাৎ সোডিয়াম বা পটাসিয়াম স্টিয়ারেট, পামিটেট প্রভৃতি। এই লবণগুলি সবই জলে বিশেষ দ্রাব্য : কিন্তু এ-সব জৈব অ্যাসিডের ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম লবণ জলে অদ্রাব্য। কাজেই কোন জলে যদি ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়ামের সালফেট, বাইকার্বনেট প্রভৃতি অজৈব লবণ দ্রবীভূত থাকে, আর তার মধ্যে সাবান গলানো হয়, তাহলে সাবানের ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সেই জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়ামের অদ্রাব্য জৈব লবণ (স্টিয়ারেট, অলিয়েট প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়ে জল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই অদ্রাব্য লবণগুলি জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায়, সাবানের অপচয় ঘটে।

খর জল ও কোমল জল : যে জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়ামের সালফেট, বাইকার্বনেট প্রভৃতি অজৈব লবণ দ্রবিত থাকে তাকে বলা হয় 'খর জল,' ইংরেজীতে বলে **হার্ড ওয়াটার**। এরূপ জলে সাবান গুললে সাবানই বিয়োজিত হয়ে যায় বলে এরূপ জলে কাপড়-চোপড় কাচতে গেলে সহজে ফেনা হয় না, কাপড়-চোপড় তেমন পরিষ্কারও হয় না ; সাবানের হয় অপচয়। অনেকটা সাবান ব্যবহার করে এরূপ জলের সম্যক ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামই অদ্রাব্য লবণে রূপান্তরিত হয়ে গেলে শেষে সাবানের স্বাভাবিক ক্রিয়া দেখা দেয়। যে জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতির কোন অজৈব লবণ দ্রবিত থাকে না, কাপড়-চোপড় কাচলে সহজেই সাবানের ফেনা হয়ে বস্ত্রাদি দ্রুত পরিষ্কার হয় তাকে বলে কোমল জল, **সফ্‌ট ওয়াটার**।

জলের ক্ষরতা দূর করবার, অর্থাৎ খর জলকে কোমল করবার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে। যে খর জলে কেবল ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট দ্রবিত থাকে তাকে উত্তপ্ত করে কিছুক্ষণ ফুটালেই তার খরতা দোষ দূর হয়। একে তাই বলা হয় **অস্থায়ী ক্ষরতা**। কোন স্থানের জলে এরূপ খরতা আসে চুনা-পাথরের সঙ্গে বৃষ্টির জলের বিক্রিয়ায়; বৃষ্টির জলে বায়ুমণ্ডলের কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (অর্থাৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড, CO_2) কিছু দ্রবিত থাকে। বৃষ্টির জলের এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে চুনা-পাথর, বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটে [$Ca(HCO_3)_2$] পরিণত হয়ে জলে দ্রবিত হয়ে থাকে। এর রাসায়নিক ক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$CaCO_3 + H_2O + CO_2 = Ca(HCO_3)_2$$
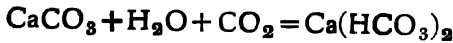
এরূপ খর জল উত্তপ্ত করলে তাতে দ্রবিত ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট উত্তাপে বিয়োজিত হয়ে আবার ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয়। অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনা পাথর জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। এভাবে অস্থায়ী খর জলের খরতা দোষ কেটে যায় কেবল উত্তপ্ত করলেই। ক্যালসিয়াম কার্বনেট অদ্রাব্য বলে জল থেকে পৃথক হয়ে যায়, আর তাকে থিতিয়ে বা ছেঁকে নিলেই কোমল জল পাওয়া যায়।

খর জলে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়ামের সালফেট লবণ দ্রবিত থাকলে তাকে উত্তাপে ফুটিয়ে কোমল করা সম্ভব হয় না। জলের এরূপ খরতাকে বলে **স্থায়ী ক্ষরতা**। এরূপ স্থায়ী খর জলে সোডিয়াম কার্বনেট, অর্থাৎ 'কাপড়-কাচা সোডা' উপযুক্ত পরিমাণে মেশালে দ্রবিত ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট লবণ অদ্রাব্য কার্বনেট লবণে পরিবর্তিত হয়ে জল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে :

$$CaSO_4 + Na_2CO_3 = CaCO_3 + Na_2SO_4$$
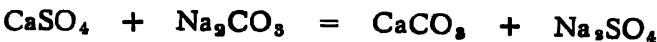
(ক্যালসিয়াম সালফেট) (সোডা) (চুনা-পাথর) (সোডিয়াম সালফেট)

এই প্রক্রিয়ায় স্থায়ী খর জলের ক্যালসিয়াম, বা ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট অদ্রাব্য চুনা-পাথরে পরিবর্তিত হয়ে পৃথক হয়ে যায়; আর জলে দ্রবিত থাকে ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন সোডিয়াম সালফেট, যার উপস্থিতিতে জলের খরতা দোষ থাকে না, সাবানের ক্রিয়াও ব্যাহত হয় না।

খর জলের অন্যান্য অসুবিধা ও তার প্রতিবিধান ঃ খর জল ব্যবহারে কেবল সাবানের অপচয়ই হয় না, কল-কারখানা ও ঘর-সংসারের কাজেও অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি করে। ষ্টিম-ইঞ্জিনের বয়লারে ক্রমাগত খর জল ব্যবহৃত হলে উত্তাপে তার ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম লবণগুলি পৃথক হয়ে ধীরে ধীরে বয়লারের দেয়ালের ভিতর দিকে একটা কঠিন আস্তরণের সৃষ্টি করে। এর ফলে ভিতরের জলে বাইরের উত্তাপ আশানুরূপ পরিমাণে পৌঁছায় না, ফলে তাপের অপচয় ঘটে। আবার কখন কখন বয়লারের এবং সংলগ্ন পাইপের ভিতরের এই কঠিন আস্তরণ ফেটে খসে গিয়ে সহসা অত্যুত্তপ্ত জলের সংস্পর্শে বয়লারের দেয়াল বা পাইপ ফেটে যায় এবং বিস্ফোরণ ঘটে বিপদ ঘটাতে পারে। ক্রমাগত খর জল ব্যবহারে চায়ের কেট্‌লির ভিতরেও অনুরূপ আস্তরণ পড়ে এবং জিনিসটা অল্প দিনেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।
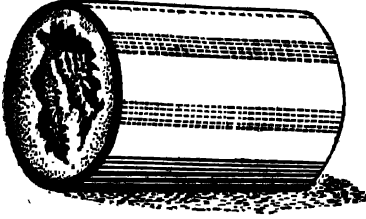
বয়লারের পাইপ খর জলের প্রভাবে বুজে যায়

খর জলকে কোমল করবার, অর্থাৎ তার খরতা দোষ দূর করবার বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। সাবান ব্যবহারের সময় খর জলের অসুবিধা দূর করতে যে-সব সাধারণ রাসায়নিক কৌশল অবলম্বিত হয় তার আলোচনা আমরা আগেই করেছি। খর জল উত্তপ্ত করলে আধারের গায়ে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেটের যে-আস্তরণ গঠনের কথা বলা হলো, তা-থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সাধারণতঃ বয়লারে ব্যবহারের জলে কিছু **সোডিয়াম হেক্সামেটা-ফস্‌ফেট** ($(NaPO_3)_6$) নামক রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। সাধারণ সোডিয়াম ফস্‌ফেটকে (NaH_2PO_4) উত্তাপে গলিয়ে ফেললে উক্ত সোডিয়াম যৌগিকটা পাওয়া যায়।

কল-কারখানা ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজে খর জলকে কোমল করবার আর একটা সহজ পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। একে বলা হয় **পারমুটিট** পদ্ধতি। পারমুটিট হলো এক রকম কৃত্রিম **জিওলাইট** প্রস্তর বিশেষ; রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে জিনিসটা হলো সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট। পদার্থটা

তৈরি হয় 'কোয়ার্টজ' পাথর, অ্যালুমিনা (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড) ও সোডিয়াম কার্বনেটের মিশ্রণকে বিশেষ উত্তাপে এক সঙ্গে গলিয়ে-মিশিয়ে। এই পদার্থের চূর্ণের ভিতর দিয়ে খর জল প্রবাহিত করে ছেঁকে নিলে জলের খরতা দূর হয়ে যায়। স্থায়ী খর জলে দ্রবিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেটের সঙ্গে পারমুটিটের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তার সোডিয়াম বিমুক্ত হয়, আর ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম তার স্থান অধিকার করে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেট যৌগিক গঠিত হয়। এভাবে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম খর জল থেকে বেরিয়ে গিয়ে জলের খরতা দূর হয়। ব্যবহৃত পারমুটিট, বা সোডিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-সিলিকেটের সম্যক সোডিয়াম উপাদান এভাবে বিমুক্ত হয়ে গেলে খর জলের কোমলায়নে পরিমুটিটের ক্ষমতা লোপ পায়; কিন্তু সেডিয়াম-ক্লোরাইডের দ্রবণে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে একে সহজেই আবার কার্যকরী করে তোলা যেতে পারে।

জল বিশুদ্ধিকরণের আধুনিক পদ্ধতি ঃ বর্তমান যুগে রাসায়নিক কলা-কৌশলের অভাবনীয় উন্নতির ফলে জল বিশুদ্ধিকরণের এমন উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যে, অবিশুদ্ধ খর জলে দ্রবিত কেবল ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামই নয়, সোডিয়াম ও অন্যান্য সব ধাতু-মূলক, এমন কি, জলে দ্রবিত তাদের সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতির অ্যাসিড-মূলকগুলিও এই পদ্ধতিতে অপসারিত করে পাতিত জলের মত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের জাতীয় রসায়নাগারের রসায়ন-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় গত 1935 খৃষ্টাব্দে এক শ্রেণীর সংশ্লেষিত রজন-জাতীয় কয়েকটি কৃত্রিম পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের জল বিশুদ্ধিকরণের উল্লিখিত আশ্চর্য ক্ষমতা বর্তমান। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কাঁচা কয়লার উপরে জল-বিহীন ধূমায়িত সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় এই **সংশ্লেষিত রজন** উৎপন্ন হয়। এরূপ এক প্রকার সংশ্লেষিত রজনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে অবিশুদ্ধ জলে দ্রবিত লবণগুলির ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, সোডিয়াম প্রভৃতি **ধাতু-মূলক**গুলি বিমুক্ত হয়ে তাদের স্থলে হাইড্রোজেন-আয়ন যুক্ত হয়। এর ফলে লবণগুলি থেকে বিচ্যুত মুক্ত অ্যাসিড-মূলকগুলি ঐ পরিস্রুত জলে মিশে থাকে। অ্যাসিড-মিশ্রিত এই জলকে আবার আর এক রকম সংশ্লেষিত রজনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে দ্রবিত অ্যাসিড-মূলকগুলিও বিমুক্ত হয়ে এবারে ঐ পরিস্রুত জলে কেবল কার্বনিক অ্যাসিড দ্রবিত থাকে। এই অবস্থায় ঐ জলের ভিতরে বায়ু-প্রবাহ চালালে দ্রবিত

কার্বনিক অ্যাসিড, অর্থাৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বিদূরিত হয়ে যায়। এভাবে জলে দ্রবিত সব রকম ধাতব লবণ সম্যক বিদূরিত হয়ে অবিশুদ্ধ জল শেষে পাতিত জলের (ডিস্টিল্ড ওয়াটার) মত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়ে পড়ে।

সমুদ্র-জলকে পানীয় জলে রূপান্তর ঃ উল্লিখিত রঞ্জন-পদ্ধতিতে বিভিন্ন লবণ-দ্রবিত জলকে পাতিত জলের অনুরূপ বিশুদ্ধ জলে পরিণত করা যায় সত্য ; কিন্তু এরূপ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ (বা পাতিত) জল স্বাদে-গুণে উৎকৃষ্ট পানীয় হয় না। তাই যথোপযুক্ত পরিমাণে কোন কোন লবণ দ্রবিত রেখে ইচ্ছানুযায়ী মানের বিশুদ্ধ পানীয় জলও এই পদ্ধতিতে পাওয়া যেতে পারে। আবার খর জল বিশুদ্ধিকরণে আগে যে 'জিওলাইট', বা 'পারমুটিট' পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে তার বিশেষ প্রয়োগেও সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে বিশুদ্ধ পানীয় জলে রূপান্তরিত করা যায়। মোট কথা, জলে দ্রবিত বিভিন্ন লবণ দূরীকরণের এই সব পদ্ধতি রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং গভীর সমুদ্রে অনেক সময় নাবিকদের জীবন রক্ষার সহায়ক হয়।

সমুদ্র-জল অতিমাত্রায় লবণাক্ত। এর মধ্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর সালফেট, ক্লোরাইড, আয়োডাইড, ব্রোমাইড প্রভৃতি বিভিন্ন লবণ কম-বেশি দ্রবিত থাকে। এদের মধ্যে অবশ্য সোডিয়াম ক্লোরাইড, বা সাধারণ খাদ্য-লবণের পরিমাণই সর্বাধিক। সমুদ্রের অত্যধিক লবণাক্ত জল মানুষের পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কাজেই সমুদ্রগামী জাহাজে পানীয় জল ফুরিয়ে গেলে, অথবা বিশেষ উড়ো-জাহাজ (হাইড্রো-প্লেন) সমুদ্রের মধ্যে অবতরণ করতে বাধ্য হলে নাবিকেরা পানীয় জলের অভাবে বিপদে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে উল্লিখিত 'জিওলাইট' পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগে সমুদ্র-জলকে সহজেই পানীয় জলে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এর জন্যে ব্যবহার করা হয় **বেরিয়াম-সিলভার জিওলাইট** নামক এক প্রকার মিশ্র জিওলাইট, অর্থাৎ বেরিয়াম, সিলভার (রৌপ্য) ও অ্যালুমিনিয়ামের সম্মিলিত সিলিকেট যৌগিক, আর তার সঙ্গে সামান্য কিছু সিলভার-অক্সাইড। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ভিতরে এগুলি মিশিয়ে কোন পাত্রে নিয়ে ঝাঁকালে জলে দ্রবিত বিভিন্ন লবণ অদ্রাব্য বেরিয়াম-সালফেট, সিলভার-ক্লোরাইড, সোডিয়াম-সিলিফেট-জিওলাইট, ম্যাগ্নেসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতি জলে-অদ্রবণীয় যৌগিকে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তারপরে ঐ জলকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় ছেঁকে নিলে অদ্রাব্য কণিকাগুলি মুক্ত হয়ে প্রায় পাতিত (ডিস্টিল্ড)

জলের মত বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। ঐ বিশেষ জিওলাইটের সংস্পর্শে অবশ্য জলে অনেক সময় কিছুটা রং ধরে ; এজন্যে জিওলাইটের মিশ্রণের সঙ্গে কতকটা কাঠ-কয়লার গুঁড়া আগেই মিশিয়ে দিলে জলের রং-ও থাকে না। এভাবে সমুদ্র-জলকে সহজেই বিশুদ্ধ পানীয় জলে রূপান্তরিত করা যায়। সার্থকতার দিক থেকে এই রাসায়নিক পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সন্দেহ নেই।

কাচ শিল্প

মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে কাচের অবদান অপরিসীম। কাচ এ-যুগে মানুষের উন্নত জীবন-যাত্রার একটি অপরিহার্য উপকরণ ; আর এর ব্যবহারও ব্যাপক ও বহুমুখী। কেবল দৈনন্দিন ব্যবহারের অজস্র জিনিসই নয়, কাচ না হলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করা সম্ভব হতো না। কাচের সঙ্গে তাই এযুগে আমরা সবাই পরিচিত ; সাধারণ ব্যবহারের তৈজস-পত্র, শিশি-বোতল, আয়না, শার্শি প্রভৃতি থেকে স্বরু করে বৈদ্যুতিক বাতি, থার্মোমিটার, চশমা, আলোকচিত্র প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন কাচের উপরে নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাচের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি না হলে চলে না। কাচের লেন্স ও প্রিজ্‌ম না হলে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবনই সম্ভব হতো না, বিশ্বের অনন্ত রহস্য থাকতো মানুষের অজ্ঞাত। ফটোগ্রাফির ক্যামেরা-যন্ত্র কাচ আবিষ্কৃত না হলে কল্পনাও করা যেত না। মোট কথা, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিস্তারে কাচের বহুমুখী অবদানের কথা বলে শেষ করা যায় না। সেই সুদূর অতীতে, যেভাবেই হোক, কাচের উৎপাদন-পদ্ধতি যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর কাছে মানবজাতির ঋণের শেষ নেই।

কাচের আবিষ্কার ও প্রাচীনত্ব ঃ বর্তমান যুগে কাচ-শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে ও ব্যাপকভাবে কাচ ব্যবহৃত হচ্ছে সত্য, কিন্তু কাচ একটি অতি প্রাচীন শিল্প। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে, খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগেও সাধারণ কাচের উৎপাদন ও ব্যবহার মানুষের জানা ছিল। সেই সুদূর অতীতে কবে কোন দেশে কাচ প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছিল, সে কথা সঠিক জানবার উপায় নেই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমক পণ্ডিত প্লিনি তাঁর এক পুস্তকে কাচ আবিষ্কারের এক কাহিনী লিখে গেছেন। প্রাচীনকালে ফিনিসবাসী একদল বণিকই নাকি ঘটনাক্রমে কাচ আবিষ্কার করে ফেলেছিল।

প্রাকৃতিক সোডা-বোঝাই জাহাজ নিয়ে সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপন্ন হয়ে সেই বণিকদল একবার ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরবর্তী কারমেল পর্বতের পাদদেশের বালুকাময় সমুদ্র-সৈকতে অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেখানে ভিজা বালির উপরে জাহাজ থেকে সোডা এনে ছড়িয়ে দিয়ে তারা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছিল। এই সময় তারা আগুনের উত্তাপে সোডা ও বালি এক সঙ্গে গলে-মিশে এক রকম চক্‌চকে কঠিন পদার্থের উৎপত্তি হতে দেখে; আর জিনিসটার অভিনবত্বে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এই জিনিসটাই হলো কাচ; আর এভাবেই হয়েছিল কাচের আবিষ্কার। কাহিনীটার সত্যতা যাচাই করবার উপায় নেই, তবে সেই সুদূর অতীতে এরূপ কোন আকস্মিক ঘটনায়ই যে দৈবাৎ কাচ উদ্ভাবিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ কাচের রাসায়নিক তত্ত্ব সে-যুগে মানুষের জানা থাকার কথা নয়।

সে যাই হোক, যে দেশে যে ভাবেই কাচের উৎপাদন-কৌশল প্রথম উদ্ভাবিত হোক না কেন, আর প্রাচীন ফিনিসীয়দের মধ্যে কাচ ব্যবহারের
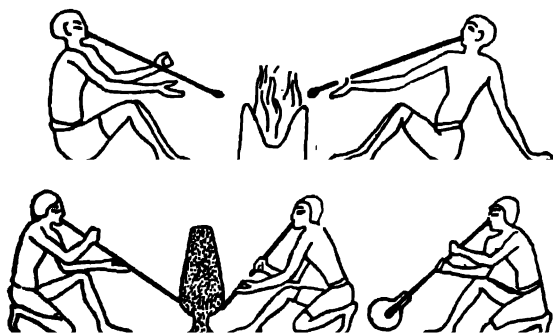
ফুঁ দিয়ে কাঁচ-পাত্র তৈরির প্রাচীন মিশরীয় চিত্র

কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেলেও অতীতে মিশর দেশেই যে সর্বপ্রথম কাচ, বা কাচের মত পদার্থের উৎপাদন-কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল তার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। মিশরের প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন মেম্‌ফিস নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কাচের পুঁতি ও অলঙ্কারাদি পাওয়া গেছে। মিশরের প্রাচীন রাজা, বা ফারাওদের সমাধিক্ষেত্রের কোন কোন পিরামিডের অভ্যন্তরে কাচের পান-পাত্র ও অলঙ্কারাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এমন কি, খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক 3800 বছরের প্রাচীন মিশর-সম্রাট 'তি'-এর সমাধি-পিরামিডের

প্রাচীর-গাত্রে ফুঁ দিয়ে কারিগরদের কাচের দ্রব্যাদি তৈরি করবার পদ্ধতি চিত্র-সাহায্যে প্রদর্শিত রয়েছে। এ-সব নিদর্শন থেকে বুঝা যায়, এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগেই মিশরীয়েরা সাধারণ কাচ তৈরির কৌশল আয়ত্ব করেছিল। এভাবে কালের বিচারে ফিনিসীয়দের অনেক আগেই মিশর দেশে কাচ আবিষ্কৃত হয়েছিল, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেই প্রাচীন যুগে মিশর দেশ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় মহেন্‌জোদারো ও হরাপ্পা নামক প্রাচীন নগরী দু'টির ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও কাচের পাত্র, পুঁতি ও অলঙ্কারাদি কিছু কিছু পাওয়া গেছে। সিন্ধু-সভ্যতা খৃষ্টপুর্ব প্রায় তিন-চার হাজার বছরের প্রাচীন বলে প্রত্নতাত্বিক পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন। কাজেই প্রাচীন ভারতেও কাচের প্রস্তুতি ও প্রচলন ছিল, এবং মিশরীয়দের প্রায় সমসাময়িক কালে ভারতীয়েরা কাচ তৈরির কৌশল আয়ত্ব করেছিল বলে অনুমান করা যায়। যাহোক, কাচের প্রাচীনত্ব ও কোন দেশে কবে প্রথম কাচ উদ্ভাবিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে কাচ যে অন্ততঃ তিন-চার হাজার বছরের প্রাচীন শিল্প, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সেই প্রাচীন যুগে যেভাবেই হোক অত্যধিক উত্তাপে সোডা ও বালি এক সঙ্গে গলে-মিশে দৈবক্রমেই কাচের সৃষ্টি হয়ে থাকবে; তারপর সেই চক্‌চকে কঠিন পদার্থটা উপযুক্ত উত্তাপে তরল হয়, আর ঠাণ্ডা করলে আবার কঠিন হয়ে পড়ে দেখে মানুষ তাকে ছাঁচে ঢেলে নানা জিনিস তৈরি করতে সুরু করে। কাচের রাসায়নিক তথ্য ও তাৎপর্য সে-যুগের মানুষ অবশ্যই কিছু জানতো না। হাজার হাজার বছরে কাচ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানীর অক্লান্ত গবেষণার ফলে ক্রমে কাচ ও কাচশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে।

কাচের রাসায়নিক পরিচয়ঃ আমরা সবাই জানি, কাচ হলো এক প্রকার স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ। অবশ্য স্বচ্ছ ও কঠিন হলেই কোন পদার্থকে কাচ বলা যায় না; যেমন—অভ্র, প্লাস্টিক, সেলুয়েড প্রভৃতি স্বচ্ছ ও কঠিন হয়েও কাচ নয়। কাচের বৈশিষ্ট্য হলো তার ভঙ্গুরতা, আর পদার্থটা উপযুক্ত উত্তাপে তরল হয় ও ঠাণ্ডা করলে আবার কঠিন অবস্থায় আসে। এ-সব হলো কাচের সাধারণ ভৌত ধর্ম। অবশ্য অত্যধিক তাপসহ ও অভঙ্গুর কাচ তৈরি করাও ইদানিং কালে সম্ভব হয়েছে।

যে-কোন কাচের প্রধান উপাদান হলো বালি বা সিলিকা, অর্থাৎ সিলিকন নামক মৌলিক পদার্থের অক্সাইড (SiO_2) যৌগিক। প্রধানতঃ এই সিলিকা-ঘটিত পদার্থ বলে কাচকে বলা হয় সিলিকা-যৌগিক, বা সিলিকেট। বিশুদ্ধ বালি, সোডা ও চুন একসঙ্গে মিশিয়ে উত্তাপে গলালে যে অর্ধ-তরল মণ্ড পাওয়া যায়, তাকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করলে **সাধারণ কাচ** উৎপন্ন হয়। কেবল বালি ও সোডা উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে যে সোডিয়াম-সিলিকেট পাওয়া যায় তা-ও ঠাণ্ডা হলে কঠিন ও স্বচ্ছ এক রকম কাচের মত জিনিস উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু একে প্রকৃতপক্ষে কাচ বলা যায় না; জলে **দ্রাব্য** বলে এই সোডিয়াম-সিলিকেট দিয়ে কাচের কাজ হয় না। আবার বিশুদ্ধ বালি ও চুন একসঙ্গে গলিয়ে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম সিলিকেট, যা জলে অদ্রাব্য বটে, কিন্তু কাচের মত **স্বচ্ছ** নয়। কাজেই ক্যালসিয়াম-সিলিকেটও কাচ নয়। বালির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে সোডা ও চুনের রাসায়নিক সংযোগে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়ামের যে যুগ্ম সিলিকেট যৌগিক উৎপন্ন হয় তা একাধারে স্বচ্ছ ও জলে অদ্রাব্য। এই হলো আমাদের সাধারণ কাচ।

বিশুদ্ধ বালির সঙ্গে সোডা, বা সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে পটাস (পটাসিয়াম কার্বনেট), আর চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বদলে ম্যাগ্নেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, লেড, জিঙ্ক প্রভৃতির কোন ধাতব-অক্সাইড ব্যবহার করলে যে-সব বিভিন্ন মিশ্র সিলিকেট যৌগিক উৎপন্ন হয়, গুণে ও ধর্মে সেগুলিও হয় বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ। এই সব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বিভিন্ন ধাতব সিলিকেট-কাচে বিভিন্ন গুণ ও ভৌত প্রকৃতির তারতম্য দেখা দেয়। এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কাচের আলোচনা পরে করা যাবে। এখন আমরা কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বালি বা সিলিকা গালিয়েই যে এক রকম উৎকৃষ্ট কাচ উৎপন্ন হয়ে থাকে তার কথাই প্রথমে আলোচনা করছি।

সিলিকা-কাচঃ আমরা আগেই বলেছি, বিশুদ্ধ বালি হলো সিলিকা, বা সিলিকন-ডাইক্সাইড। একে **কোয়ার্টজ**-ও বলা হয়। বালির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, পৃথিবীতে বালি রয়েছে অফুরন্ত। সমুদ্রতীরে যে রাশি রাশি পরিষ্কার চকচকে বালু-কণা রয়েছে তা-ই বিশুদ্ধ বালুকা, বা সিলিকা। গ্রানাইট-প্রস্তরেও পদার্থটা কণিকাকারে সহজেই লক্ষিত হয়। কোন কোন ধাতব অক্সাইডের উপস্থিতির জন্যে বিভিন্ন বর্ণের সিলিকাও নানা স্থানে পাওয়া যায়। অলঙ্কারাদিতে 'অ্যামিথিস্ট' নামক যে প্রস্তর ব্যবহৃত হয় তা-ও মূলতঃ

সিলিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশুদ্ধ ও বর্ণহীন আকারে এক রকম সিলিকা আছে, যাকে বলে **রক-ক্রস্ট্যাল ;** পদার্থটা সাধারণতঃ ষড়তলবিশিষ্ট দানা, বা কেলাসের আকারে থাকে। রাসায়নিক বিচারে এগুলি সবই সিলিকা।

বিশুদ্ধ বালুকা বা যে-কোন শ্রেণীর সিলিকাকে প্রায় 1650° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তা গলে গিয়ে বর্ণহীন তরল আকার ধারণ করে। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার সাহায্যে, অথবা বিশেষ আকারের বৈদ্যুতিক চুল্লির উত্তাপে বালিকে গলিয়ে এরূপ তরল করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই তরল সিলিকা বা কোয়ার্টজকে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করলে এক রকম বর্ণহীন স্বচ্ছ কাচের মত কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। দেখতে এটা সাধারণ কাচেরই অনুরূপ, কিন্তু সাধারণ কাচের চেয়েও বেশি স্বচ্ছ ; বস্তুতঃ পৃথিবীতে এর চেয়ে স্বচ্ছতর পদার্থ বিরল। জিনিসটা প্রকৃত কাচ, বা সিলিকেট যৌগিক নয়, গলিত ও কঠিনীকৃত কোয়ার্টজ, বা সিলিকা মাত্র ; কিন্তু স্বচ্ছতায় ও বিভিন্ন গুণে ও ধর্মে এই **কোয়ার্টজ-কাচ** সাধারণ সিলিকেট-কাচের চেয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কোয়ার্টজ-কাচ পুড়িয়ে লাল করে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ডুবালেও এ-কাচ ফাটে না, অথবা ঠাণ্ডা অবস্থায় সহসা একে অক্সি-হাই-ড্রোজেন শিখায় প্রবেশ করালেও এর কোন ক্ষতি হয় না। কোয়ার্টজ-কাচের নলের ভিতরে গলিত অবস্থায় কোন ধাতব তার ফুটিয়ে নিয়ে সেই নলকে তড়িৎ-প্রবাহের উত্তাপে লাল করে ফেললে, বা সেই উত্তপ্ত অবস্থায় তাকে ঠাণ্ডা জলে ডুবালেও নলটা ফাটে না, ধাতব তারটাও খুলে যায় না। এই সব গুণের জন্যে কোয়ার্টজ-কাচ নানা রকম যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ যে-যন্ত্রে তাপের অতি দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

ইদানিং নিয়ন-বাতি, মার্কারি-ভেপার ল্যাম্প প্রভৃতি তপ্তোজ্জ্বল গ্যাসীয় আলোকের গোলক, নল প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাচে তৈরি করা হয়। রক-ক্রস্ট্যাল শ্রেণীর সিলিকা-কাচ বিশেষতঃ চশমা ও দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের লেন্স, প্রিজম প্রভৃতি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। সিলিকা কাচের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, একমাত্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ছাড়া অন্য কোন অ্যাসিডের সঙ্গেই এর বিক্রিয়া ঘটে না ; কিন্তু যে-কোন ক্ষার বা অ্যালকালির সংস্পর্শে এ-কাচ সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্ষয়ে যায়।

জল-কাচ, বা ওয়াটার গ্লাস ঃ আমরা আগেই বলেছি, কোয়ার্ট্জ বা সিলিকা-কাচ প্রকৃত কাচ, অর্থাৎ সিলিকেট-যৌগিক নয়, গলিত সিলিকার একক পদার্থ মাত্র। প্রকৃত কাচ হলো একাধিক ধাতব সিলিকেটের একীভূত মিশ্রণ। বিশুদ্ধ বালি বা সিলিকার সঙ্গে সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **সোডিয়াম সিলিকেট** যৌগিক উৎপন্ন হয়। বালি বা সিলিকা হলো একটা অ্যাসিড-মূলক অক্সাইড, তা সোডার কার্বনিক অ্যাসিড বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে বিমুক্ত করে দেয় এবং সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম-সিলিকেট উৎপন্ন করে। এই উত্তপ্ত তরল পদার্থটা ঠাণ্ডা হলে জমে গিয়ে কাচের মত স্বচ্ছ ও চক্চকে হয়ে ওঠে। সোডিয়াম সিলিকেট জলে বিশেষ দ্রাব্য বলে একে বলা হয় জল-কাচ বা **ওয়াটার গ্লাস**। জিনিসটা ধাতব সিলিকেট যৌগিক, কাজেই রাসায়নিক বিচারে একে কাচই বলা যায়, কিন্তু এ দিয়ে কাচের কাজ চলে না। কিন্তু এর নানা রকম ব্যবহার আছে এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়। সাবান-শিল্পে এই ওয়াটার গ্লাস বা সোডিয়াম সিলিকেটের ব্যবহার সম্পর্কে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। এছাড়া কাচ ও পোর্সিলেনের দ্রব্যাদি জুড়তে, ডিম সংরক্ষণের কাজে জিনিসটা প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এর জলীয় দ্রবণের মধ্যে ডিম, বা অন্য কোন জিনিস ডুবালে তার উপরে এই সিলিকেটের একটা অতি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আঠালো আবরণ পড়ে। স্বচ্ছতার জন্যে অলক্ষিত এই নিশ্ছিদ্র আবরণের জন্যে ভিতরের বস্তু বায়ুসম্পর্কশূন্য হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত বিকৃতি বা পচন-ক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। ওয়াটার-গ্লাসের জলীয় দ্রবণের বস্ত্রাদি পরিষ্কার করবার ক্ষমতাও কিছু আছে। বালির সঙ্গে সোডার বদলে পটাস, অর্থাৎ পটাসিয়াম কার্বনেটের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যে **পটাসিয়াম সিলিকেট** পাওয়া যায় তা-ও জলে বিশেষ দ্রাব্য ও ওয়াটার-গ্লাস পর্যায়ভুক্ত; আর এর গুণ ও ধর্মও মোটামুটিভাবে সোডিয়াম সিলিকেটেরই অনুরূপ।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ ঃ আগেই বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ বালি বা সিলিকার সঙ্গে সোডা ও চুন একসঙ্গে মিশিয়ে উত্তাপে গলিয়ে ফেললে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়ামের যে মিশ্র সিলিকেট যৌগিক উৎপন্ন হয় তাই হলো সাধারণ কাচ; কাচের স্বচ্ছতা, অদ্রাব্যতা, কাঠিন্য প্রভৃতি সব গুণই এর বজায় থাকে। বালির সঙ্গে কেবল সোডা বা পটাস মেশালে হয় **জল-কাচ,** আর কেবল চুন মিশিয়ে

গলিয়ে ফেললে উৎপন্ন হয় **অস্বচ্ছ,** কিন্তু জলে অদ্রাব্য কাচ (ক্যালসিয়াম সিলিকেট)। বালি ও সোডার (অথবা পটাসের) মিশ্রণের সঙ্গে কেবল চুন-ই (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) নয়, পরন্তু ম্যাগ্নেসিয়াম, লেড, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি যে-কোন একটা ধাতুর অক্সাইড মেশালেও স্বচ্ছ ও অদ্রাব্য কাচ পাওয়া যায়। এ থেকে বুঝতে হবে, কাচের কোন নির্দিষ্ট উপাদানিক ও রাসায়নিক গঠন নেই ; কিন্তু সব রকম কাচেই বালি ও সোডা, বা পটাস থাকতেই হবে ; সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সিলিকেটই হলো কাচের মূল উপাদান। অবশ্য কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর বালি বা সিলিকা (কোয়ার্টজ বা রক্-ক্রস্ট্যাল) গলিয়েও এক প্রকার উৎকৃষ্ট কাচ পাওয়া যায়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কাচের উল্লিখিত উপাদানগুলির বিভিন্নতাই কেবল নয়, তাদের পরিমাণের অদল-বদল করেও বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট কাচ উৎপাদন করা যায়। অবশ্য উপাদানগুলির বিশুদ্ধতা সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। উপাদানের বিভিন্নতায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ উৎপন্ন হয় নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

(i) **সোডিয়াম-ক্যালসিয়াম সিলিকেট** — বালি, সোডা ও চুনের মিশ্রণ গলিয়ে এই শ্রেণীর সাধারণ কাচ তৈরি করা হয়। এই কাচ দিয়ে সাধারণ শিশি-বোতল, নল, দণ্ড, হেরিকেনের চিমনি, তেলের কুপি প্রভৃতি অল্প মূল্যের নিত্যব্যবহার্য জিনিস প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর কাচ সহজে অল্প তাপেই গলে তরল হয়। চুনের বদলে বেরিয়াম অক্সাইড মেশালে কাচ আরও সহজে গলে এবং তার স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত বাড়ে। এই শ্রেণীর কাচ দিয়ে কম দামের আয়না, দরজা-জানালার শার্শি প্রভৃতির জন্য কাচের পাতও তৈরি করা হয়ে থাকে।

(ii) **পটাসিয়াম-ক্যালসিয়াম সিলিকেট** — এই কাচে বালি ও চুনের সঙ্গে সোডার বদলে পটাস (পটাসিয়াম কার্বনেট) ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর পটাস-কাচ গলাতে বেশি তাপ লাগে, আর দেখতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও চক্‌চকে হয়। এরূপ কিছুটা অধিক তাপসহ কাচে টেস্ট-টিউব, বীকার, ফ্লাস্ক, রেটর্ট বা বকযন্ত্র প্রভৃতি রসায়নাগারের বিবিধ পাত্র তৈরি করা হয়ে থাকে।

(iii) **পটাস-লেড সিলিকেট**—এই শ্রেণীর কাচ তৈরি করতে বালির সঙ্গে সোডার বদলে পটাস ও চুনের বদলে লেড বা সীসার অক্সাইড ব্যবহৃত

হয়। অবশ্য এ-কাচে অনেক সময় সামান্য কিছু পটাসিয়াম নাইট্রেট ও সোডিয়াম কার্বনেটও মেশানো হয়। বিশেষতঃ লেড থাকার জন্যে এই কাচ অল্প তাপে গলে, আর এর স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যও বেশি হয়। এজন্যে এই কাচ দিয়ে কারুকার্য-খচিত বিবিধ কাচ-দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। এই শ্রেণীর কাচে স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে আলোক-প্রতিসরণের ক্ষমতাও বেশি থাকে বলে এ দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে চশমার লেন্স (কাচ) এবং দামী আয়নার মোটা কাচের পাতও তৈরি করা হয়।

(iv) **বোরো-সিলিকেট কাচ** — বিশুদ্ধ বালির সঙ্গে সোডা, বা পটাসের সাধারণ কাচ-মিশ্রণে অল্প পরিমাণ বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে এই শ্রেণীর কাচ প্রস্তুত করা হয়। এরূপ উপাদানিক গঠনের কাচ অধিক তাপসহ হয় এবং সহজে ফাটে না। এই কাচে উচ্চ তাপের থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। বিশেষ তাপসহ বিখ্যাত **জেনা** ও **পাইরেক্স** কাচ, যা দিয়ে গবেষণাগারের কাচের দ্রব্যাদি তৈরি হয়, তাতে শতকরা মোটামুটি 10 ভাগ বোরিক অক্সাইড থাকে। বোরো-সিলিকেট কাচে সোডা বা পটাস না দিয়ে সিলিকার সঙ্গে কেবলমাত্র বোরিক অ্যাসিড, বা বোরিক অক্সাইড দিলে সেই কাচে আরও নানা গুণ দেখা দেয়। এই শ্রেণীর ক্ষার-বিহীন কাচে আলট্রা-ভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি সহজেই প্রতিসরিত হয়। এই বিশেষ গুণের জন্যে ফটোগ্রাফিযুক্ত টেলিস্কোপ যন্ত্রে ব্যবহার্য বিশেষ ধরনের লেন্স এই কাচ দিয়ে আজকাল তৈরি করা হচ্ছে। বহু দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের দূরবীক্ষণিক আলোক-চিত্র তোলা এই কাচ ব্যতীত অন্য সাধারণ কাচের লেন্সে সম্ভব হয় না।

(v) **ফস্‌ফো-সিলিকেট কাচ** — এই কাচে বালি, সোডা ও বেরিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট ব্যবহৃত হয়। জীবজন্তুর অস্থি-ভস্মই হলো রাসায়নিক হিসেবে ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। যাহোক, এই ফস্‌ফেট-কাচ দিয়ে আজকাল মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উৎকৃষ্ট লেন্স তৈরি করা হয়; কারণ, এই কাচের আলোক প্রতিসরণাংক যথেষ্ট বেশি।

(vi) **গলিত-সিলিকা কাচ** — বিশুদ্ধ কেলাসিত সিলিকা (রক ক্রুস্ট্যাল) গলিয়ে প্রস্তুত এই শ্রেণীর কাচের প্রস্তুতি ও প্রকৃতির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। এটা কোন ধাতব সিলিকেট নয়, গলিত সিলিকা মাত্র। এর তাপ-সহতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলা হয়েছে।

কয়েক প্রকার কাচের উপাদানিক গঠন, গুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে মোটামুটি কিছু বিবরণ দেওয়া হলো মাত্র। উপাদানের প্রকার ও পরিমাণের তারতম্যে আবার আরও নানারকম কাচ প্রস্তুত হয়ে থাকে।

কাচের প্রস্তুতি : কাচের মিশ্রণ গলানোর জন্যে সাধারণতঃ দু'রকম ভাঁটি বা চুল্লী ব্যবহার করা হয়, কুম্ভ ভাঁটি ও কুণ্ড (বা ট্যাঙ্ক) ভাঁটি। ফায়ার-ক্লে, বা অতি-তাপসহ এক রকম মাটির সঙ্গে সিলিমেনাইট প্রভৃতি কিছু খনিজ পদার্থ মিশিয়ে এই বিশেষ আকারের ভাঁটি, বা চতুষ্কোণ ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়। এরূপ একাধিক কুম্ভ বা ট্যাঙ্ক বিশেষ আকারের চুল্লীর মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় পর-পর বসিয়ে উত্তপ্ত করবার ব্যবস্থা করা হয়। আগের দিনে কাঠ অথবা কয়লা পুড়িয়ে এ-সব চুল্লী জ্বালানো হতো, আজকাল গ্যাসীয় জ্বালানী দিয়ে, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় এ-সব চুল্লীকে প্রজ্বলিত ও উত্তপ্ত রাখা হয়। যে রকম কাচ প্রস্তুত করতে হবে তার
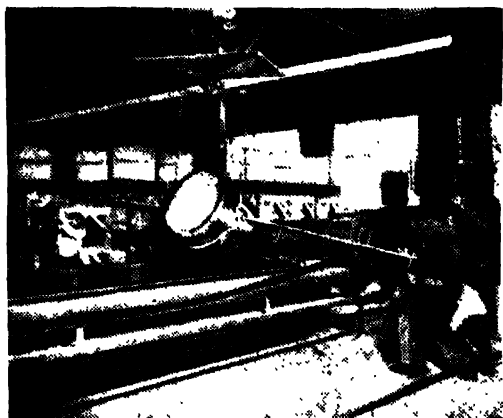
আধুনিক কাচশিল্প কারখানা (তরল কাচ ঢালা হচ্ছে)

উপাদানগুলিকে কিছুটা উত্তপ্ত অবস্থায় ঐসব আধারের মধ্যে আগে থেকে বেশ করে মিলিয়ে-মিশিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়, আর চুল্লীর উত্তাপে ভাঁটি বা ট্যাঙ্কের মধ্যে উপযুক্ত সময়ে তা গলে গিয়ে তরল কাচের মণ্ড তৈরি হয়। ভাঁটির মধ্যে এই তরল কাচ প্রথম দিকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ দেখায় না ; এর কারণ, উপাদান-গুলির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অসংখ্য বুদবুদ তরল কাচকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ক্রমে এই গ্যাস অপসারিত হয়ে বুদবুদগুলি মিলিয়ে যায়, আর তরল স্বচ্ছ কাচ দেখা দেয়।

এই তরল কাচকে এর পরে ছাঁচে ঢেলে, অথবা লম্বা ধাতব নলের মুখে

খানিকটা তরল কাচ তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ইচ্ছানুরূপ আকারের দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। নানা আকারের ফাঁপা জিনিস, যেমন কাচের গোলক, নল, ফ্লাস্ক প্রভৃতি সাধারণতঃ এভাবে ফুঁ দিয়েই তৈরি হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য এর জন্যে যান্ত্রিক ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছে। দক্ষ কারিগরেরা ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন আকার-আকৃতির কাচ-দ্রব্য সহজেই তৈরি করতে পারে। শিশি-বোতল, বৈদ্যুতিক বাতির বাল্ব প্রভৃতি তৈরি করতে আজকাল স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক কৌশলই অবলম্বিত হয়। এর ফলে সবগুলি যেমন একই রকম হয়, তেমনই উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে। কাচের কেবল ফাঁপা জিনিসই নয়, কাচের পাত বা সিট তৈরি করতেও আজকাল উন্নত ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আগের দিনে ধাতুনির্মিত সমতল ক্ষেত্রের উপরে তরল কাচ ঢেলে রোলারের সাহায্যে চেপে পাত তৈরি করা হতো; সস্তা কাচের পাত তৈরি করতে আজকালও এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে।

কাচের দ্রব্যাদি তৈরি করতে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় কাচের মূল উপাদানিক সংমিশ্রণেরও কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে। এর কারণ, যন্ত্র ব্যবহার করলে গলিত কাচ-পিণ্ড যাতে অপেক্ষাকৃত ধীর-গতিতে জমে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কঠিনীভবনে গলিত কাচে এরূপ ধীরতা আসে অবশ্য কাচ-মিশ্রণে চুনের ভাগ কমিয়ে ও সোডার ভাগ বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু এ-ব্যবস্থায় বস্তুতঃ কোন সুবিধা হয় না, যেহেতু সোডিয়ামের আধিক্যের ফলে সে-কাচ জলের সংস্পর্শে ক্ষয় হয়, অর্থাৎ কিছুটা দ্রবিত হয়ে যায়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে দেখা গেছে, কাচ-মিশ্রণে সামান্য পরিমাণে অ্যালুমিনা (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড, Al_2O_3) ও ম্যাগ্নেসিয়া (ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড, MgO) মেশালে উৎপন্ন গলিত কাচ অনেকটা ধীরে ধীরে জমে কঠিন হয়, জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং যন্ত্রের সাহায্যে দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে তা সুবিধাজনক হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ-দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত কাচের পাত যথেষ্ট নিখুঁত ও সমতল হয় বটে, কিন্তু তার উপরিভাগেও সামান্য উঁচু-নিচু থেকে যায়; যার ফলে এরূপ কাচের ভিতর দিয়ে দৃশ্য বস্তু স্থানে স্থানে বিকৃত দেখায়। এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে নির্মিত পাতের উপরিভাগ বিশেষ কৌশলে ঘষে পালিস করা হয়, যাকে বলা হয় **পেটেণ্ট কাচ**। এরূপ কাচের পাত দিয়ে

ফটো বাঁধানো, আয়না তৈরি প্রভৃতি কাজ হয়ে থাকে। এ-সব কাজে বিশেষ স্বচ্ছ, মসৃণ ও সম্পূর্ণ সুসমতল কাচের পাত ব্যবহার করতেই হয়, নতুবা প্রতিচ্ছবি এব্ড়ো-থেব্ড়ো ও বিকৃত দেখায়। কয়েক শতাব্দী আগেও কাচের দর্পণ তৈরি করবার কৌশল মানুষের জানা ছিল না; আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা পালিশ করা চক্চকে ধাতব দর্পণ ব্যবহার করতেন। সম্পূর্ণ মসৃণ ও স্বচ্ছ কাচের পাতের একদিকে আলোক প্রতিফলনক্ষম পদার্থের আস্তরণ লাগিয়ে আধুনিক কাচ-দর্পণ তৈরি করা হয়; ইংরেজীতে এই পদ্ধতিকে বলে **সিলভারিং** করা। প্রথম দিকে দর্পণের কাচের পাতে টিন ও পারদের (মার্কারি) সংমিশ্রণ, অর্থাৎ অ্যামালগামের আস্তরণ লাগানো হতো। কিন্তু পারদের যেমন দামও বেশি, তেমন আবার ধাতুটা নিয়ে কাজ করতে কারিগরদের এক রকম বিষ-ক্রিয়ারও ভয় থাকে। দর্পণের আস্তরণে তাই টিন-পারদ অ্যামালগামের ব্যবহার বন্ধ হয়েছে, আর তার পরিবর্তে সিলভার অর্থাৎ রৌপ্যের এক রকম আস্তরণ দেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাচের গায়ে সূক্ষ্ম রৌপ্য-কণিকা সর্বত্র সমানভাবে এঁটে গিয়ে আস্তরণটাকে বিশেষভাবে আলোক-প্রতিফলনক্ষম করে তোলে। আজকাল আবার রূপার বদলে সুকৌশলে অ্যালুমিনিয়াম-কণিকার আস্তরণ ধরিয়েও কাচ-দর্পণ তৈরি করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে দর্পণের উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে।
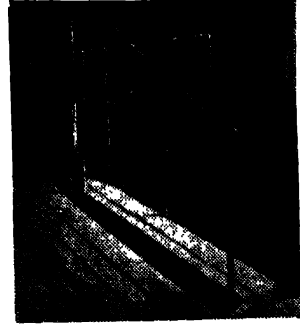
কাচের পাত তৈরির বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতি

কাচের কোমলায়ন : তরল কাচ ছাঁচে ঢেলে, বা ফুঁ দিয়ে, যেভাবেই নির্মিত হোক না কেন, কাচের জিনিস তৈরি হওয়ার পরে আবার সেগুলিকে যথোপযুক্তভাবে উত্তপ্ত করা হয়। কাচ প্রায় নরম হয়ে আসে এমন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে নিয়ে একটা আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে রেখে তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এই পদ্ধতিকে বলে **অ্যানিলিং ;** এর সার্থকতা হলো এই যে, উৎপাদন-কালে যথেষ্ট দ্রুত ঠাণ্ডা ও কঠিন হওয়ার ফলে তৈরী দ্রব্যাদির কাচ অতিমাত্রায় কঠিন হয় বটে, কিন্তু তার গায়ে সামান্য

একটু আঁচড় কাটলেও জিনিসটা সহজেই খণ্ড-খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যায় ; অ্যানিলিং পদ্ধতিতে কাচের এই ত্রুটি দূর হয়। কাচের এই অবস্থার বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো **রুপার্ট ড্রপ** নামক এক রকম কাচের খেলনা, যা সপ্তদশ শতাব্দীতে রুপার্ট নামক এক ব্যক্তি উদ্ভাবন করেছিলেন। ঠাণ্ডা তেলের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত তরল কাচের কিছুটা ফোঁটার আকারে ফেললে তা সহসা ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হয়ে পড়ে। এই কাচের পিণ্ড বা ফোঁটা হয় অত্যন্ত কঠিন ; এমন কি, হাতুড়ীর আঘাতেও ভাঙ্গে না ; কিন্তু এর গায়ে উকো দিয়ে সামান্য একটু আঁচড় কাটলে বা ফোঁটার গায়ে সংলগ্ন সরু অংশ ভেঙ্গে দিলে সঙ্গে সঙ্গে গোটা জিনিসটার কাচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

যাহোক, কাচের দ্রব্যাদি তৈরি করতে তরল কাচের কঠিনীভবনের দ্রুততা ও ধীরতার উপরে কাচ-দ্রব্যের স্থায়িত্ব ও উপযোগিতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কাচ-শিল্পে উল্লিখিত **অ্যানিলিং পদ্ধতি** তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অতি-কঠিন কাচ

কাচের কোমলায়ন বা 'অ্যানিলিং' প্রসঙ্গে যে ঘাতসহ কাচের উল্লেখ করা হয়েছে তার কোন অংশ একটু ভাঙ্গলে, বা তাতে ছুরি বা উকো দিয়ে একটু আঁচড় কাটলে সব জিনিসটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় বটে, কিন্তু কাঠিন্যে এই কাচের তুলনা নেই। রাসায়নিক সংযুক্তিতে এ-কাচের কোন বৈশিষ্ট্য নেই ; সাধারণ কাচ-মিশ্রণে উৎপাদিত কাচের প্রকৃতিতে এই কাঠিন্য আসে কেবল গরম কাচকে ঠাণ্ডা করবার কৌশলের বৈশিষ্ট্যে। প্রস্তুতির পরে বেশ গরম অবস্থায়ই ঠাণ্ডা তেলের ভিতরে ডুবিয়ে দিলে কাচের উপরিভাগের স্তর অতি দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে পড়ে, ভিতরের অংশ নরমই থাকে। ভিতরের এই গরম কাচ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হওয়ার সময়ে বাইরের কঠিন স্তরের উপরে ক্রমাগত একটা চাপ দেয়, যার ফলে কাচের জিনিসটা অত্যন্ত কঠিন ও ঘাতসহ হয়ে পড়ে। ভঙ্গুর কাচের বদলে—এই অতি কঠিন কাচের আজকাল যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে, অবশ্য যদিও এটা মূলতঃ কোন বিশেষ শ্রেণীর কাচ নয়। একে অতি-কঠিন বা **কঠোর কাচ,** (ইংরেজীতে 'tough glass') বলা হয়।

প্রাচীন গ্রন্থাদির বিবরণ থেকে জানা যায়, প্রায় দু'হাজার বছর আগে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই এরূপ কঠোর কাচের দ্রব্যাদি উৎপাদনের কৌশল

উদ্ভাবিত হয়েছিল; রোম-সম্রাট জুলিয়াস সিজারের রাজত্বকালের একটি কাহিনী থেকে এ-কথা জানা যায়। সে-যুগের এক কাচ-শিল্পী এমন সুকঠিন কাচের পাত্রাদি তৈরি করতে পারতো যে, সোনা বা রূপার তৈরী পাত্রের মত কঠিন আঘাতেও সেগুলি ভাঙতো না। একদিন সেই শিল্পী কাচের একটি অতি সুদৃশ্য পান-পাত্র তৈরি করে সম্রাট সিজারকে সেটি উপহার দিতে গেল। সম্রাট পান-পাত্রটির গঠন-নৈপুণ্য ও কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে সেটি গ্রহণ করেন এবং প্রশংসার সঙ্গে শিল্পীকে প্রচুর পরিতোষিক দান করেন। সম্রাট ও সভাসদগণকে আরও মুগ্ধ ও বিস্মিত করে সম্রাটের অধিকতর অনুগ্রহ লাভের আশায় শিল্পী তার পান-পাত্রটি চেয়ে নিয়ে সভাকক্ষের প্রস্তর-কঠিন মেঝের উপরে সেটিকে সজোরে নিক্ষেপ করে। সে আঘাতে যে-কোন কঠিন ধাতুনির্মিত পাত্রও অক্ষত থাকবার নয়; সিজার শিল্পীর এরূপ কাজে বিস্মিত ও বিরক্ত হন। কিন্তু শিল্পী হৃষ্ট চিত্তে সেটি ভূমিতল থেকে তুলে দেখাল, পাত্রটি ভাঙ্গে নি, ধাতু-পাত্রের মত একটু টোল খেয়েছে মাত্র,—এ যেন কাচের স্বচ্ছতা নিয়ে কোন ধাতুনির্মিত পাত্র। লোকটি তার পকেট থেকে হাতুড়ী বার করে সেই কাচ-পাত্রের টোল-খাওয়া অংশ ঘা মেরে-মেরে মেরামত করে ফেলে, যেন ওটা একটা কাঁসা-পিতলের ঘড়া। সভাসদগণসহ সিজার এ-সব দেখে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলেন; আর শিল্পী সম্রাটের প্রীতি-প্রশংসা ও পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির আশায় উন্মুখ হয়ে উঠলো। অবস্থাটা কিন্তু ঘটলো বিপরীত; সিজার শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আর কেউ এরূপ কঠিন ও ঘাতসহ কাচ তৈরি করবার কৌশল জানে কিনা। শিল্পী সানন্দে ও সগর্বে বলেছিল, একমাত্র সে-ই এ বিদ্যার অধিকারী, পৃথিবীতে আর কেউ এ কৌশল জানে না। সম্রাট সিজার তৎক্ষণাৎ সেই শিল্পীর শিরচ্ছেদের আদেশ দিয়ে মন্তব্য করেন, 'এরূপ গুণসম্পন্ন কাচের উৎপাদন-শিল্প প্রসার লাভ করলে পৃথিবীতে সোনা-রূপার কোন কদরই থাকবে না, রাজৈশ্বর্য মূল্যহীন হয়ে পড়বে।' কাহিনীটা কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই।

নিরাপদ কাচ

মোটর গাড়ীর দরজা-জানালায় এক বিশেষ ধরনের কাচ ব্যবহৃত হয়, যা বাইরের কোন আঘাতে হয়তো ফেটে যেতে পারে, কিন্তু সাধারণ কাচের মত তার ধারালো টুকরো ছিটকে গিয়ে লোকের বিপদ ঘটায় না। এরূপ কাচকে বলা

হয় 'নিরাপদ কাচ' ; আইনানুযায়ী মোটর গাড়ী, লরি প্রভৃতিতে এরূপ কাচের পাত ব্যবহার করতে হয়। এটা অবশ্য কোন বিশেষ শ্রেণীর কাচ নয়, সাধারণ কাচেরই পাতলা দু'খানা বা তিনখানা পাতের মাঝে কোন স্বচ্ছ আঠালো পদার্থ দিয়ে চেপে একসঙ্গে জুড়ে এই নিরাপদ-কাচ সাধারণতঃ তৈরি হয়ে থাকে। এরূপ দ্বি-পাত বা ত্রি-পাত কাচকে আবার ইংরেজীতে বলে **'ট্রাইপ্লেক্স গ্লাস'।** দু'খানা পাতের মাঝে সেলুলয়েড শ্রেণীর স্বচ্ছ প্লাস্টিক-পদার্থ, বা 'ক্যানাডা-বাল্‌সাম' নামক স্বচ্ছ আঠা লাগিয়ে হাইড্রলিক প্রেসের চাপে তাদের জুড়ে ফেলা হয়। আজকাল কোথাও কোথাও 'ভাইনাল' নামক এক রকম পলিভাইনাল প্লাস্টিক মাঝে দিয়েও এরূপ ট্রাইপেক্স কাচ তৈরি হয়ে থাকে। ভিতরে স্বচ্ছ পদার্থের আস্তরণ থাকায় এর স্বচ্ছতা কিছুমাত্র নষ্ট হয় না ; অথচ এরূপ যুক্ত-কাচের পাত বেশ শক্ত হয়। গুরুতর আঘাত লাগলে এ-কাচ ফেটে চৌচির হলেও টুকরোগুলি ছিটকে বেরিয়ে যায় না, ভিতরের আঠালো স্তরে এঁটে থাকে। এরূপ ট্রাইপ্লেক্স কাচে ক্যানাডা-বালসাম ব্যবহার করলে বিশেষতঃ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সুবিধাজনক হয় না। গরম আবহাওয়ায় ভিতরের ক্যানাডা-বাল্‌সামের স্তর কয়েক বছর পরে অস্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়ে পরে। যাহোক, মোটা কাচের পাতের ভিতরে ধাতব তার-জালি দিয়ে তৈরি করেও এক রকম নিরাপদ কাচ প্রস্তুত করা হয়।

সাম্প্রতিক কালে উল্লিখিত ট্রাইপ্লেক্স কাচের চেয়েও উন্নত শ্রেণীর নিরাপদ কাচ প্রচলিত হয়েছে, যাকে বলা হয় **'আর্মারপ্লেট' কাচ,** বা কঠিনীকৃত ট্রাইপ্লেক্স কাচ। নামে ট্রাইপ্লেক্স হলেও এটা দ্বি-পাত বা ত্রি-পাত কাচের মত জোড়া কাচ নয়। এটা সাধারণ কাচেরই একক পাত, যাকে বিশেষ কৌশলে পূর্বোল্লিখিত রূপার্ট ড্রপের মত অতি কঠিন কাচে পরিণত করা হয়। উত্তপ্ত করে কাচের পাতকে প্রায় নরম অবস্থায় নিয়ে তারপরে শীতল তেলে না ডুবিয়ে সুকৌশলে বায়ুর ঝাপ্‌টা দিয়ে তাকে অতি দ্রুত ঠাণ্ডা করবার
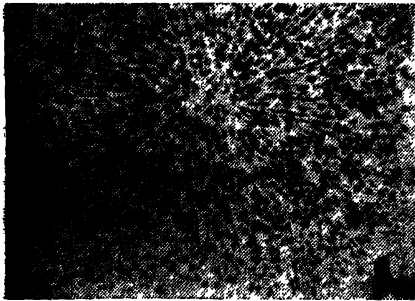
'আর্মারপ্লেট' কাচের পাত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েও লেগে থাকে

ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাচের পাত যথেষ্ট শক্ত, অথচ নমনীয় হয়ে পড়ে; আঘাতে সহজে ভাঙ্গে না, আর ভাঙ্গলেও সাধারণ কাচের মত ধারালো টুকরা ছিট্‌কে বেরিয়ে লোককে মারাত্মক আঘাত করে না। এই 'আর্মারপ্লেট' কাচ আঘাতে ছোট ছোট টুকরায় চির খেয়ে ফেটে গিয়েও গেলে থাকে, তেমন ছিট্‌কায় না। এই শ্রেণীর অতি-কঠোর কাচ কিন্তু কাটা যায় না, কাটতে গেলে রূপার্ট ড্রপের মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ-জন্যে সাধারণ কাচের পাত আগে থেকে সাইজ মত কেটে নিয়ে তারপরে তাকে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিতে কঠিনীকরণের ব্যবস্থা করা হয়।

তাপসহ কাচ

বিশেষ রাসায়নিক গঠনের এক শ্রেণীর কাচ অত্যধিক তাপ সহ্য করতে পারে; ধাতু-পাত্রের মত এরূপ উচ্চতাপ-সহ কাচের পাত্রে রান্নাবান্নার কাজ পর্যন্ত চলে। রসায়নাগারের ফ্লাস্ক, রেটর্ট প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাচে তৈরি হয়ে থাকে; আর এ-কাজে **পাইরেক্স** কাচ সুপরিচিত। পাইরেক্স কাচ তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তেমন সংকুচিত বা প্রসারিত হয় না, অর্থাৎ এর সম্প্রসারণাংক হয় অতি সামান্য। এরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই এই বিশেষ গঠনের কাচ অতি উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। এরূপ তাপসহ কাচ উৎপাদনের জন্যে কাচ-মিশ্রণে সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেটের ভাগ যথেষ্ট কমিয়ে বালি বা সিলিকার ভাগ অনেকটা বাড়িয়ে দিতে হয় এবং এই মিশ্রণে কিছু বোরিক অক্সাইড দেওয়া হয়। বোরিক অক্সাইড কাচের সম্প্রসারণাংক কমাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পাইরেক্স কাঁচের মিশ্রণে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় 80 ভাগ সিলিকা, 4 ভাগ মাত্র সোডা, 12 ভাগ বোরিক অক্সাইড ও 4 ভাগ অ্যালুমিনা (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড) দেওয়া হয়। এভাবে উৎপাদিত পাইরেক্স কাচ বেশ স্বচ্ছ ও অত্যন্ত তাপসহ হয়ে থাকে।

পাইরেক্স শ্রেণীর কাচের সম্প্রসারণাংক বিশেষ কম বলে এ-দিয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রতিফলক লেন্স তৈরি করা হয়। তাপের বৈষম্যে এই কাচে তৈরী লেন্সের তল-বক্রতা বদলায় না, আকার-আকৃতি সর্বদা সঠিক থাকে। পৃথিবীর বিখ্যাত বীক্ষণাগারগুলির বড় বড় দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের বৃহদাকার লেন্স সাধারণতঃ এই শ্রেণীর কাচে নির্মিত হয়।

রঙীন কাচ ও নকল মণি

নানা কাজে বিভিন্ন বর্ণের রঙীন কাচ ব্যবহৃত হয়। রঙীন কাচের চুড়ি, পুঁতি প্রভৃতির বহুল ব্যবহার আছে; তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণের আলোকের জন্যে বিভিন্ন রঙীন কাচ চাই। মোটর গাড়ী, এরোপ্লেন, জাহাজ প্রভৃতির চলাচলের নিরাপত্তার জন্যে ব্যবহৃত আলোক-সংকেতে বিভিন্ন রঙীন কাচের আলোর বহুল প্রচলন হয়েছে। আবার বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট এক শ্রেণীর কাচ থেকে নকল মণি তৈরি করা হয়। তরল কাচ, বা গলিত সিলিকেট-মিশ্রণের ভিতরে সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন ধাতু ও ধাতব অক্সাইড মিশিয়ে বিভিন্ন রঙীন কাচ সহজেই উৎপাদন করা যায়; যেমন, সামান্য লৌহ বা কপার (তামা) অক্সাইড মেশালে কাচের রং হয় **সবুজ**, ম্যাঙ্গানিজ-অক্সাইডে হয় **বেগুনী**, ক্যাডমিয়াম সালফাইড মেশালে হয় **লাল**। কাচ-মিশ্রণে কোবাল্ট অক্সাইড মিশিয়ে উৎপন্ন কাচের রঙ হয় **গাঢ় নীল**। এরূপ বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড মিশিয়ে বিভিন্ন বর্ণের কাচ এভাবে তৈরি হয়ে থাকে; অক্সাইডের পরিমাণ ও মিশ্রণ-পদ্ধতির তারতম্যের উপরে রঙের গাঢ়তা ও ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে। সাধারণ কাচের শিশি-বোতলে যে একটা হালকা সবুজ আভা দেখা যায় তার কারণ, সাধারণ কাচের অবিশুদ্ধ উপাদানগুলিতে স্বভাবতঃই কিছু লোহার ভাগ থাকে।

কোন কোন ইলেকট্রিক বাল্ব ও নিয়ন-বাতির নল প্রভৃতি যে **দুধের মত সাদা** কাচে তৈরি হয় তার জন্যে কাচ-মিশ্রণে 'বোন-অ্যাস' বা অস্থি-ভস্ম মেশানো হয়। অস্থি-ভস্ম হলো প্রধানতঃ ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট। ইউরেনিয়াম ধাতুর কোন কোন লবণ সামান্য পরিমাণে মেশালে কাচের রঙ হয় হল্‌দে আভাযুক্ত সবুজ, এই সুদৃশ্য রঙীন কাচে নানারকম সৌখিন কাচদ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। কাচ-মিশ্রণে চুনের বদলে জিঙ্ক-অক্সাইড ব্যবহার করে তাতে সামান্য সিলিনিয়াম মেশালে কাচের রঙ হয় উজ্জ্বল লাল; এরূপ **লাল কাচ** মোটর গাড়ির পেছনের বাতি, রেলের সিগন্যাল-বাতি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। সামান্য সোনা মিশিয়ে যে গোলাপী-লাল বর্ণের **রুবি-কাচ** প্রস্তুত হয় তাতে অবশ্য মিশ্রিত সোনা কাচের সিলিকেটের সঙ্গে মিলিত হয় না। এক্ষেত্রে সোনা অতি সূক্ষ্ম কণিকায় বিভক্ত হয়ে গলিত কাচের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, যাকে সোনার 'কলয়িড্যাল' অবস্থা বলা যায়। সোনার এরূপ কণিকাগুলি এত সূক্ষ্ম হয় যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না; এরূপ কাচ তাই রঙীন অথচ স্বচ্ছ

দেখায়। সোনার পরিমাণ বেশি হলে আর এ-কাচের স্বচ্ছতা থাকে না, স্বর্ণ-কণিকাগুলি কাচ থেকে পৃথক হয়ে থাকায় তার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন বর্ণের পান্না, নীলা, চুনি প্রভৃতি উজ্জ্বল ও মূল্যবান প্রাকৃতিক প্রস্তর বা মণির অনুরূপ রঙীন কাচের **নকল মণি** তৈরি করা হয়। নকল মণির জন্যে অবশ্য বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ ছাড়াও মূল কাচ-মিশ্রণেরও কিছু উপাদানিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এর জন্যে বিশুদ্ধ বালির সঙ্গে রেড লেড (সীসার অক্সাইড) ও পটাস কার্বনেট ব্যবহার করা হয় ; এর ফলে কাচের ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যও বাড়ে। এই কাচ-মিশ্রণ তাপ-সহ মুচিতে গলিয়ে সেই তরল কাচ ঠাণ্ডা জলে ঢেলে দিলে সহসা কঠিন হয়ে শত শত খণ্ডে ফেটে যায়। এই কাচ-খণ্ডগুলিকে বেশ করে গুঁড়িয়ে তাতে প্রয়োজনানুরূপ রঞ্জক পদার্থ মেশানো হয়, এবং পোর্সিলেনের মুচিতে আবার গলালে রঙীন কাচ পাওয়া যায়। এই তরল কাচকে সাবধানে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করতে হয়, যাতে জমতে গিয়ে কাচ না ফাটে। বেশ ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়ে গেলে মুচিটা ভেঙ্গে এই রঙীন কাচপিণ্ড উদ্ধার করা হয় ; তার পরে তা থেকে ইচ্ছানুযায়ী সাইজে কেটে ও ঘষে পালিস করে বিভিন্ন আকারের নকল মণি তৈরি করা হয়।

নকল মণির উল্লিখিত কাচ-মিশ্রণে শতকরা একভাগ কোবাল্ট অক্সাইড মেশালে কাচপিণ্ডের রঙ হয় ঘোর নীল ; এই কাচ দিয়ে কৃত্রিম **নীলা** বা 'নীলকান্ত মণি' প্রস্তুত করা হয়, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় **স্যাফায়ার**। শতকরা প্রায় অর্ধভাগ কপার অক্সাইড মেশালে কাচের রঙ হয় উজ্জ্বল সবুজ ; এ থেকে কৃত্রিম **পান্না** বা 'মরকত মণি' (ইংরেজীতে যাকে বলে এমারেল্ড) তৈরি করা হয়। **সাদা চুনি** বা ওপ্যাল কাচে থাকে শতকরা 20 ভাগ অস্থিভস্ম ও একভাগ অ্যান্টিমনি অক্সাইড ; অস্থিভস্মের ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটই প্রধানতঃ কাচকে দুধের মত সাদা করে। কাচ-মিশ্রণে সামান্য সোনা মেশালে যে গোলাপী লাল কাচ পাওয়া যায়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে ; একে বলে রুবী-কাচ। এরূপ কাচ থেকে কৃত্রিম **লাল চুনি** (রেড-রুবি) প্রস্তুত করা হয়। আবার এক রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মণি আছে, যাকে ইংরেজীতে বলে **'ব্ল্যাক ব্যালাস্ট'** ; কৃত্রিম ব্যালাস্ট তৈরি করতে কাচ-মিশ্রণে শতকরা 2 ভাগ ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড ও 2 ভাগ লৌহ অক্সাইড মেশানো হয়। এ-সব রঙীন কাচের কৃত্রিম মণিগুলির উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য অনেকটা প্রাকৃতিক মূল্যবান প্রস্তর বা মণির মত হয় বটে, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করলে নানা বৈশিষ্ট্যে এগুলির কৃত্রিমতা ধরা পড়ে।

কাচের নানা বিশিষ্ট রূপ ও ব্যবহার

সুপরিচিত কয়েক রকম কাচ ও তাদের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহারাদি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু কিছু আলোচনা করা হলো। বর্তমান যুগে কাচ-শিল্প বহু বিস্তৃত, আর কাচের ব্যবহারও ব্যাপক। কত বিচিত্র ও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন কাচ ইদানিং উৎপাদিত হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। কেবল উপাদানগত বৈশিষ্ট্যই নয়, একই কাচের বর্ণ ও ভৌত প্রকৃতিতে নানা বৈচিত্র্য এনে দৃশ্যতঃ নানা শ্রেণীর কাচ আজকাল উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে। সে-সবের সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; কাচের কয়েকটি বিশিষ্ট রূপ ও তাদের বিচিত্র সব ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমরা কাচ-প্রসঙ্গ শেষ করবো।

আজকাল সাধারণ কাচকে বিশেষ কৌশলে স্পঞ্জের মত সছিদ্র ও হাল্কা করবার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, একে বলা হয় **ফেন-কাচ,** বা ফোম-গ্লাস। কাচ-মিশ্রণের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে কোন সহজদাহ্য ও গ্যাস-উৎপাদক পদার্থ মিশিয়ে গলালে এরূপ কাচ পাওয়া যায়। উত্তাপে ঐ পদার্থ থেকে উদ্ভূত গ্যাস গলিত কাচকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে এরূপ সছিদ্র ও ঝাঝ্‌ড়া করে তোলে; ব্যাপারটা অনেকটা পাউরুটি তৈরি করবার মত (পৃঃ 119)। ফেন-কাচ সাধারণতঃ বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হয় না, হয় অস্বচ্ছ ও সাদা; আর তা এত হাল্কা হয় যে, জলে ভেসে থাকে। ভিতরে বায়ু ও গ্যাসের অসংখ্য বুদ্‌বুদ থাকায় ফেন-কাচের তাপ-পরিবহণ ক্ষমতা যথেষ্ট কম; তার ফলে এই কাচের পাত, ইট, টালি প্রভৃতি দিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরি করলে তা অনেকটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ও আরামদায়ক হয়। পাশ্চাত্য দেশে ফেন-কাচের এরূপ ঘর-বাড়ীর প্রচলন হয়েছে। এ-কাচ করাত দিয়ে কাটা চলে, ছিদ্র করাও যায়। আমাদের দেশে ফেন-কাচের উৎপাদন ও প্রচলন আজও তেমন প্রসার লাভ করে নি। কোথাও কোথাও সছিদ্র ও হালকা এক রকম পাথর পাওয়া যায় যাকে বলে **পিউমিস** পাথর; বিভিন্ন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে এটা ফেন-কাচের অনুরূপ। পিউমিস পাথরকে বস্তুতঃ প্রাকৃতিক ফেন-কাচ বলা যায়।

চাপের প্রভাবে আবদ্ধ পাত্রের উত্তপ্ত গলিত কাচকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চেপে বার করলে তা সুতার আকারে গুচ্ছ-গুচ্ছ বেরিয়ে আসে। বিশেষ কৌশলে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করলে এই সূক্ষ্ম কাচ-তন্তু নমনীয় ও অভঙ্গুর হয়। এরূপ নমনীয়

কাচ-তন্তুকে বলে **গ্লাস-উল**। রসায়নাগারে অ্যাসিড বা ক্ষারীয় দ্রবণের পরিস্রাবণ-পদ্ধতিতে ফিল্টার-কাগজ, তুলা প্রভৃতির বদলে এই গ্লাস-উল ব্যবহৃত হয়; কারণ বিশুদ্ধ কাচের সঙ্গে অ্যাসিড বা ক্ষারের কোন বিক্রিয়া ঘটে না। এরূপ সূক্ষ্ম কাচ-তন্তু দিয়ে বস্ত্রাদিও তৈরি করা হয়; এরূপ **কাচ-বস্ত্র** বেশ চাক্‌চিক্যময় উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। কাচের তাপ-পরিবাহিতা কম বলে এর বস্ত্র ও পোষাক পরলে শীত কম লাগে, গরম পশমী বস্ত্রের কাজ হয়। এ জন্যে শীতপ্রধান দেশে কাচ-বস্ত্রের কিছুটা প্রচলন হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো এ জিনিস জলে ভেজে না, বা আগুনে পোড়ে না। সাধারণ বস্ত্রের মত কাচবস্ত্রে রঙ্ ধরে না; কিন্তু রঙীন কাচের তন্তু দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের বেশ ঝল্‌মলে বস্ত্র তৈরি করা যায়। কাচ-বস্ত্র দেখতে কৃত্রিম রেশম-বস্ত্রের মত হলেও ততটা কোমল হয় না; এর আর একটা ত্রুটি হলো, নাড়া-চাড়ায় এতে এক রকম ঝন্‌ঝনে মৃদু শব্দ হয়। এ-সব সত্ত্বেও এরূপ বস্ত্র চাকচিক্যে ও ব্যবহারে উৎকৃষ্ট; আর এটা হলো কাচের এক অভিনব ব্যবহার। আমাদের দেশে অবশ্য আজও কাচ-বস্ত্রের উৎপাদন ও প্রচলন হয় নি।

সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত অলংকার ও পাত্রাদির উপরে যে বিভিন্ন বর্ণোজ্জ্বল ও সুদৃশ্য মিনার কাজ করা হয়, তা মূলতঃ এক প্রকার বিশেষ ধরনের রঙীন কাচ মাত্র। অল্প তাপমাত্রায় গলনক্ষম রঙীন কাচের প্রলেপ লাগিয়ে ধাতব দ্রব্য উত্তপ্ত করলে ঐ কাচ ধাতুর গায়ে এঁটে লেগে যায়। রাসায়নিক গঠনে ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে **মিনা-কাচ** নানা রকমের তৈরি হয়; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তার গলনাংক যে ধাতুর উপরে লাগাতে হবে তার গলনাংকের চেয়ে যথেষ্ট কম হওয়া দরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধাতু ও ধাতু-সংকর

ধাতু ও অধাতু : অ্যাল্‌কেমিস্টদের সপ্তধাতু : সম্ভ্রান্ত ধাতু ও নিকৃষ্ট ধাতু : স্বর্ণ নিষ্কাশন, অ্যাকোয়া-রিজিয়া, ক্যারেট গোল্ড, শ্বেত স্বর্ণ : রৌপ্য নিষ্কাশন — সিলভার গ্লান্স, রৌপ্য সংকর ও রৌপ্য মুদ্রা : প্লাটিনাম—পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য, প্লাটিনাইট : লৌহেতর ধাতুগোষ্ঠী —তামা ও তামার ধাতু-সংকর পিতল ও কাঁসা, ডাচ মেটাল, বেল মেটাল ও সিলভারয়েড : নিকেল — পরিচয় ও ব্যবহার, কার্বনিল নিকেল, জার্মান সিলভার ও নিক্রোম : ক্রোমিয়াম ও টিন—নিষ্কাশন ও ব্যবহার, ব্রিটেনিয়া মেটাল, সিলভার-পেপার, গ্রে-টিন ও টিন-প্লেগ : জিঙ্ক — নিষ্কাশন ও ব্যবহার, গ্যালভ্যানাইজিং, জিঙ্ক-হোয়াইট ও লিথোপোন : পারদ বা মার্কারি : সীসা — টাইপ মেটাল, রেড লেড, মিনিয়াম, হোয়াইট লেড ও 'সুগার অব লেড' : লৌহ ও ইস্পাত — লৌহের খনিজ ও নিষ্কাশন, ব্লাস্ট ফার্ণেস ; পিগ, কাস্ট ও রট্‌ আয়রন : ইস্পাত উৎপাদন — বিসিমার পদ্ধতি, সিমেণ্টাইট, বেসিক স্ল্যাগ, ইন্‌ভার ও এলিন্‌ভার, স্টেনলেস স্টিল, হাই-কার্বন ও হাই-স্পিড ষ্টীল ও প্লাটিনাইট : টাংস্টেন বা উলফ্রাম ধাতু।

মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে নানা প্রকার ধাতুর ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ ; তাই মানব-সভ্যতার ক্রম বিকাশের ইতিহাসে ধাতু ব্যবহারের মাপ-কাঠিতেই সভ্যতার যুগ-পর্যায় নির্ণীত হয়েছে—প্রস্তর যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। বহু সহস্র বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানতো না, পাথরের হাতিয়ার ও জিনিস-পত্র দিয়েই জীবন-সংগ্রামের কাজ চালাতো। তারও আবার কয়েক হাজার বছর পরে মানুষ ক্রমে তামা ও টিন ধাতু আবিষ্কার করেছে ও তাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত কঠিনতর সংকর-ধাতু ব্রোঞ্জের ব্যবহার শিখেছে। এর ফলে মানব-সভ্যতার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে মানুষের জীবন-যাত্রার পথ অনেকটা সুগম হয়। মানুষ ক্রমে খনিজ প্রস্তর থেকে লৌহ নিষ্কাশনের পদ্ধতি আয়ত্ত করে এবং লৌহের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে আরও উন্নত জীবনযাত্রা সুরু করে। ইতিমধ্যে অবশ্য পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের মানুষ তামা ও দস্তার সংকর-ধাতু পিতলের ব্যবহারও শিখেছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে। এসব কথা আমরা 'রসায়নের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক অধ্যায়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। যাহোক, ধাতু ব্যবহারের মাপকাঠিতে মানব-সভ্যতার এরূপ যুগ-বিভাগ নিঃসন্দেহে বাস্তবতা-সম্মত ;

কিন্তু এটা পৃথিবীর সর্বত্র সমকালীন ছিল না। কোন অঞ্চলে কোন জাতির মধ্যে লৌহ হয়তো অনেকটা প্রচলিত হয়েছে, তখনও হয়তো অন্যত্র অপর জাতির মধ্যে ব্রোঞ্জের ব্যবহার চলছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় লোহার কার্যকারিতা বুঝে ক্রমে শেষে সর্বত্র লোহার ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। এক হিসেবে এখনও আমরা লৌহ-যুগেই বাস করছি। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহার ও বহুমুখী উপযোগিতার তথ্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইতিমধ্যে আরও বহুবিধ ধাতু ও ধাতু-সংকর আবিষ্কৃত হয়ে আধুনিক শিল্প-সভ্যতা দিকে-দিকে প্রসারিত ও সমুন্নত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে ; কিন্তু লৌহের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।

কয়েকটি মাত্র ধাতু, বিশেষতঃ সোনা প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় কোথাও কোথাও কিছু কিছু আজও পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, আদিম মানুষ ধাতুর মধ্যে সোনার সঙ্গেই সর্বপ্রথম পরিচয় লাভ করেছিল। সোনার স্বাভাবিক সুদৃশ্য বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্যের জন্যে এবং তাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে সহজে মনোমত আকারের জিনিসে পরিণত করা যায় বলে আদিম যুগেও যেমন, বর্তমান যুগেও তেমনি, সোনা একটি মূল্যবান ধাতু হিসেবে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এবং অলংকারাদি তৈরির কাজে সোনা ব্যবহৃত হচ্ছে। সোনা যতই সুদৃশ্য ও মূল্যবান ধাতু বলে গণ্য হোক না কেন, কোন যুগেই ধাতুটা মানুষের জীবন-সংগ্রামে ও বাস্তব শিল্প-প্রয়োজনে সার্থক ধাতু বলে বিবেচিত হয় নি। চিরকালই দেহের শোভাবর্ধনেই দেখা যায় এর সর্বাধিক ব্যবহার। মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব প্রায় 3500 বছরের পুরাতন নানারকম স্বর্ণালংকার রয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের জীবন-সংগ্রাম ও শিল্প-প্রসারে ধাতুটার উপযোগিতা নেই বলে মানব-সভ্যতার যুগ-বিভাগ সোনা দিয়ে করা হয় নি, হয়েছে নিকৃষ্ট কঠিন ধাতু তামা (ব্রোঞ্জ) ও লোহা দিয়ে। যাহোক সোনা, রুপা ও প্লাটিনাম ধাতু প্রকৃতিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় কিছু কিছু পাওয়া যায় ; তা ছাড়া অন্যান্য সব ধাতুই প্রকৃতিতে রয়েছে বিভিন্ন যৌগিকের আকারে, যা থেকে বিশুদ্ধ ধাতু কৌশলে নিষ্কাশিত করে নিয়ে তবে তাকে কাজে লাগানো যায়। কাজেই খনিজ থেকে বিভিন্ন জটিল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন-বিদ্যা রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায।

পৃথিবীর যাবতীয় মৌলিক পদার্থগুলিকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—ধাতু ও অধাতু। সাধারণভাবে বলা যায়, ধাতু হবে

কঠিন, অস্বচ্ছ, আর তার থাকবে বিশেষ ধাতব বর্ণোজ্জ্বলতা; আবার ধাতু মাত্রই হবে মোটামুটি তাপ ও তড়িৎ পরিবাহী। ধাতু হবে অভঙ্গুর, উত্তাপে নরম হবে, আর তাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে সরু তার ও পাতে পরিণত করা যাবে। ধাতুকে অধাতু থেকে পৃথক করতে এ-সব ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য অবশ্য সব ক্ষেত্রে সমভাবে খাটে না; তথাপি ধাতুকে মোটামুটিভাবে উল্লিখিত বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট বলা যেতে পারে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে; যেমন, ধাতুর অন্যান্য অনেক ধর্ম উপস্থিত থেকেও পারদ বা মার্কারি তরল পদার্থ; একমাত্র তরল ধাতু। সে যাই হোক, বহুবিধ ধাতুর মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা প্রভৃতি কতকগুলি অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ধাতু ও তাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বিভিন্ন ধাতু-সংকর সম্বন্ধে আমরা এই অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করবো।

অ্যাল্‌কেমি যুগ পর্যন্ত মোটামুটি সাতটা ধাতুর সঙ্গে মানুষ প্রথম দিকে পরিচিত হয়েছিল। অ্যালকেমিস্টরা মনে করতেন, এগুলির নিজ নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য এরা বিভিন্ন গ্রহ ও সূর্য থেকে অর্জন করেছে, আর তাই এগুলির মধ্যে এক-একটি জ্যোতিষ্কের প্রভাব বর্তমান। এই ধারণা থেকে অ্যালকেমিস্টরা তাদের পরিচিত সাতটা ধাতুকে সাতটা জ্যোতিষ্কের তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যা-সম্মত সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা পরিচিত করেছিলেন; যেমন:

ধাতু	গ্রহ	প্রতীক	ধাতু	গ্রহ	প্রতীক
সোনা	সূর্য	☉	সীসা	শনি	♄
রূপা	চন্দ্র	☾	টিন	বৃহস্পতি	♃
তামা	শুক্র	♀	পারদ	বুধ	☿
লোহা	মঙ্গল	♂			

ধাতুগুলির বর্ণ ও কোন কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অ্যালকেমিস্টরা এরূপ প্রতীক ব্যবহারে উৎসাহিত হয়েছিলেন; যেমন, ঔজ্জ্বল্যের জন্যে সোনাকে সূর্য, শ্বেতবর্ণের জন্য রূপাকে চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের দ্বারা ধাতুগুলি প্রভাবিত বলে তাঁদের ধারণা জন্মেছিল। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা অর্থহীন ও অহেতুক। ধাতু সম্পর্কে এই প্রাচীন ধারণার কিছু রেশ অবশ্য এখনও রয়ে গেছে; যেমন, সিলভার-নাইট্রেট যৌগিক অদ্যাপি 'লুনার কস্টিক' (চন্দ্র সম্বন্ধীয় ক্ষার) নামে পরিচিত। পারদের প্রাচীন

'মার্কারি' (বুধ গ্রহ) নাম এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পারদ বা মার্কারি আবার 'কুইক-সিলভার' নামেও পরিচিত।

এখন বহুল ব্যবহৃত সাধারণ ধাতুগুলির নিষ্কাশন-পদ্ধতি, গুণ, ধর্ম ও ব্যবহার প্রভৃতি এবং তাদের বিভিন্ন ধাতু-সংকর সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করবো। ধাতুগুলিকে তাদের মুখ্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের বিচারে প্রধানতঃ দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে — **উৎকৃষ্ট** বা সম্ভ্রান্ত ধাতু (noble metal) ও **নিকৃষ্ট** ধাতু (base metal)। সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম হলো সম্ভ্রান্ত ধাতু ; এদের কৌলিন্যের কারণ হলো, এই ধাতুত্রয়ে মরচে ধরে না,—সাধারণতঃ সর্বাবস্থায় এরা অবিকৃত ও উজ্জ্বল থাকে ; আবার দুষ্প্রাপ্য বলে মূল্যবানও বটে। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট ধাতু তামা, লোহা, সীসা প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুগুলি সাধারণ আবহাওয়ায় ঔজ্জ্বল্য ও বিশুদ্ধতা হারায় এবং বিভিন্ন যৌগের আকারে এগুলি খনিজ থেকে প্রচুর পাওয়া যায় বলে দামেও সস্তা। অবশ্য মানুষের বাস্তব প্রয়োজন, কাযকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে ধাতুর এরূপ শ্রেণীবিভাগ অসঙ্গত।

সম্ভ্রান্ত ধাতু-গোষ্ঠী

(সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম)

সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম ধাতু তিনটি পৃথিবীতে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অবস্থায় কোথাও কোথাও পাওয়া যায় ; অবশ্য রূপা ও প্লাটিনাম অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে রাসায়নিক যৌগিকের আকারে খনিজরূপেও থাকতে পারে। এই ধাতু তিনটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা-মানে, মূল্যবান অলংকার-শিল্পে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে বিশেষতঃ প্লাটিনাম ধাতু সর্বাধিক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ।

সোনা : পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে প্রস্তরের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় বিশুদ্ধ সোনা আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে, রাশিয়ায়, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডা রাজ্যে এরূপ স্বর্ণ-মিশ্রিত প্রস্তরের খনি আছে এবং পৃথিবীর বেশির ভাগ সোনা এ-সব দেশে উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও দক্ষিণ ভারতের কোলার অঞ্চলে এরূপ সোনার খনি আছে, তবে তা-থেকে সামান্য পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়। অতীতকালে কোন কোন স্থানের বালুকার সঙ্গে, বিশেষতঃ নদীবাহিত বালি ও কাদার মধ্যে যথেষ্ট স্বর্ণ-কণিকা পাওয়া যেত। শুনা যায়, সুবর্ণরেখা নদীর

বালিতে এরূপ বিশুদ্ধ সোনার কণা পাওয়া যেত, আর তার জন্যেই নদীটার এই নামের উৎপত্তি। সোনা বিশুদ্ধ অবস্থায় এরূপ নানাস্থানে পাওয়া যেত এবং এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে অতি প্রাচীনকালের গুহাবাসী মানুষেরাই বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে প্রথমে সোনা চিনেছিল।

এরাই প্রথমে সোনা চিনেছিল

যাহোক, আজকাল স্বর্ণকণিকা-মিশ্রিত খনিজ প্রস্তর থেকেই সোনা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই **নিষ্কাশন** পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম; তবে মোটমুটি কৌশলটা একই। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় (রোটারি মিলে) স্বর্ণ-প্রস্তরকে অতি সূক্ষ্ম কণিকায় চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়; তারপরে তাকে প্রশস্ত ও সামান্য হেলানো পাটাতনের উপরে রেখে জলধারায় ধৌত করলে সোনার ভারী দানাগুলি প্রস্তর ও অন্যান্য পদার্থ থেকে মোটামুটিভাবে পৃথক হয়ে যায়। এর পরে সেই অধিকতর সোনা-মিশ্রিত চূর্ণকে প্রকাণ্ড পাত্রে নিয়ে তাতে পারদ মিশিয়ে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাড়া-চাড়া করলে সোনা ও পারদ মিশে **অ্যামালগাম,** বা পারদ-সংকর তৈরি হয়ে প্রস্তর-চূর্ণ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। এই স্বর্ণ-পারদ সংকর উত্তপ্ত করে পাতন-পদ্ধতিতে পারদ বাষ্পাকারে পৃথক করে নিলে পাত্রে বিশুদ্ধ সোনা পড়ে থাকে। চূর্ণিত স্বর্ণ-প্রস্তর ধৌত করে বেশির

ভাগ সোনা পৃথক করে নেওয়ার পরে অবশিষ্ট প্রস্তর-চূর্ণের সঙ্গে যে সামান্য সোনা থেকে যায়, তাকে উদ্ধার করবার জন্যে ঐ চূর্ণের মধ্যে সোডিয়াম-সায়েনাইড লবণের জলীয় দ্রবণ মেশানো হয়। এর ফলে অবশিষ্ট সোনা ঐ সায়েনাইড দ্রবণে গলে বেরিয়ে আসে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়। স্বর্ণ-প্রস্তর থেকে সোনা নিষ্কাশনের আরও নানা রকম পদ্ধতি আছে।

আমরা আগেই বলেছি, সাধারণ জলহাওয়ায় সোনা তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায় না; লোহার মত সোনার অক্সাইড হয় না। সোনার সঙ্গে সহজে কোন অ্যাসিড বা ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না; কোন একক অ্যাসিডে ধাতুটা গলেও না। সোনার একমাত্র দ্রাবক হলো **'অ্যাকোয়া-রিজিয়া'**—একভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও চার ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ। সোনা গলানোর এই অ্যাসিড-মিশ্রণটা প্রাচীন অ্যাল্‌কেমিস্টরাই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তাঁদের দেওয়া এই অ্যাকোয়া-রিজিয়া নামটা এখনও চলছে। অ্যাকোয়া-রিজিয়ায় দ্রবিত সোনা 'গোল্ড ক্লোরাইড' নামক লবণের হল্‌দে দানার আকারে দ্রবণ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সোনার এই ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণ ফটোগ্রাফের ছবি পরিস্ফুট করতে ব্যবহৃত হয়।

সোনার সর্বাধিক ব্যবহার অলংকার শিল্পে। তবে একেবারে বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে তৈরী অলংকারের গঠন ও কারুকার্য তেমন স্থায়ী হয় না, কারণ খাটি সোনা যথেষ্ট নরম। ধাতুটা এমন প্রসার্য যে, একে পিটিয়ে অতি সূক্ষ্ম পাতে এবং টেনে চুলের চেয়েও বহুগুণ সরু তারে পরিণত করা যায়। ফুঁ দিলে উড়ে যায় এমন সূক্ষ্ম সোনার পাত করা যায়, যার বেধ এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, বা এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র হতে পারে। সোনার রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Au (ল্যাটিন শব্দ **'Aurum'** থেকে); আণবিক ওজন 197·2, আপেক্ষিক গুরুত্ব 19·3, গলনাংক 1,063 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সোনার বিশুদ্ধতা সাধারণতঃ **ক্যারেট** হিসাবে প্রকাশ করা হয়, বিশুদ্ধ সোনা হলো 24 ক্যারেট। সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে ধাতুটা বিশেষ নরম বলে এর সঙ্গে তামা ও রূপা মিশিয়ে ধাতু-সংকর তৈরি করে একে ব্যবহারোপ-যোগী কাঠিন্য দেওয়া হয়। স্বর্ণ-মুদ্রা তৈরি করতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানের ক্যারেট-সোনা ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের স্বর্ণ মুদ্রায় থাকে 22 ক্যারেট সোনা (যাকে বলে গিনি সোনা), অর্থাৎ 22 ভাগ বিশুদ্ধ সোনার সঙ্গে 2 ভাগ

তামা ও রূপার মিশ্রণ ; শতকরা হিসাবে গিনি সোনায় থাকে 91·67 ভাগ সোনা, 2 ভাগ রূপা ও 6·33 ভাগ তামা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণমুদ্রায় থাকে শতকরা 90 ভাগ সোনা ও 10 ভাগ তামা ও রূপা। ভারতের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা 'মোহরে' সোনার বিশেষ কোন সুনির্দিষ্ট মান ছিল না — আকবরী মোহর এক রকম, আবার প্রাচীন হিন্দুযুগের স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল অন্য রকম। বর্তমানে ভারতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এক রকম নেই, বলা যায়।

অলংকার-শিল্পে আমাদের দেশে সাধারণতঃ '22 ক্যারেট' সোনাই পূর্বে ব্যবহৃত হতো, যাকে বলা হতো 'গিনি সোনা'। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সোনার অত্যধিক প্রয়োজনের জন্যে কয়েক বছর আগে ভারত সরকার এদেশে '14 ক্যারেট' সোনার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছিল ; 14 ক্যারেট মানে মিশ্র সোনার 24 ভাগের মধ্যে 14 ভাগ সোনা ও 10 ভাগ তামা ও রূপা। দেশের স্বার্থে এর অধিক মানের সোনা অলংকারাদিতে ব্যবহার করা আইন-বিরুদ্ধ হওয়াই উচিত। অন্যান্য প্রায় সব দেশে আগে থেকেই 18 ক্যারেট বা তারও নিম্নমানের সোনা অলংকার-শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দেহের শোভা বৃদ্ধির জন্যে উচ্চমানের সোনা ব্যবহার করে এই মূল্যবান ধাতুকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অকেজো করে রাখা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থবিরোধী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনেক দেশে অলংকার-শিল্পে **'শ্বেত স্বর্ণ'** যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। জিনিসটা দেখতে মূল্যবান প্লাটিনাম ধাতুর মত চকচকে সাদা ; সামান্য সোনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ প্যালাডিয়াম বা নিকেল ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত একটা উজ্জ্বল সংকর-ধাতু হলো এই শ্বেতস্বর্ণ।

রূপা : প্রাচীনকালে পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাকৃতিক বিশুদ্ধ রৌপ্যপিণ্ড পাওয়া যেত ; কাজেই সোনার মত রূপার ব্যবহারও সুপ্রাচীন। আজকালও উত্তর আমেরিকার কানাডা রাজ্যে বিশুদ্ধ রৌপ্যপিণ্ড কিছু কিছু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গন্ধকের সঙ্গে রাসায়নিক যৌগিকের আকারে রূপার সালফাইড খনিজ থেকেই ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে ; এই খনিজকে বলে **'সিলভার গ্লান্স'** বা **আর্জেন্টাইট**। তামা, সীসা, পারদ প্রভৃতির সঙ্গে রূপার সংকর-ধাতুর আকারে বিভিন্ন খনিজ থেকেও রূপা নিষ্কাশিত করা হয়। এসব খনিজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেই প্রধানতঃ পাওয়া যায় এবং নানা জটিল পদ্ধতিতে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। মৌলিক ধাতু রূপার রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Ag (ল্যাটিন নাম 'আর্জেন্টাম' থেকে) ;

পারমাণবিক ওজন 107·88, আপেক্ষিক গুরুত্ব 10·5, গলনাংক প্রায় 950 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সোনার মত রূপাও বহুকাল থেকেই অলংকার-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে আসছে ; তবে এর মুখ্য ব্যবহার হলো মুদ্রা তৈরির কাজে। আগের দিনে প্রায় খাঁটি রূপা দিয়েই টাকা তৈরি করা হতো, কাঠিন্য বৃদ্ধির জন্যে সামান্য তামা ও নিকেল মিশিয়ে রূপার সংকর-ধাতু সৃষ্টি করা হতো মাত্র। রূপার দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্য বৃদ্ধির জন্যে আজকাল রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হ্রাস করা হয়েছে, যা-ও তৈরি হয় তাতে শতকরা 40 ভাগেরও বেশি নিকেল প্রভৃতি ধাতুর খাদ থাকে। রূপার অন্যান্য নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে বর্তমান যুগে কোন দেশেই খাঁটি রৌপ্য-মুদ্রা তৈরি করা হয় না। পূর্বে ইংলণ্ডের স্টার্লিং মুদ্রায় যেখানে প্রায় শতকরা 90 ভাগ রূপা থাকতো, আজকাল থাকে মাত্র 50 ভাগ ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য মুদ্রায় আগে মাত্র 10 ভাগ তামা মেশানো হতো, আজকাল মেশানো হয় শতকরা 40 ভাগ তামা, 5 ভাগ নিকেল ও 5 ভাগ দস্তা। সব দেশেই রৌপ্য মুদ্রার ধাতু-মূল্য এভাবে হ্রাস পেয়েছে।

রূপা সম্ভ্রান্ত ধাতুগোষ্ঠীর অন্যতম ; এতে মরিচা ধরে না, সাধারণ উষ্ণতায়, এমন কি, উচ্চ তাপেও রূপা অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় না, অর্থাৎ অক্সিডাইজ করে না। সাধারণ জলহাওয়ায় রূপার উপরে যে মালিন্য ধরে তা প্রকৃত-পক্ষে রূপার সালফাইড গঠনের ফলে। বায়ুতে, বিশেষতঃ বড় বড় শিল্প-নগরীর বায়ুমণ্ডলে সাল্ফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস অধিকমাত্রায় মিশ্রিত থাকে, আর তার সংস্পর্শে রূপার সালফাইড যৌগিক সৃষ্টি হয়ে ধাতুটার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সালফাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্যে রূপার জিনিস ডোবালে তার উপরে যে কালো আস্তরণ পড়ে, সাধারণ কথায় তাকে 'অক্সিডাইজ্‌ড সিলভার' বলা হলেও তা বস্তুতঃ অক্সাইড নয়, রূপার সালফাইড (Ag_2S) যৌগিক। সোনার মত রূপাও বিশুদ্ধ অবস্থায় যথেষ্ট নরম বলে তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর খাদ মিশিয়ে তাকে ব্যবহারোপযোগী কঠিন করা হয়। অলংকারাদি ও মুদ্রা তৈরি করা ছাড়াও রূপার নানা রকম রাসায়নিক ব্যবহারও আছে : রূপার বিভিন্ন যৌগিক, বিশেষতঃ ক্লোরাইড ($AgCl$), ব্রোমাইড ($AgBr$) সবিশেষ **আলোক-সুবেদী** বলে ফটোগ্রাফির কাজে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর জিনিসের উপরে রৌপ্য-প্রলেপ ধরাতে (সিল্‌ভার-প্লেটিং করতে) ইলেক্‌ট্রো

প্লেটিং প্রক্রিয়ায় পটাসিয়াম-সিলভার সায়েনাইড, [$KAg(CN)_2$] লবণ ব্যবহৃত হয়। সিলভার-নাইট্রেট ($AgNO_3$) সল্টের জলীয় দ্রবণ চোখের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রূপার গাঢ় ধূসর বর্ণের অক্সাইড (Ag_2O) হলদে রঙের কাচ তৈরির কাজে কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ধাতু মাত্রেই অবশ্য তাপ ও তড়িতের চলাচলে মোটামুটি সুপরিবাহী ; কিন্তু রূপা হলো তাপ ও তড়িতের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক পরিবাহী ধাতু।

প্লাটিনাম ঃ প্রচলিত ধাতুগুলির মধ্যে প্লাটিনাম সব চেয়ে মূল্যবান, সোনার চেয়েও বহুগুণ বেশি। দেখতে রূপার মত সাদা, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য, কাঠিন্য ও অন্যান্য নানা গুণ ও ধর্মে প্লাটিনাম উৎকৃষ্টতর। ধাতুটার পারমাণবিক ওজন 195·23 ; আপেক্ষিক গুরুত্ব 21·4 ; গলনাংক 1750° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এর স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য সোনার চেয়েও দীর্ঘস্থায়ী, কিছুতেই এর বিকৃতি ঘটে না। প্লাটিনামকে পিটিয়ে অতি সূক্ষ্ম তার ও পাতে পরিণত করা যায় ; তাই মণি-মুক্তাখচিত মূল্যবান অলংকার তৈরি করতে ধাতুটা ব্যবহৃত হয়। রসায়নাগারেও এর বিশেষ ব্যবহার আছে ; অত্যধিক গলনাংকের জন্যে ধাতুটা সহজে গলে না, অথবা কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে এর বিক্রিয়াও ঘটে না। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্লাটিনাম একটি বিশেষ কার্যকরী অনুঘটক (ক্যাটালিস্ট) হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

এক সময় রাশিয়ার উরাল পার্বত্য অঞ্চলেই প্রধানতঃ প্লাটিনাম পাওয়া যেত। পরে কানাডা রাজ্যে প্রচুর প্লাটিনাম ও তৎশ্রেণীর প্যালাডিয়াম, ইরিডিয়াম ও রেডিয়াম ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। আজকাল কানাডাতেই সারা পৃথিবীর অর্ধাংশ পরিমাণ প্লাটিনাম পাওয়া যায়, রাশিয়ার স্থান দ্বিতীয়। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার ব্রেজিল, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও প্লাটিনাম ও তৎশ্রেণীর মূল্যবান ধাতুগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পাওয়া যায়। খনিজ প্লাটিনামের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই প্যালাডিয়াম, ইরিডিয়াম ও ও রেডিয়াম ধাতু প্রাকৃতিক খনিজের আকারে মিশ্রিত থাকে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এদের পৃথকভাবে নিষ্কাশিত করা হয়।

প্লাটিনাম ধাতুর একটা বৈশিষ্ট্য হলো, উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ধাতুটার সঙ্কোচন ও প্রসারণের হার কাচের প্রায় অনুরূপ ; তাই কাচ গলিয়ে তার মধ্যে প্লাটিনামের তার ঢুকিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করলে তারটা এঁটে থাকে, কাচ ফেটে যায় না। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে এবং অত্যধিক তাপসহ বলে উন্নত ধরনের

বৈদ্যুতিক বাতি ও যন্ত্রপাতিতে প্লাটিনামের তার সংযোজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আজকাল এ-সব কাজে মূল্যবান প্লাটিনাম ধাতু ব্যবহারের আর প্রয়োজন হয় না; এর পরিবর্তে **প্লাটিনাইট** নামক এক রকম ধাতু-সংকর ব্যবহৃত হয়। নিকেল ও লৌহের সংমিশ্রণে প্রস্তুত অনুরূপ গুণসম্পন্ন এই ধাতু-সংকরের কথা আমরা পরে 'লৌহ ও ইস্পাত' প্রসঙ্গে আলোচনা করবো।

লৌহেতর ধাতু ও ধাতু-সংকর সমূহ

বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে ধাতুগুলির মধ্যে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবহারই সর্বাধিক ও সর্বব্যাপক; লোহাই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধাতু। কাজেই লোহা ও তার বিভিন্ন সংকর-ধাতুকে একটি বিশেষ শ্রেণীর ধাতু হিসাবে গণ্য করা হয়; আর লোহা ছাড়া অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য ধাতুগুলিকে লৌহেতর **(nonferrous)** ধাতুগোষ্ঠী বলা হয়। আমরা প্রথমে এই লৌহেতর ধাতুগুলির কিছু আলোচনা করবো।

তামা ঃ আদিম যুগের মানুষ হয়তো সোনার পরেই তামার সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমিত হয়েছে যে, খৃষ্টপূর্ব 5000 বছর আগেও মানুষ তামার ব্যবহার জানতো। সোনার মত তামাও প্রকৃতিতে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অবস্থায় কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিও তামার সালফাইড ও কার্বনেট খনিজ থেকেই প্রধানতঃ ধাতুটা আজকাল নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, কানাডা, আফ্রিকার কঙ্গো ও রোডেসিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রাকৃতিক খনিজ থেকে প্রচুর পরিমাণে তামা উৎপাদিত হয়ে থাকে। লাল্চে বর্ণের মৌলিক ধাতু তামার রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Cu (ল্যাটিন নাম 'কুপ্রাম' থেকে)। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ বলা হয় যে, প্রাচীন রোমক সভ্যতার যুগে একমাত্র সাইপ্রাস দ্বীপেই বিশুদ্ধ তামা পাওয়া যেত, তাই সাইপ্রাসের প্রাচীন নাম থেকে তামাকে কুপ্রাম বলা হয়।

তামার পারমাণবিক ওজন 63.57, আপেক্ষিক গুরুত্ব 8.95, গলনাংক 1083° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তামা বিশুদ্ধ অবস্থায় অনেকটা নরম বলে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি তা দিয়ে সুবিধাজনক হয় না। বিশুদ্ধ তামার সর্বাধিক ব্যবহার হলো বৈদ্যুতিক তার তৈরির শিল্পে। কপার পাইরাইটস, কপার গ্লান্স, ম্যালাকাইট, অ্যাজুরাইট প্রভৃতি তামার বিভিন্ন খনিজ-প্রস্তর

থেকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতব তামা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই তামা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় না বলে তা বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে অনুপযোগী ; কারণ সামান্য মালিন্য বা খাদ মিশ্রিত থাকলেও তামার তড়িৎ-পরিবাহী ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। তড়িৎ-পরিবাহী হিসেবে সব ধাতুর মধ্যে উৎকৃষ্ট ধাতু রূপার পরেই তামার স্থান ; কাজেই রূপার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুলভ ও স্বল্পমূল্য বলে এ-কাজে তামাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়া চাই। বৈদ্যুতিক তারের জন্য খনিজ থেকে নিষ্কাশিত সাধারণ তামাকে বিশেষ ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। এভাবে উৎপন্ন অতিবিশুদ্ধ তামাকে বলা হয় **'ইলেক্‌ট্রোলিটিক কপার'**। এ সম্বন্ধে 'রসায়ন ও তড়িৎশক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

ধাতব তামার রং লাল্‌চে, যাকে আমরা তামাটে-লাল বলি। সাধারণ জল-হাওয়ায় তামার স্বাভাবিক বর্ণ লোপ পায় ; বায়ুর অক্সিজেন ও সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রভাবে তামার উপরে তার অক্সাইড ও সালফাইড যৌগিকের কাল্‌চে-বাদামী বর্ণের একটা আস্তরণ পড়ে। আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে দীর্ঘ দিনে তামার উপরে ধাতুটার বেসিক কার্বনেট লবণের একটা সবুজ আস্তরণও পড়তে পারে। তামার সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যথাক্রমে তামার ক্লোরাইড, নাইট্রেট ও সালফেট লবণ উৎপন্ন হয়। অ্যাসিডের সঙ্গে তামার বিক্রিয়ার তারতম্যে দু'রকমের লবণ উৎপন্ন হয় ; যেমন—কিউপ্রাস ক্লোরাইড ($CuCl$) এবং কিউপ্রিক ক্লোরাইড ($CuCl_2$)। তামার সালফেট যৌগিক কপার-সালফেট (বিশেষ নাম **'ব্লু-ভিট্রিয়ল'**) হলো একটি নীলবর্ণের স্ফটিকাকার পদার্থ ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$); আমাদের পরিচিত বস্তু তুঁতে, যার জলীয় দ্রবণ কীটনাশক ঔষধ হিসেবে পোকা-মাকড় ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে বিশুদ্ধ তামা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা তৈরির জন্যেও তামার ব্যবহার আছে ; বর্তমান যুগে অবশ্য মুদ্রা তৈরির জন্যে তামার প্রচলন প্রায় লোপ পেয়েছে, বিভিন্ন সংকর-ধাতুই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। তামা যথেষ্ট নরম বলে এককভাবে ধাতুটা সাধারণ ব্যবহারে অনুপযোগী ; কিন্তু অপরাপর ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন তামার বিভিন্ন ধাতু-সংকর যথেষ্ট কঠিন ও ব্যবহারোপযোগী

হয়ে থাকে। তাই বহুল ব্যবহৃত ও অতি প্রয়োজনীয় নানা রকম সংকর-ধাতুর উৎপাদন-শিল্পে তামার ব্যবহার অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানব-সভ্যতার আদিযুগে যে **ব্রোঞ্জ**-এর ব্যবহার সুরু হয়েছিল তা-ও তামার সঙ্গে টিন ধাতুর একটা ধাতু-সংকর মাত্র। তামার সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে দস্তা ও টিন মিশিয়ে তৈরি হয় কাঁসা (বেল-মেটাল) ও পিতল (ব্রাস) নামক সংকর-ধাতু ; এদের ব্যবহার এ-যুগে বহুবিস্তৃত এবং এই শিল্পে প্রভূত পরিমাণ তামার প্রয়োজন হয়। তামা ও টিনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতু ব্রোঞ্জের কথা আগেই বলা হয়েছে, একে বাংলায় বলা হয় বিদড়ী। মিশ্রণের অনুপাতের বিভিন্নতায় বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁসা ও পিতল তৈরি হয়, কিন্তু তামা তাতে থাকবেই।

পিতল — এই সংকর-ধাতুকে ইংরেজীতে বলে 'ব্রাস' ; সাধারণতঃ শতকরা 80 ভাগ তামা ও 20 ভাগ দস্তার সংমিশ্রণে পিতল তৈরি হয়, যার বর্ণ হয় হল্‌দে। এর বিশেষ নাম **ডাচ-মেটাল (Dutch metal)**। এ দিয়ে বাসনপত্র তৈজসাদি, নানা যন্ত্রাংশ, ঢালাই জিনিস প্রভৃতি তৈরি করা হয়। আবার 70 ভাগ তামার সঙ্গে 30 ভাগ দস্তা (জিঙ্ক) মিশিয়ে এক প্রকার উৎকৃষ্টতর পিতল উৎপন্ন হয়, যার বর্ণ অপেক্ষাকৃত সাদাটে হয়ে থাকে। যে পিতলে শতকরা 40 ভাগ দস্তা থাকে তাকে বলে **মাঞ্জ মেটাল (muntz metal)** ; বিশেষ কাঠিন্য ও ক্ষয়রোধক গুণের জন্যে এই ধাতু-সংকরের পাত দিয়ে অনেক সময় সমুদ্রগামী জাহাজের তলদেশ মুড়ে দেওয়া হয়। যাহোক, এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর পিতল ও তামার আরও কোন-কোন সংকর-ধাতুকে হাতুড়ির আঘাতে পিটিয়ে, অথবা যান্ত্রিক চাপে টেনে-বাড়িয়ে যে-সব
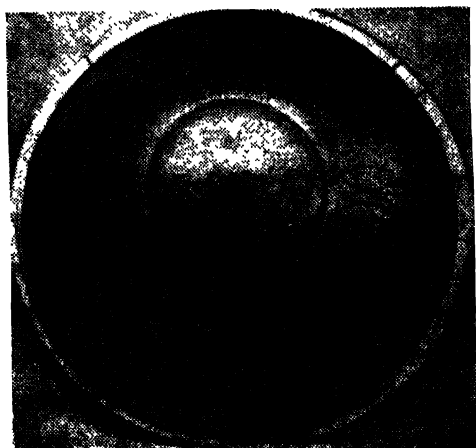
পিতলের পাত্রে অনেক সময় এরূপ সুন্দর চির ধরে

জিনিস তৈরি করা হয় তাদের গায়ে অনেক সময় সূক্ষ্ম চির ধরে এবং পরে ফেটে যায়। হাওয়ায় সামান্য অ্যামোনিয়া গ্যাস মিশ্রিত থাকলে পিতলের জিনিসের এই ত্রুটি আরও বৃদ্ধি পায়। এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে তৈরী জিনিসগুলিকে 200° থেকে 300° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপাংকে কিছু সময় উত্তপ্ত করা হয়; এর ফলে তৈরী জিনিসের ভিতরের ধাতব টান দূর হয়, কিন্তু তার কাঠিন্য নষ্ট হয় না। এই প্রক্রিয়ায় পিতলের তৈরী জিনিস সহজে ফাটে না। প্রক্রিয়াটা অনেকটা যেন কাচের 'অ্যানিলিং' করবার মত ব্যাপার।

কাঁসা

কাঁসাকে ইংরেজীতে বলে 'বেল-মেটাল'; তামা, দস্তা ও টিন ধাতুর সংমিশ্রণে কাঁসা তৈরি করা হয়। কখন কখন এর সঙ্গে কিছু অ্যান্টিমনি, বা সীসাও মিশিয়ে দেওয়া হয়। বাসন-পত্র, পেটা-ঘড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করতে কাঁসা ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এদেশে 'খাগড়াই কাঁসা' নামে যে উৎকৃষ্ট কাঁসার থালা-বাটি তৈরি হয় তা এই শ্রেণীর সংকর-ধাতু। কেবল তামা ও টিন মিশিয়ে তৈরী সংকর-ধাতুকে সাধারণতঃ বলে **ব্রোঞ্জ** বা বিদ্‌ড়ী; প্রাচীন কালে যে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হতো তাতে সাধারণতঃ শতকরা 90 ভাগ তামা ও 10 ভাগ টিন থাকতো। সাধারণ ব্রোঞ্জের বর্ণ হয় মেটে বাদামী, ঘষে পালিস করলে চক্‌চকে হয়। এদিয়ে মুদ্রা, মেডেল, স্মারকমূর্তি প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে; আজকাল মূর্তি নির্মাণে যে উৎকৃষ্টতর ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয় তার উপাদান হলো শতকরা 90 ভাগ তামা, 5 ভাগ টিন, 4 ভাগ দস্তা ও 1 ভাগ সীসা।

বিশেষ এক প্রকার ব্রোঞ্জে শতকরা মোটামুটি 10 থেকে 15 ভাগ টিন ও 80 থেকে 90 ভাগ তামা মেশানো হয়, একে বলা হয় **গান-মেটাল**। আর এক রকম ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয় শতকরা 15 থেকে 25 ভাগ টিন ও 75 থেকে 85 ভাগ তামার সংমিশ্রণে, যাকে কখন কখন **বেল-মেটাল** বা ঘণ্টা-ধাতুও বলে। বাসন-পত্র তৈরি করতেও এই শ্রেণীর ব্রোঞ্জের যথেষ্ট প্রচলন আছে। আর্থিক লেন-দেনের মুদ্রা প্রস্তুতিতে যে ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হয় তাতে সাধারণতঃ শতকরা 95 ভাগ তামা, 4 ভাগ টিন ও 1 ভাগ দস্তা থাকে। আবার এই শ্রেণীর এক প্রকার ধাতু-সংকরকে **ফস্‌ফর-ব্রোঞ্জ** বলে, যা সহজে ক্ষয় হয় না এবং অত্যধিক কাঠিন্যের জন্য নানা রকম যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অনুপাতে তামা, টিন, সীসা ও ফসফরাস মিশিয়ে এই সংকর-ধাতুটা তৈরি করা হয়।

শতকরা মোটামুটি 33 ভাগ তামা, 60 ভাগ নিকেল ও 7 ভাগ লোহার সংমিশ্রণে বিশেষ এক প্রকার ধাতুসংকর তৈরি হয়, যার নাম **মোনেল-মেটাল (monel metal)**। সাধারণ ক্ষারীয় দ্রবণে, বিশেষতঃ সমুদ্র-জলের প্রভাবে এই ধাতু-সংকরটা ক্ষয়গ্রস্ত হয় না এবং বিশেষ সুকঠিন বলে এটা নানা কাজে, বিশেষতঃ সমুদ্রগামী জাহাজের চাকা, বয়লার, পাম্প প্রভৃতি তৈরি করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। শতকরা 54 ভাগ তামা, 45 ভাগ নিকেল ও 1 ভাগ ম্যাঙ্গানিজের সংমিশ্রণে যে সংকরধাতু তৈরি হয় তা দেখতে রূপার মত সাদা ও চকচকে। এর বিশেষ নাম **সিলভারয়েড ;** নানা রকম সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরি করতে এটা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নিকেল

মৌলিক ধাতু নিকেলের প্রতীকচিহ্ন Ni ; পারমাণবিক ওজন 85·69, আপেক্ষিক গুরুত্ব 8·9, গলনাংক 1435° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ধাতুটা দেখতে রূপার মত সাদা, কিন্তু গুণ ও ধর্মে লোহার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে, ধর্মও লোহারই মত। খনিজ নিকেল প্রধানতঃ কানাডা রাজ্যের অণ্টারিও অঞ্চলে যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং মন্ড (Mond) পদ্ধতিতে নিকেল নিষ্কাশিত ও পরিশুদ্ধ করা হয়। মোটামুটি 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত নিকেলের উপরে কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে **কার্বনিল-নিকেল** নামক একটা উদ্বায়ী তরল পদার্থের উদ্ভব হয়। একে উত্তাপে বাষ্পীভূত করলে যৌগিকটা বিশ্লিষ্ট হয়ে বিশুদ্ধ নিকেল চূর্ণাকারে পৃথক হয়ে পড়ে, আর কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে আসে। এই কার্বন-মনক্সাইডকে পুনরায় নিকেল-পরিশুদ্ধির কাজে লাগানো হয়। এভাবে প্রাপ্ত নিকেলচূর্ণ উত্তাপে গলিয়ে ঠাণ্ডা করলে সুকঠিন, চকচকে সাদা ধাতব নিকেল পাওয়া যায়। সাধারণ জলহাওয়ায় নিকেলের উপরে মরিচা (অক্সাইড) ধরে না, কোন বর্ণ-বিকৃতিও ঘটে না ; এজন্যে ইলেকট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় লোহা ও ইস্পাতে তৈরী জিনিসের উপরে নিকেলের আস্তরণ (নিকেল-প্লেটিং) ধরানো হয়। নিকেল-প্লেটিং-এর আগে অবশ্য লোহা ও ইস্পাতের উপরে সাধারণতঃ তামার প্রলেপ (কপার-প্লেটিং) ধরিয়ে নেওয়া হয়। এ-সব বিষয় আমরা 'রসায়ন ও তড়িৎ-শক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করবো। বিশুদ্ধ নিকেল সুকঠিন ও ক্ষয়রোধক বলে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী যন্ত্রাংশের তড়িৎ-দ্বার (ইলেকট্রোড) অনেক ক্ষেত্রে এ দিয়ে তৈরি করা হয়।

উন্নত ধরনের অতি প্রয়োজনীয় নানা রকম ধাতু-সংকর উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে নিকেল ব্যবহৃত হয়। নিকেল-মিশ্রিত ধাতুসংকর মোনেল-মেটাল, সিল্‌ভারয়েড প্রভৃতির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে; তা ছাড়া জার্মান-সিলভার, নিক্রোম প্রভৃতি নিকেলের বিভিন্ন ধাতু-সংকর বহুল প্রচলিত ও প্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ শতকরা 50 ভাগ তামা, 30 ভাগ দস্তা (জিঙ্ক) ও 20 ভাগ নিকেলের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতু হলো **জার্মান-সিলভার**; যাকে অনেকে বলেন **হোয়াইট-মেটাল**। এর উজ্জ্বল সাদা বর্ণের সহজে কোন বিকৃত ঘটে না; রূপার মত স্থায়ী ঔজ্জ্বল্যের জন্যে রূপার বিকল্প হিসেবে অলংকার, বাসনপত্র ও নানা সৌখিন জিনিস তৈরি করতে এই ধাতু-সংকরটার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। **নিক্রোম** নামক সংকরধাতু নিকেল ও ক্রোমিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি হয়, যার মধ্যে সচরাচর শতকরা প্রায় 23 ভাগ থাকে নিকেল। এর মধ্যে সামান্য (শতকরা এক ভাগ মত) সিরিয়াম ধাতু মেশালে সেই নিক্রোম অত্যধিক তাপসহ ও দীর্ঘস্থায়ী হয় বলে বৈদ্যুতিক উনানের তার-কুণ্ডলী এই শ্রেণীর নিক্রোম দিয়ে তৈরি করা হয়। সাধারণতঃ তামার সঙ্গে শতকরা প্রায় 25 ভাগ নিকেল মিশিয়ে উৎপন্ন সংকরধাতু দিয়ে বিভিন্ন দেশে (আর্থিক) মুদ্রা তৈরি হয়ে থাকে। নিকেলের আর একটা বিশেষ কার্যকরী ধাতুসংকর হলো **পার্ম-অ্যালয়**; লোহার সঙ্গে শতকরা 78 ভাগ নিকেলের সংমিশ্রণে এই নিকেল-লৌহ ধাতুসংকরটা প্রস্তুত হয়ে থাকে। সমুদ্রতলে বিস্তৃত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার (কেব্‌ল) এই পার্ম-অ্যালয়ের আবরণে মুড়ে দিলে তারের বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণের ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ও এরোপ্লেনের বিভিন্ন অংশ তৈরির জন্যেও এর ব্যবহার আছে।
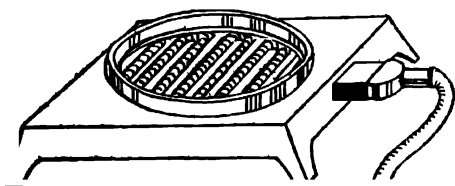
নিক্রোম-তারের বৈদ্যুতিক উনান

ক্রোমিয়াম

মৌলিক ধাতু ক্রোমিয়ামের প্রতীক চিহ্ন Cr; পারমাণবিক ওজন 52·01, গলনাংক 1510° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ক্রোমাইট নামক লৌহ ও

ক্রোমিয়ামের অক্সাইড খনিজ-প্রস্তর থেকে ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়। ক্রোমিয়াম-অক্সাইডকে থার্মিট পদ্ধতিতে (পৃষ্ঠা 81) অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সংযোগে জ্বালিয়ে বিজারিত করলে বিশুদ্ধ ক্রোমিয়াম পাওয়া যায়। ক্রোমিয়াম নিকেলের চেয়ে অধিকতর কঠিন এবং জলহাওয়ায় এর কিছুমাত্র ক্ষয় বা বিকৃতি ঘটে না, সর্বদা চক্‌চকে উজ্জ্বল থাকে। এজন্যে অন্যান্য সাধারণ ধাতু-নির্মিত জিনিসের উপরে ক্রোমিয়ামের প্রলেপ (প্লেটিং) ধরানো হয় এবং এই কাজেই ধাতুটার বহুল ব্যবহার রয়েছে। যে **স্টেনলেস স্টিল** (মরিচা-বিহীন ইস্পাত) আজকাল বাসন-পত্র তৈরি ও অন্যান্য নানা কাজে প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে তা প্রধানতঃ (ষ্টিল) ইস্পাত ও ক্রোমিয়ামের একটা সংকর-ধাতু ; ইস্পাতের সঙ্গে মোটামুটি শতকরা 20 ভাগ ক্রোমিয়াম ও 10 ভাগ নিকেল মিশিয়ে এটা উৎপন্ন হয়। লেড-ক্রোমেট নামক ক্রোমিয়াম ও সীসার একটা যৌগিক পদার্থের চূর্ণ এক রকম হলদে রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টিন

টিন ধাতুর ব্যবহার অতি সুপ্রাচীন ; আদিম সভ্যতার যুগে ব্যবহৃত ব্রোঞ্জ ধাতু-সংকরটি তামা ও টিনের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। কথিত আছে, প্রাচীন কালে ফিনিসীয় বণিকেরা ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশের কর্ণওয়াল অঞ্চলে টিন-স্টোন নামক টিনের খনিজ অক্সাইডের সন্ধান পেয়েছিল। এই **টিন-স্টোন** থেকে ফিনিসীয়েরাই প্রথমে টিন ধাতু নিষ্কাশিত করে তামার সঙ্গে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ধাতু-সংকর প্রস্তুত করতো এবং এই ব্যবসায় তাদের দীর্ঘকাল একচেটিয়া ছিল। যাহোক, কর্ণওয়ালের উক্ত টিন-খনিজ সম্পদ লোপ পেয়েছে ; ক্রমে পৃথিবীর নানা দেশে, বিশেষতঃ মালয়, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, আফ্রিকার নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে টিনের খনির সন্ধান মিলেছে। টিন-খনিজ ক্যাসিরাইট বা টিন-স্টোন থেকে বিশুদ্ধ টিন আজকাল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে।

টিন ধাতুর রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Sn. (ল্যাটিন নাম 'স্ট্যানাম' থেকে) ; পারমাণবিক ওজন 118·7, গলনাংক 230° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মাত্র। টিন ধাতুও রূপার মত সাদা, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নরম। ধাতু হিসেবে টিনের ব্যবহার বহুবিধ ও বহুবিস্তৃত। বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে টিনের সংমিশ্রণে বিভিন্ন রকম সংকর-ধাতু তৈরি হয় ; যেমন, তামা ও টিনের সংকর-ধাতু হলো **ব্রোঞ্জ** ; তামা, টিন ও অ্যান্টিমনির

সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম **বৃটেনিয়া মেটাল** ; সীসা ও টিনের সংমিশ্রণে তৈরি হয় রাং-ঝাল, যাকে ইংরেজিতে বলে **সল্ডার**। বৃটেনিয়া মেটাল অতি সুকঠিন ও ঘর্ষ-ক্ষয়হীন বলে এ দিয়ে বিশেষতঃ ইঞ্জিনের বেয়ারিং তৈরি হয় ; 'সল্ডার' ধাতু-ঝালাইয়ের কাজে অত্যাবশ্যক। সাধারণ জলহাওয়ায় টিনের কোন বিকৃতি ঘটে না, তাই লোহা বা ইস্পাতের জিনিস মরিচা ধরা থেকে রক্ষা করবার জন্যে তার উপরে গলিত টিনের পাত্‌লা আস্তরণ ধরানো হয়। বিস্কুট, মাখন প্রভৃতি খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য নানা জিনিসের আধার হিসেবে যে টিনের কৌটা ব্যবহৃত হয় তা প্রকৃতপক্ষে টিনের পাতে তৈরি হয় না, হয় লোহার পাতের উপরে টিনের সূক্ষ্ম প্রলেপ ধরিয়ে। গলিত টিনের ভিতরে পরিষ্কার লোহার পাত্‌ ডুবিয়ে এই তথাকথিত টিনের পাত্‌ তৈরি করা হয়। ঘরের চালে যে ঢেউ-তোলা টিন ব্যবহৃত হয় তাতে আদৌ টিন থাকে না ; লোহার পাতের উপরে দস্তার (জিঙ্ক) প্রলেপ ধরিয়ে তৈরি হয় এই 'করোগেটেড টিন', যা প্রকৃতপক্ষে **গ্যালভ্যানাইজড** লোহ, অর্থাৎ দস্তার প্রলেপ যুক্ত ঢেউ-তোলা লোহার পাত্‌।

নরম ধাতু টিনের প্রসার্যতা (malleability) এত অধিক যে, যন্ত্রের সাহায্যে চেপে একে অতি সূক্ষ্ম পাতে পরিণত করা যায়। চকোলেট, সিগারেট প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য কাগজের মত পাত্‌লা টিনের এরূপ পাতে জড়িয়ে বিক্রয় হয় ; একে সচরাচর বলা হয় **সিলভার পেপার** ; বস্তুতঃ এর মধ্যে রূপার লেশমাত্র নেই। টিনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতায় ধাতুটার চক্‌চকে সাদা রং অবিকৃত থাকে, কিন্তু নিম্ন-তাপমাত্রায় (মোটামুটি 13° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে) টিন তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করে, যাকে বলে **গ্রে-টিন**। সাধারণ উষ্ণ আবহাওয়ায় টিনের এই পরিবর্তন অবশ্য দীর্ঘকালেও ঘটে না। অতি সামান্য মাত্র সীসা, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি,

টিনের তৈরী মেডেলের উপরে টিন-প্লেগের নমুনা

অথবা ক্যাড্‌মিয়াম ধাতুর কোন একটি সামান্য পরিমাণে মেশালে টিনের এই পরিবর্তন মন্দীভূত হয়, নিম্ন-তাপমাত্রায়ও সহজে পরিবর্তনটা আসে না। আবার টিনের সঙ্গে সামান্য কিছু অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, কোবাল্ট, বা ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত থাকলে টিনের উক্ত বর্ণ-বিকৃতি দ্রুততর হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই উজ্জ্বল ধাতুটার উপরিভাগের সর্বত্র সমান ভাবে এরূপ ধূসর বর্ণের বিকৃতি হতে দেখা যায় না; দেখা যায়, স্থানে স্থানে চক্রাকার ফোস্কার মত; সে সব জায়গার চক্‌চকে সাদা টিন ধূসর বর্ণের হাল্‌কা গুঁড়ায় পরিণত হয়। টিনের এই বিকৃতিকে বলা হয় **টিন-প্লেগ**। আরও বিচিত্র কথা, মানুষের প্লেগ রোগের মত টিনের এই বিকৃতি-রোগও ছোঁয়াচে ও সংক্রামক; টিনের একটা জিনিসে এরূপ হলে কাছাকাছি অন্যগুলিও অতি দ্রুত অনুরূপভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে।

দস্তা বা জিঙ্ক

দস্তা একটা মৌলিক ধাতু; পারমাণবিক ওজন 65·38; আপেক্ষিক গুরুত্ব 7, গলনাংক 420° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। বিশুদ্ধ দস্তা প্রধানতঃ নিষ্কাশিত হয় ধাতুটার কার্বনেট-খনিজ 'ক্যালামাইন' ($ZnCO_3$) ও সালফাইড-খনিজ জিঙ্ক-ব্লেড (ZnS) থেকে। দস্তার এ-সব খনিজ বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নিষ্কাশনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে অবিশুদ্ধ দস্তা প্রথমতঃ পাওয়া যায় তাকে বলে **স্পেল্টার**; লোহার জিনিসের উপরে দস্তার প্রলেপ ধরাতে (গ্যাল্‌ভ্যানাজিং) ও সাধারণ শিল্প-কাজে এই অবিশুদ্ধ দস্তা বা স্পেল্টারই ব্যবহৃত হয়।

বিশুদ্ধ দস্তা একটা নীলাভ-সাদা ধাতু, যথেষ্ট কঠিন পদার্থ। কঠিন হলেও ধাতুটার গলনাংক কম, 420° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড মাত্র। কাজেই একে সহজে গলিয়ে তার মধ্যে লোহার জিনিস ডুবিয়ে লোহাকে 'গ্যাল্‌ভ্যানাইজ' করা সম্ভব হয়। বস্তুতঃ গ্যাল্‌ভ্যানাইজিং-এর কাজেই দস্তার বিশেষ ব্যবহার: তা ছাড়া পিতলের (দস্তা ও তামার ধাতু-সংকর) উৎপাদন-শিল্পেও দস্তা প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। তড়িৎ-উৎপাদক বিভিন্ন সেল ও ব্যাটারি তৈরি করতেও দস্তার চাহিদা প্রচুর। দস্তার অক্সাইড যৌগিক (জিঙ্ক অক্সাইড) সাদা চূর্ণের আকারে নানারকম মলম তৈরি করতে এবং তিসির তেলে মিশিয়ে সাদা রং হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে বলে **জিঙ্ক হোয়াইট**। আবার জিঙ্ক-সালফাইড ও বেরিয়াম-সালফেট এক সঙ্গে মিশিয়ে যে তেল-রং তৈরি করা হয় তার

ব্যবসায়িক নাম **লিথোপোন**। বিশেষ বিশেষ ঢালাই-শিল্পে অতি-বিশুদ্ধ দস্তার প্রয়োজন হয়, যার শতকরা বিশুদ্ধতা 99·99 হতে হয়। এরূপ অতি বিশুদ্ধ দস্তাকে ধাতুবিদ্যার চলতি কথায় বলে 'চার-নয়' (four-nines) দস্তা।

পারদ

পারদ বা মার্কারি হলো একমাত্র তরল ধাতু; যথেষ্ট ভারী ও রূপার মত উজ্জ্বল সাদা। পারদকে ইংরেজীতে বলে **মার্কারি,** কখন-কখন বলা হয় **কুইক সিলভার**। এই তরল মৌলিক ধাতুটার পারমাণবিক ওজন 200·61, আপেক্ষিক গুরুত্ব 13·6, স্ফুটনাংক 357° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পারদের প্রাকৃতিক সালফাইড যৌগিক 'সিনাবার' (HgS) নামক খনিজ থেকেই প্রধানতঃ ধাতুটা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। এই সিনাবার বা মার্কিউরিক সালফাইড চূর্ণ করলে উজ্জ্বল লাল রঙের মিহি গুঁড়া হয়, যাকে বলে **ভার্মি-লিয়ন,** বা সিন্দুর, যা মেয়েরা সিঁথিতে পরে। খনিজ সিনাবারকে চূর্ণ করে উন্মুক্ত পাত্রে বিশেষ উত্তপ্ত করলে তার সালফার বা গন্ধক উপাদান বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের আকারে বেরিয়ে যায়, আর ধাতব পারদ বাষ্পাকারে ঊর্ধ্ব-পাতিত হয়। এই পারদ-বাষ্পকে প্রকাণ্ড আধারে প্রবাহিত করে নিয়ে ঠাণ্ডা করলে তরল পারদ পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের নানা যন্ত্রে পারদ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, বিশেষতঃ থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, ভ্যাকুয়াম-পাম্প প্রভৃতি যন্ত্র নির্মাণে পারদ বহুল ব্যবহৃত। পারদের বিভিন্ন যৌগিক মূলতঃ বিষাক্ত হলেও কোন-কোনটি ঔষধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এর যৌগিক হয় দুই শ্রেণীর—মার্কিউরাস ও মার্কিউরিক। মার্কিউরাস ক্লোরাইডের বিশেষ নাম **ক্যালোমেল,** যা ঔষধ হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। মার্কিউরিক ক্লোরাইড, বা **করোসিভ সাব্লিমেট** হলো একটা তীব্র জারক ও বিষাক্ত পদার্থ; কীটঘ্ন বিষ হিসেবে এর ব্যবহার আছে। **মার্কিউরিক ফুল্মিনেট** (পারদ ও ফুল্মিনিক অ্যাসিডের যৌগিক) একটা বিস্ফোরক পদার্থ, সামান্য আঘাতে পদার্থটা সহসা বিস্ফোরিত হয়। পারদ-বাষ্পের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে অতি উজ্জ্বল সবুজাভ আলোক ছড়ায়; এরূপ বৈদ্যুতিক বাতিকে বলে 'মার্কারি-ভেপার ল্যাম্প'। এর আলোক থেকে প্রচুর অতি-বেগুনী রশ্মি বিকিরিত হয়। প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে ঔষধ হিসেবে যে স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে,

তা মূলতঃ পারদের একটা সালফাইড যৌগিক; পারদ ও গন্ধকের এই রাসায়নিক সংযোগ-প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে সোনা ব্যবহৃত হয় বলে একে সাধারণভাবে স্বর্ণসিন্দুর বলা হয়।

সীসা

সীসা বা লেড একটা নরম ও ভারী মৌলিক ধাতু; এর রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Pb (ল্যাটিন নাম 'প্লাম্বাম' থেকে)। সীসার পারমাণবিক ওজন 207·21, আপেক্ষিক গুরুত্ব 11·3, গলনাংক 327° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ধাতুটা প্রধানতঃ নিষ্কাশিত হয় সীসার সালফাইড যৌগিক (PbS) 'গ্যালেনা' নামক খনিজ থেকে। এর নিষ্কাশন-পদ্ধতি সিনাবার থেকে পারদ নিষ্কাশনের অনুরূপ। বিশুদ্ধ সীসা রূপার মত সাদা, রূপার চেয়ে কিন্তু যথেষ্ট নরম ও ভারী।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সীসার সঙ্গে পরিচিত এবং নানা কাজে ধাতুটা লোকে ব্যবহার করে আসছে; কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার বহুবিস্তৃত। সাধারণ জলহাওয়ায় সীসা আক্রান্ত হয় না এবং সাধারণ উষ্ণতায় অ্যাসিডের সঙ্গেও এর বিক্রিয়া ঘটে না; তাই সীসার পাতে অনেক জিনিসের উপরে আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের সঞ্চয়-প্রকোষ্ঠ ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আধারের অভ্যন্তরভাগ সীসার পাতে তৈরি করা হয়। তড়িৎ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত **ষ্টোরেজ ব্যাটারি**গুলি সীসা দিয়ে তৈরি হয়। নরম বলে ধাতুটাকে চাপ দিয়ে বা পিটিয়ে অতি সহজেই এর রড ও পাইপ তৈরি করা সম্ভব হয়। সীসার পাইপে জল সরবরাহের ব্যবস্থা বহুকাল থেকে প্রচলিত; কিন্তু পানীয় জল সরবরাহে সীসার পাইপ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এর কারণ, অতি সামান্য সীসা দ্রবিত হয়ে জলে মিশলেও তাতে স্বাস্থ্যহানিকর বিষ-ক্রিয়া ঘটতে পারে। জলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবিত থাকলে তাতে সীসা অনেকটা দ্রুত দ্রবিত হয়; কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের কার্বনেট, বা সালফেট লবণ যে জলে থাকে তাতে সীসা আক্রান্ত হয় না। আমরা জানি, এই দু'রকম লবণ যে জলে দ্রবিত থাকে তাকে বলে 'খর জল' (হার্ড ওয়াটার); এই জলে সীসা দ্রবিত হয়ে মেশে না বলে এরূপ জলের পক্ষে সীসার পাইপ নিরাপদ। আর সব জলকে বলে 'মৃদু জল' (সফ্‌ট ওয়াটার), যার পক্ষে সীসার পাইপ বিপজ্জনক। সহরাঞ্চলের জল সরবরাহ ব্যবস্থায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়; মৃদু জল হলে তাতে

সামান্য চুন (ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) মিশিয়ে 'খর' করে নিয়ে সীসার পাইপে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ সীসা যথেষ্ট নরম বলে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্যে অন্য কোন-কোন ধাতু সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে এর কঠিনতর ধাতু-সংকর প্রস্তুত করা হয়। সীসার সঙ্গে সামান্য আর্সেনিক ধাতু মিশিয়ে বন্দুকের গুলি প্রস্তুত করা হয়। ছাপার টাইপ তৈরি করতে সীসার সঙ্গে মেশানো হয় অ্যান্টিমনি; আর এই ধাতু-সংকরকে বলা হয় **টাইপ মেটাল**। অ্যান্টিমনির সংযোগে একদিকে যেমন সীসার কাঠিন্য কিছু বাড়ে, অপরপক্ষে ঢালাইয়ের সময়ে এর টাইপও হয় নিখুঁত ও পরিষ্কার। এর কারণ, টাইপ-মেটাল অর্থাৎ সীসা-অ্যান্টিমনি ধাতু-সংকরটি ছাঁচের মধ্যে ঠাণ্ডা হওয়ার সময়ে সংকুচিত না হয়ে বরং কিছু প্রসারিত হয়। সীসার সঙ্গে টিন ও বিস্‌মাথ মিশিয়ে উৎপন্ন সংকর-ধাতু রাং-ঝালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এর কারণ, এই মিশ্র-ধাতুর গলনাংক 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও (জলের স্ফুটনাংক) কম।

সীসার সব রকম যৌগিকই কম-বেশি বিষাক্ত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেগুলি বিভিন্ন কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সীসার বিভিন্ন অক্সাইডের মধ্যে **লিথার্জ**, বা লেড-মনঅক্সাইড (PbO), লেড-ডাইঅক্সাইড (PbO_2) ও **রেড লেড** (Pb_3O_4) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাল্‌চে-হলুদ বর্ণের স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ লিথার্জ এক বিশেষ শ্রেণীর কাচ (ফ্লিন্ট গ্লাস) তৈরি করতে ও ভার্নিস রং প্রস্তুতিতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। রেড লেড অক্সাইড **মিনিয়াম** নামেও পরিচিত; এটা 'ক্রিস্ট্যাল গ্লাস' নামক আর এক শ্রেণীর কাচ উৎপাদনে ও রঙ্গক (pigment) হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লেড-ডাইঅক্সাইড (কখন কখন একে লেড-পারক্সাইডও বলা হয়) বিশেষ এক রকম ব্যাটারি বা তড়িৎ-কোষের ধনাত্মক প্লেট তৈরি করতেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। সীসার আর একটা উল্লেখযোগ্য যৌগিক হলো **হোয়াইট লেড**, যাকে বাংলায় বলে সীসশ্বেত বা সফেদা; এর রাসায়নিক পরিচয় হলো 'বেসিক লেড কার্বনেট' $2PbCO_3.Pb(OH)_2$। উজ্জ্বল সাদা রং তৈরি করতে এই হোয়াইট লেড বা সীসশ্বেতের বহুল ব্যবহার আছে। লেড অ্যাসিটেট যৌগিকের বিশেষ নাম **সুগার অব লেড**; পদার্থটা কিছু মিষ্ট স্বাদযুক্ত, তাই এই নাম; কিন্তু অত্যন্ত বিষাক্ত। সীসার এই অ্যাসিটেট লবণটি স্ফটিকাকার ও জলে বিশেষ দ্রবণীয়; বস্ত্রাদির রঞ্জন-শিল্পে এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

ধাতব সীসা সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন ; তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ধাতুর তেজঃ বিকিরণের ফলে তার মৌলিক গঠনের পরিবর্তন হতে হতে একেবারে শেষ পর্যায়ে সীসা বা লেডে পরিণত হয়। এ-সব কথা আমরা পদার্থের 'পারমাণবিক গঠন ও তেজস্ক্রিয়তা' শীর্ষক অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করবো। আমাদের বিশেষ পরিচিত ও প্রয়োজনীয় লৌহেতর ধাতুগুলির মধ্যে কয়েকটির পরিচয় ও সাধারণ তথ্যাদির কিছু আলোচনা করা হলো। অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর আলোচনা পরে 'রসায়ন ও তড়িৎশক্তি' অধ্যায়ে করা হবে। এখন আমরা মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী ধাতু লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে এ অধ্যায় শেষ করবো।

লৌহ ও ইস্পাত

সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম ধাতু বিবিধ গুণে, ঔজ্জ্বল্যে, মূল্যে যতই সম্ভ্রান্ত হোক না কেন, বর্তমান যুগের শিল্প-সভ্যতায় এদের প্রয়োজনীয়তার স্থান লোহার অনেক নিচে। সুদৃশ্য ও মূল্যবান ধাতু সোনা-রূপা বাস্তব কার্যক্ষেত্রে অনুজ্জ্বল ও স্বল্পমূল্য ধাতু লোহার সমকক্ষ নয়; প্রকৃতপক্ষে লোহাকে 'ধাতুর রাজা' বলা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, শিল্প-বাণিজ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বক্ষেত্রেই লোহার ব্যবহার অপরিহার্য ; বস্তুতঃ আমরা লৌহ-যুগে বাস করছি। আধুনিক মানব-সভ্যতায় লোহার প্রয়োজন যেমন অশেষ, প্রকৃতি দিয়েছেনও তেমনি অঢেল ; পৃথিবীর মোট ধাতু-সম্পদের শতকরা 90 ভাগই লোহা।

এরূপ অনুমিত হয়েছে যে, ভূ-পৃষ্ঠের সমগ্র কঠিন আবরণের শতকরা 5 ভাগই লোহা ; কিন্তু বহিরাগত উল্কাপিণ্ডের কিছু লোহা ছাড়া বিশুদ্ধ লোহা পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না, সবই অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যৌগিকের আকারে রয়েছে। লোহার প্রাকৃতিক খনিজের মধ্যে এর অক্সাইড ও সালফাইডই প্রধান ; এদের মধ্যে হিমাটাইট (Fe_2O_3), লিমোনাইট ($2Fe_2O_3,3H_2O$) ও ম্যাগ্নেটিক আয়রন (Fe_3O_4) নামক খনিজগুলি লোহার অক্সাইডরূপে এবং আয়রন-পাইরাইট্‌স (FeS_2) সালফাইড আকারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। **আয়রন পাইরাইট্‌স** খনিজটা দেখতে অনেকটা পিতলের মত চক্‌চকে ; একে প্রাচীন যুগে সোনার কোন খনিজ বলে ভ্রম করেছে অনেকে, 'তাই এটা 'নির্বোধের সোনা' (fool's gold) বলে পরিচিত। লোহার এই সালফাইড আকরিক লোহা নিষ্কাশনের জন্যে তেমন ব্যবহৃত হয় না, সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের

কাজেই এটা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে যাই হোক, লোহার অক্সাইড আকরিক হিমাটাইট, লিমোনাইট ও ম্যাগ্নেটিক আয়রন, কখন কখন লৌহ-কার্বনেট ($FeCO_3$) থেকেই সাধারণতঃ লোহা নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। লৌহ নিষ্কাশনের জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাদের মধ্যে 'ব্লাস্ট ফার্নেস' বা মারুত-চুল্লী পদ্ধতিই প্রধান। মারুত-চুল্লীর প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার খোলের অভ্যন্তরভাগ হয় অনেকটা ডিম্বাকার; উপর দিকে লৌহ খনিজ প্রবেশ করাবার ও নিচের দিকে তরল লৌহ ও গাদ (স্ল্যাগ) নির্গমনের নানারকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে। উত্তপ্ত চুল্লীর উপর থেকে আকরিক লোহা, কোক-কয়লা ও লাইম-স্টোনের (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) মিশ্রণ চুল্লীর অভ্যন্তরে ঢেলে দেওয়া হয় এবং চুল্লীর নিম্নভাগে সংলগ্ন নলপথে উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। এর ফলে নিচের দিকে উচ্চ তাপের সৃষ্টি হয়ে প্রবিষ্ট কোক-কয়লার দহনে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলন্ত কয়লার ভিতর দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে কার্বন-মনক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়। কার্বন-মনক্সাইড আবার উত্তপ্ত লৌহ-আকরিকের ভিতর দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে তার অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনরায় কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়; আর এভাবে অক্সিজেন হারিয়ে আকরিক লৌহ-অক্সাইড থেকে ধাতব লোহা বিমুক্ত হয়। চুল্লীর প্রচণ্ড তাপে বিমুক্ত লোহা গলিত অবস্থায় নিচে নামতে থাকে; ইত্যবসরে আবার খনিজ লৌহপিণ্ডে মিশ্রিত মাটি, বালি (সিলিকেট) প্রভৃতি আবর্জনা গলিত লাইম-স্টোন থেকে বিয়োজিত চুনের (CaO) সঙ্গে মিলে এক রকম চক্‌চকে মিশ্র পদার্থের গাদ (স্ল্যাগ) সৃষ্টি করে। এই গাদও গলিত অবস্থায় চুল্লীর নিচের দিকে নেমে গলিত লোহার উপরে ভেসে থাকে। মারুত-চুল্লীতে আকরিক লৌহ-অক্সাইডের বিজারণ-ক্রিয়া এভাবে চলতে থাকে, আর গলিত লোহার
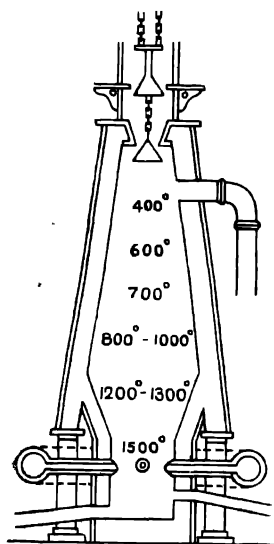
ব্লাস্ট ফার্নেস বা মারুত-চুল্লীর নমুনা

উপরে ভাসমান গাদ অপসারিত করে গলিত লোহা চুল্লীর নিচের নির্গমন-পথে প্রবাহিত করে সারিবদ্ধ ছাঁচে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সব ছাঁচের মধ্যে গলিত লোহা ঠাণ্ডা হয়ে জমে কঠিন হয়; আর তাকেই বলে **পিগ আয়রন** বা অবিশুদ্ধ কাঁচা লোহা। এই লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতিতে যে প্রভূত পরিমাণ এরূপ গাদ উৎপন্ন হয় তাকে অনেক সময় সিমেন্ট উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

এই অবিশুদ্ধ 'পিগ' লোহাকে আবার এক বিশেষ ধরনের চুল্লীতে (কুপোলা ফার্নেস) গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে তৈরি হয় ঢালাই লোহা বা **কাস্ট আয়রন** ; বস্তুতঃ 'পিগ আয়রন' ও 'কার্স্ট আয়রন' মোটামুটি একই। পিগ আয়রনকে 'রিভার্বেটরি ফার্নেস' নামক চুল্লীতে গলিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরি হয় **রট আয়রন**, যাকে বাংলায় বলা যায় 'পেটা লোহা'। 'কাস্ট আয়রন' দিয়ে ঢালাইয়ের কাজ চলে, কিন্তু হাতুড়ীর আঘাতে এ-লোহা প্রসারিত হয় না, ভেঙ্গে যায়। কিন্তু 'রট আয়রন' অধিকতর বিশুদ্ধ লোহা বলে তার প্রসার্যতা আছে, আঘাতে বাড়ে, পিটিয়ে একে বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। বিভিন্ন শিল্প কাজে এ-সব অবিশুদ্ধ লোহাই ব্যবহৃত হয় ; এগুলির মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে সর্বদাই কার্বন মিশ্রিত থাকে। পিগ্ বা কাস্ট আয়রনের মধ্যে সচরাচর শতকরা **2** থেকে **5** ভাগ যে কার্বন (কয়লা) থাকে তার অধিকাংশই থাকে কার্বনের বিশেষ রূপ গ্রাফাইটের আকারে। তা ছাড়া সিলিকন, সালফার প্রভৃতিও কিছু কিছু এই শ্রেণীর লোহায় থেকে যায়, যাদের আনুপাতিক পরিমাণ, নিষ্কাশনে ব্যবহৃত মূল আকরিকের গঠনের উপরে নির্ভরশীল। আমরা আগেই বলেছি, পিগ বা কাস্ট আয়রন বেশ শক্ত হলেও ভঙ্গুর, আঘাতে ভেঙ্গে যায় ; এ দিয়ে কেবল ঢালাইয়ের কাজ চলে। সাধারণ কাস্ট আয়রন মৃদু সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে সহজেই আক্রান্ত হয়ে গলে যায় ; কিন্তু তাতে সিলিকনের (বালির) মাত্রা আরও বাড়ালে অ্যাসিডের বিক্রিয়া হ্রাস পায়। যে কাস্ট আয়রন বা ঢালাই-লোহায় সিলিকনের ভাগ শতকরা 15 থেকে 20 ভাগ থাকে তার উপরে অ্যাসিডের বিক্রিয়া প্রায় থাকে না ; এরূপ সিলিকন-বহুল লোহা দিয়ে ঢালাই-করা পাত্রে অ্যাসিডও রাখা চলে। এই শ্রেণীর কাস্ট আয়রন অ্যাসিড-রোধক বটে, কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়ে থাকে।

বিভিন্ন শিল্প-কাজে ব্যবহৃত সাধারণ লোহার মধ্যে পেটা-লোহা বা রট আয়রনই সবচেয়ে বিশুদ্ধ। সাধারণ পিগ্ আয়রনের সঙ্গে অনেক সময় আবার আকরিক লৌহ-অক্সাইড 'হিমাটাইট' মিশিয়ে রিভার্বেটরি ফার্নেসে অত্যধিক

উত্তপ্ত করা হয়; এর ফলে ঐ-আকরিক-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিমুক্ত হয়ে পিগ্ আয়রনে মিশ্রিত কার্বন, সিলিকন, সালফার প্রভৃতিকে দগ্ধ করে এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ **রট আয়রন** পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে রট আয়রনও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লোহা নয়। কার্বন ও অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম থাকে বলে এই শ্রেণীর লোহা নরম ও প্রসার্য হয়; একে ঠাণ্ডা অবস্থায়ও পিটিয়ে নানা আকারের জিনিস তৈরি করা যায়, অবশ্য তা কষ্টসাধ্য। পুড়িয়ে নরম করে পিটিয়েই সচরাচর লোহার জিনিস প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ লোহার গলনাংক প্রায় 1,535° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আপেক্ষিক গুরুত্ব 7·86, পারমাণবিক ওজন 55·85; লোহার রাসায়নিক প্রতীক চিহ্ন Fe (ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'ফেরাম' থেকে)। বিশুদ্ধ লোহার স্বাভাবিক বর্ণ ম্যাট্‌মেটে সাদা, সামান্য ধূসর আভাযুক্ত; কিন্তু এরূপ স্বাভাবিক বর্ণের বিশুদ্ধ লোহা কদাচিৎ দেখা যায়; কারণ, সাধারণ জলহাওয়ায় সহজেই ধাতুটার উপরে মরিচা, অর্থাৎ লৌহ-অক্সাইডের আবরণ পড়ে।

ইস্পাত: বিশেষ এক শ্রেণীর সুকঠিন লোহাকে বলা হয় ইস্পাত; যন্ত্র-শিল্পে ও নানা কাজে এর ব্যবহারই সমধিক। কিন্তু ইস্পাত কোন নির্দিষ্ট গঠনের লোহা নয়; বিভিন্ন গঠনের ইস্পাত আছে—যার সবগুলিই বিশুদ্ধ লোহার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতুর বা অধাতুর সংমিশ্রণ থাকে। সাধারণতঃ ইস্পাত বলতে আমরা বুঝি লৌহ ও কার্বনের এক বিশেষ ধাতু-সংকর, যার মধ্যে কার্বনের ভাগ শতকরা 0·1 থেকে 2·0 থাকতে পারে; আর এই কার্বনের কম-বেশির উপরেই ইস্পাতের গুণাগুণ নির্ভর করে। ইস্পাতের গঠনে লোহার সঙ্গে কার্বন মিলে **সিমেণ্টাইট** নামক একটা যৌগিক (Fe_3C) সৃষ্টি হয়। কেবল কার্বনই নয়, লোহার সঙ্গে নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়েও বিভিন্ন ধরনের নিকেল-ষ্টিল, ক্রোম-ষ্টিল নামক বিশেষ বিশেষ গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত উৎপাদিত হয়ে থাকে।

আকরিক থেকে নিষ্কাশিত 'পিগ' লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করা হয় প্রধানতঃ 'বিসিমার' বা 'ওপেন-হার্থ' পদ্ধতিতে। হেনরি বিসিমার নামক জনৈক বৃটিশ ধাতু-বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি তাঁর নামানুসারে ইস্পাত উৎপাদনের **'বিসিমার পদ্ধতি'** নামে খ্যাত। আকরিক থেকে পিগ্ আয়রনে অনির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন, সিলিকন, সালফার, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি যে-সব মালিন্য থেকে যায় এই পদ্ধতিতে তাদের সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করে তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ

কার্বন মিশিয়ে নির্দিষ্ট মানের ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। এ জন্যে যে বিশেষ ধরনের চুল্লী ব্যবহৃত হয় তাকে বলে 'বিসিমার কন্‌ভার্টার'। এই চুল্লীর মধ্যে গলিত পিগ্‌ আয়রনের ভিতরে বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে উল্লিখিত অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলির অক্সিডেসন ঘটানো হয়। এর ফলে সেগুলি সম্যক জারিত হয়ে বিদূরীত হয় এবং বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। আর 'ওপেনহার্থ' পদ্ধতিতে উন্মুক্ত চুল্লীর উত্তপ্ত পাত্রে গলিত পিগ্‌ আয়রনের সঙ্গে লোহার অক্সাইড আকরিক 'হিমাটাইট' মিশিয়ে অনুরূপ অক্সিডেসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। উভয় পদ্ধতিতেই পিগ্‌ আয়রনের স্বাভাবিক মালিন্যগুলি জারিত করে বিশুদ্ধ লৌহ উদ্ধার করাই উদ্দেশ্য। তারপর এই বিশুদ্ধ লোহার সঙ্গে কার্বন, অথবা কোন ধাতু আবশ্যক অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে ও গলিয়ে লোহার বিশেষ ধাতু-সংকর 'ইস্পাত' তৈরি করা হয়।
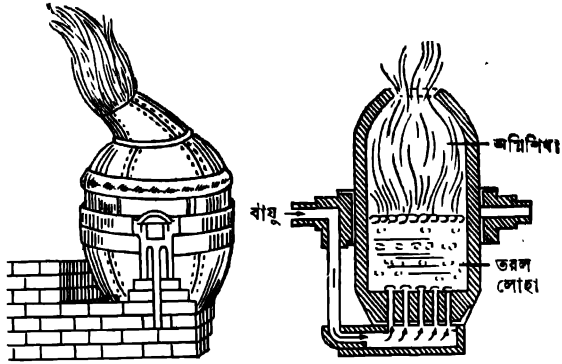
ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত 'বিসিমার কন্‌ভার্টার'
(ডান দিকে চুল্লীর ভিতরের অংশ দেখানো হয়েছে)

পিগ্‌ আয়রনে যদি ফস্‌ফরাসের আধিক্য থাকে তাহলে চুল্লীর অভ্যন্তরভাগে ম্যাগ্নেসিয়াম-কার্বনেট 'ম্যাগ্নেসাইটে'র, অথবা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের যুগ্ম কার্বনেট আকরিক 'ডলোমাইটে'র আস্তরণ দেওয়া হয়। এর ফলে গলিত পিগ্‌ আয়রন থেকে উদ্ভূত ফসফরাস-অক্সাইড ঐ আস্তরণের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়ামের সঙ্গে মিলে তাদের ফস্‌ফেট যৌগিক উৎপন্ন করে, এবং গলিত লৌহের উপরে গাদ হিসেবে জমে। একে বলে **বেসিক স্ল্যাগ,** যা কৃষিকার্যের উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট 'ফস্‌ফেট সার' হিসেবে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইস্পাতের উল্লিখিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় 'বেসিক স্ল্যাগ' একটি মূল্যবান উপজাত পদার্থ।

বিশুদ্ধ লোহার সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণে মিশিয়ে বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন নানা শ্রেণীর ইস্পাত তৈরি হয়। ধাতু-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিভিন্ন কাজের উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদিত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম ধাতুর মিলনে উৎপন্ন ইস্পাত বিশেষ কাঠিন্য লাভ করে; তাই শতকরা প্রায় দু'ভাগ ক্রোমিয়ামের সংযোগে উৎপন্ন **ক্রোম-স্টিল** যন্ত্রাদির চাকার বল-বেয়ারিং, পাথর গুঁড়া করবার যন্ত্র, বিভিন্ন উঁকো, রেলগাড়ীর চাকা, সৈন্যদের শিরস্ত্রাণ ও বর্ম প্রভৃতি তৈরি করতে বিশেষ উপযোগী। ক্রোম-স্টিলে আবার সামান্য পরিমাণ নিকেল মেশালে যে ইস্পাত তৈরি হয় তাতে কাঠিন্যের সঙ্গে বিশেষ স্থিতিস্থাপকতা ধর্মও যুক্ত হয়। লোহার সঙ্গে শতকরা 12 থেকে 15 ভাগ ক্রোমিয়াম সংযোগে উৎপন্ন ইস্পাতে মরিচা ধরে না, অথবা ক্ষার বা টক্ (অ্যাসিড) জাতীয় জিনিসের সংস্পর্শেও কোন বিকৃতি ঘটে না। এরূপ মরিচাবিহীন ইস্পাতের তৈজস-পত্র গৃহস্থালীর কাজে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ক্রোমিয়ামের সঙ্গে কিছু নিকেল মেশালে আরও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর **স্টেনলেস স্টিল** তৈরি হয়ে থাকে। লোহার সঙ্গে প্রায় 20 ভাগ ক্রোমিয়াম ও 10 ভাগ নিকেলের সংযোগে উৎপন্ন ষ্টেনলেস-স্টিল তার মরিচাহীনতা, কাঠিন্য ও শ্বেত ঔজ্জ্বল্যের জন্যে আজকাল সমধিক প্রচলিত। এই শ্রেণীর স্টিলের বিশেষ নাম **স্টেব্রাইট**। কেবল গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিই নয়, এর বিশেষ ক্ষয়রোধক ধর্মের জন্যে এ-জাতীয় স্টিল সমুদ্রের লবণাক্ত জল বা কোন অ্যাসিডের ক্রিয়ায় ক্ষয়িত বা বিকৃত হয় না বলে সমুদ্রগামী জাহাজের অংশবিশেষ নির্মাণে ও বিভিন্ন রসায়ন-শিল্পে এই শ্রেণীর স্টিলের পাত্র ব্যবহৃত হয়।

নিকেলের সংযোগে স্টিলের কাঠিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার তার স্থিতিস্থাপকতা গুণও বৃদ্ধি পায়, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। নিকেলের ভাগ যথেষ্ট বাড়ালে স্টিলের গঠনে আরও নানা বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়; যেমন, যে স্টিলে শতকরা 36 ভাগ নিকেল, অতি সামান্য (শতকরা মাত্র 0·2 থেকে 0·5 ভাগ) কার্বন থাকে, উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তার আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রায় ঘটে না, অর্থাৎ আয়তন-বৃদ্ধির গুণাংক বা সম্প্রসারণাংক (coefficient of expansion) স্থির থাকে। এই শ্রেণীর স্টিলের বিশেষ নাম **ইন্‌ভার**; উক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই সংকর ধাতু দিয়ে প্রমাণ মাপকাঠি, জরিপ-কার্যের ফিতে, দেয়াল-ঘড়ির দোলক-দণ্ড, সূক্ষ্ম ও সঠিক মাপের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। অনুরূপ

আর এক রকম নিকেল-স্টিলকে বলে **এলিনভার**, যা দিয়ে হাত-ঘড়ির ব্যালান্স স্প্রিং তৈরি করা হয় ; কারণ তাপের তারতম্যে আয়তনের সঙ্গে সঙ্গে এ স্টিলের স্থিতিস্থাপকতা গুণও সঠিক থাকে, যার ফলে স্প্রিং-এর জোর নির্দিষ্ট থাকে। শতকরা 46 ভাগ নিকেলের সম্মিলনে উৎপন্ন নিকেল-স্টিলকে বলা হয় **প্লাটিনাইট ;** উত্তাপে এর আয়তন বৃদ্ধির হার কাচের অনুরূপ, কাজেই কাচের জিনিসের ভিতরে এই ধাতু-সংকরের তার প্রবেশ করিয়ে পারস্পরিক সংযোগের ব্যবস্থা করা যায়। প্লাটিনাম ধাতুর আলোচনা প্রসঙ্গে এর কথা আমরা (পৃষ্ঠা 161) আগেই বলেছি। আবার আর এক শ্রেণীর ধাতু-সংকর তৈরি হয়েছে শতকরা 53·8 ভাগ লোহা, 29 ভাগ নিকেল, 17 ভাগ কোবাল্ট ও 0·2 ভাগ ম্যাঙ্গানিজের সংযোগে ; উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে এর আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির হার বিশেষ এক শ্রেণীর কঠিন কাচের (হার্ড গ্লাস) অনুরূপ বলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কাচে এই সংকর-ধাতুর তার বিশেষ উপযোগী।

কোন কোন শ্রেণীর ইস্পাতে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজও দেওয়া হয় সত্য, কিন্তু তার শতকরা পরিমাণ থাকে অতি সামান্য। ম্যাঙ্গানিজের ভাগ যথেষ্ট বাড়ালে (শতকরা 10 থেকে 14 ভাগ) এক শ্রেণীর অতি-কঠিন ও সুদৃঢ় ইস্পাত পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ইস্পাত ডাকাতি-নিরোধক সুকঠিন লৌহ-সিন্দুক, পাথর গুঁড়া করবার যন্ত্র, সৈন্যদের বিশেষ শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই **ম্যাঙ্গানিজ-স্টিল** আবার চৌম্বকশক্তিহীন হয়ে থাকে ; এই বিশেষ গুণের জন্যে জাহাজের দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্রের (কম্পাস) অংশ বিশেষ এরূপ ইস্পাত দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে গভীর সমুদ্রে নাবিকদের দিঙ্‌নির্ণয় নির্ভুল হতে পারে।

বিভিন্ন ধাতব জিনিস কাটবার জন্যে যে কঠিন ইস্পাতের যন্ত্র তৈরি হয় তাতে কার্বনের ভাগ বেশি থাকে। এরূপ সাধারণ **হাই-কার্বন স্টিল** দিয়ে ধাতু কাটবার কাজ ভালই চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘর্ষণে উদ্ভূত উত্তাপ অত্যধিক না বাড়ে ; কিন্তু ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে এটা যখন যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে লাল্‌চে হয়ে ওঠে তখন এরূপ স্টিল তার কাঠিন্য হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। হাই-কার্বন স্টিলের এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানা গেছে যে, বিশেষ শ্রেণীর ক্রোম-স্টিলের সঙ্গে কিছু টাংস্টেন, অথবা মলিব্‌ডিনাম ধাতু মিশিয়ে যে **হাই-স্পিড স্টিল** উৎপন্ন হয় তার কাঠিন্য লোহিত-তপ্ত অবস্থায়ও অক্ষুণ্ন থাকে। এই শ্রেণীর ধাতু-কর্তন যন্ত্রের ইস্পাতে লোহার সঙ্গে

শতকরা মোটামুটি 4 ভাগ ক্রোমিয়াম, 0·6 ভাগ কার্বন, 14 থেকে 20 ভাগ টাংস্টেন (অথবা 5 থেকে 6 ভাগ মলিব্‌ডিনাম) মিশ্রিত থাকে। কখন কখন আবার শতকরা প্রায় 1 ভাগ ভ্যানাডিয়াম ধাতুও এই শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধাতু-বিজ্ঞানে এটা একটা অতি মূল্যবান ধাতু-সংকর বা ইস্পাত, যার উপযোগিতা ও ব্যবহার আধুনিক কারিগরি-শিল্পে অপরিহার্য।

টাংস্টেন ধাতু **উলফ্রাম** নামক আকরিক পিণ্ড থেকে নিষ্কাশিত হয়। এই মৌলিক ধাতুটির রাসায়নিক প্রতীক W ('উলফ্রাম' থেকে), এবং পারমাণবিক ওজন 183·92। ধাতুটা অত্যধিক তাপসহ; গলনাংক প্রায় 3,370° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এরূপ উচ্চ গলনাংকের জন্যে ইলেক্‌ট্রিক বাতির ফিলামেন্ট (দীপ্যমান তারকুণ্ডলী) তৈরির কাজে টাংস্টেন ধাতুর তার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোন কোন শ্রেণীর ইস্পাত, বিশেষতঃ হাই-স্পিড স্টিল উৎপাদনে ধাতুটার ব্যবহারের কথা আমরা আগেই বলেছি। বিভিন্ন অনুপাতে টাংস্টেন ও কার্বনের মিলনে উৎপন্ন যৌগিকগুলি **টাংস্টেন-কার্বাইড** নামে পরিচিত। এর সঙ্গে আবার সামান্য কোবাল্ট ধাতুর সংযোগ ঘটালে যে এক প্রকার উৎকৃষ্ট ধাতু-সংকর উৎপন্ন হয়, তার বিশেষ নাম **কার্ব্যালয়।** এই শ্রেণীর ধাতু-সংকর হীরকের মত সুকঠিন হয় এবং ধাতু-কাটা করাত তৈরি করতে যে হাইস্পিড টাংস্টেন-স্টিল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার চেয়েও এই কার্ব্যালয় অধিকতর উপযোগী হয় এবং অত্যুচ্চ তাপেও অধিকতর কর্মক্ষম থাকে।

মানুষের উন্নত জীবনযাত্রার বিবিধ প্রয়োজনে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত বিভিন্ন ধাতু ও ধাতু-সংকরের জ্ঞাতব্য তথ্যাদির সামান্য কিছু আলোচনা এই অধ্যায়ে করা হলো। মানব-কল্যাণে ধাতু-রসায়নের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, শিল্প-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যন্ত্র-প্রগতিতে বিভিন্ন ধাতু ও ধাতু-সংকর মানব-জাতিকে কতটা শক্তিধর করেছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এ-সবই বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। বিশেষতঃ লৌহ ও তার অসংখ্য ধাতু-সংকরের উদ্ভাবন ও প্রচলনে মানুষের যান্ত্রিক ও কারিগরি নৈপুণ্য আজ এক চরম উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। উন্মুক্ত জল-হাওয়ায় লোহা জারিত হয়ে সহজেই মরিচা (লৌহ-অক্সাইড) ধরে ক্ষয়িত ও অকেজো হয়ে পড়ে। লোহার এই ত্রুটি দূর করবার জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে লোহার উপরে রঙের আবরণ দেওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার লোহার উপরে দস্তা বা টিনের আস্তরণ (গ্যাল্‌ভ্যানাইজিং বা

টিন-প্লেটিং) ধরানো হয়ে থাকে। এ-সব স্থূল ব্যবস্থায় মানুষ সন্তুষ্ট থাকে নি; নানা শ্রেণীর মরিচাহীন (স্টেন-লেস) ও সুকঠিন লোহা বা ইস্পাত তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধাতুর সংযোগে বিভিন্ন প্রকার লৌহ-সংকর উৎপাদন করে ধাতুটার কাঠিন্য, ঔজ্জ্বল্য, স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছে। এ সব কথা আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন ধাতুর বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ পর্যালোচনাই কেবল নয়, আধুনিক বিজ্ঞান ধাতুর আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রকৃতিও উদ্‌ঘাটন করেছে। এক ধাতুকে অপর ধাতুতে রূপান্তরিত করবার রহস্যও এ-যুগের মানুষ উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ-সব কথা আমরা 'পদার্থের পারমাণবিক গঠন ও তেজস্ক্রিয়তা' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। প্রমাণিত হয়েছে যে, তেজঃ-বিকিরণের ফলে ইউরেনিয়াম ধাতু ধাপে-ধাপে রূপান্তরের শেষ পর্যায়ে সীসায় পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির রসায়নাগারে লক্ষ লক্ষ বছরে বহু পরিবর্তন ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এসে বিভিন্ন ধাতুকে যে অবস্থায় আজ আমরা দেখছি তা হয়তো তাদের চরম রূপ নয়।

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন জ্বালানী ঃ তাপ ও আলোক

জ্বালানীর রাসায়নিক প্রকৃতি ও প্রকার ভেদ — প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত ; কঠিন জ্বালানী কয়লা ঃ গঠন-প্রকৃতি, ক্যালরি-মূল্য, তাপ-শক্তির সর্বপ্রধান উৎস ; কাঁচা কয়লা ও কোক কয়লা; কোল-টার থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও গ্যাসীয় জ্বালানী ; হাই-টেম্পারেচার কোক ও হাফ-কোক ঃ আলোকদায়ী জ্বালানী — উদ্ভিজ্জ তেল ও জান্তব চর্বির রাসায়নিক গঠন ; মোমবাতি — প্রাচীন ও আধুনিক, প্যারাফিন ও স্পার্মাসেটি ঃ গ্যাসীয় জ্বালানী — প্রাকৃতিক গ্যাস ও কোল-গ্যাস — উৎপাদন, উপযোগিতা ও ব্যবহার ; কোল-গ্যাসের বিভিন্ন উপাদান ও বিশুদ্ধিকরণ ; তাপ ও আলোকদায়ী জ্বালানী — বুনসেন বার্ণার, গ্যাস-কুকার, অক্সি-কোলগ্যাস শিখা, লাইম-লাইট ও কৃত্রিম মণি উৎপাদন ঃ ওয়াটার গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস, কার্বুরেটেড ওয়াটার গ্যাস, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস, অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা ও ওয়েল্ডিং ; গ্যাস-ম্যাণ্টেল উৎপাদন ও ব্যবহার ঃ তরল জ্বালানী পেট্রোলিয়াম — উৎপত্তি, সংগ্রহ ও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন পৃথকিকরণ ; মার্স-গ্যাস, ফায়ার-ড্যাম্প ও ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প ; ময়লা-আবর্জনাও ফেল্‌না নয় ; খনিজ পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার — আংশিক-পাতন পদ্ধতিতে ইথার, পেট্রল, বেঞ্জোলিন, কেরোসিন, গ্যাস-অয়েল, প্যারাফিন প্রভৃতি ও বিভিন্ন প্রকার মোটর-স্পিরিট,—মিশ্রণ ও কৃত্রিম উৎপাদন ; হাইড্রোজেনেসন অব কোল।

পূর্ববর্তী 'দহন ও অগ্নি উৎপাদন' শীর্ষক এক অধ্যায়ে আমরা পদার্থের দহন-ক্রিয়ার রাসায়নিক তাৎপর্য ও তথ্যাদি সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করেছি। আমরা জানি, দহন হলো একটি রাসায়নিক ক্রিয়া, যাতে দাহ্য পদার্থের উপাদানের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের মিলন ঘটে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার তীব্রতায় তাপের সৃষ্টি হয়, আর তার দ্রুততা ও তীব্রতার আধিক্যে দীপ্তি বা আলোকের উদ্ভব হয়ে থাকে। এভাবে দহনের রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয়ে অবস্থাবিশেষে তাপ-শক্তি ও আলোক-শক্তিতে প্রকাশ পায়। সাধারণ দাহ্য পদার্থ সবই মুখ্যতঃ **কার্বন**-বহুল ; দহনে তাদের কার্বন-উপাদানের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন হয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস। অনেক দাহ্য পদার্থ আবার **হাইড্রোকার্বন** শ্রেণীর, এগুলির ক্ষেত্রে দহন-ক্রিয়ায় কার্বন রূপান্তরিত হয় কার্বন-ডাইঅক্সাইডে, আর হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগে জারিত

হয়ে উৎপন্ন করে জল। দাহ্য পদার্থের দহনে উৎপন্ন এই জল (জলীয় বাষ্প) ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে মিলিয়ে যায়; আর এই রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় বিমুক্ত শক্তি তাপশক্তিতে, অবস্থাভেদে আলোক-শক্তিতে বিকাশ লাভ করে। সে যাই হোক, এরূপ কার্বন ও হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর বিভিন্ন দাহ্য পদার্থকে বলা হয় **জ্বালানী,** ইংরেজীতে যাকে বলে 'ফুয়েল'। উল্লিখিত আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, একক কার্বনের চেয়ে হাইড্রোকার্বন (কার্বন + হাইড্রোজেন যৌগিক) শ্রেণীর দাহ্য পদার্থ, বা জ্বালানীর দহনে উল্লিখিত দ্বিবিধ রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ার ফলে শক্তির বিকাশ দ্রুততর ও তীব্রতর হয়; তাই দেখা যায়, অল্প সময়ে উদ্ভূত অত্যধিক তাপ-শক্তির রূপান্তরের ফলে আলোকের উদ্ভব ঘটে থাকে। বস্তুতঃ তরল ও গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর জ্বালানীগুলিই তাপের চেয়ে অধিকতর আলোকদায়ী হয়। এ বিষয়ে আমরা পরে যথাস্থানে সবিশেষ আলোচনা করবো।

জ্বালানীর প্রকার ভেদ : সাধারণভাবে বলা যায়, যে-সব পদার্থ দগ্ধ হয় বা জ্বলে তা-ই জ্বালানী; আর সেই দহন বা জ্বলনে আমরা পাই তাপশক্তি ও অবস্থাভেদে দীপ্তি বা আলোক-শক্তি। জ্বালানী কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিন রকমই আছে; কঠিন জ্বালানীগুলিই সাধারণতঃ তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী থেকেও তাপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ এগুলি আলোকদায়ী হয়ে থাকে। জ্বালানীকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত। কাঠ, খনিজ কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি হলো **প্রাকৃতিক জ্বালানী,** আর খনিজ কাঁচা কয়লা থেকে উৎপাদিত কোক-কয়লা ও কোল-গ্যাস, ওয়াটার-গ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস প্রভৃতি দাহ্য গ্যাসগুলিকে বলা যায় **উৎপাদিত জ্বালানী**। প্রাকৃতিক জ্বালানীর মধ্যে প্রধানতঃ কাঠই আবহমান কাল থেকে জ্বালানী হিসেবে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল; বস্তুতঃ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খনিজ কয়লা ব্যাপকভাবে উত্তোলিত হওয়ার পরে কয়লাই মানুষের প্রধান জ্বালানীর স্থান অধিকার করেছে। আমাদের দেশে কয়লার প্রচলন মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে সুরু হয়েছে। আধুনিক মানব-সভ্যতা প্রধানতঃ কয়লার দহনে উদ্ভূত তাপশক্তির উপরেই নির্ভরশীল। তাপের আরও নানা উৎস আবিষ্কৃত হলেও বিভিন্ন শিল্পের প্রসারে আজও কয়লাই তাপ-শক্তির মুখ্য উৎস, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কঠিন জ্বালানী: কয়লা

মানুষের প্রথম ও প্রধান জ্বালানী কাঠ; কিন্তু কাঠে শতকরা হিসাবে কার্বনের ভাগ থাকে অনেক কম বলে তার তাপোৎপাদক শক্তিও কম। কাঠের মুখ্য উপাদান সেলুলোজের সঙ্গে লিগ্‌নিন, উদ্ভিজ্জ মোম, রজনজাতীয় বিভিন্ন জৈব যৌগিক ও ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি নানা অজৈব পদার্থ কাঠে থাকে, তা ছাড়া থাকে জল। এ-সব পদার্থের মধ্যে কাঠের কার্বনবহুল **সেলুলোজ** উপাদানই মুখ্যতঃ দগ্ধ হয়; কিন্তু ওজনের হিসাবে কাঠের অন্যান্য উপাদানের আপেক্ষিক তুলনায় সেলুলোজের গঠনে কার্বনের পরিমাণ যথেষ্ট কম, তাই কাঠের দহনে যথেষ্ট তাপ উদ্ভূত হয় না। আমরা জানি, কয়লা হলো কাঠেরই বিকৃত রূপ; প্রাচীন যুগের ঘন সন্নিবিষ্ট বন-জঙ্গল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূ-গর্ভে প্রোথিত হয়ে উদ্ভিদ-দেহই ক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত হয়ে সঞ্চিত রয়েছে। বহু সহস্র বছর ধরে ভূ-গর্ভের চাপ ও তাপের প্রভাবে এবং বিভিন্ন জীবাণুর বিক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহের সেলুলোজ বা কাষ্ঠ-তন্তুগুলি ধীরে ধীরে অধিকতর কার্বনঘটিত (অঙ্গারীভূত) পদার্থপিণ্ডে রূপান্তরিত ও প্রস্তরীভূত হয়ে রয়েছে। একেই আমরা বলি **কয়লা**।

খনি-গর্ভে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা কাটা হচ্ছে

কয়লার গঠন ও ক্যালরি-মূল্য: উদ্ভিদ-দেহের সেলুলোজ হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি জৈব যৌগিক পদার্থ, $C_6H_{10}O_5$; এর গঠন সম্পর্কে আমরা 'সেলুলোজ ও সেলুলোজ-শিল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে পরে আলোচনা করবো। ভূ-গর্ভের স্বাভাবিক তাপ ও চাপে এবং জীবাণুদের প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহের নানা বিকৃতির ফলে সেলুলোজের হাইড্রোজেন ও

অক্সিজেন উপাদান দু'টি ধীরে ধীরে বিমুক্ত হয়ে যায় ; তাই বিকৃত বা রূপান্তরিত সেলুলোজে (কয়লায়) শতকরা হিসাবে কার্বনের ভাগ যথেষ্ট বেড়ে যায়। বিমুক্ত ঐ গ্যাস দু'টা আবার কিছু কার্বনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে যুক্ত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও মার্স-গ্যাসে (CH_4) রূপান্তরিত হয়ে খনিগর্ভে আবদ্ধ থাকে। হাজার হাজার বছরের ক্রম-রূপান্তরের ধারায় উদ্ভিদের সেলুলোজ-অংশ এভাবে বিভিন্ন পরিমাণ কার্বনসমন্বিত পিট, লিগ্‌নাইট, বিটুমিনাস-কোল ও অ্যান্থ্রাসাইট জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। কাঠের সেলুলোজ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার গঠনে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উপাদান দু'টির ভাগ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে যে কার্বনের ভাগ বেড়েছে, নিম্নলিখিত তালিকা থেকে তার মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে :

		কার্বন	হাইড্রোজেন	অক্সিজেন
সেলুলোজ	শতকরা	44·5	6·2	49·9
শুষ্ক কাঠ	"	50·0	6·0	44·0
পিট	"	60·0	5·9	34·1
লিগ্‌নাইট	"	67·0	5·2	27·9
বিটুমিনাস কোল	"	88·5	5·6	6·0
অ্যান্থ্রাসাইট	"	94·1	3·4	2·5

উল্লিখিত তালিকায় দেখা যায়, কাঠের চেয়ে কয়লায় কার্বনের ভাগ অনেক বেশি থাকে, আর তাই কাঠের চেয়ে কয়লার দহনে অধিকতর তাপশক্তি পাওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি পাউণ্ড কাঠ থেকে 9,600 একক, আর অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা থেকে 15,700 একক তাপশক্তি উদ্ভূত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় তাপশক্তির পরিমাণ বা **ক্যালরিফিক ভ্যালু** প্রকাশের একক হলো বি. টি-এইচ. ইউ (বৃটিশ থার্মাল ইউনিট)। তাপশক্তির পরিমাপ প্রসঙ্গ পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, কাঠ বা কয়লা কোন নির্দিষ্ট গঠনের রাসায়নিক যৌগিক নয় ; কাঠের মধ্যে সেলুলোজ ছাড়া লিগ্‌নাইট, রজন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি বহুবিধ জৈব ও অজৈব উপাদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণে যুক্ত থাকে ; তাই বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ বা কয়লার গঠনে যথেষ্ট বিভিন্নতা বর্তমান। কাঠের মুখ্য উপাদান সেলুলোজই

কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাই উপরের তালিকায় বিভিন্ন অবস্থায় সেলুলোজের সংগঠক উপাদান তিনটির একটা মোটামুটি গড় হিসাব দেওয়া হয়েছে মাত্র। কয়লার (রূপান্তরিত সেলুলোজের) গঠনে কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলেই তার দহনে বিমুক্ত তাপ-শক্তির পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কয়লার ভিতরে আর যে-সব জৈব বা অজৈব পদার্থ সংবদ্ধ থাকে দহনে বা তাপোৎপাদনে সেগুলির তেমন কোন কার্যকারিতা নেই বলা চলে।

ভূ-গর্ভে কাঠ থেকে কয়লার রূপান্তরের ক্রমপর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লায় কার্বন-বৃদ্ধি, বা 'কার্বনিজেসন' পদ্ধতি যত অগ্রসর হয় ততই তার গ্যাসীয় ও উদ্বায়ী উপাদানগুলির পরিমাণ কমতে থাকে। বিভিন্ন জ্বালানীর উদ্বায়ী উপাদানের পরিমাণের উপরেই দহনক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ভর করে ; আর তাদের দহনে বিমুক্ত উদ্বায়ী পদার্থের বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন জ্বালানী বিভিন্ন রকম জ্বলে। শুষ্ক কাঠ সহজে জ্বলে ও উজ্জ্বল শিখা ছড়ায় ; কিন্তু কার্বন-বহুল **অ্যানথ্রাসাইট** কয়লা জ্বালানো শক্ত ; আবার জ্বললেও কিছু উজ্জ্বল শিখা ছড়ায় না, কিন্তু তাপ সৃষ্টি করে যথেষ্ট বেশি। একই কারণে কাঠের চেয়ে কাঠ-কয়লায় ও কাঁচা-কয়লার চেয়ে কোক-কয়লায় অধিকতর তাপ উদ্ভূত হয়ে থাকে। সব ক্ষেত্রেই গ্যাসীয় ও উদ্বায়ী উপাদানের স্বল্পতাই কঠিন জ্বালানীর তাপোৎপাদন-শক্তির আধিক্যের কারণ। যাহোক, কাঠ বা কয়লার দহনে উদ্ভূত দীপ্তি বা শিখার ঔজ্জ্বল্য এখানে আমাদের আলোচ্য নয়, দহনে কতটা তাপ উদ্ভূত হয় জ্বালানীর ক্ষেত্রে তা-ই বিচার্য। জ্বালানীর দহনে উৎপন্ন তাপ-শক্তির পরিমাণ, অর্থাৎ তার ক্যালরিফিক ভ্যালুর মাপে কঠিন জ্বালানীর সার্থকতা পরিমিত হয়।

বিভিন্ন জ্বালানীর পর্যায়ক্রমিক কার্বন-বৃদ্ধির (কার্বনিজেসনের) ফলেই তাদের তাপোৎপাদক শক্তি বৃদ্ধি পায়, একথা আগেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার কার্বনিজেসনের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মধ্যে অ্যানথ্রাসাইট কয়লাই সর্বাধিক কার্বন-বহুল ; কাজেই দহনে এই কয়লাই সর্বাধিক পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে।

তাপশক্তির পরিমাণ মাপতে নানা রকম একক ব্যবহার করা হয় ; সাধারণতঃ ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (সংক্ষেপে বি. টি-এইচ ইউ) বা ইংলণ্ডীয় তাপ-একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক **বি. টি-এইচ. ইউ** হলো ততটা তাপশক্তি যার প্রভাবে এক পাউণ্ড জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট (1°F) বর্ধিত হয়। অনেক সময় **ক্যালরি** একককেও (সি. জি. এস পদ্ধতি) তাপশক্তি মাপা

হয়; এক গ্র্যাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (1°C) বাড়াতে যতটা তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বলে এক ক্যালরি। হিসাব করলে দেখা যায়, এক বি.টি-এইচ.ইউ হলো 252 ক্যালরির সমান। আগেই বলা হয়েছে, এক পাউণ্ড শুষ্ক কাঠের দহনে যেখানে মাত্র 8,600 বি, টি-এইচ একক তাপ উদ্ভূত হয়, সমপরিমাণ অ্যানথ্রাসাইট কয়লা থেকে সেখানে তারই 15,700 একক তাপ পাওয়া যায়। ঘর-সংসারে ব্যবহৃত সাধারণ বিটুমিনাস কয়লা থেকে পাওয়া যায় 14,900 একক তাপ। এ থেকে জ্বালানী হিসাবে কাঠের চেয়ে কয়লার অধিকতর কার্যকারিতার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

জ্বালানীরূপে কাঠ ও কয়লা ঃ কাঠের দহনে সামান্য তাপ পাওয়া গেলেও সস্তা ও সুলভ বলে সাধারণ জ্বালানী হিসাবে নানা কাজে, বিশেষতঃ রান্না-বান্নার জন্যে এ-যুগেও কাঠের ব্যবহার বড় কম নয়। আবার চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী শ্মশানে শবদাহের জন্যে আমরা হাজার হাজার টন কাঠ পুড়িয়ে ফেলি; সংস্কারবশে অন্ততঃ কলিকাতায়ও বৈদ্যুতিক চুল্লীর সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করেন না। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে কাঠের এরূপ অপচয় কোন দেশের পক্ষেই সঙ্গত ও সমীচীন নয়। বাসগৃহ ও আসবাব-পত্রের জন্যে প্রচুর কাঠ লাগে; আবার কাগজ, কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন, সেলোফেন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্পের মূল উপাদান সেলুলোজের উৎস হলো কাঠ। এরূপ বিভিন্ন কাজে কাঠের ব্যবহার জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান ও বিজ্ঞানসম্মত। জ্বালানীর মূল সার্থকতা হলো তার তাপ-উৎপাদন শক্তিতে। এদিক থেকে কাঠ হলো নিকৃষ্ট জ্বালানী; কয়লা অধিকতর উপযোগী ও উৎকৃষ্ট। আজকাল অবশ্য বিভিন্ন গ্যাস জ্বালিয়ে ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে জ্বালানীর চাহিদা অনেকটা মিটছে। তথাপি উৎকৃষ্ট জ্বালানী হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়লা ব্যবহৃত হয়; কারণ সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে কয়লা থেকেই সর্বাধিক তাপশক্তি পাওয়া যায়।

আধুনিক শিল্প-সভ্যতা প্রধানতঃ কয়লার উপরেই আজও নির্ভরশীল। পৃথিবীতে দৈনিক হাজার হাজার টন কয়লা বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ও সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে রাখা দরকার, ভূ-গর্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ; এ যুগে কয়লা আর নূতন করে সৃষ্টি হচ্ছে না। কাজেই একদিন পৃথিবীর সঞ্চিত কয়লা অবশ্যই নিঃশেষ হবে, সেদিন মানুষ তার প্রয়োজনীয় তাপশক্তির বিপুল ভবিষ্যৎ চাহিদা কি দিয়ে মেটাবে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের

ভাবনা ও গবেষণার শেষ নেই। তাপশক্তির নূতন নূতন উৎসের সন্ধানে বহু গবেষণা হয়েছে ;—আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন জ্বালানী তেল, গ্যাস প্রভৃতি, যাদের কথা আমরা পরে পৃথকভাবে আলোচনা করবো। তা ছাড়া উদ্ভাবিত হয়েছে বৈদ্যুতিক চুল্লী (ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস), সৌরতাপ চুল্লী (সোলার হিট রেডিয়েটর) ও সর্বশেষ পারমাণবিক শক্তিচুল্লী (অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টর)। তাপের এ-সব উৎসের আলাচনা অবশ্য রসায়নের গণ্ডির ভিতরে পড়ে না। কয়লার মত সর্বত্র সর্বকাজে ও সস্তায় তাপোৎপাদনের জন্যে এ সব যান্ত্রিক তাপচুল্লীর প্রচলন সহজ-সাধ্য নয়, পরন্তু এগুলির ব্যবস্থা করা উন্নত কারিগরী-বিদ্যা ও যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। সব দিক বিচার করলে তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসেবে কয়লাই সর্বাধিক উপযোগী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাপশক্তির এই প্রাকৃতিক উৎস, যার সঞ্চয় পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ ও পরিপূরণের সম্ভাবনাও যার নেই, সেই কয়লার ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত প্রয়োজন। কয়লার যাতে অপচয় না হয়, সর্বাধিক তাপশক্তি তা থেকে আহরণ করা সম্ভব হয়, আর তার কোন উপাদানই যাতে অপচিত না হয়, তার জন্যে কয়লার বিভিন্ন উপাদান ও রাসায়নিক গঠনের তথ্যাদি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে।

কালো-সোনা আল্‌কাত্‌রা ঃ আধুনিক মানব-সভ্যতায় খনিজ কয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও তার বিবিধ উপাদান সংগ্রহের শিল্প-প্রচেষ্টা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কয়লা থেকে কেবল তাপই পাওয়া যায় না, বহুবিধ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ কয়লা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ খনিজ কাঁচা-কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা কয়লার গুরুতর অপচয়; তাতে বহু মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ অকারণ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, আবার তাতে কয়লার সম্যক তাপশক্তিও পাওয়া যায় না। কাঁচা কয়লাকে আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে অন্তর্ধূম-পাতন (ডেষ্ট্রাক্‌টিভ ডিষ্টিলেসন) প্রক্রিয়ায় প্রথমে কয়লার গ্যাসীয় ও উদ্বায়ী উপাদান অ্যামোনিয়া, কোল-গ্যাস প্রভৃতি বেরিয়ে আসে; তারপরে পাতিত হয় কালো চট্‌চটে এক রকম অর্ধ-তরল পদার্থ, যাকে আমরা বলি আল্‌কাত্‌রা বা **কোল-টার**। এর পরে পাত্রের অভ্যন্তরে কয়লার যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **কোক** বা পোড়া-কয়লা। জ্বালানী হিসাবে এই কোক-কয়লা কাঁচা-কয়লার চেয়ে সর্বাংশে অধিকতর উপযোগী; দহনে তাপ দেয় অনেক বেশি, আবার তার দহনে কাঁচা কয়লার মত বিশ্রী ধূমও নির্গত হয় না। মাঝে থেকে অতিরিক্ত হিসাবে পাওয়া ঐ

আল্‌কাত্‌রা হলো প্রকৃতির একটি অতি মূল্যবান পদার্থ, বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থের উৎস। বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে আল্‌কাত্‌রা উত্তপ্ত করে আংশিক-পাতন (ফ্রাক্সনাল ডিস্টিলেসন) পদ্ধতিতে বিভিন্ন তাপাংকে পাওয়া যায় বিভিন্ন শ্রেণীর তৈলাক্ত পদার্থ ; বিশেষ পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে সেগুলি থেকে আবার পাওয়া যায় ক্রিয়োজেট, ফেনল, ন্যাপ্‌থলিন, বেঞ্জিন, প্যারাফিন প্রভৃতি
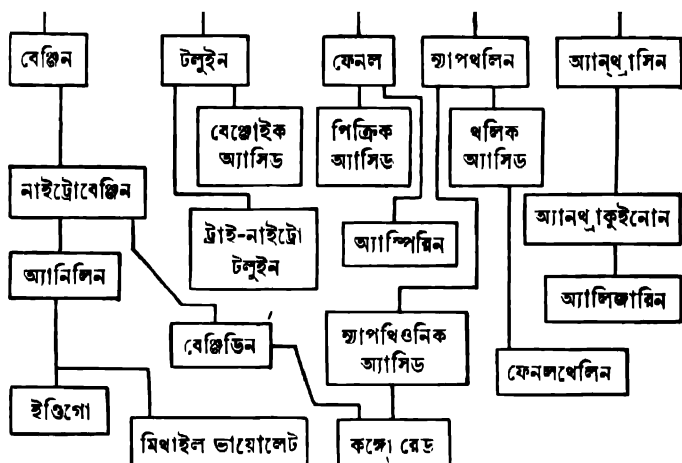
কোল-টার থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের পর্যায়ক্রমিক তালিকা

রাসায়নিক পদার্থ। আল্‌কাত্‌রা থেকে এসব রাসায়নিক উপাদানগুলি বেরিয়ে গেলে যে অংশটা অবশিষ্ট থাকে তা-ই হলো **পিচ**, যা সহরাঞ্চলের রাস্তায় দেওয়া হয়। আল্‌কাত্‌রার ঐসব মূল রাসায়নিক উপাদানগুলি থেকে আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় অ্যাস্পিরিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি নানারকম ঔষধ, —অ্যানিলিন, অ্যালিজারিন, ইণ্ডিগোটিন প্রভৃতি বিভিন্ন রং—টি-এন-টি, পিক্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ,—রজনজাতীয় বিভিন্ন প্লাস্টিক পদার্থ প্রভৃতি অসংখ্য রাসায়নিক দ্রব্য। এমন কি, এই কালো কুৎসিত আল্‌কাত্‌রা থেকে নিষ্কাশিত হয় সুমিষ্ট স্যাকারিন ও নানাবিধ সুগন্ধী সেণ্ট। মানব-কল্যাণে কয়লা, তথা আল্‌কাত্‌রার রাসায়নিক অবদানের শেষ নেই। বস্তুতঃ কয়লা বা

আলকাতরা রসায়নের বিচারে এতই মূল্যবান যে, একে যুক্তিযুক্তভাবেই **কালো সোনা** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যাহোক, খনিজ কয়লা যে কেবল একটা জ্বালানীই নয়, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বহু রাসায়নিক পদার্থেরও উৎস, তারই কিছু আভাস এখানে দেওয়া হলো মাত্র।

কয়লা থেকে আবার বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রাবার, পেট্রোল প্রভৃতি উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছে। এ বিষয় আমরা 'সংশ্লেষণী রসায়ন' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করবো। কেবল এ-সব রাসায়নিক পদার্থই নয়, বিভিন্ন দাহ্য গ্যাসও কয়লা থেকে উৎপাদিত হয়। কয়লা ও চুনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় **ক্যালসিয়াম কার্বাইড ;** জলের বিক্রিয়ায় পদার্থটা থেকে পাওয়া যায় দাহ্য **অ্যাসিটিলিন** গ্যাস। আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কয়লা থেকে উৎপাদিত হয় কোল-গ্যাস, ওয়াটার-গ্যাস ও প্রোডিউসার গ্যাস ; এগুলি সবই তাপ ও আলোকদায়ী জ্বালানী গ্যাস। গ্যাসীয় জ্বালানী প্রসঙ্গে আমরা এগুলির কথা পরে আলোচনা করবো। এখন জ্বালানী হিসাবে কয়লার কথাই আমাদের আলোচ্য।

কাঁচা কয়লা ও কোক কয়লা ঃ জ্বালানী হিসাবে কাঁচা কয়লা ব্যবহার করলে কেবল যে উল্লিখিত বহুবিধ মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থের অপচয় হয়, তা-ই নয় ; দহনে কাঁচা কয়লা থেকে উদ্গত বিভিন্ন গ্যাসীয় ও উদ্বায়ী উপাদানের সঙ্গে অজস্র সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা বেরিয়ে প্রচণ্ড ধূমের সৃষ্টি করে। খোলা উনানে কাঁচা কয়লা পোড়ালে এই ধূমে বায়ু দূষিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় ; আবার কয়লার তাপশক্তিও এভাবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়। কয়লার ভিতরে অন্যান্য বহু রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে স্বভাবতঃ সালফার বা গন্ধকের (সাল্ফাইড) যৌগিকও কিছু থাকে ; কয়লার দহনে তা পুড়ে কয়লার ধূমের সঙ্গে **সালফার-ডাইঅক্সাইড** গ্যাসও বেরোয়। এই গ্যাসটা কেবল মানুষের পক্ষেই নয়, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির পক্ষেও অনিষ্টকর। এসব কারণে জ্বালানী হিসাবে কোক-কয়লা ব্যবহার করাই স্বাস্থ্যবিধি ও অর্থনীতি সব দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উনানে কাঁচা কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফলে জনবহুল সহরাঞ্চলে, বিশেষতঃ কলকাতার মত সহরে হাজার হাজার খোলা উনানের ধূম-ধোঁয়ায় আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে জনজীবন বিপন্ন করে। দেশের শিল্পনৈতিক অনগ্রসরতাই এর মূল কারণ। আজও কয়লা-খনিতে বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিতে কাঁচা-কয়লা থেকে কোক-কয়লা উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা হয় নি। সুপ্রতিষ্ঠিত কোক-চুল্লী ও কোল-টার ডিস্টিলারির সংখ্যা এদেশে প্রয়োজনানুরূপ নয়। তাই অনেক ক্ষেত্রেই রাশিকৃত কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বহু অপচয়ের ভিতর দিয়ে কোক-কয়লা উৎপাদিত হয়ে থাকে। ইদানিং দুর্গাপুরে আধুনিক কোক-চুল্লী স্থাপিত হয়েছে এবং কোক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে কোল-গ্যাস উৎপাদন ও আল্‌কাত্‌রা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করবার কাজও সুরু হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, বৃহদাকার বক-যন্ত্রে খনিজ কাঁচা কয়লা উত্তপ্ত করলে অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় তা থেকে কোল-গ্যাস ও অ্যামোনিয়া প্রথমে বেরোয়, তারপরে ক্রমে আল্‌কাত্‌রা পাতিত হয়ে বেরিয়ে এসে বিশেষ ট্যাঙ্কে জমে। বক-যন্ত্রে পোড়া কয়লা বা **কোক** পড়ে থাকে। কোক-কয়লা জ্বালানীরূপে ব্যবহার করলে তাপ পাওয়া যায় বেশি, ধূমও প্রায় হয় না। কোল-গ্যাস উৎপাদনের কারখানার কোক-চুল্লীতে কাঁচা কয়লাকে বক-যন্ত্রের অভ্যন্তরে সাধারণতঃ 1100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়। এই উত্তাপে উৎপন্ন কোক-কয়লা ধূমহীন হয় বটে, কিন্তু একে সহজে জ্বালানো যায় না; কাজেই ঘর-সংসারের উনানে ব্যবহার করা কষ্টকর। এই শ্রেণীর কোক কয়লা প্রধানতঃ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় চুল্লীতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এবং একে বলা হয় **হাইটেম্পারেচার কোক**। সাধারণ উনানে ব্যবহারের উপযোগী কোক-কয়লা উৎপাদনের জন্যে কাঁচা কয়লাকে অতটা বেশি উত্তপ্ত করা হয় না। মোটামুটি মাত্র 500° থেকে 600° ডিগ্রি সেন্টগ্রেডে উত্তপ্ত করলে যে কোক কয়লা পাওয়া যায় তার ভিতরে কতকটা উদ্বায়ী উপাদান থেকে যায়; তাই এরূপ আধ-পোড়া কয়লা সহজে জ্বলে এবং ধূমও তেমন বেশি হয় না। এই শ্রেণীর কোক-কয়লা খোলা উনানে জ্বালবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী; একে বলা হয় লো-টেম্পারেচার কোক, বা **হাফ-কোক**। এরূপ ধূমহীন সাধারণ জ্বালানী কয়লার ক্যালরি-মূল্যও যথেষ্ট, সাধারণতঃ প্রায় 13.500 বি, টি-এইচ একক হয়ে থাকে।

আলোকদায়ী কঠিন জ্বালানী

আমরা এযুগে কত সহজে আলো জ্বালি;—নানারকম গ্যাসের আলো, কেরোসিন বাতি, মোমবাতি প্রভৃতির আধুনিক ব্যবস্থায় অতি সহজে অনেকটা

উজ্জ্বল আলোক পাই। আর বৈদ্যুতিক আলোর তো কথাই নেই, বোতাম টিপে মুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল আলোর ছটায় অন্ধকার দূর করি। আজ একথা ভাবাও কঠিন, প্রাচীন যুগের মানুষ পাথর ঠুকে, বা কাঠে-কাঠে ঘর্ষে অতি কষ্টে আগুন জ্বালতো, এবং তা থেকে শুষ্ক কাঠ ও লতাপাতা জ্বেলে তাপ ও আলোক পেত। সহজে আগুন জ্বালবার জন্যে বহু চেষ্টার পরে মাত্র খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশলাই উদ্ভাবিত হয়েছে। এ সব কথা আমরা 'দহন ও অগ্নি-উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করেছি। সে-কালের মানুষ খড়-কুটার মশাল জ্বেলে, বা কোন কোন উদ্ভিজ্জ তেল বা জান্তব চর্বি পুড়িয়ে আলোক উৎপাদন করতো; আর তার সামান্য স্তিমিত আলোকের সঙ্গে প্রচুর ধূম ও দুর্গন্ধ সয়েই মানুষ কোনক্রমে আলোর কাজ চালাতো। বৈদ্যুতিক আলোর কথা ছেড়ে দিলেও বর্তমান যুগে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছন্দ আলোক উৎপাদনের বিবিধ প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে মানব-কল্যাণে রসায়নের দানের মহিমা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আলোক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর অগ্রগতি বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই সুরু হয়েছে। আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবে বিবিধ তেল ও গ্যাসের কথা পরে আলোচিত হবে; এখন আমরা মোম-জাতীয় কঠিন জ্বালানীর রাসায়নিক স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করবো।

একমাত্র বৈদ্যুতিক আলোক ছাড়া আর সব রকম আলোক উৎপাদনের ব্যবস্থাই মূলতঃ পদার্থের দহন-ক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল; যেহেতু কোন-না-কোন জ্বালানী জ্বালিয়েই আলোক উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমরা জানি, জ্বালানীর কার্বন উপাদান বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে মিলিত হয়ে দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; আর তার ফলেই তাপ ও আলোক উদ্ভূত হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগের মানুষ নিশ্চয়ই স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ তেল ও জীব-জন্তুর চর্বি জ্বালিয়ে সর্বপ্রথম তার প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা করেছিল। রেড়ি, বাদাম প্রভৃতির তৈল নিষ্কাশিত করে তাতে পল্‌তে জ্বেলে আলোক উৎপাদনের ব্যবস্থা চলেছে বহুকাল। প্রাচীন যুগ থেকে বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেলই মানুষের একমাত্র আলোকদায়ী জ্বালানী ছিল। ইতিমধ্যে কঠিন জান্তব চর্বি জ্বেলে আলোক উৎপাদনের কৌশলও মানুষ আয়ত্ত করেছে। এটা অবশ্যই কিছু উন্নততর ব্যবস্থা; কারণ তেলের পাত্র বা প্রদীপের প্রয়োজন এতে থাকে না। জীব-জন্তুর চর্বি শুকিয়ে শক্ত করে অনেকটা আধুনিক মোমবাতির মত মাঝে একটা পলতে দিয়ে জ্বালাতো; পলতেটা জ্বালালে তার উত্তাপে চর্বি

বাষ্পীভূত হয়ে জ্বলে আলো দিত। প্রাচীন যুগের এরূপ চর্বির মোমবাতি আলো দিত সামান্য; প্রচুর ধূমের সৃষ্টি হতো, আর দুর্গন্ধ ছড়াতো। এরূপ জান্তব **চর্বির বাতি** সে-যুগে পাশ্চাত্য দেশেই সমধিক প্রচলিত হয়েছিল; বর্তমান যুগেও আইসল্যাণ্ড, ল্যাপল্যাণ্ড প্রভৃতি বরফের দেশের অধিবাসীরা সিল, ওয়ালরাস প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর চর্বি জ্বেলে তাদের প্রয়োজনীয় আলোক ও উত্তাপের ব্যবস্থা করে বলে শুনা যায়। আমাদের দেশে ধর্মীয় কারণে জান্তব চর্বির বাতি আজকের মত সে-যুগেও প্রচলিত হয় নি; প্রাচ্য দেশে সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ তেলের বাতি ও অনুষ্ঠানাদিতে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা চলে আসছে।

রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে উদ্ভিজ্জ তেল ও জান্তব চর্বি মূলতঃ একই শ্রেণীর পদার্থ। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিজ্ঞানী সেভ্রয়েল তেল ও চর্বির রাসায়নিক তথ্যাদির গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল হলো বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের [$C_3H_5(OH)_3$] বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ; যাদের বলা হয় গ্লিসারাইড। এই জৈব অ্যাসিডগুলির মধ্যে **পামিটিক** অ্যাসিড ($C_{15}H_{31}COOH$) ও **স্টিয়ারিক** অ্যাসিড ($C_{17}H_{35}COOH$) হলো কঠিন পদার্থ; কাজেই এদের গ্লিসারিন-যৌগিকও কঠিনাকার হয় এবং সেগুলিই হলো কঠিন জান্তব চর্বি। পক্ষান্তরে **অলিয়িক** অ্যাসিড হলো তরল পদার্থ, কাজেই গ্লিসারিনের সংযোগে এর যৌগিক হয় তরল; আর তাই হলো উদ্ভিজ্জ তেল। চর্বি ও তেলের এই রাসায়নিক গঠন-তত্ত্ব আমরা 'কয়েকটি প্রাচীন রাসায়নিক শিল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে সাবান-শিল্প প্রসঙ্গে যথোচিত আলোচনা করেছি। তেল ও চর্বির উল্লিখিত রাসায়নিক তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পরে আলোকদায়ী জ্বালানী হিসেবে মোমবাতির উৎপাদন-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আধুনিক মোমবাতি উৎপাদনের উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। জান্তব চর্বিকে প্রথমে সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু জলীয় দ্রবণে ফুটানো হয়; এর ফলে চর্বির ভিতরে যে-সব ছিব্‌ড়ে মত পদার্থ থাকে সেগুলি দ্রবিত চর্বি থেকে বেরিয়ে যায়। এই পরিস্রুত তরল চর্বির ভিতরে অত্যুত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে চর্বি বিয়োজিত হয়ে তার সংগঠক গ্লিসারিন ও জৈব অ্যাসিডে পৃথক হয়ে পড়ে। বিশেষ ব্যবস্থায় তা থেকে গ্লিসারিন অংশ আলাদা করে অবশিষ্ট অ্যাসিড-মিশ্রিত চর্বিকে পাতিত (ডিষ্টিল) করে কঠিন ষ্টিয়ারিক ও পামিটিক অ্যাসিড তরল অলেয়িক অ্যাসিড থেকে

পৃথক করা হয়। প্রকৃতপক্ষে জান্তব চর্বির কঠিনাংশ হলো প্রধানতঃ ষ্টিয়ারিক অ্যাসিডে গঠিত,' যাকে সাধারণতঃ বলা হয় **ষ্টিয়ারিন**। চর্বির এই কঠিন অ্যাসিডাংশের সঙ্গে কিছু **প্যারাফিন** মোম (কয়লা বা খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে উপজাত) মিশিয়ে আধুনিক মোমবাতির কঠিন জ্বালানী উপাদানটা তৈরি করা হয়। এই মোমবাতি আগের দিনের কাঁচা চর্বির মোমবাতির চেয়ে দেখতেও যেমন পরিষ্কার ও সাদা হয়, তেমনি হয় অপেক্ষাকৃত শক্ত; আবার তা ধূমহীন শিখায় জ্বলে উজ্জ্বলতর আলোক দেয়।

আধুনিক মোমবাতির জ্বালানী উপাদানে ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড বা ষ্টিয়ারিনের সঙ্গে **প্যারাফিন** (মোম) মেশানো হয় বলা হলো সত্য, কিন্তু আজকাল কেবল মাত্র প্যারাফিন দিয়েই বেশির ভাগ মোমবাতি তৈরি হয়ে থাকে। প্যারাফিন হলো একটা **হাইড্রোকার্বন** যৌগিক, অর্থাৎ পদার্থটা কেবলমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে গঠিত; আর চর্বির সংগঠক ষ্টিয়ারিন হলো একটা সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর যৌগিক, যাতে কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনও রয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই কার্বন ও হাইড্রোজেন রয়েছে বলে উভয়ই জ্বালানীর কাজ দেয়। লিগ্‌নাইট শ্রেণীর খনিজ কয়লাকে পাতিত করে যথেষ্ট প্যারাফিন মোম পাওয়া যায়; আবার খনিজ তেল পেট্রোলিয়াম থেকেও প্রচুর পরিমাণে প্যারাফিন নিষ্কাশিত হয়ে থাকে। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম শিল্পের অগ্রগতির ফলে বর্তমান যুগে প্যারাফিন যথেষ্ট সুলভ ও সস্তা হয়েছে, আর তাই স্বল্পমূল্যে মোমবাতি পাওয়া যায়। তার আগে মৌচাকের মোম ও **স্পার্মাসেটি** নামক এক রকম চর্বি জাতীয় পদার্থ দিয়ে মোমবাতি তৈরি করা হতো বলে জিনিসটা দুর্মূল্য ছিল। স্পার্ম নামক এক বিশেষ শ্রেণীর তিমি মাছের তেল থেকে এই স্পার্মাসেটি নামক হাইড্রোকার্বন-শ্রেণীর জৈব যৌগিক পদার্থটা পাওয়া যেত। কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত মোমই নয়, উদ্ভিজ্জ মোমও কোথাও কোথাও মোমবাতি প্রস্তুতির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মোমবাতির উপাদান ষ্টিয়ারিন বা প্যারাফিন দাহ্য পদার্থ বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, কাঠ বা কয়লার মত এগুলি জ্বলে না, উত্তাপে অবস্থান্তরিত বা গ্যাসীভূত হয়ে এরা জ্বলে। পল্‌তে জ্বালিয়ে দিলে প্রথমে সেই সামান্য উত্তাপে পার্শ্ববর্তী মোম গলে যায় এবং ক্রমে তাপাংক বৃদ্ধি পেয়ে পল্‌তের মাথায় গলিত মোম উঠে বাষ্পে পরিণত হয়; আর সেই ঊর্ধ্বগামী বাষ্পই জ্বলে আলোক-শিখার সৃষ্টি করে। প্যারাফিন হাইড্রোকার্বনগুলির গলনাংক উষ্ণতা

মোটামুটি 55° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড মাত্র, আর 100° ডিগ্রির কিছু অধিক উত্তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। গলিত মোম পল্‌তের সূতো বেয়ে কৈশিক (ক্যাপিলারি) টানে উপরে উঠে যায়, আর পল্‌তের মাথায় পৌঁছে বাষ্পে পরিণত হয়ে জ্বলতে থাকে। এই জ্বলন বা দহন-ক্রিয়ায় বাষ্পীয় প্যারাফিনের (হাইড্রো-কার্বনের) হাইড্রোজেন ও কার্বন উপাদান দুটি সংলগ্ন বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে (দহনে) উৎপন্ন করে যথাক্রমে জল (জলীয় বাষ্প) ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস; সেই সঙ্গে কিছু অদগ্ধ কার্বন-কণিকাও ধূমের আকারে উপরে ওঠে। মোমবাতির শিখার কিছু উপরে ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার একখানা কাচের পাত ধরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনলে অনেক সময় হাইড্রোজেনের দহনে উৎপন্ন ঐ জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বিশেষ পরীক্ষায় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও কার্বন-কণিকার অস্তিত্বও প্রমাণ করা যায়।
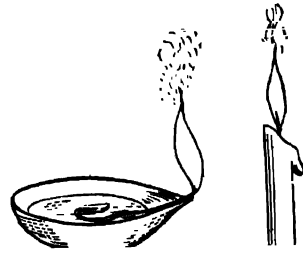
তেলের প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বলছে ও শিখার অগ্রভাগে অদগ্ধ কার্বনের ধূম উঠছে

গ্যাসীয় জ্বালানী

প্রধানতঃ রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভে সঞ্চিত এক রকম প্রাকৃতিক গ্যাস বিভিন্ন উৎস-মুখ থেকে এক সময় প্রচুর পরিমাণে নির্গত হতো; আজও কোথাও কোথাও এরূপ প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস উত্থিত হয়ে থাকে। এই গ্যাস জ্বালিয়ে আলোক ও উত্তাপ উভয়ই পাওয়া যায়। শত শত মাইল দূরবর্তী স্থানে পাইপের সাহায্যে প্রবাহিত করে নিয়ে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় এক সময় জ্বালানী হিসাবে এই গ্যাস যথেষ্ট ব্যবহৃত হতো। বিশেষতঃ আমেরিকায় কেবল আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবেই নয়; ইস্পাত, সোডা, কাচ, রং প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পে উৎকৃষ্ট জ্বালানী হিসাবে এই **প্রাকৃতিক গ্যাস** ব্যবহার করা হতো। এটা একক কোন গ্যাস নয়, ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন দাহ্য গ্যাসের সংমিশ্রণ, যার মুখ্য উপাদান হলো **মিথেন** (CH_4) গ্যাস। প্রধানতঃ এই গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনটার দহনেই প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তাপ ও আলোক পাওয়া যায়। দহনে উদ্ভূত তাপ-শক্তির

বিচারে জ্বালানী হিসাবে এই প্রাকৃতিক গ্যাসের উপযোগিতা যথেষ্ট; প্রতি ঘন ফুট গ্যাস জ্বালিয়ে 1000 বি. টি-এইচ এককেরও বেশি তাপশক্তি পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ক্যালরি-মূল্য কোল-গ্যাসের ক্যালরি-মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ। আবার এই প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মোটর-গাড়ীতে ব্যবহারের উপযোগী এক রকম **তরল জ্বালানী** (মোটর-স্পিরিট) উৎপাদিত হয়ে থাকে; এ বিষয় আমরা 'তরল জ্বালানী' প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করবো। প্রাকৃতিক গ্যাস একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানী হলেও সব দেশে সর্বত্র এটা পাওয়া যায় না; কাজেই আধুনিক শিল্প-প্রগতির যুগে এর উপরে নির্ভর করা চলে না। বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে আজকাল নানা রকম জ্বালানী গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে।
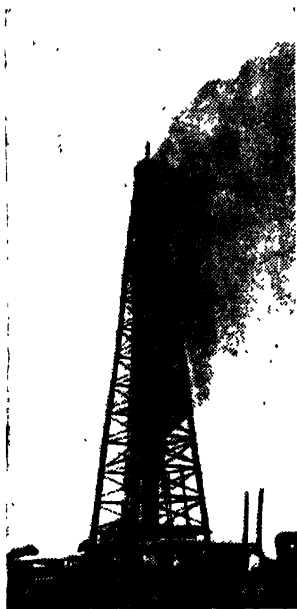
স্বতঃউৎসারিত প্রাকৃতিক গ্যাস সংগ্রহ ও তৈলকূপ খনন

আধুনিক যুগে তাপ ও আলোক সৃষ্টির জন্যে যে-সব জ্বালানী গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে সেগুলি প্রধানতঃ কয়লা থেকেই বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাওয়া গেছে। খনিজ কাঁচা কয়লাকে আবদ্ধ পাত্রে বায়ু-সম্পর্কহীন অবস্থায় উত্তপ্ত করে কোক-কয়লা উৎপাদনের সময়ে যে **কোল-গ্যাস** পাওয়া যায়, সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। তা ছাড়া উত্তপ্ত কোক-কয়লার ভিতরে জলীয় বাষ্প চালিয়ে **ওয়াটার গ্যাস** এবং বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে **প্রোডিউসার গ্যাস** উৎপাদিত হয়। এগুলি সবই দাহ্য গ্যাস; জ্বালানী হিসাবে নানাভাবে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার বিশেষ ব্যবস্থায় উত্তপ্ত করে খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত 'কেরোসিন' তেল বাষ্পীভূত করেও এক রকম দাহ্য গ্যাস পাওয়া যায়, যাকে **তেল-গ্যাস** বলা যেতে পারে। এগুলি সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে সবিশেষ আলোচনা করবো।

কোল-গ্যাসঃ বিশেষ আকারের আবদ্ধ পাত্র বা বকযন্ত্রে কাঁচা কয়লা

উত্তপ্ত করলে অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় আল্‌কাত্‌রা বা **কোল-টার** ; আর সেই সঙ্গে এক রকম গ্যাসও নির্গত হয়, যা জ্বালালে আলোক ও উত্তাপ দেয়। কাঁচা-কয়লা বা কোল থেকে পাওয়া যায় বলে একে বলা হয় কোল-গ্যাস। এই গ্যাসের দাহ্য-প্রকৃতি প্রথম লক্ষ্য করেন 1688 খৃষ্টাব্দে **জন ক্লেটন** নামক ইংলণ্ডের এক জন ধর্মযাজক। সেকালের ধর্মযাজকেরা অনেকে প্রাকৃতিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করতেন ; কোল-গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তারই ফল। কিন্তু বিজ্ঞানী-সমাজে তথ্যটা তখন তেমন প্রচার লাভ করে নি। শতাধিক বছর পরে জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করেন **উইলিয়ম মার্ডক** নামক স্কটল্যাণ্ডবাসী একজন ইঞ্জিনিয়ার। 1792 খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ণওয়ালস্থিত তাঁর বাসগৃহ কোল-গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করেন। সেকালের উদ্ভিজ্জ তেল ও জান্তব চর্বির বাতির ধোঁয়াচ্ছন্ন স্তিমিত আলোকের যুগে গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক দেখে মানুষ বিস্মিত ও চমকিত হয়েছিল। খনিজ কয়লা থেকে মার্ডক যে পদ্ধতিতে এরূপ উজ্জ্বল আলোকদায়ী **কোল-গ্যাস** উৎপাদন করেছিলেন, তা সারা দেশে দ্রুত প্রচারিত হয়ে পড়ে এবং মাত্র 10—12 বছরের মধ্যেই ইংলণ্ডের সহরাঞ্চলে এই গ্যাসের আলো প্রবর্তিত হয়। এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা ; তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে কোল-গ্যাস ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় এবং তার উৎপাদন-পদ্ধতিরও প্রভূত উন্নতি ঘটে।

কঠিন জ্বালানী কয়লার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই বলেছি, খনিজ কয়লার নির্দিষ্ট কোন রাসায়নিক গঠন নেই ; এটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। আমরা এ-ও জেনেছি যে, কয়লার প্রধান মৌলিক উপাদান হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ; আবার কিছু নাইট্রোজেন, গন্ধক (সালফার) প্রভৃতি অজৈব মৌলিক পদার্থও কয়লার মধ্যে থাকে। এসব বিভিন্ন মৌলের সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগের আকারে অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থ কাঁচা-কয়লার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বকযন্ত্র নামক বৃহদাকার আবদ্ধ পাত্রে খনিজ কয়লা যথেষ্ট উত্তপ্ত করলে তা থেকে তাপ ও আলোকদায়ী দাহ্য গ্যাস বা কোল-গ্যাসই কেবল বেরোয় না, সেই সঙ্গে কতকটা অ্যামোনিয়া গ্যাসও নির্গত হয় ; আর যথেষ্ট পরিমাণ আল্‌কাত্‌রা বা **কোল-টার** পাতিত হয়ে আসে। তারপরে পাত্রের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট থাকে কোক বা পোড়া-কয়লা, যা জ্বালানী হিসাবে অধিকতর তাপদায়ী ও বিভিন্ন শিল্পে সবিশেষ উপযোগী।

বিশেষতঃ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জ্বালানী হিসাবে বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ টন খনিজ কয়লাকে উল্লিখিত অন্তর্ধূম-পাতন পদ্ধতিতে কোক-কয়লায় রূপান্তরিত করা হয়। এর ফলে আনুষঙ্গিক উপজাত পদার্থ হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ কোল-গ্যাস ও কোল-টার পাওয়া যায় তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। অবশ্য মার্ডকের সময় থেকে জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে সত্য, কিন্তু ঐ কালো বিদ্ঘুটে পদার্থ কোল-টারকে মূল্যহীন অকেজো জঞ্জাল হিসাবে ফেলে দেওয়া হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আল্‌কাত্‌রার রাসায়নিক গুরুত্ব ক্রমে উদ্ঘাটিত হতে থাকে। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত গবেষণার ফলে কোক-চুল্লীর এই উপজাত পদার্থটা থেকে একে একে বহুবিধ মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ নিষ্কাশিত হয়েছে। আল্‌কাত্‌রা থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিবিধ ঔষধ, রং, বিস্ফোরক, সুগন্ধী, প্লাস্টিক প্রভৃতি আধুনিক মানব-সভ্যতার অতি প্রয়োজনীয় বহু রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়েছে; এ বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। জ্বালানী প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না।

কোল-গ্যাসের শিল্পোৎপাদন ঃ খনিজ কাঁচা কয়লাকে কোক-কয়লায় রূপান্তরিত করবার অন্তর্ধূম-পাতন পদ্ধতিতে উপজাত কোল-গ্যাসের পরিমাণ
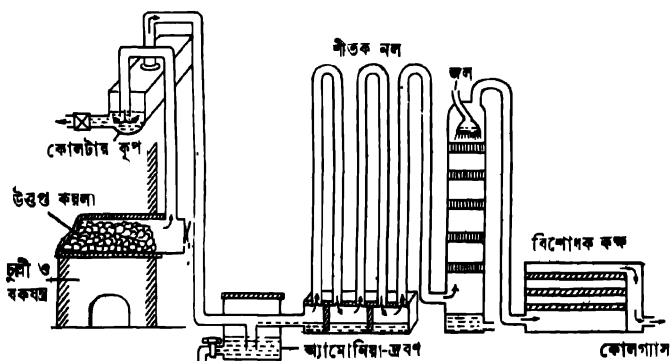
বকযন্ত্রে কাঁচা-কয়লা উত্তপ্ত করে কোল-গ্যাস ও কোল-টার উৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতি

যদিও কয়লার গঠন-প্রকৃতি ও প্রযুক্ত উত্তাপের বিভিন্নতার উপরে নির্ভরশীল, তথাপি মোটামুটি হিসাবে বলা যায়—প্রতি টন কয়লা থেকে প্রায় 11,000 ঘন

ফুট পরিমাণ কোল-গ্যাস নির্গত হয়। খনিজ কয়লা তাপশক্তির এক বিরাট উৎস; তা থেকে রূপান্তরিত **কোক** কয়লা যেমন একটি অত্যধিক তাপদায়ী জ্বালানী, আবার উপজাত এই বিপুল পরিমাণ **কোল-গ্যাস** থেকেও পাওয়া যায় প্রচুর তাপ ও আলোক। কোল-গ্যাস উৎপাদনের কারখানার কোক-চুল্লীতে (কোল-গ্যাস প্ল্যাণ্ট) 'ফায়ার-ক্লে' নামক বিশেষ তাপসহ এক রকম চীনামাটির তৈরী বৃহদাকার 'রেটর্ট' বা বকযন্ত্রে খনিজ কাঁচা কয়লাকে মোটামুটি 1,000° থেকে 11,00° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণতঃ কোক-কয়লা জ্বালিয়েই এই উত্তাপ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই তাপ-মাত্রায় আবদ্ধ পাত্রের বায়ুহীন অবস্থায় খনিজ কাঁচা-কয়লা বিয়োজিত হতে থাকে, আর তার উদ্বায়ী পদার্থগুলি একটি নলপথে চলে যায় একটা জলাধারে, যাকে বলা হয় **হাইড্রলিক মেন।** নলের মুখটা ঐ আধারের জলের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। এখানে কয়লার জলীয় অংশ ও বিভিন্ন উদ্বায়ী উপাদানগুলির অধিকাংশই জমে ঘনীভূত হয়ে আল্‌কাত্‌রা রূপে ঐ আধারে থেকে যায়; আর অন্যান্য গ্যাসীয় অংশ শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি নলের ভিতর দিয়ে যায় স্তম্ভাকার বিশুদ্ধিকরণ প্রকোষ্ঠে, যার মধ্যে উপর থেকে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা থাকে। উল্লিখিত শ্রেণীবদ্ধ নলগুলি থাকে বাইরের হাওয়ায় উন্মুক্ত ও লম্বভাবে দণ্ডায়মান: কাজেই এগুলির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বাহিত অবশিষ্ট জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ও আল্‌কাত্‌রার ভাগ জমে নিচে নামে, আর গ্যাসীয় অংশ বিশোধক চেম্বারে চলে যায়। সেখান থেকে বিশুদ্ধ কোল-গ্যাস প্রবাহিত হয়ে গিয়ে গ্যাসাধারে সঞ্চিত হয়।

উত্তপ্ত কয়লা থেকে কোল-গ্যাসের সঙ্গে যে অ্যামোনিয়া গ্যাস বেরিয়ে আসে তা প্রধানতঃ হাইড্রলিক মেনের জলে দ্রবিত অবস্থায় থেকে যায়। কোল-গ্যাসের সঙ্গে আরও কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ কয়লা থেকে চলে আসে, যেগুলির উপস্থিতি জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাস ব্যবহারের পক্ষে অসুবিধাজনক ও অহিতকর। এগুলি দূর করবার জন্যেই উল্লিখিত বিশোধক প্রকোষ্ঠের প্রয়োজন হয়। এই গ্যাসগুলির মধ্যে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন (H_2S) ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস প্রধান। **সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন** বা হাইড্রোজেন-সালফাইড গ্যাস জ্বালানী হিসাবে অনিষ্টকর; কারণ, দহনে এর থেকে সালফার-ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর তো বটেই, তাছাড়া গাছপালা ও ধাতব দ্রব্যাদির উপরেও

এর বিনাশী-ক্রিয়া রয়েছে। আর অদাহ্য কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস মিশ্রিত থাকলে কোল-গ্যাসের তাপ ও আলোকদায়ী শক্তি বিলক্ষণ হ্রাস পায়। এই অবাঞ্ছিত গ্যাস দুটাকে দূর করবার জন্যে বিশোধক প্রকোষ্ঠের মধ্যে অনেকগুলি পাত্রে রক্ষিত জলীয় চুন বা স্লেক্‌ড লাইমের ভিতর দিয়ে কোল-গ্যাস প্রবাহিত করা হয়; এর ফলে চুনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস দূরীভূত হয়। আবার ঐ প্রকোষ্ঠের মধ্যে কতকগুলি বাক্সে ভরতি জারিত লৌহখনিজ বা হাইড্রেটেড আয়রন-অক্সাইডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে কোল-গ্যাসে মিশ্রিত হাইড্রোজেন-সালফাইড গ্যাসও বিদূরিত হয়। আয়রন-অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেন-সালফাইডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় একটা কঠিন যৌগিক, আয়রন সালফাইড উৎপন্ন হয়। এভাবে বিশোধিত হয়ে কোল-গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে এবং তাকে বিরাটকার গ্যাসাধারে প্রবাহিত করে নিয়ে সঞ্চিত করে রাখা হয়।

সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছাড়াও কার্বন-ডাইসালফাইড, ন্যাপ্‌থলিন, হাইড্রোসায়েনিক (প্রুসিক) অ্যাসিড প্রভৃতি আরও বিভিন্ন পদার্থ কিছু কিছু গ্যাসীয় আকারে কোল-গ্যাসে মিশ্রিত থাকে। পরিমাণে অল্প হলেও কয়লার এসব উপজাত পদার্থও কোল-গ্যাস থেকে সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায়; এর কারণ, পৃথকভাবে এগুলির রাসায়নিক মূল্য যথেষ্ট। কয়লার প্রধান উপজাত পদার্থ আল্‌কাত্‌রা থেকে নিষ্কাশিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও কোল-গ্যাস থেকে প্রাপ্ত এসব রাসায়নিক পদার্থের প্রত্যেকটিরই বিশিষ্ট ব্যবহার আছে। আবার এগুলি থেকে নানারূপ মূল্যবান রাসায়নিক যৌগিকও উৎপাদিত হয়ে থাকে। কয়লার উপজাত পদার্থগুলির মধ্যে অ্যামোনিয়াম থায়োসায়েনেট, NH_4CNS, উত্তপ্ত করলে **থায়ো-ইউরিয়া,** $CS(NH_2)_2$, নামক একটি নূতন যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়; কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত প্লাস্টিক উৎপাদনে যা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বিষয় 'রাসায়নিক সংশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

কোল-গ্যাসের গঠন ঃ কোল-গ্যাস থেকে জ্বালানীর পক্ষে অনাবশ্যক উল্লিখিত বিভিন্ন পদার্থ বিদূরিত করে যে বিশুদ্ধ কোল-গ্যাস পাওয়া যায় তা-ও কোন নির্দিষ্ট একক গ্যাস নয়, বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা থেকে, এমন কি, একই গ্যাস-প্লান্টে একই কয়লা থেকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার তারতম্যে উৎপন্ন কোল-গ্যাসের গঠন যদিও এক

হয় না, তথাপি তাতে যে-সব গ্যাস সাধারণতঃ যে অনুপাতে মিশ্রিত থাকে তার মোটামুটি হিসাব নিম্নরূপ দেওয়া যেতে পারে :

হাইড্রোজেন, H_2	...	আয়তনের শতকরা	56·0	ভাগ
মিথেন, CH_4	...	„ „	22·5	„
ইথিলিন (C_2H_4), বেঞ্জিন প্রভৃতি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন গ্যাসসমূহ		„ „	2·5	„
কার্বন-মনক্সাইড, CO	...	„ „	10·9	„
কার্বন-ডাইঅক্সাইড, CO_2	...	„ „	1·0	„
নাইট্রোজেন, N	..	„ „	6·0	„
অক্সিজেন, O	...	„ „	0·5	„

কোল-গ্যাস আসলে উল্লিখিত গ্যাসগুলির মিশ্রণ মাত্র। বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার পরেও কোল-গ্যাসের ভিতর কার্বন-ডাইঅক্সাইড কিছুটা থেকেই যায়। সাধারণতঃ বিশুদ্ধ কোল-গ্যাসে শতকরা মোটামুটি সবশুদ্ধ 7·5 ভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস থাকে ; এগুলি জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাসের আবশ্যকীয় উপাদান নয়। মালিন্য হিসাবে এ-সব অদাহ্য গ্যাসের উপস্থিতিতে কোল-গ্যাসের দহন-শক্তি কিছুটা হ্রাস পায় এবং তার ফলে উদ্ভূত তাপ ও আলোকের পরিমাণও কমে।

কোল-গ্যাসের সংগঠক দাহ্য গ্যাসগুলির মধ্যে **হাইড্রোজেন** গ্যাস জ্বলে প্রায় অদৃশ্য ও অনুজ্জ্বল শিখায় ; আর **কার্বন-মনক্সাইড** গ্যাসের দহনে আলোকহীন, অথচ উজ্জ্বল নীলাভ শিখার সৃষ্টি হয়ে থাকে। কার্বন-মনক্সাইড একটা বিষাক্ত গ্যাস ; খোলা উনানে প্রজ্বলিত কয়লার উপরিভাগে যে নীলাভ শিখা দেখা যায় তার সৃষ্টি হয় এই কার্বন-মনক্সাইড গ্যাসের দহনে। **মিথেন** গ্যাসের দহনে সৃষ্ট শিখার যথেষ্ট আলোকদায়ী ক্ষমতা আছে ; বস্তুতঃ কোল-গ্যাসের দহনে যে আলোক-শিখা ছড়ায় তার প্রায় সবটাই মিথেন, ইথিলিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনগুলির দহনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনগুলি কোল-গ্যাসে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে থাকে, কিন্তু এদের শিখাই উজ্জ্বল আলোক ছড়ায়। ইথিলিন তীব্র আলোকদায়ী শিখায় জ্বলে। কোল-গ্যাসের উক্ত অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন উপাদানগুলির মধ্যে **বেঞ্জিন**

উল্লেখযোগ্য ; এই বেঞ্জিন বা বেঞ্জলের বাষ্পও উজ্জ্বল আলোকদায়ী শিখায় জ্বলে, আর তা থেকে সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা যথেষ্ট পরিমাণে বিমুক্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে কোল-গ্যাস, মোমবাতি, কেরোসিন প্রভৃতি যে-কোন জ্বালানীর দহনে যে আলোকের উদ্ভব হয় তার মূলগত তথ্য হলো এই যে, উত্তাপে জ্বালানীগুলির কার্বনবহুল উপাদানসমূহ বিয়োজিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা উদ্ভূত হয়, আর প্রকৃতপক্ষে সেগুলির দহনেই আলোক ছড়ায়। যে-কোন জ্বালানীর প্রজ্বলিত শিখার ভিতরে এরূপ সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকার অস্তিত্ব সহজেই প্রমাণ করা যায়ঃ পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা একখানা ধাতব পাত ঐ শিখার ভিতরে নিয়ে দ্রুত টেনে আনলে দেখা যায়, তার গায়ে কার্বন বা কয়লার গুঁড়োর একটা হাল্‌কা আস্তরণ পড়েছে। অবশ্য এই কার্বন-কণিকাগুলি সাধারণতঃ শিখার বাইরে বাতাসে বেরিয়ে যায় না ; শিখার অভ্যন্তরভাগ থেকে সেগুলি বহিরাংশে এলেই বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগ পেয়ে দগ্ধ হয়, আর তাদের রাসায়নিক মিলনে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে অদৃশ্যভাবে বাতাসে মিশে যায়। তাই বিভিন্ন গ্যাসীয় জ্বালানীর আলোকশিখা লক্ষ্য করলে তার মধ্যে পরিষ্কার তিনটা অংশ দেখা যায়ঃ একেবারে ভিতরের অংশে জ্বালানীর গ্যাসীয় উপাদানগুলি বিয়োজিত হয়ে সূক্ষ্ম কার্বন-কণিকা বিমুক্ত হয়, এই অংশটা তাই অনুজ্জ্বল দেখায়। মাঝের অংশে ঐ কার্বন-কণিকাগুলি প্রজ্বলিত অবস্থায় এসে কতকটা উজ্জ্বল শিখার সৃষ্টি করে ; আর একেবারে বাইরের অংশে বায়ুর অক্সিজেন পুরাপুরি পেয়ে অবশিষ্ট অদগ্ধ কার্বন-কণিকাগুলির দহনক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়। এই অংশে অবশ্য আলোকের চেয়ে তাপই বেশি হয়ে থাকে। কোন কোন জ্বালানীর ক্ষেত্রে কার্বন-কণিকার অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন-বহুল ধূমের সৃষ্টি হয়।
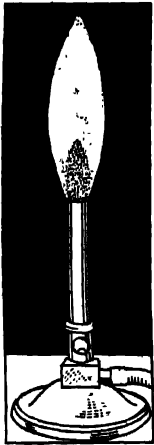
জ্বলন্ত শিখার তিনটি অংশ

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল, কোল-গ্যাসের প্রজ্বলিত শিখায় তেমন উজ্জ্বল আলোক দেয় না ; তার মধ্যে অধিকতর আলোকদায়ী গ্যাসীয় হাইড্রো-কার্বন উপাদান ইথিলিন, বেঞ্জিন প্রভৃতির স্বল্পতাই এর কারণ। অল্প হলেও এগুলির গঠনে কার্বনের অনুপাত বেশি থাকায় দহনকালে প্রচুর কার্বন-কণিকা

বিমুক্ত হয়ে জ্বলবার সুযোগ পায়, আর তাই অধিকতর আলোক ছড়ায়। এজন্যে আজকাল কোন কোন দেশে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বাইরে থেকে কিছুটা ইথিলিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন মিশিয়ে তার আলোকদায়ী শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। আগের দিনে কেবলমাত্র আলোক উৎপাদনের জন্যেই কোল-গ্যাস ব্যবহৃত হতো; বৈদ্যুতিক আলোর বহুল প্রচলনের পরে সাম্প্রতিককালে কোল-গ্যাস প্রধানতঃ তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসাবেই ঘর-সংসারে ও শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই আজকাল কোল-গ্যাসের জ্বালানী-মূল্য তার থেকে উদ্ভূত তাপশক্তির পরিমাণের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়; প্রতি একশত ঘন ফুট গ্যাসের দহনে কত **থার্ম** তাপশক্তি পাওয়া যাবে তার হিসাবেই কোল-গ্যাসের উৎকৃষ্টতা যাচাই করা হয়ে থাকে। এক থার্ম তাপ-শক্তি হলো এক লক্ষ বি, টি, এইচ এককের সমান। খনিজ কয়লাকে উচ্চ তাপে অর্থাৎ 1000° থেকে 1100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত (অর্থাৎ 'কার্বোনাইজ') করলে যে কোল-গ্যাস পাওয়া যায় তার তাপশক্তি বা ক্যালরি-মূল্য সাধারণতঃ প্রতি ঘন ফুটে হয় প্রায় 500 বি, টি, এইচ একক, অর্থাৎ প্রতি 100 ঘন ফুটে অর্ধ থার্ম। পক্ষান্তরে অল্প তাপে (500° থেকে 600° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) কার্বোনাইজ করে যে কোল-গ্যাস উদ্ভূত হয় তার ক্যালরি-মূল্য প্রতি ঘন ফুটে হয় প্রায় 800 থেকে 1000 বি, টি এইচ একক, অর্থাৎ প্রায় এক থার্ম।

কোল-গ্যাসের ব্যবহার ঃ কোল-গ্যাসকে তাপোৎপাদক জ্বালানীরূপে ব্যবহারের সময় এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে তার দহন-ক্রিয়া অতি দ্রুত ও সামগ্রিকভাবে সম্পন্ন হতে পারে, অসম্পূর্ণ দহনের ফলে কার্বন-কণিকার বিমুক্তি ঘটে অপচয় না হয়। এজন্যে গ্যাসটার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু মিশিয়ে নিলে গ্যাসীয় অণুগুলি পর্যাপ্ত অক্সিজেন পেয়ে দ্রুত ও পরিপূর্ণভাবে জ্বলবার সুযোগ লাভ করে। এর ফলে অদগ্ধ কার্বন-কণিকার বিমুক্তি ঘটে না, কাজেই প্রজ্বলিত শিখাটা হয় কিছু অনুজ্জ্বল, অথচ উচ্চ তাপবিশিষ্ট। এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী বুনসেন যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং যা তাঁর নামানুসারে **বুনসেন বার্নার** নামে প্রচলিত, তাপ-সৃষ্টির জন্যে তা-ই রসায়নাগারে সর্বত্র অদ্যাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। এই বুনসেন বার্নারের নলমুখে কোল-গ্যাস জ্বলবার আগেই তার নিচের দিকের ছিদ্রপথে গ্যাসটার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু মিশে যায়; তাই গ্যাসটার পূর্ণ দহনের ফলে বার্নারের নলমুখে প্রায় অদৃশ্য কিন্তু অত্যুত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি হয়। বার্নারের নল-

পথে গ্যাসের টানে নিচের ছিদ্র দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে, আর তা গ্যাসের সঙ্গে মিশে বায়ু ও কোল-গ্যাসের সংমিশ্রণটা নলের মুখে জ্বলে। ঐ ছিদ্রপথের মুখে সংলগ্ন একটা ঢাক্‌না ঘুরিয়ে ছিদ্রটাকে ছোট-বড় করে প্রবিষ্ট বায়ুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ছিদ্রমুখটা একেবারে বন্ধ করলে অবিমিশ্র কোল-গ্যাস লাল্‌চে শিখায় জ্বলে, যার তাপ অতি কম; ঢাক্‌নাটা ঘুরিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করলে নল-মুখে বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত অক্সিজেন ও কোল-গ্যাসের মিশ্রণটা অনুজ্জ্বল, কিন্তু অত্যুত্তপ্ত শিখায় জ্বলতে থাকে। আবার যদি ছিদ্র-মুখটা বেশি খুলে দিয়ে অত্যধিক বায়ু কোল-গ্যাসের সঙ্গে মেশার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় প্রজ্বলিত শিখা নলের ভিতরে ঢুকে বিস্ফোরণও ঘটাতে পারে। এরূপ হলে বার্নারের গ্যাস-নলের চাবি ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। যাহোক, কেবল বুনসেন বার্নারই নয়, তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাস ব্যবহারের সময় তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু মিশ্রণের ব্যবস্থা করা সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়। ঘর-সংসারে কোল-গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না-বান্নার জন্যে যে গ্যাসের উনান বা **গ্যাস-কুকার** ব্যবহার করা হয় তাতেও বায়ু সংমিশ্রণের ব্যবস্থা থাকে। চক্রাকার উনানের বহু সংখ্যক সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে গ্যাসটা সূক্ষ্ম ধারায় নির্গত হয়, আর তাই নির্গত গ্যাসের পরিমাণের অনুপাতে সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট বায়ু পেয়ে অত্যুত্তপ্ত ছোট ছোট শিখায় জ্বলতে থাকে এবং সামগ্রিকভাবে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি করে।

গ্যাস-কুকার, বা ঘর-সংসারে ব্যবহৃত গ্যাসের উনান

কোল-গ্যাসের সঙ্গে বায়ুর বদলে অক্সিজেন মেশালে স্বভাবতঃই আরও অধিকতর তাপবিশিষ্ট শিখায় মিশ্রণটা জ্বলে; কারণ, জ্বলন বা দহন-ক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেনই কার্যকরী উপাদান, নাইট্রোজেন দহনের সহায়ক তো নয়ই, বরং তা দগ্ধ গ্যাসের শিখার তাপ অনেকটা কমিয়ে দেয়। অধিকতর তাপের জন্যে সাধারণ বার্নার বা কুকারে কোল-গ্যাসের সঙ্গে বায়ুর বদলে অক্সিজেন মিশিয়ে অবশ্য জ্বালানো যায় না; কারণ তাতে জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই শিখা ভিতরে ঢুকে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিশেষ গঠনের বার্নারেই কেবল এই মিশ্রণ জ্বালানো

সম্ভব হয়, যাতে যে নলমুখে কোল-গ্যাস বেরিয়ে জ্বলবে তার ভিতর দিক দিয়ে আর একটা নলমুখে অক্সিজেন বেরিয়ে জ্বলন্ত শিখার গ্যাসে মিশতে
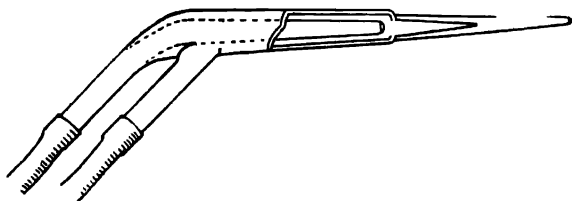
অক্সি-হাইড্রোজেন ও অক্সি-কোলগ্যাস বার্নার বা ব্লো-পাইপের গঠন

পারে। এই কৌশলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে কোল-গ্যাস জ্বালালে যে অত্যুত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি হয় তাকে বলে **অক্সি-কোলগ্যাস** শিখা। এর তাপমাত্রা 1500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। আমরা জানি, শুষ্ক চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটি বিশেষ তাপসহ পদার্থ; চুনকে ইংরেজিতে বলে **লাইম**। খানিকটা চুনের উপরে অক্সি-কোলগ্যাস শিখা ফেললে অল্পক্ষণেই চুনটা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আর তা থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মি ছড়ায়, যাকে বলা হয় **লাইম-লাইট।** চুন বা লাইমের বদলে দুর্লভ ধাতু জির্কোনিয়ামের অক্সাইড যৌগিকের উপরে এই শিখা ফেললে আরও উজ্জ্বলতর আলোকের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

উল্লিখিত ব্যবস্থায় কোল-গ্যাসের বদলে হাইড্রোজেন গ্যাসকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে জ্বালালে যে **অক্সি-হাইড্রোজেন** শিখার সৃষ্টি হয়, তার তাপমাত্রা হয় আরও বেশি, অনেক সময় 2000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই শিখার কথা আমরা 'দহন ও অগ্নি উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে আগেই বলেছি। এই অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার উত্তাপে যে-কোন ধাতু গলিয়ে ফেলা যায়। এর সাহায্যে ইস্পাতের যন্ত্রাংশ মুহূর্তে গলিয়ে জুড়ে মেরামত করা সম্ভব হয়ে থাকে। এই অত্যুত্তপ্ত শিখার চমকপ্রদ ব্যবহার হলো, এর সাহায্যে কৃত্রিম চুনি (রুবি), নীলা (স্যাফায়ার), পান্না (এমারেল্ড) প্রভৃতি **নকল মণি** প্রস্তুত করা হয়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসল মণিগুলির মুখ্য উপাদান দেখা গেছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা **অ্যালুমিনা,** যা প্রধানতঃ কোরাণ্ডাম নামক খনিজ প্রস্তরে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। এই অ্যালুমিনা সুকঠিন ও বিশেষ তাপসহ পদার্থ হলেও অক্সি-হাইড্রোজেন শিখার উত্তাপে তা গলে যায়। মোটামুটি শতকরা

97·5 ভাগ অ্যালুমিনা ও 2·5 ভাগ ক্রোমিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণকে এই শিখার উত্তাপে গলিয়ে পরে ঠাণ্ডা করলে প্রাকৃতিক লাল-চুনির অবিকল অনুরূপ উজ্জ্বল ও সুকঠিন পদার্থ পাওয়া যায়। একই প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনার সঙ্গে টিটানিয়াম ও আয়রনের অক্সাইড সামান্য পরিমাণে মিশিয়ে কৃত্রিম নীলা বা **স্যাফায়ার** প্রস্তর প্রস্তুত করা হয়। এগুলি মূল্যবান মণি-প্রস্তর হিসাবে অলংকারাদিতে ব্যবহৃত হয় এবং অত্যন্ত কঠিন ও ঘর্ষসহ পদার্থ বলে ঘড়ি প্রভৃতির সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশে 'বেয়ারিং' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘড়ির 'জুয়েল' হলো বেশির ভাগই এই জিনিস।

গ্যাসীয় জ্বালানী প্রসঙ্গে আমরা কোল-গ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম; প্রসঙ্গত অন্য নানা কথা এসে গেল। গ্যাসীয় জ্বালানী হিসাবে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোচনা আমরা পরে করবো; এখন কয়লা থেকে কোল-গ্যাস ছাড়াও অন্যান্য যে-সব গ্যাসীয় জ্বালানী উৎপাদিত হয়, ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে সেগুলির আলোচনা করাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

ওয়াটার-গ্যাস : কয়লা থেকে কেবল কোল-গ্যাসই পাওয়া যায় না, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য দাহ্য গ্যাসও উৎপাদিত হয়ে থাকে। আবদ্ধ পাত্রে শ্বেত-তপ্ত কোক-কয়লার উপরে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে এক রকম গ্যাস উৎপন্ন হয়, যেটা আসলে কার্বন-মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। এর রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$C + H_2O = CO + H_2$$

কার্বন (কোক) জলীয় বাষ্প কার্বন-মনক্সাইড হাইড্রোজেন
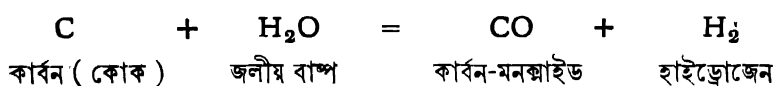
এই গ্যাসীয় মিশ্রণটা কয়লার সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় বলে ওয়াটার-গ্যাস বা **জল-গ্যাস** নামে পরিচিত। শ্বেত-তপ্ত কোকের তাপমাত্রা হয় প্রায় 1400° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, এই উত্তাপেই উপরিউক্ত বিক্রিয়াটা ঘটে। কিন্তু বিক্রিয়াটা তাপশোষক বলে অল্প সময়েই উত্তপ্ত কোকের তাপমাত্রা হ্রাস পায়; তখন কার্বন-মনক্সাইডের বদলে কার্বন-ডাইক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে, যেটা অদাহ্য। কাজেই কোকের তাপমাত্রা যাতে হ্রাস না পায়, তার জন্যে কয়েক মিনিট পরে-পরে জলীয় বাষ্পের প্রবাহ বন্ধ করে পাত্রের অভ্যন্তরে বায়ুপ্রবাহ চালাতে হয়, যাতে কোক-কয়লা আবার শ্বেত-তপ্ত

অবস্থায়, অর্থাৎ 1400° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গিয়ে পৌঁছায়। জ্বালানী গ্যাস হলেও ওয়াটার-গ্যাসের তাপ বা আলোকদায়ী ক্ষমতা সামান্য ; কাজেই সচরাচর একক-ভাবে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয় না। একে সাধারণতঃ কোল-গ্যাসের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে তার জ্বালানী-মূল্য কিছু বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কখন কখন খনিজ তেল (কেরোসিন) বাষ্পীভূত করে যে-সব অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় তার সঙ্গে ওয়াটার-গ্যাস মিশিয়েও ব্যবহার করা হয়। এই মিশ্রণকে বলা হয় **'কার্বুরেটেড ওয়াটার গ্যাস'**। জ্বালানী-শক্তি কম হলেও ওয়াটার-গ্যাসের উৎপাদন-ব্যয় কম, কাজেই দামে সস্তা ; এজন্যে কোল-গ্যাস বা তেল-গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে একে অল্প মূল্যের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ আমেরিকার কোন কোন সহরাঞ্চলে আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্যে ওয়াটার-গ্যাস উৎপাদন করে সঙ্গে-সঙ্গে তাকে সংলগ্ন তেল-গ্যাস প্লান্টে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং উৎপন্ন সেই গ্যাসীয় মিশ্রণ বা কার্বুরেটেড (হাইড্রোকার্বনযুক্ত) ওয়াটার-গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবদ্ধ স্তম্ভের অভ্যন্তরে সজ্জিত তাপসহ ইটের উত্তপ্ত জালির উপরে সূক্ষ্ম ধারায় খনিজ তেল (কেরোসিন) ফেলা হয়। উত্তাপে কেরোসিন প্রভৃতি খনিজ তেল বিয়োজিত হয়ে (ভেঙ্গে) বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়। খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায় বলে এরূপ দাহ্য গ্যাসকে বলা হয় **তেল-গ্যাস**।
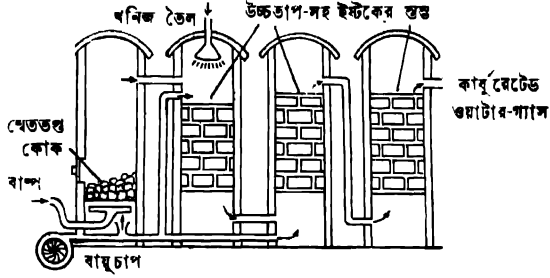
কার্বুরেটেড ওয়াটার-গ্যাস উৎপাদন

প্রোডিউসার গ্যাস : আবদ্ধ পাত্রের অভ্যন্তরে শ্বেত-তপ্ত কোক-কয়লার ভিতরে জলীয় বাষ্পের বদলে বায়ুপ্রবাহ চালালে আর এক রকম গ্যাস পাওয়া যায়, যাকে বলে প্রোডিউসার গ্যাস। এটা প্রধানতঃ কার্বন-মনক্সাইড ও নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র। এর উৎপাদনে চুল্লীর ভিতরে লোহার শিকের ঝাঁঝরির উপরে কোক-কয়লা উত্তপ্ত করা হয়, আর নিচের দিক থেকে

নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে বায়ু-প্রবাহ তার ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। ক্রমে যখন ঐ অর্ধ-দগ্ধ কোক প্রায় 1000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শ্বেত-তপ্ত অবস্থায় আসে, তখন প্রবিষ্ট বায়ুর সীমিত পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে কয়লার কার্বনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস ($2C+O_2=2CO$)। প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবে কয়লার আংশিক দহনের ফলেই এই প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বদলে **কার্বন-মনক্সাইড** উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রোডিউসার গ্যাসে কার্বন-মনক্সাইডের সঙ্গে বায়ুর যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন মিশে থাকে; কাজেই প্রোডিউসার গ্যাস স্তিমিতভাবে জ্বলে, দহনে তাপ দেয় কম। উৎপাদনের পরে সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করতে হয়; কয়েক দিন রেখে দিলে এর সামান্য ক্যালরি-মূল্য আরও হ্রাস পায়। তাপোৎপাদন ক্ষমতা কম হলেও প্রোডিউসার গ্যাসের উৎপাদন-ব্যয় যেহেতু অতি কম, তাই কোন কোন শিল্পে তাপদায়ী জ্বালানী হিসাবে এর কিছু ব্যবহার আছে।

কয়লা বা কার্বনের অসম্পূর্ণ দহনের ফলেই কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রোডিউসার গ্যাস জ্বলবার সময়ে তার কার্বন-মনক্সাইড অংশই বাইরের বায়ুর অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়ে জ্বলতে থাকে, উৎপন্ন হয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড ($2CO+O_2=2CO_2$) এবং বিমুক্ত হয় তাপশক্তি। ওয়াটার-গ্যাস ও প্রোডিউসার-গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সময় ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় দহনের ফলে অদগ্ধ কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস কিছুটা বাতাসে মিশে যেতে পারে; এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস মানুষের শ্বাস-ক্রিয়ায় অনুপযোগী হলেও কার্বন-মনক্সাইডের মত মারাত্মক বিষাক্ত হয়। বায়ুতে পাঁচ হাজার ভাগে এক ভাগ মাত্র কার্বন-মনক্সাইড থাকলেও শ্বাস-প্রশ্বাসে তা গ্রহণ করলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে; বায়ুতে শতকরা এক ভাগ কার্বন-মনক্সাইড থাকলে মানুষ সংজ্ঞা হারায় ও অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসে গ্যাসটা ভিতরে গিয়ে রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে রক্তে **কার্বক্সি-হিমোগ্লোবিন** নামক একটা স্থায়ী যৌগিকের সৃষ্টি করে; যার ফলে রক্তের পক্ষে আর বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না, কাজেই দেহের রক্ত চলাচল-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষের সংজ্ঞা লোপ পায় ও শেষে মৃত্যু ঘটে।

অ্যাসিটিলিন

আলোকদায়ী গ্যাসীয় জ্বালানীগুলির মধ্যে অ্যাসিটিলিন গ্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য; গ্যাসটা জ্বালালে যথেষ্ট উজ্জ্বল আলোক-শিখার সৃষ্টি হয়, অবশ্য কিছু ধূমও ছড়ায়। জলের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম-কার্বাইড নামক যৌগিক থেকে এই অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনটা উৎপন্ন হয়ে থাকে: $CaC_2 + H_2O = C_2H_2$ (অ্যাসিটিলিন) + $Ca(OH)_2$ (জলীয় চুন)। গ্যাসটা জ্বালালে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের সংগঠক কার্বন ও হাইড্রোজেন উপাদান দু'টি মিলিত হয়ে অতি দ্রুত কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। অ্যাসিটিলিন গ্যাসের দহনে এই দ্বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উজ্জ্বল আলোকের উৎপত্তি ঘটে।

অ্যানথ্রাসাইট কয়লা বা কোক-কয়লার সঙ্গে নির্জল চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO) মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে অতি উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে কার্বন ও ক্যালসিয়ামের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় **ক্যালসিয়াম কার্বাইড**। বিশেষ গঠনের বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এই রাসায়নিক সংযোগ ঘটে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়; তা ছাড়াও ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড প্রভৃতি নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের জন্যেও প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বাইড আজকাল প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রিক আর্কের উচ্চ তাপমাত্রায় কার্বন ও হাইড্রোজেনের সরাসরি মিলনেও অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাস কোথাও কোথাও উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায় ডিম্বাকৃতি আধারের অভ্যন্তরে দুই প্রান্তে দু'টা কার্বন-দণ্ড তড়িদ্দ্বার (ইলেক্ট্রোড) হিসাবে সংলগ্ন থাকে, আর তার দু-দিকে দু'টা ছিদ্রপথ রাখা হয়। এর একটা ছিদ্রপথে আধারের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করিয়ে ইলেক্ট্রোড দু'টার মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালানো হয়। ইলেক্ট্রোডের কার্বন-দণ্ড দু'টার মধ্যবর্তী ব্যবধানে **বৈদ্যুতিক আর্ক** সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রায় 3000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দণ্ডের কার্বন-কণিকা ক্রমাগত বিমুক্ত হয় এবং তা প্রবিষ্ট হাইড্রোজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হয়ে অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাস উৎপন্ন করে। এভাবে আধারের এক ছিদ্রপথে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করে এবং অপর ছিদ্রপথে নির্গত অ্যাসিটিলিন গ্যাস নিয়ে গ্যাসাধারে সঞ্চিত করে রাখা হয়।

জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বা 'ন্যাচারাল' গ্যাস ও খনিজ তেল **পেট্রোলিয়াম** থেকে প্রচুর পরিমাণে মিথেন (CH_4) গ্যাস পাওয়া যায়। **পাইরোলিসিস** বা অতি উচ্চ তাপ-বিভাজন পদ্ধতিতে এই মিথেন গ্যাস থেকে অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাস উৎপাদিত হতে পারে। যে সব দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় সেখানে মিথেনের রূপান্তর ঘটিয়ে এভাবে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপাদনের বিরাট শিল্প-সম্ভাবনা রয়েছে; বস্তুতঃ কোথাও কোথাও এ-কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

অ্যাসিটিলিনের ব্যবহারঃ অ্যাসিটিলিন একটা অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন। এর গঠনে কার্বনের অনুপাত অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি; গ্যাসটার শতকরা 92 ভাগেরও বেশি হলো কার্বন। তাই অ্যাসিটিলিন উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে; অবশ্য সাধারণভাবে জ্বালালে অসম্পূর্ণ দহনের ফলে এর থেকে প্রচুর ধূম উত্থিত হয়; কিন্তু বার্নারের সূক্ষ্ম ধারায় জ্বালালে বা জ্বালবার আগে বিশেষ ব্যবস্থায় সামান্য বায়ু এর সঙ্গে মেশালে অ্যাসিটিলিনের শিখা অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো ছড়ায়। কেবল আলোকদায়ী জালানী হিসাবেই নয়, অতি উচ্চ তাপ সৃষ্টির জন্যেও অ্যাসিটিলিনের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। আমরা ইতিমধ্যে 'অক্সি-হাইড্রোজেন' শিখার উল্লেখ করেছি, যাতে মোটামুটি 2000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উদ্ভব হয়। অনুরূপ বার্নার বা ব্লো-পাইপের সাহায্যে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের প্রজ্বলিত শিখার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস প্রবাহিত করালে অক্সিজেনের সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিনের দহন সুতীব্র হয়, আর প্রায় 3480° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড

অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার সাহায্যে লোহার চাদর বা পাত কাটা হচ্ছে

তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যন্ত্র-শিল্পে **অক্সি-অ্যাসিটিলিন** শিখার এই উচ্চ তাপমাত্রার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। ধাতব যন্ত্রাদির অংশ-বিশেষ গলিয়ে জোড়া দেওয়ার **ওয়েল্ডিং** পদ্ধতিতে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার ব্যবহার আজকাল বহুল প্রচলিত ; কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য অক্সি-হাইড্রোজেন শিখাও ওয়েল্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লৌহ বা ইস্পাতের মোটা চাদরের কোন এক স্থানে অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা ফেললে স্থানীয়ভাবে জায়গাটা মুহূর্তে লোহিত-তপ্ত হয়ে ওঠে ; তারপর সেই তপ্ত স্থানে অক্সিজেন গ্যাসের ধারা প্রবাহিত করলে সেখানকার অত্যুত্তপ্ত লৌহ জারিত হয়ে লৌহ-অক্সাইডে পরিণত হয়। তখন অক্সি-অ্যাসিটিলিনের শিখা আবার সেখানে প্রবাহিত করালে তা জলের মত অনায়াসে গলিত লোহা বা লৌহ-অক্সাইড ভেদ করে চলে গিয়ে লোহার পাতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। এই উপায়ে ইস্পাতের রড, পাইপ, পাত প্রভৃতি অতি সহজে নিখুঁতভাবে কাটাও চলে।

এ-সব ছাড়া অ্যাসিটিলিনের বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ব্যবহারও রয়েছে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ইথাইল অ্যালকোহল, কৃত্রিম রাবার প্রভৃতি উৎপাদনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটিলিন গ্যাস ব্যবহৃত হয় ; 'রাসায়নিক সংশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এ-সব উৎপাদন-শিল্পের কিছু আলোচনা করা যাবে। অ্যাসিটিলিন গ্যাস জলে যথেষ্ট দ্রবণীয় ; এর শতকরা মোটামুটি এক ভাগের জলীয় দ্রবণ মাখালে কাঁচা কমলালেবু, নেসপাতি, আম প্রভৃতি ফল অনেকটা তাড়াতাড়ি পেকে যায়। অ্যাসিটিলিন গ্যাস আবার অ্যাসিটোনেও সবিশেষ দ্রবণীয় ; এজন্যে অধিক চাপে প্রচুর পরিমাণ অ্যাসিটিলিন গ্যাস অ্যাসিটোন-দ্রাবকে দ্রবিত করে লোহার সিলিণ্ডারে পুরে দীর্ঘ দিন সঞ্চিত রাখা যায় এবং এভাবে স্থানান্তরেরও সুবিধা হয়। যথেষ্ট চাপ বৃদ্ধি করে অ্যাসিটিলিন গ্যাসকে অবশ্য তরল করা যায় সত্য, কিন্তু গ্যাসটা সহজেই বিয়োজিত হয়ে আবদ্ধ পাত্রে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। বিশেষ অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলে অ্যাসিটিলিন গ্যাস খুবই অস্থায়ী যৌগিক, এবং বিশেষ সক্রিয় ; তাই এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌগিক উৎপন্ন হয়। যাহোক, আলোকদায়ী গ্যাসীয় জ্বালানী হিসাবে ও অক্সি-অ্যাসিটিলিনের অত্যুত্তপ্ত শিখা উৎপাদনের কাজেই গ্যাসটা সমধিক প্রচলিত। জ্বালানী হিসাবে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রয়োগে অ্যাসিটিলিন গ্যাসের বিপুল চাহিদা রয়েছে। অতি সহজে জলের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম-কার্বাইড থেকে গ্যাসটা পাওয়া যায়, তাই ক্যালসিয়াম কার্বাইডের শিল্প-উৎপাদন বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্যাস-ম্যাণ্টেলঃ আলোকদায়ী জ্বালানীর, বিশেষতঃ কোল-গ্যাসের আলোর প্রসঙ্গে গ্যাস-ম্যাণ্টেলের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উদ্ভিজ্জ তেল ও চর্বির বাতির যুগে কোল-গ্যাসের আলো প্রথম দিকে বিস্ময়কর উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়েছিল সত্য, কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের পরে আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাসের কদর বিশেষভাবে হ্রাস পায়। এর কারণ, বৈদ্যুতিক আলোর তুলনায় কোল-গ্যাসের আলো একান্ত নিষ্প্রভ ও লাল্‌চে দেখায়। কোল-গ্যাসের বাতির চলন তাই এক সময় উঠে যাওয়ারই উপক্রম হয়েছিল। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে **গ্যাস-ম্যাণ্টেল** উদ্ভাবিত হওয়ায় কেবল কোল-গ্যাসই নয়, বিভিন্ন গ্যাসীয় আলোর ঔজ্জ্বল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় বৈদ্যুতিক আলোর সমকক্ষ হয়ে ওঠে। আলোক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাই গ্যাস-ম্যাণ্টেলের আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এটা কোন পরিকল্পিত গবেষণার ফলে উদ্ভাবিত হয় নি, হয়েছিল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। 1884 খৃষ্টাব্দে ওয়েলস্‌বাক নামক একজন বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী বিভিন্ন দুর্লভ ধাতুর (রেয়ার আর্থ মেটাল্‌স) অক্সাইড নিয়ে তাদের রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা করছিলেন। এই পরীক্ষাসূত্রে সহসা তিনি লক্ষ্য করেন, তাদের কোন-কোনটির অক্সাইড উত্তপ্ত হলে প্রতিপ্রভ হয়ে ওঠে, অতি উজ্জ্বল আলোক ছড়ায়। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়েল্‌সবাক সচেতন থাকলেও বহু দিন এটাকে তিনি কোন কাজে লাগাতে পারেন নি। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার এক কথা, আর তাকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। তার জন্যে সুদীর্ঘ ও সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সে যাই হোক, দীর্ঘ দিনের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে **থোরিয়াম** ও **সিরিয়াম** ধাতুর অক্সাইডের উক্ত প্রতিপ্রভ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গ্যাস-ম্যাণ্টেল উদ্ভাবিত হয়; আর গ্যাসীয় আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্যে এর ব্যবহার আলোক-শিল্পে যুগান্তর ঘটায়।
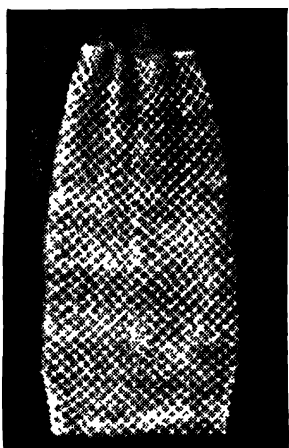
গ্যাস-ম্যাণ্টেল

গ্যাস-ম্যাণ্টেলের সঙ্গে এ যুগে আমরা সবাই পরিচিত; কোল-গ্যাসের বাতিতে ও হ্যাজাক, পেট্রোমাক্স প্রভৃতিতে তেল-গ্যাসের (কেরোসিন) শিখায় এই ম্যাণ্টেলই ভাস্বর হয়ে অতি উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করে। সাধারণ কার্পাস সুতা, বা কৃত্রিম রেশম বা রেয়নের সূত্র দিয়ে ম্যাণ্টেলের থলে বা জালিটা বোনা হয়, আর সুনির্দিষ্ট অনুপাতে থোরিয়াম ও সিরিয়াম ধাতুর **নাইট্রেট** লবণের ঘন দ্রবণে সেটাকে সিক্ত করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপরে সেই শুষ্ক থলেগুলিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত করলে তাদের সুতা বস্তুতঃ পুড়ে যায়, আর তার গায়ে মাখানো নাইট্রেট লবণ উত্তাপে বিজারিত হয়ে ধাতু দু'টার অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে জালির ম্যাণ্টেলের কাঠামোটা বজায় রাখে। এই মিশ্র ধাতব অক্সাইডের থলেগুলি যাতে নাড়া-চড়ায় ভেঙ্গে না যায়, তার জন্যে সেগুলিকে কলোডিয়ন নামক পদার্থের দ্রবণে ডুবিয়ে কিছুটা ঘাতসহ ও অভঙ্গুর করা হয়। এরূপ থলে বা ম্যাণ্টেল কোন গ্যাসীয় বাতির গ্যাস-নির্গমনের মুখে পরিয়ে গ্যাসটা জেলে দিলে সেই প্রজ্বলিত শিখার উত্তাপে ম্যাণ্টেলের জালিটা সঙ্গে সঙ্গে ভাস্বর হয়ে ওঠে, আর তা থেকে উজ্জ্বল সাদা আলো ছড়ায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ম্যাণ্টেলে আলোর ঔজ্জ্বল্য সর্বাধিক হয় যখন তাতে শতকরা 99 ভাগ **থোরিয়া** (থোরিয়াম অক্সাইড) ও মাত্র 1 ভাগ **সিরিয়া** (সিরিয়াম অক্সাইড) থাকে। একক থোরিয়া বা সিরিয়া থাকলে ম্যাণ্টেলে আলো ভাল দেয় না; আবার তাদের মিশ্রণে উল্লিখিত অনুপাতের কম-বেশি হলেও ম্যাণ্টেল থেকে বিকিরিত আলোকের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়।

গ্যাস-ম্যাণ্টেলের উপাদানিক গঠনে সিরিয়া বা সিরিয়াম-অক্সাইড থাকে অতি সামান্য; শতকরা মাত্র এক ভাগ। বস্তুতঃ এটা দাহ্য গ্যাসের পূর্ণ দহনে ও থোরিয়াম-অক্সাইডকে প্রতিপ্রভ করে তুলতে অনুঘটকের কাজ করে। আগেই বলা হয়েছে, বিভিন্ন দুর্লভ ধাতুর অক্সাইড উত্তাপে ভাস্বর হয়ে ম্যাণ্টেলটাকে আলোকোজ্জ্বল করে তোলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে থোরিয়াম ধাতু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হলেও রাসায়নিক অর্থে দুর্লভ (রেয়ার আর্থ) ধাতুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবল সিরিয়াম ধাতুই এই শ্রেণীর অন্তর্গত; অন্যান্য 'রেয়ার আর্থ' ধাতু হলো ল্যান্থানাম, স্যামারিয়াম, ইয়োরোপিয়াম, গ্যাডোলিয়াম প্রভৃতি। কেবল সিরিয়াম ছাড়া এদের অন্য কোন ধাতুর অক্সাইড ম্যাণ্টেলের ভাস্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়। তা ছাড়া থোরিয়াম হলো একটি দুষ্প্রাপ্য তেজস্ক্রিয় ধাতু,

যা উত্তাপে ভাস্বর হয়ে ওঠে; তাই এটা ম্যাণ্টেলের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস-ম্যাণ্টেল উৎপাদনের ধাতব উপাদান থোরিয়াম ও সিরিয়াম (অক্সাইড) প্রধানতঃ পাওয়া যায় **মোনাজাইট** নামক একটি দুষ্প্রাপ্য খনিজ থেকে। ব্রেজিল প্রভৃতি কোন কোন দেশে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে এই দুষ্প্রাপ্য মোনাজাইট খনিজ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

গ্যাস-ম্যাণ্টেল উদ্ভাবিত হওয়ায় বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবে কোল-গ্যাসের ব্যবহার আবার প্রসার লাভ করে। ইদানিং বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন দ্রুত বেড়ে গেলেও কোন কোন দেশে ম্যাণ্টেল সহযোগে কোল-গ্যাসের আলোর প্রচলন আজও যথেষ্ট রয়েছে। এর কারণ, ম্যাণ্টেল ব্যবহার করলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সস্তা কয়লা থেকে উৎপন্ন কোল-গ্যাস জ্বালিয়েও যথেষ্ট আলো পাওয়া যায়। আবার কোল-গ্যাসের সঙ্গে সস্তা জ্বালানী ওয়াটার-গ্যাস ও প্রোডিউসার-গ্যাস মিশিয়েও ম্যাণ্টেলের সাহায্যে যথেষ্ট উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেতে পারে। এ-সব কারণে শিল্প হিসাবে কোল-গ্যাসের উৎপাদন ও জ্বালানীরূপে তার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত লাভজনক হয়েছে। এর উৎপাদন-ব্যয় যথেষ্ট কম; বস্তুতঃ কোক-কয়লা উৎপাদন করতে কাঁচা কয়লার 'কার্বনিজেসন' প্রক্রিয়ায় আল্‌কাত্‌রা ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে অতিরিক্ত উপজাত পদার্থ হিসাবেই কোল-গ্যাস পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ম্যাণ্টেল ব্যবহারে কোল-গ্যাসের বাতির স্তিমিত আলোক বিশেষ উজ্জ্বল হয় বলে আজও এর প্রচলন রয়েছে। কেবল কোল-গ্যাসের বাতিতেই নয়, খনিজ তেল কেরোসিন বা পেট্রলের বাতিতেও ম্যাণ্টেল ব্যবহারে অত্যুজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। এ-সব তেলের বাতিতে সূক্ষ্ম ধারায় তেল নির্গত হয়ে গ্যাসীয় আকারে বায়ুর সংযোগে জ্বলে, আর তার উত্তাপে ম্যাণ্টেলটা প্রদীপ্ত হয়ে উজ্জ্বল আলো ছড়ায়। পল্লী অঞ্চলে যেখানে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ বা কোল-গ্যাসের সরবরাহ নেই সে-সব জায়গায় উজ্জ্বল আলোর জন্যে ম্যাণ্টেলযুক্ত এরূপ কেরোসিনের বাতি, যেমন—পেট্রোমাক্স, হ্যাজাক প্রভৃতি আজকাল বহুল প্রচলিত এবং সকলেরই পরিচিত। বস্তুতঃ খনিজ তেল ও গ্যাসীয় জ্বালানীর দহনে উদ্ভূত আলোকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে ম্যাণ্টেলের উদ্ভাবন রসায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান

তরল জ্বালানী: পেট্রোলিয়াম

তরল জ্বালানীর মধ্যে রেড়ি, বাদাম প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেলের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এগুলি প্রধানতঃ অলেয়িক অ্যাসিডের গ্লিসারিন-যৌগিক বা গ্লিসারাইড নামক তরল জৈব পদার্থ। বর্তমান যুগে তরল জ্বালানী বলতে খনিজ তেল পেট্রোলিয়ামই বুঝায়; **পেট্রোলিয়াম** কথাটার মূলগত অর্থ হলো 'পাথুরে তেল' ('পেট্রো' মানে প্রস্তর বা পাথর, আর 'অলিয়াম' তেল)। বস্তুতঃ এটা এক রকম প্রাকৃতিক তেল, ভূগর্ভের শিলা-স্তরে যা সঞ্চিত থাকে; কোথাও কোথাও ভিতরের চাপে ভূ-স্তর ভেদ করে কোন রন্ধ্র-পথে উপরেও ওঠে। আজকাল অবশ্য যান্ত্রিক ব্যবস্থায় গভীর কূপ খনন করেই ভূ-গর্ভ থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয়। যাহোক, প্রাকৃতিক এই তেলের সঙ্গে বা কোথাও কোথাও এককভাবে প্রাকৃতিক এক রকম দাহ্য গ্যাসও নির্গত হয়। গ্যাসীয় জ্বালানী প্রসঙ্গে এই প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সহস্রাধিক বছর আগেও মানুষ এই প্রাকৃতিক তেল পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত ছিল। তেলটাকে লোকে ঔষধরূপে ব্যবহার করতো, জ্বালালে জ্বলতো; কিন্তু এর প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অবশ্য সে-কালের মানুষ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জানা যায়, কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী কোন কোন গিরি-কন্দরে বা পার্বত্য উপত্যকায় এক সময় অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলতো। সেকালের মানুষ একে নৈসর্গিক ব্যাপার ও দেবতার রোষাগ্নি মনে করতো; আর লোকে, বিশেষতঃ অগ্নি-উপাসকেরা দেবতার লীলাভূমি মনে করে এ-সব জায়গায় তীর্থযাত্রা করতো। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এর অনেক উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ পশ্চিম এশিয়ায়, বিশেষতঃ আরব অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে ভূগর্ভের এই প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাস স্থানে স্থানে নির্গত হয়ে স্বভাবতঃ জ্বলে এরূপ দৃশ্যের অবতারণা করতো। মানুষের রাসায়নিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে এরূপ ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য এবং এই প্রাকৃতিক দাহ্য তেল ও গ্যাসের রাসায়নিক স্বরূপ ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হয় প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। আমেরিকার পেনিসিল্‌ভেনিয়া প্রদেশে 1859 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কূপ খনন করে ভূগর্ভ থেকে এই তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই খনিজ তেলের, যা শেষে **পেট্রোলিয়াম** নামে পরিচিত হয়েছে, রাসায়নিক গঠন ও বিভিন্ন উপাদান, বিশেষতঃ তার জ্বালানী-মূল্য সম্পর্কে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করেছে; আর

অল্প কালের মধ্যেই পেট্রোলিয়ামের এক বিরাট শিল্প গড়ে ওঠেছে। এই ‘পাথুরে তেল’ বা পেট্রোলিয়াম এ-যুগে ‘তরল সোনা’ নামে অভিহিত হয়; প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে যে দেশে যত বেশী পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, শিল্প-বাণিজ্যে ও সামরিক শক্তিতে সে দেশ আজ তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ।

ভূ-গর্ভে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না; তবে বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে মনে করেন যে, প্রাচীন যুগের সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহাবশেষ ও নানা উদ্ভিজ্জ পদার্থাদি কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে বিভিন্ন জীবাণুর বিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়ে এই তেলের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদ ও জীব-দেহের তৈলাক্ত নির্যাস

নল-কূপ খনন করে ভূ-গর্ভ থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন

ও আনুষঙ্গিক গ্যাসীয় পদার্থ সছিদ্র ভূ-স্তরের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে নিচে চলে গেছে; তারপর তা ভূ-গর্ভের গভীরে অভেদ্য শিলা-স্তরে জমে বিশাল তৈল-কুণ্ডের আকারে সঞ্চিত রয়েছে। কোন কোন স্থলে ঐ তেলের উপরে সঞ্চিত গ্যাসের চাপের প্রভাবে ভূ-স্তরের কোন ফাটল দিয়ে ঐ তেল ও গ্যাস উপরে উঠে আসে। পৃথিবীর কোন কোন দেশে এভাবেই প্রাকৃতিক দাহ্য গ্যাস পাওয়া গেছে; আবার আগের দিনে এভাবেই স্থানে স্থানে পেট্রোলিয়াম উপরে উঠে উন্মুক্ত তৈলকুণ্ডের সৃষ্টি হতো এবং তা বায়ুর সংস্পর্শে অনির্বাণ ভাবে জ্বলতে দেখা যেতো। আজকালও নল-কূপ খনন করে ভূ-গর্ভে সঞ্চিত পেট্রোলিয়াম উত্তোলনকালে ভিতরের গ্যাসীয় চাপে অনেক সময় প্রবিষ্ট নলের ভিতর দিয়ে ফোয়ারার মত সজোরে তেল ও গ্যাস উপরে উঠে আসে।

বিভিন্ন দেশের তৈল-কূপ থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামের উপাদানিক গঠনে যদিও যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই খনিজ তেলটা বিভিন্ন **হাইড্রোকার্বন** যৌগিকের সংমিশ্রণ মাত্র। হাইড্রোকার্বন হলো কেবল মাত্র

হাইড্রোজেন ও কার্বনের সংযোগে গঠিত জৈব যৌগিক। বিভিন্ন অনুপাতে এই দু'টা মৌলিক পদার্থের সংযোগে বিভিন্ন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন গঠিত হয়। পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান হলো মিথেন বা প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রো-কার্বন, তার সঙ্গে আবার বিভিন্ন অনুপাতে ন্যাপথিন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনও মিশ্রিত থাকে। বেঞ্জিন, টলুয়িন প্রভৃতি তথাকথিত 'অ্যারোমেটিক' বা গন্ধবহ হাইড্রোকার্বনগুলি ন্যাপথিন শ্রেণীর অন্তর্গত। এসব হাইড্রোকার্বন আল্‌কাত্‌রা বা কোল-টারের মধ্যেও রয়েছে, একথা আমরা কয়লার আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। পেট্রোলিয়ামে 'ন্যাপথিন' শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে থাকে।

হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর বিভিন্ন যৌগিকগুলির রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম মূলতঃ একই রূপ ; এদের মধ্যে মিথেন সবচেয়ে সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের। এটা একটা গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন এবং সাধারণতঃ **মার্স গ্যাস** নামে পরিচিত। একটি কার্বন-পরমাণুর সঙ্গে চার-টি হাইড্রোজেন-পরমাণু যুক্ত হয়ে মিথেন বা মার্স গ্যাসের একটি অণু (CH_4) গঠিত হয়। একটি কার্বন-পরমাণু সর্বাধিক চার-টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ কার্বন হলো একটি চতুর্যোজী মৌল। মিথেনের গঠনে তাই কার্বন হলো সর্বাধিক সংযোজিত বা সম্পৃক্ত ; তাই মিথেনকে বলা হয় সম্পৃক্ত বা **স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন**। আবদ্ধ জলাশয়ের লতাপাতা-পচা পাঁকে নাড়া দিলে বুদ্‌বুদের আকারে যে গ্যাস উঠতে দেখা যায়, সেটা মিথেন গ্যাস ; তাই জলাভূমির গ্যাস বলে মিথেনকে ইংরেজিতে বলা হয় মার্স গ্যাস। এটা সবিশেষ দাহ্য ; এমন কি, বায়ুর সংযোগে সাধারণ তাপেও অনেক সময় জ্বলে ওঠে। জলাভূমির বন-বাদাড়ে, শ্মশান ও গোরস্থানে রাত্রির অন্ধকারে অনেক সময় সহসা আলো জ্বলতে দেখা যায়, যাকে সাধারণ লোকে 'ভূতের আলো' ভেবে ভয় পায় ; আসলে এটা মিথেন গ্যাসের দহনে উৎপন্ন ক্ষণিক প্রজ্বলিত আলোক-শিখা মাত্র। ভূগর্ভে প্রোথিত উদ্ভিদরাজি স্বাভাবিক 'কার্বনিজেসন' প্রক্রিয়ায় ক্রমে যে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে তাতেও এই মিথেন বা মার্স-গ্যাস উৎপন্ন হয়ে খনিগর্ভে কয়লার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। খননকালে কয়লার খনির গহ্বরে তাই এই গ্যাসের সঙ্গে বায়ু মিশে একটা বিস্ফোরক-ধর্মী গ্যাসীয় মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, যাকে বলে **ফায়ার ড্যাম্প**। কয়লার খনিতে বায়ু ও মিথেন গ্যাসের এই মিশ্রণটা সামান্য অগ্নিশিখা বা স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শেই মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটায়। এরূপ বিস্ফোরণের হাত

থেকে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্যেই ডেভির **সেফ্‌টি ল্যাম্প** উদ্ভাবিত হয়েছিল। এসব কথা 'দহন ও অগ্নি উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা আগেই বলেছি।

দাহ্য গ্যাস হিসাবে মিথেনের জ্বালানী-মূল্য যথেষ্ট ; আর এই গ্যাসটা কেবল কয়লা-খনিতেই নয়, কোল-গ্যাসেও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আবার এটা পেট্রোলিয়ামেরও একটি সংগঠক উপাদান। গ্যাসীয় জ্বালানী প্রসঙ্গে আমরা যে প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখ করেছি তা-ও পেট্রোলিয়াম-খনির নিকটবর্তী অঞ্চলেই ভূগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং তা প্রধানতঃ এই মিথেন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। পয়ঃ-প্রণালীর মলমূত্র, বিবিধ আবর্জনা, গোবর, প্রভৃতি পচেও মিথেন গ্যাসের উদ্ভব হয়। অনেক দেশে সহরাঞ্চলের এ-সব দূষিত আবর্জনাদি থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় গ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এভাবে উৎপন্ন গ্যাসের শতকরা 70-80 ভাগই থাকে মিথেন গ্যাস। পাশ্চাত্যের বড় বড় সহরের এরূপ গ্যাসোৎপাদন-কেন্দ্রে প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ ঘন ফুট এই গ্যাস উৎপাদিত হয়ে থাকে এবং জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের কলকাতার বিপুল পরিমাণ আবর্জনাদি থেকে ধাপা অঞ্চলে এরূপ গ্যাস-উৎপাদনের কথা মাঝে মাঝে শুনা যায় ; কিন্তু এর প্রাথমিক ব্যবস্থায় যে বিরাট আয়োজন, কারিগরী নৈপুণ্য ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন তার কথা ভেবেই পৌরসংস্থা দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু একবার এরূপ গ্যাস-উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে শেষে সম্পূর্ণ নিঃখরচায় অনায়াসে এই গ্যাস বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করা যেতে পারে ; কারণ, এর কাঁচা মালের অভাব নেই— প্রতিদিন হাজার হাজার টন আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ কলকাতা থেকে ধাপায় অপসারিত হচ্ছে। প্রত্যেক উন্নতিকামী দেশের পক্ষে মিথেন গ্যাসের অপচয় নিবারণে তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেহেতু এটা কেবল জ্বালানী হিসাবেই কাজে লাগে না, এর থেকে কার্বন-ব্ল্যাক, হাইড্রোজেন, মেথানল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনের বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পও সহজে গড়ে তোলা যেতে পারে। কাজেই দেখা যায়, রসায়নের বিচারে লোকবসতির পরিত্যক্ত ময়লা ও আবর্জনাদি বস্তুতঃ হেলা-ফেলার জিনিস নয়।

বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের গঠন: যাহোক, এ প্রসঙ্গ এখন থাক। আমরা খনিজ তেল পেট্রোলিয়ামের সংগঠক হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যে মিথেনের কথাই বলছিলাম। জৈব রসায়নে প্যারাফিনশ্রেণীর হাইড্রোকার্বন গোষ্ঠির মধ্যে মিথেনকে বলা যায় প্রাথমিক যৌগিক ; কারণ, একটি মাত্র কার্বন-পরমাণুর

সঙ্গে চার-টি হাইড্রোজেন-পরমাণু যুক্ত হয়ে মিথেন গ্যাস (CH_4) গঠিত। মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে কার্বনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর বিভিন্ন পরমাণু আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর হাইড্রোকার্বন অণু গঠন করতে পারে; আর তাতে কার্বন-পরমাণুরা শৃঙ্খলের আকারে জুড়ে একই গোষ্ঠিভুক্ত বিভিন্ন যৌগিক উৎপন্ন করে। সাংকেতিক প্রতীকের সাহায্যে ব্যাপারটা এভাবে দেখানো যেতে পারে:

$H_3C—CH_3$ (ইথেন), $H_3C—CH_2—CH_3$ (প্রোপেন), $H_3C—CH_2—CH_2—CH_3$ (বুটেন) ইত্যাদি।

মিথেনের মত এগুলিও সব সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন। উল্লিখিত ইথেন, প্রোপেন প্রভৃতি বহুসংখ্যক হাইড্রোকার্বন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলির গঠনে সর্বক্ষেত্রেই যতগুলি কার্বন-পরমাণু থাকে তার দ্বিগুণের চেয়ে দু'টা বেশী হাইড্রোজেন-পরমাণু থাকে, অর্থাৎ এদের সাধারণ সংকেত হলো C_nH_{2n+2}। এই শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন রাসায়নিক ক্রিয়ায় তেমন সক্রিয় নয়, তাই এদের বলা হয় **প্যারাফিন** গোষ্ঠী। ল্যাটিন ভাষায় প্যারাফিন শব্দটার অর্থই হলো 'সামান্য সক্রিয়'। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মিথেন, ইথেন, প্রোপেন প্রভৃতি হাইড্রোকার্বনগুলি গ্যাসীয় আকারে থাকে এবং এদের সবগুলিই দাহ্য গ্যাস। এই শ্রেণীর যৌগিকের গঠনে কার্বনের অনুপাত, অর্থাৎ কার্বন-পরমাণুর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে ততই তারা ভারী হয়ে উদ্বায়ীত্ব হারায়, ক্রমে তরল ও পরে কঠিন হয়। হাইড্রোকার্বনের অণুতে কার্বন-পরমাণুর সংখ্যা 16-এর বেশি হলে সেগুলি হয় কঠিন প্যারাফিন শ্রেণীর, অর্থাৎ মোম-জাতীয় পদার্থ। খনিজ পেট্রোলিয়ামকে বিশেষ ব্যবস্থায় উত্তপ্ত করলে তাপমাত্রার ক্রমানুসারে প্রথমে গ্যাসীয় ও পরে তরল হাইড্রোকার্বনগুলি একে একে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পৃথক হয়, সব শেষে কঠিন হাইড্রোকার্বনগুলি থেকে যায়। এ-সব কথা পরে বিশেষভাবে আলোচিত হবে।

একটা কথা এখানে বলা দরকার যে, কেবল উল্লিখিত প্যারাফিন শ্রেণীর সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনই নয়, আর এক শ্রেণীর অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আছে, যাদের গঠনে হাইড্রোজেনের অনুপাত মিথেন-শ্রেণীর চেয়ে কম থাকে। মিথেন (CH_4) শ্রেণীর সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনগুলির (ইথেন, প্রোপেন প্রভৃতি) প্রত্যেকটি থেকে দু'টি করে হাইড্রোজেন-পরমাণু বিচ্যুত হয়ে গেলে এই শ্রেণীর **ইথিলিন** (C_2H_4), **প্রোপিলিন** (C_3H_6) প্রভৃতি অসম্পৃক্ত

হাইড্রোকার্বনের উৎপত্তি হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসেও এই শ্রেণীর কোন-কোন হাইড্রোকার্বন থাকে। আবার আর এক শ্রেণীর হাইড্রোকার্বন আছে যাদের গঠনে হাইড্রোজেনের ভাগ আরও কম থাকে, অর্থাৎ কার্বনের অনুপাত থাকে অনেক বেশি। ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জলের বিক্রিয়ায় যে **অ্যাসিটিলিন** (C_2H_2) গ্যাস পাওয়া যায় তা এই শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনের অন্তর্গত। অসংখ্য ও বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব বা সমীচীন হবে না; খনিজ পেট্রোলিয়ামের আলোচনা প্রসঙ্গে হাইড্রোকার্বনের গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা হলো মাত্র।

পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন উপাদানঃ খনিজ পেট্রোলিয়াম একটা ঘন তরল পদার্থ। সাধারণতঃ এর রং থাকে হল্‌দে, কোন কোন তৈল-কূপের পেট্রোলিয়াম কালো বা ধূসর বর্ণেরও হয়ে থাকে; কিন্তু সবক্ষেত্রেই এর বর্ণে একটা বেগুনী আভা দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে, এটা বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের একটা সংমিশ্রণ, যার মধ্যে গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন সব রকম হাইড্রেকার্বনই থাকে। গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনগুলির অধিকাংশই থাকে তরল পেট্রোলিয়ামের মধ্যে দ্রবিত অবস্থায়; আর এগুলি স্বতঃই তরলাংশ থেকে বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এর পরে তরল পদার্থ টাকে বিশেষ পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় পরিস্রুত ও বিশুদ্ধ করে নিয়ে আবদ্ধ আধারে ফুটিয়ে বিভিন্ন তাপমাত্রায় তার বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন উপাদানগুলি পাতিত করে সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলে আংশিক পাতন-ক্রিয়া, বা **ফ্রাক্সনাল ডিস্টিলেসন**। নানারকম জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ এই পদ্ধতির সাহায্যে পৃথক করা হয়। পেট্রোলিয়াম ইথার, গ্যাসোলিন বা পেট্রল, কেরোসিন প্রভৃতি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন এভাবে পেট্রোলিয়াম থেকে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। এগুলি সবই হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর তরল পদার্থ, কাজেই দাহ্য; কিন্তু সবগুলি কেবল জ্বালানী হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না।

স্তম্ভাকার আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে বায়ু-সম্পর্কশূন্য অবস্থায় খনিজ পেট্রোলিয়াম উত্তপ্ত করা হয়; ফলে এর উচ্চ স্তম্ভের উপরের দিকে পেট্রোলিয়ামের উদ্বায়ী উপাদানগুলি উঠতে থাকে। এই লম্বমান স্তম্ভের বিভিন্ন উচ্চতায় বিশেষ ধরনের অনেকগুলি সছিদ্র ধাতব তাক বসানো থাকে; উপরের দিকে নিম্ন তাপমাত্রা অনুযায়ী এই তাকগুলির উপরে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন-গুলি ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থায় জমতে থাকে। নিচের তাকগুলি

স্বভাবতঃই থাকে অধিকতর উত্তপ্ত, তারপর উচ্চতা অনুযায়ী ক্রমে উপরের তাকগুলির তাপমাত্রা কম হয়। কাজেই পেট্রোলিয়ামের যে-সব উপাদানের স্ফুটনাংক যত কম সেগুলি গ্যাসীয় আকারে পর্যায়ক্রমে উপরে উঠে যায় এবং নিম্নবর্তী অধিকতর উত্তপ্ত তাকের উপরে অধিকতর স্ফুটনাংকের হাইড্রোকার্বনগুলি ঘনীভূত হয়ে জমতে থাকে। এভাবে অধিকতর উদ্বায়ী, অর্থাৎ স্ফুটনাংক যেগুলির কম, সে-সব উপাদানের বাষ্প উপরে উঠে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর তাকে কম উষ্ণতায় তরল হয়। বিশেষ ব্যবস্থায় বিভিন্ন নলপথে তাকগুলি থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় (তাপমাত্রায়) বিভিন্ন স্ফুটনাংকের তরলীভূত হাইড্রোকার্বনগুলি পৃথকভাবে সংগৃহীত হয়ে থাকে। মোটামুটি এই হলো পেট্রোলিয়ামের 'ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন' বা আংশিক পাতন-ক্রিয়ার সাধারণ পদ্ধতি।
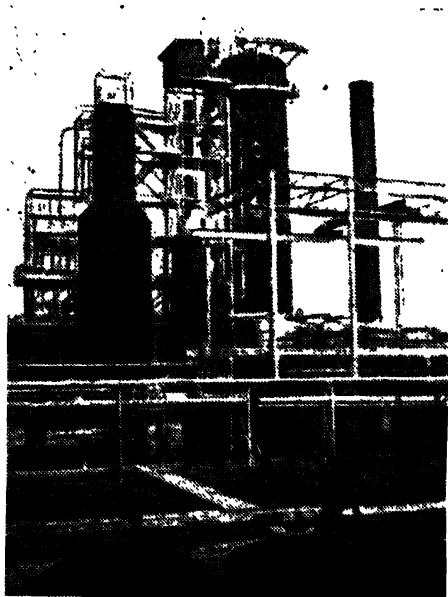
পেট্রোলিয়ামের ফ্রাক্সন্যাল ডিস্টিলেসন প্রক্রিয়ার আধুনিক প্ল্যাণ্ট

এভাবে পেট্রোলিয়ামের সর্বাধিক উদ্বায়ী অংশ সবচেয়ে উপরের তাকে প্রায় 70° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় তরল হয়, যাকে বলা হয় **পেট্রোলিয়াম ইথার**। জিনিসটা উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়; আবার অতি দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে তীব্র শৈত্য উৎপাদন করে বলে দেহের কোন স্থান অসাড় ও অনুভূতিশূন্য করতে এটা ঔষধরূপে শস্ত্র-চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। তারপরে 70° ডিগ্রি থেকে 120° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পাতিত অংশ নিচের পরবর্তী তাকে জমে, যাকে বলে **পেট্রল** বা **গ্যাসোলিন**। এই তরল তৈলাক্ত পদার্থটার সঙ্গে এ-যুগে সকলেই পরিচিত। মোটর, এরোপ্লেন

প্রভৃতি এই তেলে চলে ; অন্তর্দাহী (ইণ্টারনাল কম্বাস্‌সন) ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে এর বহুল ব্যবহার। খনিজ পেট্রোলিয়ামের পরবর্তী উদ্বায়ী অংশ **পেট্রোলিয়াম-বেঞ্জিন** বা **বেঞ্জোলিন** 120° ডিগ্রি থেকে 150° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পাতিত একটি তরল পদার্থ, যা দ্রাবক হিসাবে ও মূল্যবান বস্ত্রাদির শুষ্কধৌত-করণে (ড্রাই ওয়াশিং) ব্যবহৃত হয়। খনিজ কয়লার আংশিক পাতনে যে বেঞ্জিন নামক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত এই বেঞ্জোলিন বা পেট্রোলিয়াম-বেঞ্জিন তা থেকে আলাদা বস্তু। পেট্রোলিয়ামের যে অংশ 150° ডিগ্রি থেকে 300° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পাতিত হয়ে তরল অবস্থায় সঞ্চিত হয় তা-ই হলো আমাদের পরিচিত জ্বালানী-তেল **কেরোসিন** ; একে পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে **প্যারাফিন অয়েল**ও বলে। এর পরে প্রায় 350° ডিগ্রি তাপমাত্রার মধ্যে পাতিত হয় এক রকম অপেক্ষাকৃত ভারী তেল, যা **সোলার অয়েল** বা **গ্যাস-অয়েল** নামে পরিচিত। সাধারণতঃ একে বলা হয় **ডিজেল-তেল,** কারণ ডিজেল ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবেই এই তেল সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে উল্লিখিত উদ্বায়ী অংশগুলি পাতিত হয়ে গেলে যে অনুদ্বায়ী অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনেকটা নিম্ন-চাপে পাতিত করলে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারী ও ঘন তেল পাওয়া যায়। এগুলি বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পিচ্ছিলিকরণে **লুব্রিকেটিং অয়েল** হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর পরে যে সম্পূর্ণ অনুদ্বায়ী ঘন চট্‌চটে হলুদাভ-সাদা পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তা-ই হলো **ভেসেলিন ;** কোন কোন শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামের এই অংশ হলো কঠিন মোম বা **প্যারাফিন,** যা মোমবাতি, ওয়াটার প্রুফ, কাগজ প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সর্বশেষে পেট্রোলিয়ামের যে পরিত্যক্ত কালো অংশ পড়ে থাকে তা হলো **পিচ**। এটা কোল-টার বা আল্‌কাত্‌রার আংশিক পাতন-ক্রিয়ার শেষে যে কালো পিচ পাওয়া যায় তারই অনুরূপ পদার্থ।

বর্তমান যুগে খনিজ পেট্রোলিয়ামের উল্লিখিত বিভিন্ন মূল্যবান উপাদানগুলির পৃথকীকরণ ও সংগ্রহের বিরাট শিল্প গড়ে উঠেছে এবং ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ ও লাভজনক রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম-শিল্পে বিপুল যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, কারিগরী জ্ঞান ও বিশেষ রাসায়নিক তৎপরতা আবশ্যক। কোন কোন দেশের খনিজ পেট্রোলিয়ামে সালফার বা গন্ধকের ও নাইট্রোজেনের

বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; কাজেই উল্লিখিত পাতন-প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত বিভিন্ন তৈলোপাদানের সঙ্গে ঐ পদার্থগুলিও পাতিত হয়ে গিয়ে মালিন্য হিসেবে মিশে যায়। পেট্রোলিয়াম থেকে পাতিত বিভিন্ন উপাদানগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন কাজের উপযোগী করে বিক্রয়ের আগে নানা রকম জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গন্ধক ও নাইট্রোজেনের ঐ সব অবাঞ্ছিত যৌগিকগুলি বিদূরিত করা হয়। পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশের, বিশেষতঃ গ্যাসোলিন (পেট্রল), কেরোসিন প্রভৃতির বিশুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে সালফারের ও নাইট্রোজেনের যৌগিকগুলি সম্পূর্ণ বিদূরিত করা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ; নতুবা জ্বালানী হিসাবে ঐ গুলির ব্যবহার অনিষ্টকর।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশগুলি প্রধানতঃ আলোকদায়ী জ্বালানী, দ্রাবক ও লুব্রিক্যাণ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতো। ক্রমে অন্তর্দাহী (ইণ্টারন্যাল কম্বাস্‌সন) ইঞ্জিনের উদ্ভাবন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ জ্বালানী-তেলের উৎস হিসাবে পেট্রোলিয়ামের গুরুত্ব বিশেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোলিয়াম থেকে উচ্চ তাপাংকে পাতিত অংশগুলির (ডিজেল তেল প্রভৃতি জ্বালানী-তেলের) প্রতি পাউণ্ড দহনে প্রায় 19,500 বি, টি এইচ একক তাপ উদ্ভূত হয় ; এই ক্যালরি-মূল্য সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লারও প্রায় দেড়গুণ বেশি। আবার কয়লার চেয়ে এর পরিবহন, সংরক্ষণ, তাপনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে সুবিধাও অনেক বেশি। তাই ডিজেল তেলে চালিত ইঞ্জিন রেল, স্টীমার, বিশেষতঃ সমুদ্রগামী জাহাজে ইদানিং সমধিক প্রচলিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম তাপাংকে পাতিত পেট্রল বা গ্যাসোলিন অংশ অন্তর্দাহী জ্বালানী-তেল হিসাবে বিশেষ উপযোগী হওয়ায় মোটর, এরোপ্লেন প্রভৃতির ইঞ্জিনে সমধিক ব্যবহৃত হয়। আগের দিনে পেট্রলের বাষ্পের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে বায়ু মিশিয়ে আলো জ্বালানো হতো ; আজকাল আর আলোকদায়ী জ্বালানী-রূপে পেট্রল ব্যবহৃত হয় না। পেট্রোলিয়ামের পাতিত অংশগুলির মধ্যে একমাত্র **প্যারাফিন-অয়েল** বা কেরোসিনই আলোকদায়ী জ্বালানী হিসাবে আজকাল বহুল প্রচলিত। কেরোসিনের গঠনে কার্বনের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশি ; তাই তার বাষ্প জলবার সময় ধুম উদ্‌গিরণ করে, কালি পড়ে। কার্বন-কণিকার অসম্পূর্ণ দহনের ফলেই এরূপ হয় ; কেরোসিনের বাষ্পের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু মিশ্রণের ব্যবস্থা করলে এই ধুম ও কালি-পড়া বন্ধ হয়। এজন্যে হ্যারিকেন প্রভৃতি কেরোসিন-বাতিতে কাচের চিমনি পড়ানো হয়, যার নিচের

দিকের ছিদ্রপথে বায়ু-প্রবাহ ঢুকে কেরোসিনের শিখায় প্রয়োজনানুরূপ অক্সিজেন সরবরাহ করে, আর তার ফলে কার্বন-কণিকাগুলি দগ্ধ হয়ে ধূমহীন ও অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোক দেয়। কোন কোন কেরোসিন-বাতিতে চ্যাপ্‌টা পল্‌তে-ফিতার বদলে গোলাকার পল্‌তে ব্যবহার করা হয়, আর তার ভিতরের দিকে একটা নলপথে বায়ু ঢুকে কেরোসিনের বাষ্পীয় শিখার অভ্যন্তরেও অক্সিজেন সরবরাহ হয়ে কার্বনের সম্যক দহনে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় নির্ধূম ও অধিকতর আলো পাওয়া যায়। যাহোক, এ-সব সত্ত্বেও কেরোসিনের শিখায় উদ্ভূত আলো হয় লাল্‌চে ও অনুজ্জ্বল; ম্যান্টেল ব্যবহার করলে কেরোসিনের আলোর ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট বাড়ে, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি।

মিশ্র পেট্রল-জ্বালানী

খনিজ পেট্রোলিয়ামের অল্প তাপাংকে পাতিত অংশ গ্যাসোলিন বা পেট্রল মোটর ও এরোপ্লেনের অন্তর্দাহী ইঞ্জিনে জ্বালানী-তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়; আর এর প্রয়োজন ও চাহিদা এ-যুগে এত বেশি যে, খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পাতিত পেট্রলে সে বিপুল চাহিদা আজকাল মেটে না। এজন্যে পেট্রোলিয়ামের অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাস-অয়েলগুলি, এমন কি, কেরোসিন অংশকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে পেট্রল বা মোটর-স্পিরিটে পরিণত করা হয়। এসব অপেক্ষাকৃত ভারী তেলকে অধিক চাপে প্রায় 400° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তাদের বৃহত্তর ও জটিল হাইড্রোকার্বন অণুগুলি ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত সরল ও ক্ষুদ্রতর অণুতে পরিণত হয়, আর তা-ই হলো **গ্যাসোলিন** বা **পেট্রল**। এই রূপান্তর-ক্রিয়ায় প্রধানতঃ অ্যালুমিনিয়াম-ক্লোরাইড অনুঘটক (ক্যাটালিস্ট) হিসাবে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ এই ধাতব যৌগিকের উপস্থিতিতে ঐ সব ভারী তেলের পেট্রলে রূপান্তরের বিক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হয়। এভাবে উৎপাদিত পেট্রল বা মোটর-স্পিরিটের সঙ্গে নানা রকম অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন ও বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতি তথাকথিত গন্ধবহ (অ্যারোমেটিক) হাইড্রোকার্বনও মেশানো হয়ে থাকে। এ-সবের উপস্থিতি পেট্রলের অন্তর্দহনে কোন অসুবিধা ঘটায় না, বরং ইঞ্জিনের গ্যাস-সিলিণ্ডারের ভিতরে এরূপ পেট্রলের গ্যাস ও বায়ুর সংমিশ্রণে বিস্ফোরণ ঘটবার আশঙ্কা কম থাকে। বস্তুতঃ খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পাতিত বিশুদ্ধ পেট্রলের সঙ্গেও বেঞ্জিন (বেঞ্জোল), লেড ইথাইল, আইসো-প্রোপাইল ইথার প্রভৃতি শতকরা প্রায় 40 ভাগ মিশিয়ে

অন্তর্দাহী ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। এরূপ মিশ্রণই মোটর-ইঞ্জিনের উৎকৃষ্ট জ্বালানী তেল হিসাবে সমাদৃত ; কারণ, অধিকতর গ্যাসীয় চাপেও বায়ু ও এর মিশ্রণে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে না। অন্তর্দাহী ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে এরূপ মিশ্র পেট্রল বা মোটর-স্পিরিটের কার্যকারিতা যথেষ্ট বেশি।

পেট্রোলিয়ামের বিকল্প

পৃথিবীর খনিজ সম্পদ হিসাবে কয়লার মত পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয়ও নিশ্চয়ই অফুরন্ত নয় ; এক দিন অবশ্যই তা ফুরিয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় পেট্রলের মত মূল্যবান জ্বালানী তেলের কোন কার্যকরী বিকল্প উৎপাদনের জন্যে নানা দেশের রসায়নবিদেরা দীর্ঘ দিন ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন এবং তাতে ফলও পাওয়া গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অষ্ট্রেলিয়া, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর শক্ত খোলা উত্তপ্ত করে এক রকম তেল নিষ্কাশনের উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই খোলাগুলি কার্বন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিকের সংমিশ্রণে গঠিত, আর এগুলিকে বলা হয় **অয়েল শেল**। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে অয়েল-শেল পাওয়া যায়, আবার কোথাও কোথাও ভূগর্ভে এগুলি খনিজ আকারেও থাকে। বিশেষ উত্তাপে এই খোলা থেকে যে ঘন তেল পাওয়া যায় তাকে খনিজ পেট্রোলিয়ামের অনুরূপ পদ্ধতিতে পাতিত করলে বিভিন্ন তাপাংকে পাতিত অংশে পেট্রল বা মোটর স্পিরিট শ্রেণীর জ্বালানী তেল, ঘন ও পিচ্ছিল তেল (লুব্রিকেটিং অয়েল) ও কঠিন প্যারাফিন অর্থাৎ মোমজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন জ্বালানী তেলের চেয়ে এই বিকল্প তেলের উৎপাদন-ব্যয় কিছু বেশি হলেও এ দিয়ে দীর্ঘকাল জ্বালানী তেলের কাজ চলতে পারবে। ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ায় শিল্পগত পদ্ধতিতে বছরে প্রায় তিন কোটি গ্যালন শেল-অয়েল উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতি টন শেল থেকে প্রায় 100 গ্যালন তেল পাওয়া যায়।

খনিজ কয়লা থেকেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে জ্বালানী তেল উৎপাদিত হয়। কয়লার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই বলেছি, কাঁচা-কয়লার কার্বনিজেসন বা অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় যে **কোল টার** বা আলকাত্‌রা উৎপন্ন হয়, আংশিক পাতন পদ্ধতিতে (ফ্রাক্সনাল ডিস্টিলেসন) তা থেকে মোটর-স্পিরিট, জ্বালানী-তেল ও পিচ্ছিলকারী (লুব্রিকেটিং) ঘন তেল প্রভৃতি পাওয়া যায়। এগুলি

পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত উপাদানগুলির প্রায় অনুরূপ। সাধারণ বিটুমিনাস কয়লাকে নিম্ন-তাপাংকে পাতিত করলেও উল্লিখিত উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেতে পারে; পক্ষান্তরে উচ্চ তাপমাত্রায় পাতন-ক্রিয়া ঘটালে যে আল্‌কাতরা পাওয়া যায় তাতে **বেঞ্জিন** বা বেঞ্জোলই থাকে বেশি। এককভাবে বেঞ্জিন পেট্রলের মত অন্তর্দাহী জ্বালানী হিসাবে সুবিধাজনক নয়, কিন্তু পেট্রলের সঙ্গে বেঞ্জিন মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে মোটর-স্পিরিট হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ পেট্রল বা অ্যালকোহলের সঙ্গে বেঞ্জিন (পেট্রোলিয়াম-বেঞ্জিন) মেশালে অন্তর্দহনে তার কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা যথেষ্ট বাড়ে, এ-সব কথা আগেই বলা হয়েছে।

কৃত্রিম পেট্রল

কয়লা থেকে আর এক পদ্ধতিতেও পেট্রল বা মোটর-স্পিরিট উৎপাদিত হয়ে থাকে; একে কয়লার সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ-ক্রিয়া বা হাইড্রোজেনেসন পদ্ধতি বলা হয়। আমরা জানি, কয়লার মুখ্য উপাদান হলো কার্বন, আর সেই কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগেই গঠিত হয় বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন। পেট্রল হলো এরূপ কতকগুলি হাল্‌কা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ মাত্র; কাজেই রাসায়নিক যুক্তির দিক দিয়ে পেট্রল উৎপাদনে কয়লার **হাইড্রোজেনেসন পদ্ধতি** সহজসাধ্য মনে হলেও কার্যতঃ তা নয়, ব্যাপারটা বিশেষ জটিল। এর কার্যকরী উপায় প্রথম উদ্ভাবন করেন জার্মান রাসায়নিক বার্জিয়াস। খনিজ কাঁচা-কয়লার গুঁড়োর সঙ্গে কিছু ভারী খনিজ তেল মিশিয়ে কতকটা আঠালো মত করা হয়, তারপর তাকে আবদ্ধ পাত্রে প্রায় 500° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে পাত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করা হয়। এভাবে ভিতরের গ্যাসীয় চাপ সাধারণ বায়ু-মণ্ডলীয় চাপের প্রায় 200 গুণ বৃদ্ধি করলে উত্তপ্ত কয়লার কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের রাসায়নিক মিলন ঘটে; আর তার ফলে মিথেন, ইথেন প্রভৃতি গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন, হাল্‌কা তেল পেট্রল ও বিভিন্ন ভারী তেল উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন ভারী তেল মাখিয়েই এই পদ্ধতির প্রাথমিক কয়লার গুঁড়োকে আঠালো করা হয়; আর পেট্রল ও অপেক্ষাকৃত কম ভারী তেলগুলিকে বাষ্পীয় আকারে উত্তপ্ত নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এই উত্তপ্ত নলের ভিতরে অনুঘটক হিসাবে থাকে **মলিব্‌ডিনাম সালফাইড,** যার উপস্থিতিতে ভারী

তেলের জটিল হাইড্রোকার্বনগুলি ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত হালকা তেলের অণু গঠন করে। বিভিন্ন হালকা হাইড্রোকার্বনের এই উত্তপ্ত গ্যাসীয় সংমিশ্রণ ঠাণ্ডা করে যে মিশ্র তেল পাওয়া যায় তাকে মোটর-স্পিরিট হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে নানা রকম অনুঘটক ব্যবহার করে হাইড্রোকার্বনের উল্লিখিত রূপান্তর-ক্রিয়া ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করাও যায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাসের উপস্থিতিতে ধাতব টিনের অনুঘটনে প্রতি টন বিটুমিনাস কয়লার গুঁড়ো থেকে এরূপ হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় প্রায় 200 গ্যালন উক্ত মিশ্র পেট্রল বা মোটর-স্পিরিট পাওয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা গেল, খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে যে বিভিন্ন জালানী তেল; বিশেষতঃ পেট্রল বা মোটর-স্পিরিট পাওয়া যায়, বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে কয়লা থেকেও অনুরূপ জালানী তেল উৎপাদিত হয়ে থাকে ; রসায়নের এ এক কৃতিত্বপুর্ণ অধ্যায়। আবার বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোটর-স্পিরিট উৎপাদনের আর একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। 1926 খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী এফ. ফিশার ওয়াটার-গ্যাসকে পেট্রলজাতীয় জালানী তেলে রূপান্তরিত করেন। গ্যাসীয় জালানীর আলোচনা প্রসঙ্গে **ওয়াটার-গ্যাসের** কথা আমরা আগেই বলেছি ; এটা কার্বন-মনঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র। বিশেষ ব্যবস্থায় অনুঘটক হিসাবে কোবাল্ট ও থোরিয়াম ধাতুর উপস্থিতিতে ওয়াটার-গ্যাসকে প্রায় 300° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেটা বিভিন্ন হাইড্রো-কার্বনের (তরল ও গ্যাসীয়) একটা মিশ্রণে রূপান্তরিত হয়। আংশিক পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে এই তরল হাইড্রোকার্বন থেকে (নিম্ন তাপাংকে পাতিত করে) যে অংশ পাওয়া যায় তার সঙ্গে বেঞ্জোল, লেড-ইথাইল প্রভৃতি মিশিয়ে পেট্রলের মত এক জাতীয় অন্তর্দাহী জালানী-তেল উৎপাদন করা হয়, যা উৎকৃষ্ট মোটর-স্পিরিট হিসাবে ব্যবহার করা চলে। কেবল তা-ই নয়, বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবার ওয়াটার-গ্যাসকে ঘন ও পিচ্ছিল (লুব্রিকেটিং) তেলেও রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। গ্যাসটাকে এরূপ ভারী হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত করবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম-ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মোটর-ইঞ্জিনের জালানী হিসাবে খনিজ পেট্রল ও পেট্রলজাতীয় উল্লিখিত (স্বাভাবিক ও উৎপাদিত বিকল্প) তেলগুলি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কোথাও আবার **অ্যালকোহল**ও মোটর-স্পিরিট শ্রেণীর জালানীরূপে যথেষ্ট

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য পেট্রলের মত অ্যালকোহলও এককভাবে অন্তর্দাহী ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অ্যালকোহলের সঙ্গে ইথার মিশিয়ে আফ্রিকার কোন কোন দেশে মোটর-ইঞ্জিনের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্র জ্বালানী **ন্যাটালাইট** নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও অ্যালকোহল ও বেঞ্জিনের, অথবা অ্যালকোহল ও পেট্রলের মিশ্রণও মোটরের জ্বালানী হিসাবে চলে। যদিও পেট্রল বা গ্যাসোলিনের মত অ্যালকোহলের তাপ বা ক্যালরি-মূল্য তত বেশি নয়; কিন্তু পেট্রলের চেয়ে অ্যালকোহলের বাষ্পের অন্তর্দহনে অধিকতর বাষ্পীয় চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে, পেট্রল-বাষ্পের ক্ষেত্রে যে চাপে গ্যাস-সিলিণ্ডারে বিস্ফোরণ ঘটবার আশঙ্কা থাকে। পেট্রলের চেয়ে অ্যালকোহলের জ্বালানী বা ক্যালরি-মূল্য কম হলেও যথেষ্ট বেশি চাপিত বা সংকুচিত অবস্থায় ইঞ্জিনের ভিতরে অ্যালকোহল-বাষ্প জ্বালানো যায় বলে এর কার্যকারিতা পেট্রলের চেয়ে তেমন কিছু কম নয়।

অষ্টম অধ্যায়

রসায়ন ও তড়িৎশক্তি

কেমিক্যাল এনার্জি ও শক্তির রূপান্তর : ইলেক্ট্রো-কেমিস্ট্রি : গ্যালভানির পরীক্ষা — তড়িতের আবিষ্কার : ভোল্টেইক সেল — তড়িৎশক্তি ও রসায়নে তড়িতের ব্যবহার : ইলেক্ট্রোপ্লেটিং : ইলেক্ট্রোলাইট ও নন্-ইলেক্ট্রোলাইট : ইলেক্ট্রোলিসিসের ব্যাখ্যা —আয়ন-তত্ত্বের অ-আ-ক-খ : আর্হেনিয়াসের মতবাদ — অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন। বিভিন্ন তড়িৎ-কোষ — লেক্লান্স সেল ; পোলারিজেসন ও ডিপোলারাইজার ; ড্রাই সেল ও লেড্ অ্যাকুমুলেটর : রাসায়নিক শিল্পে তড়িতের ব্যবহার — ইলেক্ট্রোলিটিক কপার, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উৎপাদন-শিল্প : বিভিন্ন ধাতুর নিষ্কাশন ও শোধন — সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের নিষ্কাশন, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম এবং তাদের বিভিন্ন ধাতু-সংকর : ইলেকট্রিক আর্ক ; কোরাণ্ডাম ও অ্যালাণ্ডাম : কৃত্রিম গ্রাফাইট।

পদার্থের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ থেকে বুঝা যায়, পদার্থ মাত্রেই নিহিত রয়েছে শক্তি ; আর বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে সেই শক্তির আদান-প্রদানের ফলেই (রাসায়নিক বিক্রিয়ায়) পদার্থের রূপান্তর ও অবস্থান্তর ঘটে, সেই সঙ্গে অবস্থাবিশেষে শক্তি শোষিত বা বিমুক্ত হয়। পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর-জনিত এই শক্তিকে আমরা বলি রাসায়নিক শক্তি বা 'কেমিক্যাল এনার্জি'। পরীক্ষায় দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন পদার্থের কেবল সংযুতির প্রভেদ বা রূপান্তরই ঘটে না, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থগুলির মধ্যে 'আয়ন' বা তড়িৎ-কণিকার আকারে মুক্ত শক্তির একটা প্রবাহ বয়, তড়িৎ-শক্তির বিকাশ ঘটে। অবশ্য পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিমুক্ত শক্তি তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুতঃ রাসায়নিক ক্রিয়া হলো পরোক্ষভাবে শক্তির রূপান্তরের ব্যাপার। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য হলো শক্তির প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তর সাধন ও মানব-কল্যাণে তার ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন।

'দহন ও অগ্নি উৎপাদন' অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, পদার্থের দহন-ক্রিয়া হলো অক্সিজেনের সঙ্গে দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক মিলন ; আর তার ফলেই হয় তাপ শক্তির উদ্ভব। বস্তুতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপের উদ্ভব ও বিলোপ দু'ই হতে

পারে। যাহোক, রাসায়নিক শক্তি ও তাপ শক্তির পারস্পরিক বিবিধ সম্বন্ধের তথ্যাদি রসায়ন-বিজ্ঞানের 'থার্মো-কেমিষ্ট্রি' বা তাপ-রসায়ন শাখায় আলোচিত হয়ে থাকে। আবার বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ-শক্তির পরিবর্তে প্রধানতঃ তড়িৎ-শক্তির উদ্ভব হয়, রাসায়নিক শক্তি রূপান্তরিত হয় তড়িৎ-শক্তিতে। রসায়ন-বিজ্ঞানের 'ইলেক্‌ট্রো-কেমিষ্ট্রি' বা তড়িৎ-রসায়ন শাখায় এই দুই শক্তির সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচিত হয়। আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানে তড়িৎ-রসায়ন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে; যেহেতু বর্তমান যুগ-সভ্যতায় তড়িৎ-শক্তির বহুমুখী ব্যবহার ও কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ। তড়িৎ-শক্তিকে আধুনিক যুগ-সভ্যতার প্রতীক বলা যায়।

তড়িৎ-রসায়ন, অর্থাৎ রসায়ন-সংশ্লিষ্ট তড়িৎ-বিজ্ঞানকে রসায়নেরই একটি বিশেষ শাখা বলা যায়; বস্তুতঃ এটা রসায়ন-বিদ্যা ও পদার্থ-বিদ্যার সমন্বয়। 1791 খৃষ্টাব্দে যে দিন ইটালীয় দেহতত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানী গ্যালভ্যানি মরা ব্যাঙের মাংসপেশীতে ঘটনাক্রমে সংকোচন ও স্পন্দন লক্ষ্য করেছিলেন সেদিন থেকেই তড়িৎ-রসায়নের সূত্রপাত ঘটেছে, বলা যায়। হঠাৎ একদিন গ্যালভ্যানি লক্ষ্য করেন, সদ্য ব্যবচ্ছেদিত একটা মরা ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীর বিভিন্ন দু'টি স্থান দু'টি বিভিন্ন ধাতব তার দিয়ে যুক্ত করলে সেই মরা ব্যাঙের পেশীতে সজীবের মত স্পন্দন ও সংকোচন ঘটে। বস্তুতঃ এটা দু'টি বিভিন্ন ধাতব তারের সংযোগের ফলে জীবদেহের মাংসপেশীর জৈব রসে সৃষ্ট রাসায়নিক শক্তির রূপান্তরে উদ্ভূত তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়া; আর এই-ই হলো মানুষের হাতে তড়িতের প্রথম প্রকাশ। এই সামান্য ঘটনায় মানুষ যার সন্ধান পেল সেই তড়িৎ-শক্তি কালে মানব-সভ্যতায় যুগান্তর এনেছে; যার সাহায্যে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, ট্রাম, ট্রেন, আলো, পাখা প্রভৃতি মানুষের কল্যাণকর অজস্র যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে।
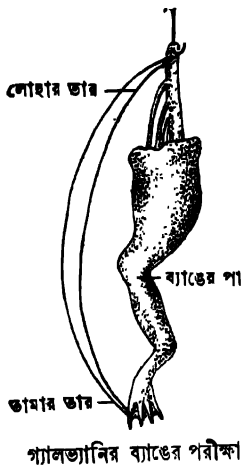
গ্যালভ্যানির ব্যাঙের পরীক্ষা

গ্যালভ্যানির উল্লিখিত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে তড়িৎ-রসায়নের সূত্রপাত হয়েছে; আর তাঁরই স্বদেশবাসী অধ্যাপক ভোল্‌টা বিজ্ঞানের এই নূতন তথ্যের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। প্রকৃতপক্ষে ভোল্‌টার হাতেই তড়িৎ-রসায়ন-

বিষ্থার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। গ্যালভ্যানির পরীক্ষায় ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীর সংকোচনের সঠিক কারণ নির্ধারণ করেন ভোল্‌টা। তিনি দেখান, দু'টি বিভিন্ন ধাতুর তার বা পাত কোন তড়িৎ-পরিবাহী তরল পদার্থের দু' জায়গায় কতকটা ডুবিয়ে কোন ধাতব তার দিয়ে তাদের মুক্ত প্রান্তদ্বয় পরস্পর জুড়ে দিলে ঐ ধাতব বেষ্টনী-পথে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়। জীবদেহের মাংসপেশীর ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটে; মাংসপেশীর জৈব রসের মাধ্যমে অনুরূপভাবে দুটি বিভিন্ন ধাতব তারে উদ্ভূত তড়িৎস্রোতের প্রভাবে পেশীর স্পন্দন ও সংকোচন লক্ষিত হয়। এই তথ্যের উপরে ভিত্তি করে ভোল্‌টা উল্লিখিত ব্যবস্থায় একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন, যাতে সেই তরল পদার্থে নিহিত রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ধাতব বর্তনীর পথে তড়িৎ-প্রবাহ বইতে থাকে। একটি কাচপাত্রে মৃদু (জল-মিশ্রিত) সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে তামা ও দস্তার তৈরী দু'খানা পাতের দুই প্রান্ত কিছুটা ডুবিয়ে অপর দুই প্রান্ত তড়িত-পরিবাহী ধাতব তার দিয়ে যুক্ত করে ভোল্‌টা ঐ তারে একটা মৃদু তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করেন। এই হলো মানুষের তৈরী প্রথম তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র, বা সেল; যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভোল্‌টেইক সেল'। এরূপ কতকগুলি সেলের একটার তামার পাত পরবর্তীটার দস্তার পাতের সঙ্গে কোন ধাতব তার দিয়ে (সিরিজে) জুড়ে দিয়ে ভোল্‌টা অধিকতর শক্তিশালী তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বা 'ব্যাটারি' তৈরি করেন, যা থেকে উদ্ভূত তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নানা রকম রাসায়নিক ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। উল্লিখিত 'ভোল্‌টেইক সেল' ও ব্যাটারী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জগতের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ তাত্ত্বিক ঔৎসুক্য ও আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এর ফলে ক্রমে বিভিন্ন বিজ্ঞানী মোটামুটি অনুরূপ কিন্তু অধিকতর কার্যকরী নানা রকম তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র তৈরি করেন এবং বহুবিধ পদার্থের উপরে এ-সব সেল থেকে উদ্ভূত তড়িৎ-

ভোল্‌টেইক তড়িৎকোষ বা সেল (সিরিজ)
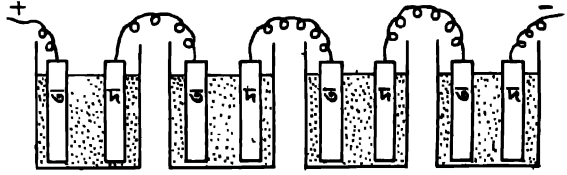
প্রবাহের ক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ-সব তথ্যানুসন্ধানের পরীক্ষাকালে 1807 খৃষ্টাব্দে স্যার হামফ্রি ডেভির তত্ত্বাবধানে এই নবাবিষ্কৃত তড়িৎ-কোষের সাহায্যে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নামক ক্ষার-ধাতু দু'টি সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ ধাতবাকারে পাওয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কষ্টিক সোডা (NaOH) এবং কষ্টিক পটাস (KOH) অবশ্য আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল। ডেভির উদ্যোগে গলিত কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাসের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে বিশুদ্ধ ধাতব সোডিয়াম (Na) ও পটাসিয়াম(K) পৃথক-ভাগে পাওয়া গেল।
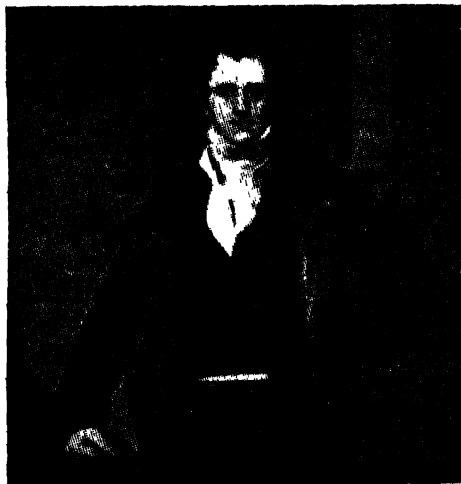
বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি ডেভি

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতুর সঙ্গে অধিকাংশ লোকেরই পরিচয় থাকার কথা নয়। ধাতু দু'টার বর্ণ রূপালী সাদা, আর বেশ চক্‌চকে; এদের বাহ্যিক গঠন অনেকটা জলশূন্য মাখনের মত নরম, আর তাই সহজেই এ-ধাতু দু'টাকে ছুরি দিয়ে কাটা যায়। দেখতে সাদা হলেও বায়ুর সামান্য সংস্পর্শেই এদের উপরিভাগে একটা অনুজ্জ্বল ঘোলাটে স্তর পড়ে; এর কারণ, বায়ুর জলীয় বাষ্পের সঙ্গে এদের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সঙ্গে সঙ্গেই কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাসের স্তর সৃষ্টি হয়। জলের সংস্পর্শে আনলে ধাতু দু'টা অতি দ্রুত ও তীব্র বিক্রিয়ায় জলকে বিশ্লিষ্ট করে তা থেকে কিছুটা হাইড্রোজেন মুক্ত করে দেয়, আর বাকী হাইড্রক্সিল (OH) অংশ টেনে নিয়ে কষ্টিক সোডা (NaOH) ও কষ্টিক পটাস (KOH) গঠন করে। বস্তুতঃ জলের সঙ্গে ধাতু দু'টার এরূপ বিক্রিয়া এত তীব্রভাবে ঘটে যে, বিমুক্ত হাইড্রোজেন গ্যাসে অনেক সময় আগুন ধরে যায়। এই দহনের শিখা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে হয় হল্‌দে, আর পটাসিয়ামের

ক্ষেত্রে হয় বেগুনি বর্ণের। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে ধাতু দু'টা কোন কাজে লাগে না সত্য, কিন্তু নানা রকম রাসায়নিক শিল্পে এদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, 'ধাতু ও ধাতু-সংকর' শীর্ষক অধ্যায়ে স্বর্ণ নিষ্কাশনের পদ্ধতি প্রসঙ্গে আমরা যে সোডিয়াম সায়েনাইডের (NaCN) কথা বলেছি তা শিল্পগতভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম ও কার্বনের (কয়লা) উত্তপ্ত মিশ্রণের ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করে :

$$2Na + 2C + 2NH_3 = 2NaCN + 3H_2$$
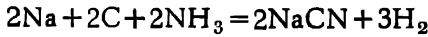
এই পদ্ধতিতে উপজাত হাইড্রোজেন নিয়ে আবার অ্যামোনিয়া (NH_3) সংশ্লেষণ ('কৃষি-রসায়ন ও রাসায়নিক সার' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) ও অন্যান্য নানারকম রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যাহোক, এভাবে রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে, আবার তড়িৎ-শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই তড়িৎ-প্রভাবে বিভিন্ন রসায়ন-শিল্প প্রসারের জয়যাত্রা স্থরু হয়। মানব-কল্যাণে শক্তির রূপান্তরের এই ইতিহাস অতি চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দিকে ভোল্‌টেইক সেল থেকে উৎপাদিত তড়িৎ-প্রবাহের বিভিন্ন কার্যকরী প্রয়োগ ও ব্যবহারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু অনেকদিন তা কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবেই রয়ে যায়, তার শিল্প-প্রয়োগ সম্ভব ও স্থবিধাজনক হয় না। এর কারণ, ভোল্‌টেইক সেল থেকে যথোপযুক্ত পরিমাণে তড়িৎ-শক্তি পেতে গেলে তা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে যতদিন 'ডায়নামো' যন্ত্র উদ্ভাবিত না হয়েছে ততদিন শিল্প-সংগঠনে তড়িতের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় নি।
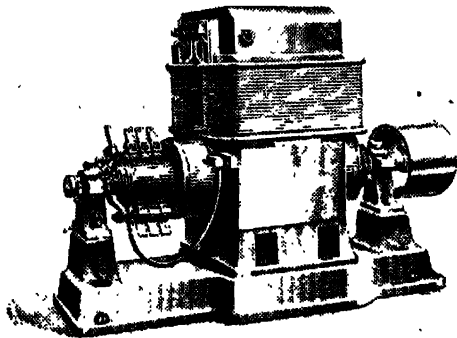
তড়িৎ উৎপাদনে আধুনিক 'ডায়নামো' যন্ত্র

আমরা জানি, দীর্ঘদিনের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে বৃটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে 1831 খৃষ্টাব্দে প্রথম তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র 'ডায়নামো' উদ্ভাবন করেন। এর সাহায্যে সহজে ও স্বল্পমূল্যে প্রচুর তড়িৎ-শক্তির সরবরাহ সম্ভব হয়; তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জল-প্রপাতের গতি-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করবার কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে; ক্রমে তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এভাবে সস্তায় প্রচুর তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের নানা কৌশল মানুষ আয়ত্ব করেছে; আর তাই স্যার হামফ্রি ডেভি যেখানে বহু ব্যয় ও পরিশ্রমে ভোল্টেইক সেলের তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে কষ্টিক সোডা থেকে অতি সামান্য পরিমাণ ধাতব সোডিয়াম পৃথকীকরণে সক্ষম হয়েছিলেন, সেখানে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন তড়িৎ-রাসায়নিক কারখানায় শত-সহস্র টন সোডিয়াম ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ অনায়াসে উৎপাদিত হচ্ছে। মানব-কল্যাণে আজ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থের তড়িৎ-রাসায়নিক শিল্প সংগঠনগুলি এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং

কোন নিকৃষ্ট ধাতুর উপরে অধিকতর মূল্যবান ও সুষ্ঠু ব্যবহারোপযোগী কোন উৎকৃষ্ট ধাতুর পাত্‌লা আস্তরণ ধরাতে তড়িতের শিল্পগত প্রয়োগ বহুদিন থেকেই প্রচলিত রয়েছে। বস্তুতঃ এটা শিল্পে তড়িৎ-শক্তির প্রাথমিক ব্যবহার গুলির অন্যতম; পদ্ধতিটা উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। এই পদ্ধতিটা ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং বা 'বৈদ্যুতিক ধাতু-লেপ' পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে আগে লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর তৈরী জিনিসের উপরে কেবলমাত্র রূপা বা সোনার প্রলেপ ধরানো হতো, আজকাল নিকেল ও ক্রোমিয়াম ধাতুর প্লেটিংও করা হয়। এ ধাতু দু'টি দেখতেও যেমন বেশ সাদা, তেমনই বায়ুমণ্ডলীয় বিভিন্ন গ্যাসের রাসায়নিক প্রভাবে সোনা-রূপার মত এদের উপরেও মরিচা ধরে না, সহজে তাদের বর্ণোজ্জ্বলতাও নষ্ট হয় না।

সাধারণ পদ্ধতির দিক দিয়ে ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এর কৌশলটা বেশ সহজ; বিশেষ কোন জটিলতা এর মধ্যে নেই। যে ধাতুর প্রলেপ ধরাতে হবে তার কোন লবণের জলীয় দ্রবণের মধ্যে কিছুটা ব্যবধানে তড়িৎ-বর্তনীর ঋণ-তড়িৎ (ক্যাথোড) ও ধন-তড়িৎ (অ্যানোড) প্রান্তদ্বয় নিমজ্জিত রাখা হয়। যে

জিনিসের উপরে প্রলেপ ধরাতে হবে তাকে চক্‌চকে পরিষ্কার করে দ্রবণের মধ্যে ঐ ক্যাথোড, বা ঋণ-তড়িৎ প্রান্তে ঝুলিয়ে দিতে হয়। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে দ্রবিত লবণের ধাতু-কণিকাসমূহ বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়ে অ্যানোড থেকে ক্যাথোড-সংলগ্ন ধাতব জিনিসের গায়ে লেগে তার উপর আস্তরণ ধরায়। পদ্ধতিটা সহজ হলেও এর মূল তথ্যটা কি, দ্রবণের তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে তড়িৎ কিভাবে প্রবাহিত হয়ে ধাতু-কণিকা বিশ্লিষ্ট করে, আর সেগুলি ক্যাথোডে চলে যায়, এ-সব জানতে হলে ব্যাপারটার কিছু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

একটা বৈদ্যুতিক বাতির তড়িৎ-বর্তনীর তারের এক জায়গা বিচ্ছিন্ন করে তার প্রান্তদ্বয় যদি কোন পাত্রের বিশুদ্ধ পাতিত জলে নিমজ্জিত করে পরস্পর কিছু ব্যবধানে রাখা যায়, আর বর্তনী-পথে তড়িৎ প্রবাহ চালানোর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ঐ বিশুদ্ধ জলের ব্যবধানে ছিন্ন বর্তনীপথে তড়িৎ প্রবাহিত হবে না, বাতিটাও জ্বলবে না; বিশুদ্ধ জল যেহেতু তড়িৎ প্রবাহের **অন্তরক**। ঐ জলে চিনি, অ্যালকোহল, বা গ্লিসারিন কিছু মেশালেও বাতিটা জ্বলবে না; কারণ এ-সব পদার্থের জলীয় দ্রবণও তড়িৎ-অপরিবাহী। কিন্তু ঐ জলে সামান্য কিছু খাদ্য-লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড), কাপড় কাঁচা সোডা (সোডিয়াম কার্বনেট) বা দু'-এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক বা অন্য কোন অ্যাসিড মেশালে বাতিটা সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। এর কারণ, এসব পদার্থের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-প্রবাহে অন্তরক নয়, কাজেই দ্রবণটা তড়িৎ-পরিবাহী হয়ে বিচ্ছিন্ন বর্তনী-পথেও তড়িৎ প্রবাহিত হয়ে বাতিটা জ্বালায়। জলে দ্রবণীয় বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে এভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তড়িৎ-পরিবহন ক্ষমতার বিচারে পদার্থ দু' রকম, এক শ্রেণীর পদার্থের জলীয় দ্রবণ হয় তড়িৎ-পরিবাহী, আর অপর শ্রেণীর পদার্থের দ্রবণ তড়িৎ-প্রবাহে বাধা দেয়, অর্থাৎ অপরিবাহী। এরূপ তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থগুলিকে বলে **ইলেক্‌ট্রোলাইট**; আর অপরিবাহী পদার্থগুলিকে বলা হয় **নন-ইলেক্‌ট্রোলাইট**। চিনি, গ্লিসারিন প্রভৃতি

বিশেষ বিশেষ পদার্থের দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ পরীক্ষা

নন্-ইলেক্‌ট্রোলাইট, আর উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি ইলেক্‌ট্রোলাইট। অ্যাসিডগুলি সবই ইলেক্‌ট্রোলাইট শ্রেণীর; অ্যাসিড হলো এমন রাসায়নিক পদার্থ, যার স্বাদ অম্ল, আর যার সংস্পর্শে 'লিট্‌মাস' নামক উদ্ভিজ পদার্থের নীল জলীয় দ্রবণ লাল হয়ে ওঠে। আবার বিভিন্ন অ্যাল্‌কালি বা ক্ষার পদার্থগুলি (যাদের সংস্পর্শে লাল লিট্‌মাস-দ্রবণ নীল বর্ণ ধারণ করে) এবং অ্যাসিড ও ধাতব ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে-সব লবণ উৎপন্ন হয় তারাও সব ইলেক্‌ট্রোলাইট শ্রেণীর। মোট কথা, সব রকম অ্যাসিড, ক্ষার ও বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক লবণ সবই ইলেক্‌ট্রোলাইট; অর্থাৎ এদের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-স্রোত সহজেই প্রবাহিত হয়।

কোন ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে যখন তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয় তখন একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়, এরূপ তরল পদার্থের তড়িৎ-পরিবাহিতার ধরন ধাতব তারের মাধ্যমে সাধারণ তড়িৎ-প্রবাহের ধরন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ধাতব তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সময় দৃশ্যতঃ ধাতুর মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, কিন্তু কোন ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের কালে দ্রবিত ইলেক্‌ট্রোলাইট যে ভেঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতেই তা নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইলেক্‌ট্রোলাইটের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের সময়ে পদার্থের এরূপ বিভাজন বা বিশ্লিষ্টি-করণ প্রক্রিয়াকে বলে **ইলেক্‌ট্রোলিসিস**, যাকে বাংলায় বলা হয় 'তড়িৎ-বিশ্লেষণ'। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যাটারির দুই তড়িদ্দ্বারে সংলগ্ন দু'গাছা তারের দুই প্রান্তে প্লাটিনামের দুটি পরিষ্কার চক্‌চকে চাক্‌তি বা পাত জুড়ে দিয়ে কপার-সালফেট বা তুঁতের জলীয় দ্রবণের মধ্যে কিছু ব্যবধানে ডুবিয়ে ধরলে দেখা যাবে, ওদের
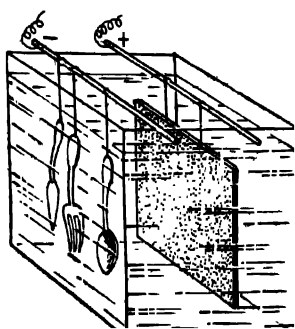
ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এর সাধারণ ব্যবস্থা

একটি চাক্‌তির গায়ে (ক্যাথোড বা ঋণ-তড়িৎ প্রান্তে) উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধ তামার সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ লেগে গিয়ে প্লাটিনামের উপরে তামার প্রলেপ ধরেছে, অপর প্রান্তের চাক্‌তিটা যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। এই তামা এল কোথা

থেকে ? এর দ্রবিত কপার-সালফেটের অণুগুলি তড়িৎ-প্রভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে মুক্ত ধাতব তাম্র-কণিকার আকারে। কোন ধাতব জিনিসের উপরে তামার প্রলেপ ধরাতে, অর্থাৎ **কপার-প্লেটিং** পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়াই অবলম্বিত হয়ে থাকে। 'ইলেক্‌ট্রোলিসিস' প্রক্রিয়ায় ইলেক্‌ট্রোলাইটটা সোডিয়াম ক্লোরাইড, অর্থাৎ খাদ্য-লবণ হলে তড়িৎ-বর্তনীর ক্যাথোড-প্রান্তে বুদ্‌বুদের আকারে হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হতে দেখা যায়, আর দ্রবণটা সেখানে হয়ে যায় ক্ষারীয়, লাল লিট্‌মাস নীল হয়ে তা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে তড়িৎ-বর্তনীর অপর প্রান্তে, অর্থাৎ অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস উদ্ভূত হয়ে জলে দ্রবিত হয়ে থাকে ; আর সেখানকার দ্রবণ বিরঞ্জক-ধর্মী (bleaching) হয়ে পড়ে। যে কোন বর্ণের লিট্‌মাস-দ্রবণ সেখানে দিলে তা অপরিবর্তিত থেকে সে-কথা প্রমাণ করে। যাহোক, যখনই কোন **ইলেক্‌ট্রোলাইটের** দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয় তখনই সেই জলীয় দ্রবণের মধ্যে দ্রবিত পদার্থের সংগঠক উপাদানগুলির অতি সূক্ষ্ম তড়িতাহিত (আয়ন) কণিকার একটা ধারা-প্রবাহ বা গতি সৃষ্টি হয় ; যেমন, তড়িতাবিষ্ট তাম্র-কণিকা, বা হাইড্রোজেন-অণু, বা ক্লোরিন-অণু। এরূপ তড়িতাহিত সূক্ষ্ম কণিকাগুলির মধ্যে (পদার্থ বিশেষে) কতকগুলির গতি হয় ঋণ-তড়িৎপ্রান্ত বা ক্যাথোডের দিকে, আর কতকগুলির ধারা বয় ধন-তড়িৎপ্রান্ত বা অ্যানোডের দিকে। প্রকৃতপক্ষে এই তড়িতাহিত কণিকাগুলির ধারা-প্রবাহের মাধ্যমেই দ্রবণের ভিতরে দুই তড়িদ্দ্বারের মধ্যবর্তী ব্যবধানে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়।

আয়ন-তত্ত্বের 'অ-আ-ক-খ'

তড়িৎ-প্রবাহের ফলে ইলেক্‌ট্রোলাইট-দ্রবণের ভিতরে তার সংগঠক উপাদানগুলির তড়িতাহিত বিভিন্ন কণিকার বিপরীতমুখী গতি সম্পর্কীয় উল্লিখিত সিদ্ধান্তে পৌছান বিজ্ঞানী **মাইকেল ফ্যারাডে** উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি এই গতিশীল তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলিকে 'আয়ন' নামে অভিহিত করেন; আর তাঁর এই মতবাদই তখন বিজ্ঞানীমহলে এই যুক্তিতে স্বীকৃতি লাভ করে যে, ইলেক্‌ট্রোলাইটের দ্রবণের ভিতর দিয়ে তারই গতিশীল আয়ন-কণিকাগুলি তড়িৎশক্তি বয়ে নিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। 'আয়ন' একটি গ্রীক শব্দ, মানে 'ভ্রমণকারী'; কথাটা বেশ সুপ্রযুক্ত হয়েছে, আজও তাই চলছে।

ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণের ভিতরে তার তড়িতাহিত কণিকা-

গুলির মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের মূলগত তাৎপর্য সম্পর্কে বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের অন্ত ছিল না। ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হলো, তড়িৎ-প্রবাহের ফলে দ্রবিত ইলেক্‌ট্রোলাইটের অণু-গুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে ধন-তড়িতাহিত ও ঋণ-তড়িতাহিত দু'রকম গতিশীল কণিকায় পৃথক হয়ে যায়; আর এই কণিকাদেরই নাম দেওয়া হয় 'আয়ন'। তাঁদের মতে ইলেক্‌ট্রোলাইটের এরূপ তড়িতাবিষ্ট আয়ন-কণিকা-গুলিই দ্রবণের ভিতরে বিপরীতমুখী গতি লাভ করে দুই তড়িৎ-প্রান্তের দিকে ছুটে যায়: ঋণতড়িৎ-বিশিষ্ট আয়ন-কণিকাগুলি বর্তনীর ধনতড়িৎ-প্রান্তে, আর ধন-তড়িৎ বিশিষ্ট আয়নগুলি ঋণতড়িৎ-প্রান্তের অভিমুখে ধাবিত হয়। পরবর্তীকালে এই মতবাদকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন সুইডেনের পদার্থ-বিজ্ঞানী সাণ্টে আর্হেনিয়াস (Svante Arrhenius)। 1886 খৃষ্টাব্দে তিনি এ-বিষয়ে এক যুগান্তকারী মত প্রকাশ করেন। তিনি দেখান যে, জলে দ্রবিত ইলেক্‌ট্রোলাইটের অণুগুলি কেবল তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবেই আয়ন-কণিকায় বিশ্লিষ্ট হয় না; প্রকৃতপক্ষে জলে দ্রবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্‌ট্রোলাইটের কতকগুলি অণু স্বভাবতঃই ভেঙ্গে আয়ন-কণিকায় বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, এটা জলীয় দ্রবণের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আবার জল মিশিয়ে দ্রবণটাকে ক্রমে যত মৃদু করা যায় ততই বেশী সংখ্যক অণুর আয়ন-কণিকায় বিভাজিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতাটা ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে। তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাবে দ্রবণের তরল মাধ্যমে এই বিভাজিত কণিকাগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে মাত্র। যাহোক, এর দৃষ্টান্তস্বরূপ
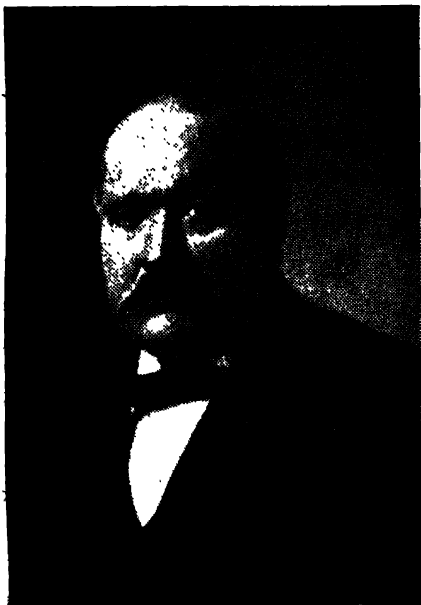
সুইডিশ বিজ্ঞানী সাণ্টে আর্হেনিয়াস

বলা যায়, সাধারণ খাদ্য-লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড জলে দ্রবিত করলেই তার অণুগুলি ($NaCl$) ভেঙ্গে ধন-তড়িতাবিষ্ট সোডিয়াম-আয়নে (Na^+) এবং ঋণ-তড়িতাবিষ্ট ক্লোরাইড বা ক্লোরিন আয়নে (Cl^-) বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এরূপ মনে করা যেতে পারে যে, এই আয়ন-কণিকাগুলি যেন দ্রাবক জলের ভিতরে আপন স্বত্বা বজায় রেখেই মুক্তাবস্থায় বিচরণ করে, তাদের নিজ নিজ রাসায়নিক ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকে। এই মতবাদটি 'থিয়োরি অব **ইলেক্‌ট্রোলিটিক ডিসোসিয়েশন**' অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রোলাইট-শ্রেণীর যৌগের স্বতঃ বিভাজন-ক্রিয়া বলে পরিচিত। রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপের অনেক ক্ষেত্রেই এই মতবাদ বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানীমহলে মতবাদটা তাই দ্রুত সমাদৃত হয়ে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আয়ন-কণিকার চলাচল এভাবে লক্ষ্য করা যায়

মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠনের ইলেক্‌ট্রন-তত্ত্ব ও বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত যৌগ বা লবণের ইলেক্‌ট্রন বিনিময়-জনিত বৈদ্যুতিক সমতা সম্পর্কিত তত্ত্বের ভিত্তিতে অবশ্য আর্হেনিয়াসের উল্লিখিত মতবাদ (রাসায়নিক লবণগুলির জলীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে) তেমন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এতদ্বিষয়ক তথ্যাদি সম্পর্কে এই পুস্তকের 'তেজস্ক্রিয়তা ও পারমাণবিক গঠন' শীর্ষক অধ্যায়ে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। যাহোক, মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গঠন-সম্পর্কিত আধুনিক ইলেক্‌ট্রন-তত্ত্বানুসারে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংগঠনে সোডিয়াম-পরমাণু একটি ইলেক্‌ট্রন (ঋণ-তড়িৎকণা) হারিয়ে ধন-তড়িৎসম্পন্ন হয়, আর সোডিয়ামের সেই বিচ্যুত ইলেক্‌ট্রনটি নিয়ে ক্লোরিন-পরমাণু ঋণ-তড়িৎসম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ধন-তড়িতাহিত সোডিয়াম পরমাণু ও ঋণ-তড়িতাহিত ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের বিপরীত ধর্মী বৈদ্যুতিক আকর্ষণে মিলিত হয়ে নিস্তড়িৎ সোডিয়াম-ক্লোরাইড অণুর উৎপত্তি ঘটায়। কাজেই দেখা যায়, সোডিয়াম-ক্লোরাইডের অণুর মধ্যে তড়িতাহিত কণিকা বা আয়নের আকারে সোডিয়াম ও ক্লোরিনের পরমাণু

স্বভাবতঃই রয়েছে। অতএব, আর্হেনিয়াসের মতবাদ অনুসারে জলীয় দ্রবণেই কোন লবণ বা ইলেক্‌ট্রোলাইটের আয়ন সৃষ্টি হয় না; যৌগের অণুর সংগঠক পরমাণুগুলি বস্তুতঃ আয়নের আকারেই পরস্পর যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। দ্রবণে কেবল তার পরমাণুগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ হ্রাস পায়, আর তার ফলে দ্রবণের জলে তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ ঘটে মাত্র। কোন লবণের অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনে তার সংগঠক পরমাণুগুলি যে আয়নায়িত অবস্থায় পারস্পরিক আকর্ষণে যুক্ত থাকে, তার পরিচয় কেবল তাদের জলীয় দ্রবণেই পাওয়া যায় না; উপযুক্ত তাপ প্রয়োগে লবণের গলিত অবস্থায়ও তার সংগঠক আয়নায়িত পরমাণু বা পরমাণু-সমষ্টির অবাধ গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর দেখা যায়, গলিত বা তরলায়িত সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম হাইড্র-ক্সাইডের মাধ্যমেও তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হয় এবং দুই তড়িৎপ্রান্তে দু'রকম পদার্থ-কণিকা ছুটে গিয়ে জমে। যৌগের অণুর সংগঠক পরমাণুরা আয়ন-অবস্থায় থাকে বলেই এটা সম্ভব হয়। আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলেছি, 1807 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি তাই তরলায়িত কষ্টিক সোডা ও কস্টিক পটাসের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু পৃথক করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হয়েছে; কিন্তু কেবল সোডিয়াম ক্লোরাইডই নয়, অন্য সব রাসায়নিক লবণেও তাদের অণুগুলির সংগঠক পরমাণুরা অনুরূপ ভাবেই আয়নায়িত অবস্থায় থাকে। তাদের জলীয় দ্রবণে কেবল সেই তড়িতাহিত পরমাণু বা আয়ন-কণিকাগুলির গতিশীলতা সহজসাধ্য ও সম্ভবপর হয় মাত্র। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের মত সব রকম ধাতব হাইড্রক্সাইডের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত আয়ন-তত্ত্বের যুক্তি সমভাবে প্রয়োজ্য। এগুলির মধ্যে ধন-তড়িতাহিত ধাতব আয়ন ও ঋণ-তড়িতাহিত হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়ন পরস্পর যুক্ত থাকে; আর এদের জলীয় দ্রবণে তাই এই দু'রকম আয়ন বিপরীতমুখী গতিশীল হয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সহায়ক হয়। বস্তুতঃ জলীয় দ্রবণে দ্রবিত যৌগের সংগঠনে এরূপ আয়ন-কণিকার অস্তিত্বের ফলেই ধাতব হাইড্রক্সাইডগুলির ক্ষার-ধর্মিতা প্রকাশ পায়।

অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আর্হেনিয়াসের মতবাদ পুরাপুরি সমর্থিত হয়; যেমন, তরল হলেও নির্জল বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহিত হয় না; বিশুদ্ধ অ্যাসিড সর্বক্ষেত্রেই তড়িৎ-অপরিবাহী। জলমিশ্রিত

অ্যাসিড বা অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণেই কেবল তার আয়ন-কণিকার বিমুক্তি ঘটে ; তাই জলমিশ্রিত মৃদু অ্যাসিড তড়িৎ-পরিবাহী হয়ে ওঠে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে হয়তো বা এরূপ একটা বিক্রিয়া ঘটে : $HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$; H_3O^+ আয়নটিকে জলসংযুক্ত হাইড্রোজেন-আয়ন $H_2O.H^+$ মনে করা যায়। বস্তুতঃ জলীয় দ্রবণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) ভেঙ্গে H^+ আয়ন ও Cl^- আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। জলীয় দ্রবণে অন্যান্য সব অ্যাসিডও অনুরূপভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে সর্বদাই H^+ আয়নের উদ্ভব ঘটায় ; আর এই হাইড্রোজেন-আয়নের অস্তিত্বই বস্তুতঃ সব রকম অ্যাসিডের তথাকথিত অ্যাসিড-ধর্মিতার কারণ বলে মনে করা যায়।

উল্লিখিত বিবিধ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, বিভিন্ন অ্যাসিড, ক্ষার (অ্যাল্‌কালি) ও বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক লবণের জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ কেন ও কিভাবে চলাচল করে ; আর দ্রবিত পদার্থের এই তড়িতাহিত আয়ন-কণিকাগুলিই প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ-প্রবাহের কার্যকরী অগ্রদূত। মোট কথা, বিভিন্ন ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণে থাকে ধন-তড়িতাবিষ্ট আয়ন, যাদের বলা হয় **ক্যাটায়ন** (যেমন, হাইড্রোজেন-আয়ন H^+, বা কোন ধাতুর আয়ন) ; আর থাকে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট আয়ন বা **অ্যানায়ন** (যেমন, হাইড্রক্সিল আয়ন OH^-, বা অ্যাসিড-আয়ন Cl^-, NO_3^- ইত্যাদি)। ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণে এরূপ বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলি মুক্তাবস্থায় বিচরণ করে। কাজেই যখন এরূপ দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ-বর্তনীর দুই বিচ্ছিন্ন প্রান্ত (তড়িদ্দ্বার বা ইলেক্‌ট্রোড) কিছু ব্যবধানে ডুবিয়ে ব্যাটারি থেকে তড়িৎ-প্রবাহ চালানো হয়, তখন ঐ তড়িৎ-বর্তনীর ধনাত্মক **অ্যানোড** প্রান্ত দ্রবণের অভ্যন্তরস্থ মুক্ত ঋণাত্মক 'অ্যানায়ন'গুলিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ; আর ঋণাত্মক **ক্যাথোড** প্রান্ত আকর্ষণ করে বিপরীত-ধর্মী ধনাত্মক 'ক্যাটায়ন' কণিকাগুলিকে ; কারণ আমরা জানি, তড়িৎ অথবা চুম্বকের
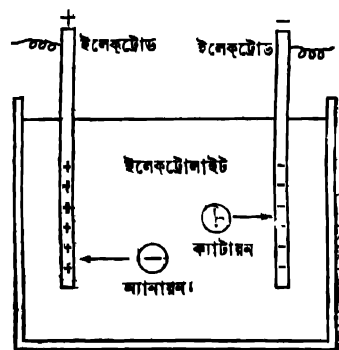
ইলেক্‌ট্রোলাইটের মধ্যে বিপরীত-ধর্মী আয়নের চলাচল পরীক্ষা

বিপরীত-ধর্মী প্রান্ত পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর সমধর্মী দুই প্রান্তের মধ্যে হয় বিকর্ষণ। যাহোক, ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নগুলি তাই দ্রবণের ভিতরে পরস্পরের বিপরীত দিকে চলে, আর তাদের তড়িৎ-শক্তির নিজস্ব পুঁজিটুকু তাদের পরস্পরের বিপরীত-ধর্মী তড়িৎ-প্রান্তে নিয়ে পৌঁছে দেয়। ইলেক্‌ট্রোলাইটের উক্ত দু'রকম আয়ন দ্রবণের ভিতর দিয়ে এভাবে তাদের তড়িৎ-বিভব দুই তড়িদ্দ্বারে বয়ে নিয়ে যায়; আর অসংখ্য আয়নের অসংখ্য তড়িৎ-কণার এরূপ ধারা-প্রবাহের ফলেই দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ অব্যাহত থাকে। এভাবে আয়ন-কণিকারা দ্রবণের তড়িৎ-পরিবাহিতার কারণ ঘটায়। তড়িৎ-বিশ্লেষণ ও আয়ন-তত্ত্বের এই হলো সংক্ষিপ্ত মূল তথ্য ও মোটামুটি ব্যাখ্যা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। কোন ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে আয়ন-কণিকার চলাচল ও তার ফলে তড়িৎ-শক্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পর্কিত এই যে-সব ব্যাখ্যা ও যুক্তি দেওয়া হলো তা কেবল নিছক কল্পনা বা যুক্তিসর্বস্ব কাহিনী নয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় এই তথ্যের সত্যতা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত তো হয়েছেই; এমন কি, প্রত্যক্ষভাবে দ্রবণের মাধ্যমে আয়ন-চলাচলের চাক্ষুষ প্রমাণও কোন কোন পরীক্ষায় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সে-সব পরীক্ষার বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।

এ-কথা আগেই বলা হয়েছে যে, কেবল জলে দ্রবিত অবস্থায়ই রাসায়নিক লবণগুলি আয়নায়িত হয়ে তড়িৎ-পরিবাহী হয় না; তাপের সাহায্যে গলিত বা তরলায়িত লবণও বিভিন্ন আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়ে তড়িৎ পরিবহনে সমভাবে সক্ষম। তরলায়িত লবণের এরূপ তড়িৎ-পরিবহন শক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তড়িৎ-রসায়নের বহুবিধ প্রক্রিয়ায় এর অশেষ কার্যকরী অবদান রয়েছে। দ্রবিত বা তরলায়িত লবণের আয়ন-তত্ত্ব থেকে যে কেবল ইলেক্‌ট্রোলিসিস বা তড়িৎ-বিশ্লেষণের ব্যাখ্যাই মেলে, তা-ই নয়; আরও একটা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; অথবা বলা যায়, তড়িৎ-শক্তি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অন্তর্নিহিত স্থিতিশক্তিকে (potential energy) কার্যকরী করে তোলে। পক্ষান্তরে আয়ন-তত্ত্বের সাহায্যে পদার্থের রাসায়নিক শক্তির তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তর-ক্রিয়ার মূলগত তথ্যেরও যুক্তি মেলে। বস্তুতঃ বিভিন্ন ভোল্‌টেইক সেলে যে তড়িৎ-শক্তি উৎপাদিত হয় তা পদার্থের অন্তর্নিহিত স্থিতি-শক্তি বা রাসায়নিক শক্তির তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরের ব্যাপার মাত্র।

বিভিন্ন সেল বা তড়িৎ-কোষ

পদার্থের রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে প্রথম তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বা সেল তৈরি করেছিলেন ইটালীয় বিজ্ঞানী ভোল্‌টা; তাঁর সেই ভোল্‌টেইক সেলের আলোচনা আমরা আগেই করেছি। পরবর্তীকালে নানা রকম উন্নত ধরনের সেল বা তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবিত হয়েছে; মূল ব্যবস্থা ঐ একই — পদার্থের রাসায়নিক শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে সব রকম সেলেরই সাংগঠনিক তথ্য ইলেকট্রোলাইটের আয়ন-তত্ত্বের উপরে নির্ভরশীল। বিভিন্ন সেলের মধ্যে **'লেক্‌লান্স সেল'**-ই সমধিক প্রচলিত ও যথেষ্ট কার্যকরী; বিশেষতঃ এই সেলের গঠন-পদ্ধতিও বেশ সরল। একটা পাত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (যার বিশেষ নাম 'স্যাল-অ্যামোনিয়াক') দ্রবণ ভরতি করে তার ভিতরে দস্তা বা জিঙ্কের একটা দণ্ড ও গ্রাফাইটের একখানা পাত নিমজ্জিত রাখা হয়। গ্রাফাইটের পাত্‌খানা অবশ্য চিনামাটির তৈরী সচ্ছিদ্র একটা খোলের ভিতরে দাঁড় করিয়ে তার চারদিকে গ্রাফাইটের টুক্‌রো ও ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের চূর্ণ দিয়ে এঁটে রাখা হয়। গ্রাফাইট মূলতঃ হলো এক শ্রেণীর খনিজ কার্বন বা কয়লা; যাকে **প্লাম্বাগো**-ও বলা হয়। ঐ সচ্ছিদ্র খোলটার ভিতরেও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ ভরতি থাকে। এখন ওই দস্তা বা জিঙ্কের দণ্ড ও গ্রাফাইটের পাত্‌খানাকে কোন ধাতব তার (যেমন তামার তার) দিয়ে যুক্ত করলে সেই পরিবাহী ধাতব বর্তনীপথে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে; দস্তার দণ্ড ও গ্রাফাইটের পাত্‌ এই সেলের যথাক্রমে ঋণ-তড়িদ্দ্বার ও ধন-তড়িদ্দ্বার (নেগেটিভ ও পজিটিভ) ইলেক্‌ট্রোডের কাজ করে। ব্যাপারটা হয় এই যে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় দণ্ডটার দস্তা থেকে ইলেক্‌ট্রন বা ঋণতড়িৎ-কণিকা ক্রমাগত বিমুক্ত হতে থাকে; আর তার ফলে ধনাত্মক জিঙ্ক-আয়ন সৃষ্টি হয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে মিশে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জিঙ্ক-ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় এবং ধনাত্মক অ্যামোনিয়াম-আয়ন বিমুক্ত হয়। দস্তার পরমাণু থেকে বিচ্যুত ওই ইলেক্‌ট্রন কণাগুলি বর্তনীর ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহের
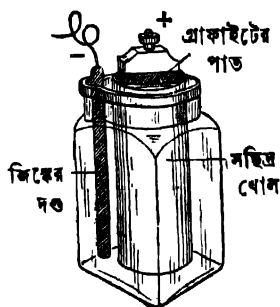
লেক্‌ল্যান্স সেলের গঠন-পদ্ধতি

আকারে বয়ে গিয়ে গ্রাফাইটের পাতে পৌঁছায়। এদিকে পাত্রের দ্রবণে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিঙ্কের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে ধনাত্মক অ্যামোনিয়াম আয়ন (NH_4^+) উৎপন্ন হয়, ওই ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রন কণিকারা তাদের প্রশমিত করে নিস্তড়িৎ অ্যামোনিয়াম (NH_4) জোটক (radical) সৃষ্টি করে। এই সংবদ্ধ পরমাণু-জোটকের (NH_4) একক অস্তিত্ব সম্ভব নয়, তাই এগুলি সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (সোডিয়াম ও জলের বিক্রিয়ার মত) অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে ও হাইড্রোজেন গ্যাস বিমুক্ত হয়। বিক্রিয়াটা ঘটে হয়তো এভাবে :

$$2\,NH_4 + 2H_2O = 2\,NH_4OH + H_2$$
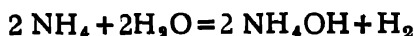
সেলের অভ্যন্তরস্থ সচ্ছিদ্র খোলের ভিতরকার ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সংযোগে জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড) হয়ে ঐ মুক্ত হাইড্রোজেন জলে পরিণত হয়; আর এভাবে সেলের **পোলারিজেসন** ত্রুটি বিদূরিত হয়। এই সেলের সচ্ছিদ্র খোলের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড 'ডিপোলারাইজার' হিসেবে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ এটা না থাকলে উল্লিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত হাইড্রোজেন গ্যাস বুদ্‌বুদের আকারে গ্রাফাইট-তড়িদ্দ্বারের গায়ে জমে গিয়ে তাকে অপরিবাহী করে তোলে; আর তার ফলে সেলের তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। যাহোক, এই লেক্‌লান্স সেলের তড়িৎ-প্রবাহক বল (electromotive force) সাধারণতঃ 1·5 **ভোল্ট** হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর সেলের সুবিধা এই যে, সেলের কার্যকারিতা নিঃশেষ হয়ে গেলে আবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের নূতন দ্রবণ ভরতি করে একে পুনরায় সক্রিয় করা যায়।

ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণ নিয়ে গঠিত এই শ্রেণীর বিভিন্ন সেলকে বলা হয় সিক্ত বা জল-যুক্ত (wet) সেল বা তড়িৎ-কোষ; আবার তরল পদার্থের পরিবর্তে নির্জল ইলেক্‌ট্রোলাইট দিয়ে আর এক রকম তড়িৎ-কোষ উদ্ভাবিত হয়েছে, যাকে বলে **ড্রাই সেল**। নানা কাজে এরূপ ড্রাই-সেলের ব্যবহার ইদানীং সমধিক প্রচলিত। লেক্‌লান্স সেলের গঠন-পদ্ধতির কিছু হের-ফের করে সাধারণ ড্রাই সেল বা শুষ্ক তড়িৎ-কোষ প্রস্তুত করা হয়। এই শ্রেণীর তড়িৎ-কোষে দস্তা বা জিঙ্কের দণ্ডের পরিবর্তে সেলের আধারটাই তৈরি করা হয় জিঙ্কের; আর সেটাই সেলের ঋণ-তড়িদ্দ্বারের কাজ করে। এই জিঙ্কের খোলটার ভিতরে কাগজের তৈরী আর একটা খোলে অ্যামোনিয়াম

ক্লোরাইড ও ডিপোলারাইজার হিসেবে ম্যাঙ্গানিজ-ডাইঅক্সাইডের একটা আঁঠালো মিশ্রণ পুরে তার মাঝখানে গ্রাফাইট বা কার্বনের একটা দণ্ড বসিয়ে দেওয়া হয়, যেটা হলো সেলের ধন-তড়িদ্দ্বার। সবশুদ্ধ কাগজের খোল-টাকে জিঙ্কের খোলটার মধ্যে এঁটে রাখা হয়; এর ফলে সেলের ঋণ-তড়িদ্দ্বার জিঙ্ক ও ধন-তড়িদ্দ্বার গ্রাফাইট দণ্ডের (মিশ্রণের মশল্লাসহ) মধ্যে কাগজের ব্যবধান সৃষ্টি হয়। ভিতরের কাগজের খোলটা ও তার অভ্যন্তরস্থ মিশ্রণকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ঘন দ্রবণে আগে থেকেই সিক্ত করে নেওয়া হয়। এরূপ ড্রাই সেলের দুই তড়িদ্দ্বারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের রাসায়নিক তথ্য ও যুক্তি সাধারণ লেক্‌লান্স সেলেরই অনুরূপ। তরল দ্রবণ না থাকায় এরূপ ড্রাই সেলের ব্যবহার নানা কাজে ও পরিবহনে বিশেষ সুবিধা-জনক; আর তাই আজকাল রেডিও-ব্যাটারি, ইলেক্‌ট্রিক বেল, টেলিফোন, সাধারণ টর্চ-বাতি প্রভৃতিতে এই শ্রেণীর সেল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
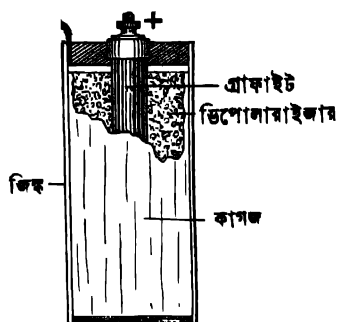
ড্রাই-সেল

বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী প্রচুর তড়িৎ-শক্তির উৎ-পাদনের জন্যে পরবর্তী কালে 'ডায়নামো' যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় যদিও তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে বিভিন্ন ভোল্‌টেইক সেলের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব তেমন আর নেই, তথাপি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেলের ব্যবহার আজও অপরিহার্য। বিশেষতঃ **'লেড অ্যাকুমুলেটর'** বা 'সীসক-সঞ্চয়ী সেল' নামক এক শ্রেণীর তড়িৎ-কোষ অনেকটা ডায়নামোর পরিপূরক হিসেবে বিশেষ কার্যকরী তড়িৎ-সরবরাহকারী যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। এই সেলে বিশুদ্ধ সীসা ও সীসার বাদামী বর্ণের অক্সাইডের (লেড-ডাইঅক্সাইডের) দু'টি দু'রকম প্লেট বা পাত্‌ কোন আাসিড-সহ (যেমন, কাচ) পদার্থে তৈরী পাত্রে রক্ষিত সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে নিমজ্জিত রাখা হয়। এই অ্যাসিড তীব্র ও বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে না, থাকে জলমিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু দ্রবণ, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে 1·30 মাত্র। তড়িৎ-পরিবাহী ধাতব তার দিয়ে ঐ প্লেট দু'খানা জুড়ে দিলে তারের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-

স্রোত প্রবাহিত হয় লেড-ডাইঅক্সাইডের প্লেট থেকে ধাতব লেডের প্লেটখানার দিকে। প্লেট দু'খানার লেড ও লেড-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লেড-সালফেট উৎপন্ন হয়; আর এই বিক্রিয়ার ফলে বিমুক্ত রাসায়নিক শক্তি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সংযোজক তারের মাধ্যমে তা প্রবাহের আকারে দেখা দেয়। উল্লিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ :

$$PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 = 2PbSO_4 + 2H_2O$$

সেলের অভ্যন্তরে উল্লিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিড নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তড়িৎ-প্রবাহও বন্ধ হয়। এই অবস্থায় সেলটা নিষ্ক্রিয় বা 'ডিস্‌চার্জড' হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। কিন্তু এরূপ সেলের সুবিধা এই যে, একে সহজেই আবার তড়িৎ উৎপাদনে সক্রিয় করে তোলা যায়। এর জন্যে অপর কোন সেল বা ডায়নামো থেকে উদ্ভূত তড়িৎ-প্রবাহ ঐ 'ডিস্‌চার্জড' সেলটার ভিতরে বিপরীত দিকে চালাতে হয়; অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় সেলটার লেড-ডাইঅক্সাইড প্লেট থেকে লেড-প্লেটের অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হয়েছে, এবারে তাকে পুনঃসক্রিয় করবার জন্যে লেড-প্লেট থেকে লেড-ডাইঅক্সাইড প্লেটের দিকে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করাতে হবে। এর ফলে ঐ সেলে দ্রবিত লেড-সালফেট পুনরায় ধাতব লেড বা সীসায় রূপান্তরিত হয়ে ঋণ-তড়িদ্দ্বারে এবং লেড-ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়ে ধন-তড়িদ্দ্বারে গিয়ে জমে। এভাবে ঐ নির্জীব সেলে প্রবাহিত তড়িৎ-শক্তি উল্লিখিত রাসায়নিক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে আবার স্থিতি-শক্তিতে (potential energy) রূপান্তরিত হয়ে সেলের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে। আর এই স্থিতি-শক্তিই পুনর্জীবিত সেল থেকে তড়িৎ-শক্তির আকারে আবার পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনানুসারে যে কোন সময়ে ব্যবহার করা চলে।
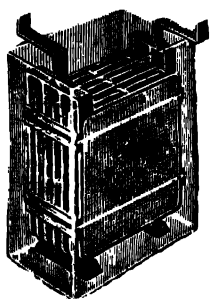
লেড অ্যাকুমুলেটর

পূর্ণ-ব্যবহৃত ও নিঃশেষিত 'লেড অ্যাকুমুলেটর' সেলের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে আর একটু বিশদ আলোচনা করা যাক। এই সেলের ব্যবহারের সময়

ভিতরকার সালফিউরিক অ্যাসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্রমে লেড-সালফেট উৎপাদনে নিঃশেষ হতে থাকে, আর তার ফলে ঐ অ্যাসিড-দ্রবণের আপেক্ষিক গুরুত্বও ক্রমে কমতে থাকে। আবার সেই নিঃশেষিত সেলকে যখন বাইরে থেকে তড়িৎ-প্রবাহ দিয়ে 'রিচার্জড্' বা পুনঃসক্রিয় করা হয় তখন সেই সালফেট থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে দ্রবণের গুরুত্ব বাড়ায়। সম্পূর্ণ 'ডিসচার্জড্' বা নিঃশেষিত সেলের অ্যাসিড-দ্রবণের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে মোটামুটি 1·15 হয়ে যায়, প্রাথমিক 'চার্জড্' সেলের অ্যাসিড-দ্রবণের গুরুত্ব থাকে 1·30। সেলের দ্রবণে 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্র বসিয়ে আপেক্ষিক গুরুত্বের এই হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সেলের তড়িৎ-উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি, অর্থাৎ চার্জের অবস্থা জানা যেতে পারে।

এই 'লেড অ্যাকুমুলেটর' সেল আজকাল নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর তড়িৎ-প্রবাহ দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো যায়; বস্তুতঃ এর সাহায্যে প্রয়োজন হলে ঘর-বাড়ী আলোকিত করাও চলে, যেখানে বিদ্যুৎ-সরবরাহ নেই। মোটরগাড়ীতে এই অ্যাকুমুলেটর সেলই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়, যার সাহায্যে গাড়ীর আলো জ্বলে, আর তার স্বয়ংক্রিয় গতি-সঞ্চারক যন্ত্রাংশের বৈদ্যুতিক শক্তি জোগায়। মোট কথা, যে-সব ক্ষেত্রে ডায়নামো থেকে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা নেই, বা তা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, সে-সব ক্ষেত্রে এই লেড-অ্যাকুমুলেটর সেল থেকে সহজে ও যখন তখন ইচ্ছামত তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যেতে পারে।

নিকেল-আয়রন অ্যাকুমুলেটর ঃ সাধারণ লেড-অ্যাকুমুলেটর সেলের চেয়ে এই নিকেল-আয়রন অ্যাকুমুলেটর নানা দিক দিয়ে অধিকতর সুবিধাজনক এবং এর স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতাও বেশি। এই শ্রেণীর সেলকে অনেক সময় **'এডিসন সেল'** বলা হয়। এর ধন-তড়িদ্দ্বারের প্লেটটা প্রধানতঃ নিকেল (নিকেলিক) হাইড্রক্সাইডের [$Ni(OH)_3$] সঙ্গে কিছুটা গ্রাফাইট বা কার্বনের গুঁড়া মিশিয়ে তৈরি করা হয়। গ্রাফাইটের গুঁড়া থাকায় প্লেটের তড়িৎ-পরিবাহিতা বৃদ্ধি পায়। এর ঋণ-তড়িদ্দ্বারের প্লেটটা তৈরি করা হয় বিশুদ্ধ লৌহ দিয়ে; আর এই সেলের ইলেক্‌ট্রোলাইট হলো পটাসিয়াম-হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·19 হওয়া দরকার। সেলের প্লেট দু'টাকে তড়িৎ-পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে তারের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে নিকেল প্লেট থেকে লৌহ-প্লেটের দিকে। ধন-তড়িদ্দ্বার

বা অ্যানোডের নিকেলিক হাইড্রক্সাইড আভ্যন্তরীণ আয়ন-প্রবাহের ফলে বিজারিত হয়ে নিকেলাস হাইড্রক্সাইডে [$Ni(OH)_2$] পরিণত হয়; আর ঋণ-তড়িদ্দার বা ক্যাথোড প্রান্তের লৌহ জারিত হয়ে ফেরাস হাইড্রক্সাইডে [$Fe(OH)_2$] পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই রাসায়নিক রূপান্তরকে সাধারণভাবে এরূপ সমীকরণের সাহায্যে বুঝানো যেতে পারে: $Fe + 2Ni(OH)_3 = Fe(OH)_2 + 2\ Ni(OH)_2$। এই সেলের তড়িৎ প্রবাহক বল বা ভোল্টেজ হয় মোটামুটি 1·35 ভোল্ট।

উৎপন্ন তড়িৎ-শক্তি ব্যবহারের ফলে যখন এই নিকেল-আয়রন সেল নিঃশেষ বা ডিস্‌চার্জ্‌ড্‌ হয়ে যায়, তখন লেড-অ্যাকুমুলেটরের মত এর মধ্যেও বিপরীতমুখী তড়িৎ-প্রবাহ চালিয়ে একে পুনরায় সক্রিয়, অর্থাৎ তড়িৎ-উৎপাদনক্ষম করা যায়। বাইরে থেকে এর নিজস্ব তড়িৎ-প্রবাহের বিপরীত ধারায় এর মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে তার নিকেলাস হাইড্রক্সাইড জারিত হয়ে পুনরায় নিকেলিক হাইড্রক্সাইডে এবং আয়রন হাইড্রক্সাইড বিজারিত হয়ে ধাতব আয়রনে পরিবর্তিত হয়ে সেলটা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। ডিস্‌চার্জ্‌ড্‌ অবস্থায় কয়েকদিন ফেলে রাখলে লেড-অ্যাকুমুলেটর কর্মক্ষমতা অনেকটা হারায়, চার্জ আর তেমন ভাল হয় না। এদিক থেকে নিকেল-আয়রন অ্যাকুমুলেটর লেড অ্যাকুমুলেটরের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী ;— অসতর্ক ব্যবহারে নষ্ট হয় কম, দীর্ঘদিন কাজ চলে।

নিকেল-আয়রন অ্যাকুমুলেটরের অনুরূপ পদ্ধতিতে নিকেল-ক্যাড্‌মিয়াম অ্যাকুমুলেটরও তৈরি করা হয়েছে। উভয়ের গঠন-পদ্ধতি ও কর্মক্ষমতা প্রায় একই রূপ; তবে এর বৈদ্যুতিক চাপশক্তি অপেক্ষাকৃত কম; সাধারণতঃ মাত্র 1 25 ভোল্ট হয়ে থাকে।

রাসায়নিক শিল্পে তড়িতের ব্যবহার

ইদানীং তড়িৎ-শক্তির ব্যবহারে বহুবিধ দ্রব্যের রাসায়নিক প্রস্তুতির সহজ উপায় উদ্ভাবিত হয়ে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর যুগান্তর ঘটেছে। আগেকার দিনে কস্টিক সোডা, কস্টিক পটাস, ক্লোরিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের শিল্প-প্রস্তুতি ও ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধিকরণে যে-সব কষ্টসাধ্য রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বিত হতো তা তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে 'ইলেক্‌ট্রোলিসিস' পদ্ধতিতে

ইদানীং অতি সহজে ও স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হয়। এমন কি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানারকম নূতন নূতন মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় পদার্থের সহজ-সাধ্য উৎপাদন-পদ্ধতিও তড়িতের সাহায্যে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, তড়িতের শিল্প-ব্যবহারগুলির মধ্যে ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতিতে ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং বা ধাতু-প্রলেপন প্রক্রিয়া বহু দিন থেকে চলে আসছে। তা ছাড়া, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধাতুকে অতি-বিশুদ্ধ অবস্থায় আনাও সম্ভবপর হয়েছে। বিশেষতঃ আজকাল কোন কোন ধাতুর বিশেষতঃ তামার বিশুদ্ধিকরণে এই বৈদ্যুতিক পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। ম্যালাকাইট, কিউপ্রাইট, অ্যাজুরাইট প্রভৃতি তামার খনিজ প্রস্তরগুলি গলিয়ে-পুড়িয়ে যে অবিশুদ্ধ তামা নিষ্কাশিত হয় তাতে প্রায়ই অন্যান্য ধাতুর মালিন্য থেকে যায়, কিছু কিছু সোনা ও রূপার খাদও থাকে। ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় এরূপ অবিশুদ্ধ তামাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করা সম্ভব হয়।

ইলেক্‌ট্রোলিটিক কপারঃ খনিজ থেকে নিষ্কাশিত অবিশুদ্ধ তামা গলিয়ে তাকে প্রথমে চতুষ্কোণ চাদর বা প্লেটের আকারে ঢালাই করে নেওয়া হয়। তারপর বড় বড় পাত্রে কপার-সালফেট বা তুঁতের জলীয় দ্রবণ ভরতি করে তার মধ্যে ঐ অবিশুদ্ধ তামার অনেকগুলি প্লেট খাড়াভাবে ডুবিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আর তার দু'খানার মাঝে মাঝে কিছু ব্যবধানে অনুরূপভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বিশুদ্ধ তামার এক-একখানা পাত্‌লা প্লেট। তড়িৎ-বর্তনীর অ্যানোড বা ধন-তড়িদ্দ্বার করা হয় অবিশুদ্ধ তামার প্লেটগুলিকে, আর ক্যাথোড বা ঋণ-তড়িদ্দ্বারে থাকে বিশুদ্ধ তামার প্লেটগুলি। এখন ঐ বর্তনীপথে
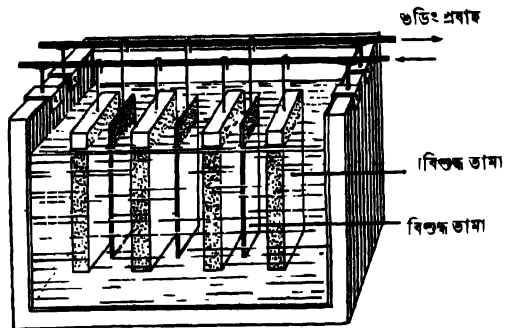
অতি-বিশুদ্ধ কপার উৎপাদনের ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতি

তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় তামার অতিবিশুদ্ধ সূক্ষ্ম কণিকাসমূহ গিয়ে ক্যাথোড প্রান্তের বিশুদ্ধ তামার প্লেটের উপরে জমতে

থাকে ; আর দেখা যায়, অ্যানোড প্রান্তস্থ প্লেটের তামা ক্রমে ক্রমে দ্রবণের জলে মিশে যাচ্ছে। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে কপার সালফেটের দ্রবণ থেকে অ্যানোড বা ধন-তড়িৎপ্রান্তে যে সালফেট (SO_4^{-}) আয়নসমূহ উদ্ভূত হয় তাদের সঙ্গে ঐ প্লেটের তাম্র-কণিকাগুলি সংযুক্ত হয়ে কপার-সালফেটে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলে দ্রবিত হয়ে মিশে যায়। এই কপার সালফেট বিশ্লিষ্ট হয়ে তার বিশুদ্ধ তাম্রকণিকাগুলি গিয়ে ক্যাথোডের প্লেটের উপর জমে। এমনিভাবে ইলেক্‌ট্রো-লিসিস প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। ক্যাথোড প্লেটের গায়ে এভাবে সঞ্চিত বিশুদ্ধ তাম্রকণিকাগুলিকে উপযুক্ত কৌশলে ছাড়িয়ে সংগ্রহ করা হয় ; এই হলো অতিবিশুদ্ধ তামা, যাকে বলে **'ইলেকট্রোলিটিক কপার'**।

অ্যানোড-প্লেটের অবিশুদ্ধ তামার বিশুদ্ধ তাম্রকণিকাগুলিই কেবল উল্লিখিতভাবে ক্রমাগত সালফেটে পরিণত হয়ে জলে মিশে যায় ; আর তাতে মিশ্রিত অন্যান্য ধাতব উপাদানগুলিও কিছু কিছু জলে দ্রবিত হয়ে যায় বটে, কিন্তু সেগুলি অ্যানোডের নিচে মালিন্যরূপে পাত্রের তলায় জমে—ইলেক্‌ট্রো-লিসিস প্রক্রিয়ায় সেগুলি অংশ গ্রহণ করে না। অবিশুদ্ধ তামার সঙ্গে মিশ্রিত যে-সব স্বর্ণ বা রৌপ্য কণিকা থাকে সেগুলি স্বভাবতঃই দ্রবিত না হয়ে সরাসরি পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে। পাত্রের তলায় অ্যানোডের নিচে এভাবে সঞ্চিত বিভিন্ন ধাতব গাদকে বলা হয় **'অ্যানোড-মৃত্তিকা'**। উপযুক্ত পদ্ধতিতে এই মিশ্র গাদ থেকে সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতব পদার্থগুলিও শেষে একে-একে পৃথক করা হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত অতি-বিশুদ্ধ তামা, বা ইলেক্‌ট্রোলিটিক কপার প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রাদি নির্মাণের কাজেই ব্যবহৃত হয়। এর কারণ, অতিবিশুদ্ধ তামাই তড়িৎ-সুপরিবাহী ; তামার ভিতরে অন্য কোন ধাতব মালিন্য সামান্য পরিমাণে থাকলেও তার তড়িৎ-পরিবহনের ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। তাই কেবল বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতির জন্যেই এই ইলেক্‌ট্রো-লিটিক কপারের শিল্পগত চাহিদা প্রচুর ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন : বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিনের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাবান, কাগজ, কৃত্রিম সিল্ক প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পে, বিভিন্ন তৈল-শোধনে, অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর নিষ্কাশনে এবং অন্যান্য নানা রাসায়নিক শিল্পে কস্টিক সোডা ও পটাস বিশেষ প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ। আর বিরঞ্জক ও বীজবারক পদার্থ হিসাবে 'ব্লিচিং পাউডার',

ডি-ডি-টি প্রভৃতি উৎপাদনে, কাগজ ও বস্ত্রশিল্পে ও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরিনের ব্যবহারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেকার দিনে এগুলি উৎপাদনের জন্যে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য জটিল **রাসায়নিক পদ্ধতি** অবলম্বিত হতো; যেমন, সোডিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণে কলি-চুন বা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড মিশিয়ে তাকে বড় বড় ভ্যাটে ফুটিয়ে কস্টিক সোডা পাওয়া যেত। সোডিয়াম কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের পারস্পরিক রাসায়নিক সংযোজন-বিয়োজনে উৎপন্ন হয় কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট। অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট থিতিয়ে পৃথক হয়ে পড়ে, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণ পাওয়া যায়। আবার ক্লোরিন তৈরি করতেও 'ওয়েল্ডন পদ্ধতি' বা 'ডিকন পদ্ধতি'তে (পৃঃ 120) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও উত্তাপে জারিত করার প্রয়োজন হতো। আজকাল সাধারণতঃ তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতির সাহায্যে স্বল্পমূল্যের সাধারণ খাদ্য-লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে অতি সহজে প্রচুর পরিমাণে কস্টিক সোডা উৎপাদন করা হয়; আর সেই সঙ্গে উপজাত পদার্থ হিসাবে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতি সাধারণ রাসায়নিক পদ্ধতির স্থান অধিকার করে এ-যুগে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন-শিল্পে যুগান্তর এনেছে।

ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতিঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য-লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ **কস্টিক সোডা** পেতে হলে বড় বড় ধাতব আধার বা ট্যাঙ্কে ভরতি লবণাক্ত জলের মধ্যে গ্রাফাইট বা কার্বনের কতকগুলি তড়িদ্দ্বার (ইলেক্‌ট্রোড) নিমজ্জিত রাখা হয়। এই কার্বন-তড়িদ্দ্বারগুলি তড়িৎ-প্রবাহে অ্যানোডের (ধন-তড়িদ্দ্বার) কাজ করে। ট্যাঙ্কগুলির উপরে থাকে ঢাক্‌না, আর সেগুলির তলদেশে মার্কারি বা পারদের একটা প্রবাহ-ধারা ধীরগতিতে বহমান রাখা হয়; এই পারদ-ধারা ইলেক্‌ট্রো-লিসিস প্রক্রিয়ায় ক্যাথোড বা ঋণ-তড়িদ্দ্বারের কাজ করে। এখন ট্যাঙ্কের ভিতরের লম্বমান কার্বন-দণ্ড ও তলদেশের পারদকে তড়িৎ-বর্তনীর পথে জুড়ে দিলে দ্রবণের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে অ্যানোডের গ্রাফাইট-প্রান্তে ক্লোরিন গ্যাস উদ্ভূত হয়ে আবদ্ধ ট্যাঙ্কের ভিতরে জমে; আর তার উপরের ঢাক্‌নার সঙ্গে সংলগ্ন নলপথে গ্যাসটা বের করে নেওয়া হয়। অপরপক্ষে বিমুক্ত সোডিয়াম ধাতু ক্যাথোডরূপী পারদের সঙ্গে মিলে সোডিয়াম 'অ্যামালগাম'

অর্থাৎ সোডিয়াম ও পারদের ধাতু-সংকর উৎপন্ন করে। ট্যাঙ্কের তলদেশে সোডিয়ামের পারদ-সংকর বা অ্যামাল্গাম প্রবাহিত হয়ে ট্যাঙ্কের বাইরে বেরিয়ে আসে। এই পারদ-সংকরকে বিশুদ্ধ জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালে তার সোডিয়াম মুক্ত হয়ে জলের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা **কস্টিক সোডা** উৎপন্ন হয়ে জলে দ্রবিত থাকে। এই বিক্রিয়ার ফলে উপজাত পদার্থ হিসাবে প্রচুর হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায় ($2Na+2H_2O=2\ NaOH+H_2$)। এর পরে সোডিয়াম-মুক্ত সেই বিশুদ্ধ পারদকে আবার ক্যাথোড হিসেবে ট্যাঙ্কের তলদেশে প্রবাহিত করা হয়। উল্লিখিত ইলেক্ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় কোথাও কোন পদার্থের অপচয় নেই ; সোডিয়াম-ক্লোরাইডের সোডিয়াম পাওয়া যায় হাইড্রক্সাইডরূপে, **ক্লোরিন** মুক্ত হয়ে আসে ; উপরন্তু আবার **হাইড্রোজেন** গ্যাসও পাওয়া যায়।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে কস্টিক সোডার জলীয় দ্রবণ থেকে বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়ায় জল শুকিয়ে ফেললে কঠিন কস্টিক সোডা পাওয়া যেতে পারে। পদার্থটা দেখতে সাদা ; অত্যন্ত জলাকর্ষী পদার্থ বলে খোলা হাওয়ায় রাখলে ঘেমে ওঠে। জল দিলে পদার্থটা সঙ্গে সঙ্গে গলে গিয়ে কস্টিক সোডার দ্রবণ সৃষ্টি করে ; অন্যান্য অ্যালকালি বা ক্ষারীয় দ্রবণের মত এর জলীয় দ্রবণও সাবান-জলের মত পিচ্ছিল বোধ হয়। কাগজ, কৃত্রিম সিল্ক প্রভৃতি নানা শিল্পে, বিশেষতঃ সাবান-শিল্পে প্রভূত পরিমাণ কস্টিক সোডার প্রয়োজন হয়।

ইলেক্ট্রোলিসিস পদ্ধতিতে কস্টিক সোডা উৎপাদনের কালে আনুষঙ্গিক উপজাত পদার্থ হিসাবে যে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যায় তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। বিরঞ্জক ও বীজবারক পদার্থ হিসেবে বিভিন্ন শিল্পে ক্লোরিনের ব্যবহার এ-যুগে বহুমুখী ও ক্রমবর্ধমান। শক্তিশালী বীজবারক ও জীবাণুনাশক হিসেবে পানীয় জল পরিশোধনে ও ব্লিচিং পাউডার, ডি-ডি-টি প্রভৃতির উৎপাদনে এবং বিরঞ্জক পদার্থ হিসাবে বিভিন্ন শিল্পে ক্লোরিন অপরিহার্য। আবার এই ইলেক্ট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় উপজাত হাইড্রোজেন গ্যাসও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয়। ওয়েল্ডিং-এর কাজে **অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা** সৃষ্টিতে, অ্যামোনিয়ার সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে, উদ্ভিজ্জ তেলকে বনস্পতি ঘৃতে রূপান্তরিত করবার **হাইড্রোজেনেসন** প্রক্রিয়ায় গ্যাসটার প্রচুর ব্যবহার আছে ; এ-সব ছাড়া ইদানীং হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সরাসরি রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

উৎপাদনেরও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ক্লোরিন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাসকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় দগ্ধ করলে উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় হাইড্রোজেন-ক্লোরাইড বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস; যাকে জলে দ্রবিত করলে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড** তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ঃ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ও শিল্প-উৎপাদনে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়। নানারকম সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস দু'টা পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সহজে ও স্বল্পব্যয়ে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পেতে হলে ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। জল হলো এই দু'টি গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত একটি পদার্থ; তাই বিশুদ্ধ জলকে ইলেক্‌ট্রোলিসিস বা তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট করলে তার সংগঠক গ্যাস দু'টা সহজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিশুদ্ধ জল তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম; কাজেই তার তড়িৎ-বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। দেখা যায়, বিশুদ্ধ জলে সামান্য কয়েক ফোঁটা সাল্‌ফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশালে সে-জল তড়িতের সুপরিবাহী হয়ে ওঠে, আর উপযুক্ত কৌশলে তাকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করলে ধন-তড়িদ্দ্বারে অক্সিজেন ও ঋণ-তড়িদ্দ্বারে হাইড্রোজেন গ্যাস উদ্ভূত হয়।

কিন্তু বিরাটাকারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের শিল্প-উৎপাদনে জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। এর জন্যে কষ্টিক সোডা অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ ইলেক্‌ট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল সাধারণতঃ এর তড়িৎ-বিশ্লেষণেই বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে। কষ্টিক
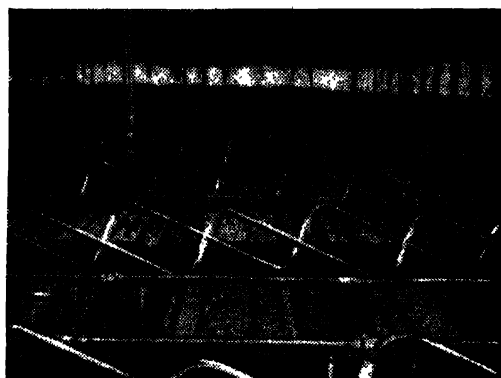
ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতিতে কষ্টিক সোডা থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা

সোডার জলীয় দ্রবণের ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা করলে তার ঋণ-তড়িদ্দ্বার বা ক্যাথোড প্রান্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অ্যানোড প্রান্তে অক্সিজেন গ্যাস উদ্ভূত হয়; অবশ্য এর জন্যে নানারকম জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। অনেকগুলি ধাতু-নির্মিত বিরাটাকার আবদ্ধ ট্যাঙ্কের মধ্যে এরূপ তড়িৎ-বিশ্লেষক সেলের অ্যানোড ও ক্যাথোডগুলি সংস্থাপিত হয়; আর সেই আধারগুলির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সঞ্চিত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে পৃথক পৃথক নলপথে চালিত করে নিয়ে প্রকাণ্ড সব গ্যাসাধারে সংগ্রহ করা হয়।

ধাতুর নিষ্কাশন ও শোধন : তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে কোন কোন খনিজ প্রস্তর থেকে বিশুদ্ধ ধাতুর নিষ্কাশন এবং অবিশুদ্ধ ধাতুকে শোধন করবার কাজও সহজে সম্পন্ন হয়। আমরা আগেই (পৃষ্ঠা 242) বলেছি, বিভিন্ন ইলেক্‌ট্রোলাইটের জলীয় দ্রবণেই কেবল ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় না, পদার্থগুলির (জলশূন্য) গলিত অবস্থায়ও ইলেক্‌ট্রোলিসিস প্রক্রিয়া সম্ভব; যেমন, গলিত কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাস থেকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে **সোডিয়াম** ও **পটাসিয়াম** ধাতু সহজে উৎপাদিত হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খনিজ থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হলো **অ্যালুমিনিয়াম** ধাতুর উৎপাদন। বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়ামই বোধ হয় সর্বাধিক পরিমাণে রয়েছে; কিন্তু তা রয়েছে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে খনিজ যৌগের আকারে। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ-সব খনিজ থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা এত দুঃসাধ্য ও ব্যয়বহুল ছিল যে, 1845 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু চেষ্টায়ও ধাতুটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব হয় নি। সে যুগে অ্যালুমিনিয়াম ছিল ধাতু-রসায়নের একটা ঔৎসুক্যের বস্তু; ধাতুটার সাধারণ বা শিল্পভিত্তিক ব্যবহার ব্যয়বাহুল্য ও দুরূহতার জন্যে বস্তুতঃ অসম্ভবই ছিল। অবশেষে ধাতু-নিষ্কাশনে তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হওয়ায় 1886 খৃষ্টাব্দের পর থেকে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে ফ্লোরিন ও সোডিয়ামের একটা খনিজ যৌগ 'ক্রায়োলাইট' নামে পরিচিত; যা প্রধানতঃ গ্রীনল্যাণ্ডে এক সময়ে প্রচুর পাওয়া যেত; ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আজও যথেষ্ট মেলে। **বক্সাইট** হলো অ্যালুমিনিয়ামের আর একটা খনিজ অক্সাইড-যৌগ, যা পৃথিবীর অনেক দেশেই, বিশেষতঃ আমাদের দেশে যথেষ্ট রয়েছে। উপযুক্ত উত্তাপে গলিত ক্রায়োলাইটের সঙ্গে

বক্সাইট মেশালে যে গলিত ধাতব মিশ্রণ পাওয়া যায় তার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে ইলেকট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম সহজে ও স্বল্পব্যয়ে উৎপাদিত হয়। লোহার তৈরী প্রকাণ্ড আধারের ভিতরটা গ্রাফাইটের চাদর দিয়ে মোড়া হয়, আর তাতে রক্ষিত ক্রায়োলাইট ও বক্সাইটের গলিত মিশ্রণের তড়িৎ-বিশ্লেষণকালে ঐ গ্রাফাইট আস্তরণটা ঋণ-তড়িদ্দ্বার বা ক্যাথোডের কাজ করে। গলিত মিশ্রণের মধ্যে নিমজ্জিত বড় বড় গ্রাফাইট-দণ্ড ধন-তড়িদ্দ্বার বা অ্যানোড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গলিত মিশ্রণের ভিতরে ঐ অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাধ্যমে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে অ্যালুমিনিয়াম গিয়ে ক্যাথোড-প্রান্তে, অর্থাৎ তরল অবস্থায় আধারের তলদেশস্থ গ্রাফাইট আস্তরণের উপরে জমতে থাকে। সেখান থেকে নলপথে ঐ তরল ও বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম মাঝে মাঝে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আর অ্যানোড দণ্ডগুলির গায়ে ক্রমাগত যে অক্সিজেন উদ্ভূত হয় তা দণ্ডগুলির গ্রাফাইট বা কার্বনের সঙ্গে মিলে বিষাক্ত কার্বন-মনক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে। এই বিষাক্ত গ্যাসটাকে বিশেষ কৌশলে বের করে নিয়ে জ্বালিয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত করে উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়।

অ্যালুমিনিয়াম একটা সাদা হাল্‌কা ধাতু; এর আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র 2·7; তুলনামূলকভাবে বলা যায়, লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো প্রায় 7·8। আধুনিক যুগে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার কি, দৈনন্দিন জীবনে, কি বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনে, একটা ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ধাতুটাতে মরিচা-ময়লা ধরে না; আর যথেষ্ট কঠিন ও হাল্‌কা বলে গৃহস্থালীর তৈজস-পত্র তৈরি করতে, এমন কি, অলঙ্কার প্রস্তুতিতেও অ্যালুমিনিয়াম যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। ধাতুটা তড়িৎ-পরিবাহী হিসাবে-এবং উচ্চতাপ সৃষ্টির জন্যে **'থার্মিট'** (ধাতু ও ধাতু-সংকর অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পদ্ধতিতে, আবার বিশেষ ক্ষেত্রে ধাতু শোধনের কাজেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়াম যেমন হাল্‌কা, তেমনই আবার বিশেষ প্রসার্য ধাতু; হাতুড়ীর ঘায়ে বা টেনে একে তাই সূক্ষ্ম তারে পরিণত করা যায়। আজকাল তামার দুর্মূল্যতার জন্যে তামার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী বৈদ্যুতিক তার-ই অধিকতর ব্যবহৃত হচ্ছে।

অ্যালুমিনিয়ামের কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অপেক্ষাকৃত কম বলে ধাতুটা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তেমন উপযোগী হয় না; বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার তাই সীমিত। এ-সব ত্রুটি দূর করবার জন্যে অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু

যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে যে-সব ধাতু-সংকর তৈরি হয় তাদের টান-সহতা ও দৃঢ়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়; এমন কি, সেগুলিতে আরও নানারকম ধাতব গুণ ও ধর্ম এসে যায়। তামার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্রণে যে ধাতু-সংকর তৈরি হয় তাকে বলে **অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ;** এটা যেমন অত্যন্ত কঠিন, তেমন আবার যথেষ্ট ঘাতসহ ও প্রসারণশীল সংকর-ধাতু। তামার সঙ্গে দস্তার মিশ্রণে তৈরি হয় সাধারণ ব্রাস বা পিতল; এর সঙ্গে কিছু অ্যালুমিনিয়াম মেশালে সংকর-ধাতুটার কাঠিন্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। একে বলে **অ্যালুমিনিয়াম ব্রাস**। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে শতকরা মাত্র দু'ভাগ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতুর বিশেষ নাম **ম্যাগ্নেলিয়াম**; এটা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়েও হাল্‌কা হয়; অথচ অত্যন্ত কঠিন ও ঘাতসহ হয়ে থাকে। অ্যালুমিনিয়ামের এই শ্রেণীর ধাতু-সংকর এরোপ্লেনের খোল ও কাঠামো তৈরি করতেই সবিশেষ ব্যবহৃত হয়। 1906 খৃষ্টাব্দে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বিশেষ সংকর-ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম **ডুর‍্যালুমিন**; অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে মোটামুটি শতকরা 4 ভাগ তামা, 0·5 ভাগ ম্যাগ্নেসিয়াম ও 0·5 ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়। এই সংকর-ধাতুটা ইস্পাতের চেয়েও প্রসার্য ও কঠিন; অথচ এর আপেক্ষিক গুরুত্ব ইস্পাতের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। এরূপ কঠিন অথচ হাল্‌কা সংকর-ধাতু উদ্ভাবিত হওয়ায় এরোপ্লেন নির্মাণ-শিল্পে যুগান্তর ঘটেছে।

রসায়নে তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার প্রসঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম ও তার বিভিন্ন সংকর-ধাতুর কথা অনেকটা বলা হলো। অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন ধাতু-সংকরের কথা বলতে গিয়ে আমরা ইতিপূর্বে **ম্যাগ্নেসিয়াম** ধাতুর উল্লেখ করেছি। ম্যাগ্নেসিয়াম হলো ধূসর বর্ণের একটা হাল্‌কা ধাতু, যার আপেক্ষিক গুরুত্ব 1·74 মাত্র; বস্তুতঃ বিভিন্ন শিল্পকাজে ব্যবহার্য ধাতুগুলির মধ্যে ম্যাগ্নে-সিয়ামই সবচেয়ে হাল্‌কা। জ্বালালে ধাতুটা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে; আর তার আলোক-রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপরে বিশেষ সক্রিয়। আগের দিনে তাই ম্যাগ্নেসিয়ামের তৈরী পাত্‌লা ফিতে আলোক-চিত্র গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হতো; আবার এর চূর্ণ জ্বালিয়ে 'ফ্ল্যাশ-লাইট' ও অন্যান্য বাতি তৈরি করাও হতো। সাম্প্রতিক কালে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ম্যাগ্নেসিয়ামের ব্যবহার আজকাল সবিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে; বিশেষতঃ অত্যধিক হাল্‌কা অথচ সুকঠিন সংকর-ধাতু উৎপাদনে ধাতুটা অপরিহার্য। অ্যালুমিনিয়াম ও দস্তা, কখন কখন সামান্য

ম্যাঙ্গানিজের সংমিশ্রণে ম্যাগ্নেসিয়ামের কাঠিন্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ অ্যালুমিনিয়াম ও দস্তার সঙ্গে শতকরা 90 ভাগ বা তারও বেশি ম্যাগ্নেসিয়ামের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকর-ধাতু আজকাল এরোপ্লেন ও মোটর-যানের কাঠামো, কখন কখন সমুদ্রগামী জাহাজের ডেকের উর্ধাংশ তৈরি করতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর সংকর-ধাতু যেমন একাধারে হাল্‌কা ও সুদৃঢ়, তেমন আবার তাতে মরিচা ধরে না।

ম্যাগ্নেসিয়ামের প্রাকৃতিক খনিজের মধ্যে কার্নেলাইট, ম্যাগ্নেসাইট ও ডলোমাইট-ই প্রধান। প্রাকৃতিক ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড ও পটাসিয়াম ক্লোরাইডের সংমিশ্রণ হলো **কার্নেলাইট**। উত্তাপে তরলায়িত অবস্থায় এই কার্নেলাইট খনিজ থেকে ইলেকট্রোলিসিস বা তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। **ম্যাগ্নেসাইট** হলো ম্যাগ্নেসিয়ামের প্রাকৃতিক কার্বনেট, আর **ডলোমাইট** হলো ম্যাগ্নেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের যুগ্ম-কার্বনেট। এই খনিজ কার্বনেটগুলি পোড়ালে ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইড (ম্যাগ্নেসিয়া) পাওয়া যায়; ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ধাতব অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি মিশিয়ে ঐ ম্যাগ্নেসিয়াম অক্সাইডকে উত্তাপে বিজারিত করলে বিশুদ্ধ ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। সমুদ্রের জলে ম্যাগ্নেসিয়ামের বিভিন্ন যৌগ কিছু পরিমাণে দ্রবিত রয়েছে। কোন কোন দেশে তাই সমুদ্র-জলের সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বা স্লেকেড লাইম (কলি চূন) মিশিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ম্যাগ্নেসিয়াম হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষেপিত করবার ব্যবস্থা করা হয়; আর সেই হাইড্রক্সাইডকে উত্তাপে বিজারিত করে ধাতব ম্যাগ্নেসিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। ইলেকট্রোলিসিস পদ্ধতি ছাড়াও এরূপ বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত করা যেতে পারে।

তড়িৎ ও তাপশক্তি

বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদন-শিল্পে তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে সৃষ্ট অত্যুচ্চ তাপের ব্যবহার বিশেষ সুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'কৃষি-রসায়ন ও রাসায়নিক সার' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংবন্ধন ও ক্যালসিয়াম সায়েন্যামাইড উৎপাদন করতে যে উচ্চ তাপ-মাত্রার (3,000° সেন্টিগ্রেড) কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করেছি তা তড়িৎ-শক্তির সাহায্যেই সম্ভব হয়। কাচ-শিল্পের আলোচনাকালে যে 'সিলিকা গ্লাস' অর্থাৎ গলিত

বালুকা-কাচ উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে তা-ও বৈদ্যুতিক চুল্লীর অতি উচ্চ তাপে সম্ভব হয়ে থাকে। ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের সঙ্গে কোয়ার্টজ শ্রেণীর বালুকা (সিলিকা) ও কোক্ কয়লা (কার্বন) মিশিয়ে উত্তপ্ত করে যে মৌলিক ফস্‌ফরাস উদ্ধার করা হয়, তাতেও তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন উচ্চ তাপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এভাবে দেখা যায়, কেবল ইলেক্‌ট্রোলিসিস পদ্ধতিতেই নয়, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে অত্যুচ্চ তাপের প্রয়োজন হলেই তড়িৎ-শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।

দৈনন্দিন ব্যবহারে তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন আলোক ও তাপের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এর মূল তথ্য হলো এই যে, কোন তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার সময়ে সেই পদার্থ টা তড়িতের প্রবাহ-পথে যে বাধার সৃষ্টি করে তারই ফলে তাপের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ তড়িৎ-শক্তি তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি বৃদ্ধি করলে উদ্ভূত তাপও বৃদ্ধি পায়; এভাবে তাপ-শক্তি যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা যেতে পারে যতক্ষণ না পরিবাহী পদার্থটা সেই তাপে গলে বা পুড়ে বাষ্পীভূত হয়ে না যায়। তাই সাধারণতঃ কোন ধাতব তারের মাধ্যমে তড়িৎ প্রবাহিত করে অত্যুচ্চ তাপ সৃষ্টি করা যায় না। আমরা জানি, কিছুটা ব্যবধানে রক্ষিত গ্রাফাইট বা গ্যাস-কার্বনের দু'টা তড়িদ্দ্বারের মাধ্যমে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত করলে যে **'ইলেক্‌ট্রিক আর্ক'** বা তড়িৎ-চক্র সৃষ্টি হয় তার উত্তাপ বা তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় 3,000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (5432° ডিগ্রি ফারেনহাইট) পর্যন্ত পৌঁছায়। এভাবে তড়িৎ-শক্তি উচ্চ মাত্রার তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়; আর এই উচ্চ তাপ-শক্তির প্রভাবে রসায়ন-শিল্পের বহু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন-বিয়োজন ক্রিয়া সম্ভব হয়ে থাকে। কেবল তা-ই নয়, এ থেকে পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেও অধিকতর জ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

তড়িৎ-শক্তির প্রভাবে সৃষ্ট অত্যুচ্চ তাপ-মাত্রার সাহায্যে সংযোজিত পদার্থগুলির মধ্যে **কার্বোরাণ্ডাম** উল্লেখযোগ্য; কার্বন ও বালুকার (সিলিকা) সংযোগে পদার্থ টা গঠিত। 1891 খৃষ্টাব্দে একিসন নামক আমেরিকাবাসী জনৈক বিজ্ঞানী কয়লা (কার্বন) ও বালুকার (সিলিকা বা সিলিকন-ডাইঅক্সাইড) মিশ্রণকে উল্লিখিত গ্রাফাইট 'আর্ক' বৈদ্যুতিক চুল্লীর উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করে কার্বোরাণ্ডাম উৎপাদন করেন। 'আর্ক' চুল্লীর (ইলেক্‌ট্রিক ফার্নেস) উচ্চ তাপে কয়লার কতকটা কার্বন বালুকার (সিলিকন-অক্সাইডের) অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত

হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসরূপে বেরিয়ে যায়, আর চুল্লীর অভ্যন্তরে থেকে যায় মৌলিক সিলিকন। মিশ্রণের অবশিষ্ট কার্বন তখন ঐ সিলিকনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক রকম স্ফটিকাকার পদার্থের (সিলিকন-কার্বাইড) সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় **কার্বোরাণ্ডাম**।

কার্বোরাণ্ডাম উৎপাদনের ইলেকট্রিক ফার্নেস
(আর্ক চুল্লী)
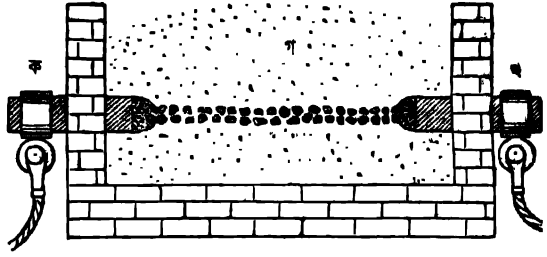
পদার্থটা প্রায় হীরকের মত সুকঠিন; অবশ্য এটা ঔজ্জ্বল্যে বা মূল্যে হীরকের তুল্য নয়। অত্যধিক কাঠিন্যের জন্যে এর স্ফটিকাকার দানাগুলি উৎকৃষ্ট ঘর্ষণ-ক্ষম পদার্থ (**abrasive**) হিসেবে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। কার্বোরাণ্ডাম আবার অত্যন্ত তাপ-সহ পদার্থ; 2200° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 4000° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ-মাত্রায়ও পদার্থটা গলে না, বা তার রাসায়নিক গঠনেরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। এরূপ উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে বলে বিভিন্ন প্রকার তাপ-চুল্লীর অভ্যন্তরভাগ তৈরি করতে জিনিসটা ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাপ-প্রতিরোধক পদার্থ হিসাবে কাজে লাগানো হয়। প্রসঙ্গতঃ আর একটা বিশেষ উপযোগী ঘর্ষণ-ক্ষম ও উচ্চতাপ-সহ পদার্থের উল্লেখ করা যেতে পারে; যার ব্যবহারিক বিশেষ নাম **এলাণ্ডাম**। রাসায়নিক গঠনে এটা হলো অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড বা অ্যালুমিনা। খনিজ অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড বা বক্সাইটকে বৈদ্যুতিক চুল্লীর উচ্চ তাপে গলিয়ে এই সুকঠিন পদার্থটা পাওয়া যায়।

রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ একিসনের কার্বোরাণ্ডাম উৎপাদনের বৈদ্যুতিক আর্ক-পদ্ধতির সাহায্যে আর একটা অধিকতর মূল্যবান পদার্থের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। পদার্থটা হলো কৃত্রিম গ্রাফাইট। 1896 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্বন বা কয়লার স্ফটিকাকার প্রতিরূপ (allotropy) গ্রাফাইট কেবল প্রাকৃতিক খনিজ হিসাবেই পাওয়া যেত। গ্রাফাইট সাধারণতঃ **প্লাম্বাগো** ও কৃষ্ণসীসা (বা ব্ল্যাক লেড) নামে সমধিক পরিচিত; নামে 'ব্ল্যাক লেড' হলেও পদার্থটার মধ্যে লেড বা সীসা কিছুমাত্র নেই। যাহোক, কার্বোরাণ্ডাম উৎপাদনের উল্লিখিত পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক

আর্ক-চুল্লীর গ্যাস-কার্বনের তড়িদ্দ্বার দু'টার মুখোমুখী অগ্রভাগের কার্বন ক্রমে গ্রাফাইটের আকার ধারণ করে। চুল্লীর অভ্যন্তরে কার্বন-তড়িদ্দ্বার দুটার মাধ্যমে উচ্চশক্তির তড়িৎ-প্রবাহ চলে, আর তাতে যে অত্যুচ্চ তাপমাত্রার উদ্ভব হয় তার প্রভাবেই কার্বন গ্রাফাইটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আবার কার্বোরাণ্ডামকে অত্যধিক উত্তপ্ত (3,000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অধিক) করলেও পদার্থটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গ্রাফাইটে পরিণত হয়। বিভিন্ন শিল্প-পদ্ধতিতে গ্রাফাইটের যথেষ্ট প্রয়োজন হয়ে থাকে ; আর তাই উল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে **কৃত্রিম গ্রাফাইট** উৎপাদনের একটা পৃথক শিল্পই গড়ে উঠেছে, যা সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

বিজ্ঞানী একিসনের উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম গ্রাফাইটের শিল্প-উৎপাদনের জন্যে মূল উপাদান হিসাবে 'অ্যানথ্রাসাইট' শ্রেণীর কয়লার গুঁড়া ব্যবহার করা হয়। পূর্বোক্ত কার্বোরাণ্ডাম উৎপাদনের আর্ক-চুল্লীর অনুরূপ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে অ্যানথ্রাসাইট কার্বনের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ জারিত লৌহ (আয়রন অক্সাইড), অ্যালুমিনা (অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড), অথবা সিলিকা (সিলিকন ডাইঅক্সাইড) মিশিয়ে মোটামুটি 3,000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। এই অত্যুচ্চ তাপে মিশ্রিত লৌহঅক্সাইড, অ্যালুমিনা বা সিলিকা জ্বলে-পুড়ে বাষ্পীভূত হয়ে বেরিয়ে যায়, আর চুল্লীর অভ্যন্তরে কার্বন বা অ্যানথ্রাসাইট কয়লা স্ফটিকাকার গ্রাফাইটে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃত-পক্ষে এই রূপান্তরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ সব ধাতব পদার্থ ও সিলিকা অনুঘটকের কাজ করে মাত্র এবং রূপান্তরের ক্রিয়াটা ত্বরান্বিত হয়। ঐ সব অনুঘটক না মেশালেও অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার কার্বন গ্রাফাইটে রূপান্তরিত হয় বটে, কিন্তু তাতে অধিকতর তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। যাহোক, এভাবে উৎপাদিত কৃত্রিম গ্রাফাইট প্রাকৃতিক খনিজ গ্রাফাইটের চেয়ে বিশুদ্ধতায় ও সমাকার স্ফটিকাকৃতিতে উৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে। গ্রাফাইটের রড্, প্লেট প্রভৃতি প্রস্তুত করতে হলে অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার অতি মিহি গুঁড়ার সঙ্গে সামান্য কিছু আয়রন-অক্সাইড মিশিয়ে আলকাত্‌রা (কোল্-টার) বা পিচের সংমিশ্রণে একটা ঘন আঁঠালো পিণ্ডে পরিণত করা হয়। তারপরে ঐ পিণ্ডকে ছাঁচে ফেলে বিশেষ চাপে রড্ বা প্লেটে পরিণত করে সেগুলিকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। চুল্লীর অত্যুচ্চ তাপ-মাত্রার প্রভাবে সেগুলির কার্বন গ্রাফাইটে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে রসায়নের বহু বিস্ময়কর অগ্রগতির কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। তড়িতের প্রভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহজসাধ্য হয়েছে, বহু নূতন নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে; আর তার ফলে রসায়নের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে বহুবিধ রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছে এবং মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের মূল উপাদান সবই অবশ্য প্রকৃতির দান, রসায়নবিদ্ তার সদ্ব্যবহার করে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও বিবিধ প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেছেন মাত্র। প্রকৃতির অফুরন্ত জল-শক্তিকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করেন যন্ত্রবিদ, আর সেই তড়িৎ-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়ে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। জগতে পদার্থ বা শক্তির উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই; আছে কেবল রূপান্তর। আমরা উল্লিখিত আলোচনায় তড়িৎ-শক্তির রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তর ও তার বিভিন্ন ফলাফল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি মাত্র।

নবম অধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটন

রসায়নের নব যুগ : জৈব রসায়নের উৎপত্তি ; রাসায়নিক শক্তি ও রাসায়নিক গতিবিদ্যা ; কেমিক্যাল এফিনিটি ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল তথ্যাদি ; বিক্রিয়ার গতিবেগ — তাপ ও বস্তু-পরিমাণের প্রভাব, 'বস্তু-ভর বিক্রিয়া' সূত্র : দ্বি-মুখী রাসায়নিক বিক্রিয়া ও স্থিরাবস্থা ; তাপোদ্‌গারী ও তাপশোষক বিক্রিয়া : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটন-সূত্র ; — বার্জিলিয়াস ; জলীয় বাষ্পের অনুঘটন-শক্তি , অনুঘটনে তামার আশ্চর্য ক্ষমতা ; ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুঘটক ; প্লাটিনামের অনুঘটন-ক্ষমতা ; প্লাটিনাম-পয়জনিং : অনুঘটক পদার্থের আবিষ্কারে আকস্মিকতা ; প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে অনুঘটন-ক্রিয়ায় বিভিন্ন এন্‌জাইম : রাসায়নিক শিল্পে অনুঘটকের প্রভাব — তেলের হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়া : চর্বি ও তেলের রাসায়নিক প্রভেদ ; স্নেহ-খাদ্যের বিকল্প মার্গারিন ; নিকেল ধাতুর অনুঘটনে হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়া : সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন-শিল্প — গন্ধকের অক্সিডেসনে দ্বি-মুখী বিক্রিয়া ; সীসক-প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি ও সংস্পর্শ পদ্ধতি ; অনুঘটনে প্লাটিনাম ও ভ্যানাডিয়াম : ওয়াটার-গ্যাসের অনুঘটন-ক্রিয়া : মেথানল বা উড্-স্পিরিট ; মিথেন থেকে ওয়াটার-গ্যাস : কয়লার হাইড্রোজেনেসন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই রসায়ন-বিজ্ঞানের আধুনিক নবযুগ সুরু হয়েছে। পদার্থের গঠন ও রাসায়নিক ক্রিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক মতবাদ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ; আর যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিক মতবাদগুলি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে একে একে বিদায় নেয়। ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়সিয়ের 1774 খৃষ্টাব্দে 'ফ্লোজিস্টন' মতবাদকে ভুল প্রমাণিত করে দহনের প্রকৃত রাসায়নিক তাৎপর্য নিরূপণ করেন (পৃষ্ঠা 68) ; আর বৃটিশ রসায়নবিদ্ জন ডাল্টন পদার্থের পারমাণবিক তত্ত্বের সূত্র (পৃষ্ঠা 29) নির্ধারণ করে রাসায়নিক ক্রিয়ার মূল তথ্যের ব্যাখ্যা করেন 1803 খৃষ্টাব্দে। বস্তুতঃ এ-দু'টি প্রমাণসিদ্ধ যুগান্তকারী মতবাদের ফলে নব্য রসায়নী-বিদ্যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এর পর থেকেই রসায়ন-বিজ্ঞানীরা পূর্ণ আস্থা নিয়ে নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করেন। কেবল রাসায়নিক যৌগিকই নয়, প্রাকৃতিক যৌগগুলিরও উপাদানিক গঠন ও মৌলিক সংযুতি নিরূপিত হয়। এমন কি, বিজ্ঞানীরা ক্রমে বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক ওজন তুলনামূলকভাবে সঠিক নির্ধারণ করেন এবং তা থেকে যৌগের আণবিক ওজন নির্ধারিত হয়।

এভাবে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও ক্রিয়া-কলাপ ক্রমে সুনির্দিষ্ট প্রামাণিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে যৌগের সংগঠক মৌলগুলির সংযোজন-বিয়োজন সহজসাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষতঃ জৈব যৌগগুলির গঠনে সর্বক্ষেত্রেই কার্বন-মৌলের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়ে প্রাকৃতিক জৈব পদার্থগুলির রাসায়নিক গঠন-রহস্যও জানা গেছে; আর এই কার্বন-ঘটিত বিবিধ জৈব যৌগগুলির রাসায়নিক তথ্যাদি নিয়ে রসায়নের এক নূতন শাখা গঠিত হয়, যার নামকরণ হয়েছে 'কার্বন-রসায়ন' বা **জৈব রসায়ন** (ইংরাজীতে অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি)। ক্রমে এই জৈব রসায়নের অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞানীরা বহু চমকপ্রদ রাসায়নিক তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান পান এবং প্রাকৃতিক পদার্থের অনুরূপ গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট বিবিধ ঔষধ, রং, সুগন্ধী দ্রব্য প্রভৃতি বহুবিধ কৃত্রিম জৈব যৌগিক রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এ-সবের ফলে কেবল তত্ত্বীয় রসায়নেরই নয়, রাসায়নিক শিল্পেরও বিস্ময়কর প্রসার ঘটিয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা মানব-কল্যাণে রসায়নের নানা অমূল্য অবদান জুগিয়েছেন।

রসায়ন-বিজ্ঞানের এই নব যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নিরলস গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পদার্থের সংগঠক অণুর আভ্যন্তরীণ গঠন, অর্থাৎ অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুরা কিরূপ সংস্থানে, কতগুলি ও কিভাবে বিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন যৌগের অণু গঠন করে, তার নিগূঢ় তথ্যাদি সম্যক নিরূপিত হয়ে পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে, এ-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেকালের বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক ক্রিয়ায় যোগদান-কারী বিভিন্ন পদার্থ ও তাদের সংযোগে গঠিত যৌগগুলির কেবল বস্তুগত পরিবর্তন বা রূপান্তরই প্রধানতঃ লক্ষ্য করতেন। পরবর্তী-কালের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বা রূপান্তরিত পদার্থই কেবল নয়, কিরূপ বিক্রিয়ায় বা কি পদ্ধতিতে রাসায়নিক রূপান্তরটা ঘটে, তারও সঠিক তথ্য নিরূপণ করেন। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে
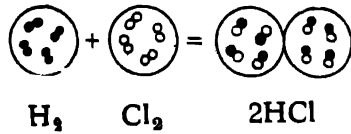
H_2 + Cl_2 = $2HCl$

H_2 H_2 + O_2 = $2H_2O$
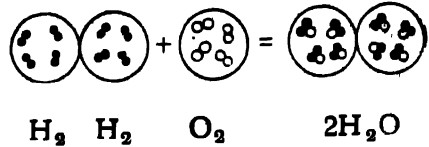
রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগে অণুর গঠন পদ্ধতি

রাসায়নিক বিক্রিয়া কেন দ্রুত বা শ্লথ হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়ার গতি-প্রকৃতি, ধারা ও দ্রুততা সম্বন্ধীয় তথ্যাদিও ক্রমে রসায়ন-বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ-সব তথ্যাদি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আধুনিক রসায়নের একটি বিশেষ শাখার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; যাকে বলা হয় **রাসায়নিক গতি-বিদ্যা** (কেমিক্যাল ডাইনামিক্স)। এ-সব তথ্যাদি থেকে জানা যায়, রাসায়নিক ক্রিয়ার মূলে রয়েছে বিভিন্ন পদার্থের নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি, যাকে আমরা সাধারণতঃ বলি পদার্থের **আণবিক শক্তি**; বস্তুতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ায় পদার্থের নিজস্ব এই আণবিক বা রাসায়নিক শক্তিই প্রধান বিচার্য। এ-যুগে আমরা জানি, পদার্থমাত্রই শক্তির আধার বা বাহক; পদার্থের অণুর (পরমাণুরও) সংগঠনে শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। পদার্থের বা তার অণুর সেই সাংগঠনিক আণবিক শক্তিই রাসায়নিক ক্রিয়ায় সপ্রকাশ হয়, যাকে বলা হয় **রাসায়নিক শক্তি**। এই শক্তিই আবার তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে দেখা দেয়। রাসায়নিক ক্রিয়ায় শক্তির এরূপ বিভিন্ন রূপান্তরের ভিতর দিয়ে পদার্থেরও রূপান্তর ঘটে। এ-সব কথা আমরা 'পদার্থ ও শক্তি : বিভিন্ন বিস্ফোরক' শীর্ষক অধ্যায়ে পরে আলোচনা করবো।

রাসায়নিক গতি-বিদ্যা বা 'কেমিক্যাল ডাইনামিক্স' সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এর তাৎপর্য সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু ধারণা না হলে আধুনিক রসায়ন-বিদ্যা, বিশেষতঃ এ-যুগের নানা গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্পের সহজসাধ্য বিবিধ উৎপাদন-পদ্ধতির মূল তথ্যের পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তাই রাসায়নিক গতি-বিদ্যার সামান্য কিছু আলোচনা এখানে করা দরকার। রাসায়নিক ক্রিয়ার মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই এরূপ একটা ধারণা চলে আসছিল যে, যে-সব মূল পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক একটা সমগোত্রতা বা সমাকর্ষণ ধর্ম বর্তমান থাকে। রসায়নের ভাষায় একে বলা হয় রাসায়নিক সমগোত্রী আকর্ষণ বা **'কেমিক্যাল এফিনিটি'**। এই 'এফিনিটি' কথাটা আজও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এখন আর এতে বিক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণকারী পদার্থগুলির মধ্যে কোন বস্তুগত সম্পর্ক বা সমগোত্রতা বুঝায় না; পরন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে এক রকম তড়িৎধর্মী শক্তির অস্তিত্ব বুঝায়, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যা সক্রিয় হয়ে পদার্থগুলির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায়। মনে করা যায়, এই শক্তি

যেন পদার্থের অভ্যন্তরে **স্থিতি-শক্তি** (পোটেন্শিয়াল এনার্জি) রূপে অবস্থান করে ; আর তা বিশেষ অবস্থায় বিমুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হয় রাসায়নিক শক্তিতে ; যার প্রভাবে বিভিন্ন উপাদানের সংযোগ-বিয়োগের ফলে পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বা বস্তুগত রূপান্তর ঘটে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার এরূপ তাৎপর্যের মোটামুটি ব্যাখ্যা আমরা এই অধ্যায়ে আগেই দিয়েছি।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগঃ পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসায়নিক ক্রিয়ার **গতিবেগ** বা দ্রুততা। বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোজন-বিয়োজন ক্রিয়ার গতিবেগে যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমরা জানি, কোন
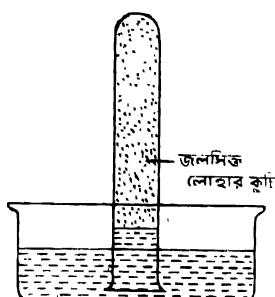
লোহার অক্সিডেসন-ক্রিয়া অতি মন্থরগতি
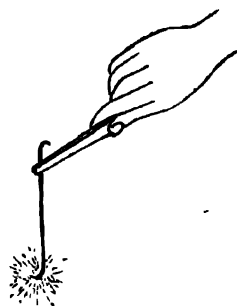
অ্যালুমিনিয়ামের দহন-ক্রিয়া অতি দ্রুত ও তীব্র

কোন রাসায়নিক ক্রিয়া অতি দ্রুত সংঘটিত হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয় অত্যন্ত ধীরগতি। লোহায় মরিচা (আয়রন অক্সাইড) ধরে, জীবের দেহাভ্যন্তরে দহন-ক্রিয়া চলে, অ্যালুমিনিয়ামের দহনে তার অক্সাইড সৃষ্টি হয়, কাঠ জ্বলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড জন্মায়, গান-কটন বা গান-পাউডার বিস্ফোরিত হয় ;—এসব রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগ বা দ্রুততার বিভিন্নতা সহজেই লক্ষ্যণীয়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগে এই যে গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয় তার কারণ কেবল রাসায়নিক আকর্ষণ বা 'কেমিক্যাল এফিনিটি' বললে সবটা বলা হয় না ; আরও নানা কারণ এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। রাসায়নিক পরিবর্তনের ধারা ও পদ্ধতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থগুলির ভর বা **বস্তু-পরিমাণ** ও প্রযুক্ত **তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি** রাসায়নিক ক্রিয়ার

গতিবেগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম-আয়তনের মধ্যে পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হবে রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পদার্থের রূপান্তর-ক্রিয়া তত দ্রুততর হবে। গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কথাটার সত্যতা সহজেই বুঝা যায়। আমরা জানি, গ্যাসের অণুগুলি আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে তীব্রবেগে সর্বদা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে; কাজেই বিভিন্ন গ্যাসীয় অণুরা স্বভাবতঃই পরস্পরের সঙ্গে মুহুর্মুহু সংঘর্ষের ফলে যথেষ্ট তাড়াতাড়ি ও সহজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায় এবং রাসায়নিক সংযোগ তাই দ্রুততর হয়। এখন ঐ গ্যাসীয় মিশ্রণের কোন একটা গ্যাসের পরিমাণ দ্বিগুণ করলে তার অণুদের অপর গ্যাসীয় অণুর সঙ্গে পারস্পরিক সংঘর্ষের সুযোগও দ্বিগুণ বাড়ে, রাসায়নিক ক্রিয়াও তাই দ্বিগুণ দ্রুততর সংঘটিত হয়। তারপরে আবার ঐ মিশ্রণের আর একটা গ্যাসের পরিমাণও অনুরূপভাবে দ্বিগুণিত করলে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাবে। এভাবে কেবল গ্যাসীয় সংযোগ-ক্রিয়াই নয়, কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রেও তথ্যটা সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষতঃ কঠিন বা তরল পদার্থের দ্রবণের ঘনত্ব বৃদ্ধি করলে তাদের অণুদের পারস্পরিক সংস্পর্শ ও সংঘাতের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে রাসায়নিক ক্রিয়া স্বভাবতঃই দ্রুততর ও তীব্রতর হয়ে থাকে। এ থেকে সহজেই বুঝা যায়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় যোগদানকারী পদার্থগুলির ভর বা বস্তু-পরিমাণের উপরে তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক ক্রিয়ার তীব্রতা বা গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করে। রসায়নের ভাষায় এই তথ্যটাকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'বস্তু-ভর বিক্রিয়া-সূত্র'; ইংরেজীতে বলে 'ল-অব্ মাস্ অ্যাকসন'।

রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপের প্রভাব ঃ তাপাংকের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরেও রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পদার্থের রূপান্তর-ক্রিয়ার তীব্রতা ও গতিবেগ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দহন-ক্রিয়ার আলোচনা প্রসঙ্গে 'দহন ও অগ্নি-উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয় আমরা আগেও একবার উল্লেখ করেছি। যদিও তাপের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, তবে মোটামুটি হিসাবে ধরা যায়, প্রতি 10° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে থাকে। তাপের তারতম্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগে যে বিরাট পার্থক্য ঘটে তা একটা সাধারণ হিসাব থেকে সহজেই বুঝা যাবে। মনে করা যাক, বরফের গলনাংক তাপমাত্রায় অর্থাৎ 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (32° ডিগ্রি ফারেনহিট) কোন রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ হতে এক সেকেণ্ড

লাগে। তাহলে জলের স্ফুটনাংক, অর্থাৎ 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা 212° ডিগ্রি ফারেনহিট তাপমাত্রায় ঐ একই রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেণ্ডের প্রায় হাজার ভাগের একভাগ সময়ে সংঘটিত হবে। তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে 200° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করলে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন হতে লাগবে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র সময়। এ-থেকে তাপ বৃদ্ধির ফলে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা বা প্রচণ্ডতা কিরূপ বৃদ্ধি পায় তা সহজেই অনুমেয়: এরূপ অতি দ্রুতসম্পন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াকেই বলা হয় **বিস্ফোরণ**। পক্ষান্তরে বলা যায়, যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে 200° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লাগে মাত্র এক সেকেণ্ড, 0° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তার সংঘটনে লাগবে দশ লক্ষ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে এগারো দিন। কাজেই বুঝা গেল, রাসায়নিক ক্রিয়ায় **তাপাংকের প্রভাব** বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ; বিশেষতঃ অল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উপযুক্ত মাত্রায় তাপ প্রয়োগের ব্যাপারটা অনেকক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের পথ দেখায়।

দ্বি-মুখী রাসায়নিক বিক্রিয়া: রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা সম্পর্কে আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় তথ্য হলো এই যে, কোন-কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি হয় দ্বি-মুখী; অর্থাৎ যে-সব পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ও তার ফলে যে-সব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদের পারস্পরিক ভর বা বস্তু-পরিমাণের বিভিন্নতায় রূপান্তর-ক্রিয়ার ধারা অবস্থানুযায়ী এদিকে-ওদিকে ঘুরে যায়। উত্তপ্ত লোহা-চুরের উপরে জলীয় বাষ্প (হাইড্রোজেন-অক্সাইড) প্রবাহিত করলে রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগের ফলে উৎপন্ন হয় লোহার অক্সাইড যৌগিক (আয়রন-অক্সাইড) ও হাইড্রোজেন গ্যাস। পক্ষান্তরে আবার উত্তপ্ত আয়রন-অক্সাইডের উপরে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে উভয়ের বিক্রিয়ায় পুনরায় ধাতব লৌহ (আয়রন) ও জলীয় বাষ্প (হাইড্রোজেন-অক্সাইড) উৎপন্ন হয়। এই **দ্বি-মুখী বিক্রিয়া**-টাকে এভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{লৌহ} + \underset{\text{(জলীয় বাষ্প)}}{\text{হাইড্রোজেন-অক্সাইড}} \rightleftharpoons \text{লৌহ-অক্সাইড} + \text{হাইড্রোজেন}$$
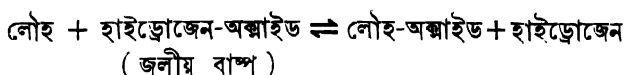
ব্যাপারটা ঘটে এরূপ: উত্তপ্ত লোহার উপরে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবাহের ফলে উভয়ের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস (উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে) ছড়িয়ে দূরে সরে যায়, কাজেই আয়রন-অক্সাইডের সংস্পর্শে এসে তাদের বিক্রিয়া ঘটবার সুযোগ হয় না। পক্ষান্তরে, প্রাথমিক বিক্রিয়াটা কিছুক্ষণ

চললে উৎপন্ন হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে আয়রন-অক্সাইডের সংস্পর্শে এসে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়া ঘটতে থাকে, ধাতব লৌহ উৎপন্ন হয়; হাইড্রোজেনের আধিক্য ঘটার ফলে জলীয় বাষ্প সরে গিয়ে লোহার সঙ্গে তার আর বিক্রিয়া ঘটতে পারে না। এভাবে হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে বাড়িয়ে-কমিয়ে ইচ্ছামত বিক্রিয়াটার দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। এখন যদি কোন আবদ্ধ পাত্রে এই বিক্রিয়াটা ঘটানো যায়, যাতে জলীয় বাষ্প ও উৎপন্ন হাইড্রোজেন বেরিয়ে যেতে না পারে, তাহলে কিছু সময় লোহা ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটবে। তারপরে প্রাথমিক এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন ও আয়রন-অক্সাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে আবার সেই লোহা ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হবে। এভাবে উভয় বিক্রিয়াই পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে : এর ফলে এক সময় জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের পরিমাণের একটা সমতা এসে উভয় দিকের বিক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যায়, কোন দিকে আর বিক্রিয়া ঘটে না। এই অবস্থাকে বলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার **স্থিরাবস্থা** বা সাম্য ভাব (কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম)।

উল্লিখিত বিক্রিয়ায় ঐ আবদ্ধ পাত্রে প্রযুক্ত তাপের পরিমাণ, অর্থাৎ তার তাপমাত্রা যতক্ষণ একই রাখা যায় ততক্ষণ ঐ বিক্রিয়ার স্থিরাবস্থা বজায় থাকে, জলীয় বাষ্প ও হাইড্রোজেনের পরিমাণ যা-ই থাক না কেন। কিন্তু তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটালে স্থিরাবস্থা আর থাকে না, বিক্রিয়া আবার সুরু হয়; তাপমাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাস, যা-ই করা যাক না কেন, কোন এক দিকে ঐ দ্বি-মুখী বিক্রিয়ার কাজ অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে আরম্ভ হয়ে যায়। এভাবে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে স্থিরাবস্থা ব্যাহত হয়ে যে-দিকেরই বিক্রিয়া চলে তাতেই রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে। এরূপ বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে রূপান্তরিত পদার্থে তাপ-শক্তি শোষিত হয় (তাপশোষক বা **এণ্ডোথার্মাল** বিক্রিয়া); আর তাপমাত্রা হ্রাস করবার ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা হয় তাপোদ্‌গারী (**এক্সোথার্মাল**) বিক্রিয়া।

রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটন

উল্লিখিত বিবিধ আলোচনা থেকে জানা গেল, রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিবেগ বা দ্রুততার হার বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থগুলির আনুপাতিক ভর বা পরিমাণ ও প্রযুক্ত তাপমাত্রার উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু

তা ছাড়াও আর একটা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে; তথ্যটা হলো এই যে, কোন কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিক্রেয় পদার্থগুলির মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা অপর কোন তৃতীয় পদার্থের উপস্থিতিতে অভাবিতভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটা এতই চমকপ্রদ ও সাধারণ রসায়নাগারে বা শিল্প-কারখানার রাসায়নিক তৎপরতার পক্ষে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অনেকদিন থেকেই রসায়ন-বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন, কোন বিশেষ অবস্থায় যে-সব পদার্থের মধ্যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না, পরস্পর নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়, অথবা বিক্রিয়া ঘটলেও তা অত্যন্ত ধীরগতি হয়; সে-ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে অপর কোন বিশেষ পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে মেশালেও সেই আপাত-নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলি বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অতি দ্রুত তাদের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়া ঘটে যায়। আরও আশ্চর্যের কথা, সেই মিশ্রিত পদার্থটা নিজে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না, যেমন মেশানো যায় তেমনি থাকে, কেবল তার উপস্থিতিতেই কাজ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন, কিন্তু তাঁরা এর তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারেন নি। অবশেষে 1838 খৃষ্টাব্দে সুইডেনের রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে একটা যুক্তি প্রদর্শন করেন, যা আজও প্রচলিত আছে। যুক্তিটা হলো

সুইডিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস

এই যে, এরূপ বিক্রিয়ায় অতিরিক্ত যে পদার্থটা মেশানো হয় তা বস্তুগতভাবে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ না করলেও তার প্রভাবে বিক্রেয় পদার্থগুলির অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত রাসায়নিক সংযোগ-প্রবণতা বা 'কেমিক্যাল এফিনিটি' জাগ্রত হয়ে ওঠে, আর তার ফলেই তাদের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়া সম্ভব ও দ্রুততর হয়। বার্জিলিয়াস এরূপ রাসায়নিক-ক্রিয়ার নাম দেন **ক্যাটালিসিস,** যাকে বাংলায় বলা হয় 'অনুঘটন' প্রক্রিয়া ; আর ঐ অতিরিক্ত যে পদার্থটার প্রভাবে এরূপ প্রক্রিয়া সম্ভব ও দ্রুততর হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় **ক্যাটালিস্ট** বা 'ক্যাটালিটিক এজেন্ট' ; যাকে বাংলায় আমরা বলি 'অনুঘটক'। মানবসমাজে ঘটকমশাই যেমন নিজে নির্লিপ্ত থেকে অপর দু'পক্ষের মিলন ঘটিয়ে দেন, রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটকের অবদানও তেমনি।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এরূপ অনুঘটন-প্রক্রিয়ার প্রকৃত রাসায়নিক তাৎপর্য আজও সঠিক নির্ধারিত হয় নি ; কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ায় এর গুরুত্ব অসামান্য, বহু রাসায়নিক শিল্প-প্রচেষ্টার সাফল্য এর সাহায্যেই সম্ভব হয়েছে। বিক্রেয় পদার্থগুলির পরিমাণের তুলনায় অনুঘটক পদার্থের পরিমাণ অতি নগণ্য হলেও তার প্রভাবে রাসায়নিক রূপান্তর যেরূপ দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ঘটে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের দ্রুততার হার বৃদ্ধিতে অনুঘটক হিসাবে জলীয় বাষ্পের প্রভাব, এর একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আমরা জানি, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণে তড়িৎ-স্ফুরণ ঘটালে গ্যাস দু'টার রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয় জল। আবার ঐ গ্যাস দু'টাকে আবদ্ধ পাত্রে বিশেষভাবে উত্তপ্ত করলেও তাদের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে ; প্রায় 600° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে গ্যাস দু'টার অতি দ্রুত ও তীব্র সংযোগে বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু এই রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়া গ্যাসীয় মিশ্রণটার মধ্যে সামান্য **জলীয় বাষ্প** থাকলেই কেবল সম্ভব হয় ; গ্যাস দুটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বা জলশূন্য হলে তাদের সংযোগ বস্তুতঃ ঘটে না। খোলা হাওয়ায় ফস্‌ফরাস পোড়ালে ফস্‌ফরাস-পেণ্টক্সাইড নামক যে যৌগিকটি পাওয়া যায় তার জল শোষণ-ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল ; কাজেই এই জলশোষক পদার্থটার সংস্পর্শে অনেকক্ষণ রেখে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণকে সম্পূর্ণ জলশূন্য করা যেতে পারে। তারপরে এই বিশুদ্ধ গ্যাসীয় মিশ্রণকে 600° ডিগ্রি কেন, 1000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলেও তাদের রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না। কেবল হাইড্রোজেন-অক্সিজেনই নয় ; আরও

বহু গ্যাসীয় মিশ্রণের সংযোগ-ক্রিয়া সামান্য জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতেই কেবল সম্ভব হয়ে থাকে ; আর তার অতি সামান্য পরিমাণেই কাজ হয়। এভাবে বিভিন্ন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প একটি বিশেষ কার্যকরী **অনুঘটক** বা ক্যাটালিস্টের কাজ করে।

রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগ বা দ্রুততা বাড়াতে অনেকক্ষেত্রে যে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা-পরিমাণ অনুঘটক পদার্থের উপস্থিতিই যথেষ্ট, তার একটা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক ; তা থেকে বুঝা যাবে, অনুঘটন-ক্রিয়ার প্রকৃত রহস্য বস্তুতঃ বিস্ময়কর। সোডিয়াম সালফাইট (সাল্‌ফাইট অব সোডা, Na_2SO_3) জলে দ্রবীভূত করে দ্রবণটাকে খোলা হাওয়ায় রাখলে বায়ুর অক্সিজেন সোডিয়াম-সালফাইটকে ধীরে ধীরে জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড) করে সোডিয়াম সালফেটে (Na_2SO_4) রূপান্তরিত করে। উপযুক্ত কোন অনুঘটক পদার্থ মিশিয়ে এই রূপান্তর-ক্রিয়ার দ্রুততা বৃদ্ধি করা যায় ; এজন্যে কপার বা তামা যথেষ্ট কার্যকরী বলে দেখা গেছে। মাত্র এক গ্রেন **কপার-সালফেট** বা তুঁতে (যাকে ইংরেজীতে ব্লু-স্টোনও বলে) প্রায় 10 লক্ষ গ্যালন জলে দ্রবীভূত করলে যে নামমাত্র তুঁতের অতি মৃদু জলীয় দ্রবণ পাওয়া যায়, আর তাতে যে কপার বা তামার অতি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব মাত্র থাকে সোডিয়াম-সালফাইটের সালফেটে রূপান্তরের বিক্রিয়ার দ্রুততা থেকে তা প্রমাণিত হয়। এই অতি মৃদু দ্রবণ, যাতে কপার এক রকম নেই বললেও চলে, তার অনুঘটনে দ্রবণের সোডিয়াম-সালফাইট অতি অল্প সময়ে সোডিয়াম-সালফেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমন কি, একখণ্ড তামা মাত্র মিনিটখানেক সময় জলের ডুবিয়ে রাখলে সেই জলে তামার যে লেশ-পরিমাণ অস্তিত্ব এসে যায় তার অনুঘটনেও এই রূপান্তর-ক্রিয়ার গতি-বৃদ্ধি কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। কোন পদার্থের এরূপ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণেও যে অনুঘটন-ক্রিয়া সম্ভবপর, এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন ; কিন্তু দৃষ্টান্তটা কাল্পনিক নয়, প্রমাণসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিবিধ অনুঘটন : বিশেষ বিশেষ পদার্থের অনুঘটনে রাসায়নিক রূপান্তরের দ্রুততা কেবল বাড়েই না, কোন-কোন ক্ষেত্রে দ্রুততা হ্রাসও পায়। এ থেকে বলা যায়, অনুঘটন-ক্রিয়া দু'রকম হতে পারে — **ধনাত্মক**, অর্থাৎ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা বৃদ্ধিকারী অনুঘটক এবং **ঋণাত্মক**, অর্থাৎ দ্রুততা হ্রাসকারী অনুঘটক। আগেই বলা হয়েছে, জলীয় দ্রবণের সোডিয়াম সাল্‌ফাইট সামান্য তামা বা কপারের অনুঘটনে অতি দ্রুত জারিত (অক্সিজেন-সংযুক্ত) হয়ে সোডিয়াম

সালফেটে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু কপার বা তার লবণের বদলে টিনের কোন ধাতব লবণ মেশালে এই রূপান্তর-ক্রিয়াটা যথেষ্ট ধীরগতি হয়ে পড়ে। আবার কোন **অবক্ষার,** অর্থাৎ অ্যাল্‌কালয়েড শ্রেণীর পদার্থ (যেমন তামাক পাতার 'নিকোটিন') মেশালেও উক্ত রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ার দ্রুততা বিশেষ-ভাবে হ্রাস পায়, সহজে আর সালফাইট-লবণ সালফেট-লবণে রূপান্তরিত হয় না। এমন কি, সোডিয়াম সালফাইটের জলীয় দ্রবণে সিগারেটের ধোঁয়া (যাতে তামাকের **নিকোটিন** কিছুটা থাকে) ছাড়লেও বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগে সালফাইটের জারণ-ক্রিয়া লক্ষণীয়ভাবে ব্যাহত হয়। এরূপ ঋণাত্মক অনুঘটন-ক্রিয়ায় অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও সাধিত হয়; এই শ্রেণীর অনুঘটক পদার্থ মিশিয়ে কোন কোন পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত বিয়োজন রোধ করে পদার্থটার স্থায়িত্ব বিধান করা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নাইট্রো-কটন, নাইট্রো-গ্লিসারিন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিস্ফোরক পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ রোধ করবার জন্যে **ঋণাত্মক অনুঘটক** পদার্থ হিসাবে 'ডাইফিনাইল্যামাইন' নামক একটা রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়। আবার প্রাকৃতিক রাবার ও রেশমের স্বাভাবিক জারণ বা অক্সিডেসন প্রক্রিয়া-জনিত বিকৃতি রোধ করতে 'থায়ো ইউরিয়া' প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ ঋণাত্মক অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মোটর-স্পিরিট ও পেট্রলের অত্যধিক দ্রুত জারণ বা দহন-ক্রিয়া রোধ করবার জন্যে ঋণাত্মক ক্যাটালিষ্ট হিসেবে বিশেষ বিশেষ পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে মেশানো হয়, যাদের সাধারণভাবে বলা হয় পেট্রলের অ্যান্টিনক (anti-knock)।

অনুঘটন-ক্রিয়ায় প্লাটিনাম

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে **প্লাটিনাম** ধাতুর কার্যকারিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, গুরুত্বপূর্ণও বটে। গ্যাসীয় মিশ্রণের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোগ বা জারণ-ক্রিয়ার দ্রুততা বৃদ্ধিতে প্লাটিনামের অনুঘটন-প্রভাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের গ্যাসীয় মিশ্রণের রাসায়নিক সংযোগ-ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হয়েছে, তা-ই পুনরায় ধরা যাক্। আমরা দেখেছি, সামান্য জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাস দু'টা বিস্ফোরণের আকারে অতি দ্রুত সংযুক্ত হয়, সাধারণ তাপমাত্রায় তাদের সামান্য সংযোগের কোন আভাসও লক্ষিত হয় না। কিন্তু সাধারণ

তাপমাত্রায়ই ঐ গ্যাসীয় মিশ্রণের রাসায়নিক সংযোগ ধাতব প্লাটিনামের সংস্পর্শে অতি দ্রুতগতিতে ঘটতে সুরু করে। এরূপ ক্ষেত্রে প্লাটিনামের ধাতব খণ্ডের বদলে ধাতুটার সূক্ষ্ম চূর্ণ (যাকে 'স্পঞ্জি প্লাটিনাম' বা 'প্লাটিনাম ব্ল্যাক' বলে) ব্যবহার করলে গ্যাস দু'টার রাসায়নিক সংযোগ এত দ্রুত হয় যে, এই তীব্র বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত তাপে প্লাটিনাম প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং ঐ গ্যাসীয় মিশ্রণ প্রজ্জলিত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। প্লাটিনামের এরূপ অনুঘটন-প্রভাব থেকে সমগ্র অনুঘটন-পদ্ধতির দু'টি মূল তথ্য ও বিশেষত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়; যেমন—অনুঘটক পদার্থের সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগ বিশেষ ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু সেই পদার্থটা রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোনরূপ অংশ গ্রহণ করে না, তার গঠন ও পরিমাণ অপরিবর্তিতই থাকে। এজন্যে ঐ একই প্লাটিনাম বার-বার ব্যবহার করে অপরিমিত পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগ সাধন করা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই প্লাটিনাম-কণিকার এরূপ বিস্ময়কর অনুঘটন-শক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। তৎকালের রসায়নবিদ্‌রা অল্পকালের মধ্যেই এর একটা বাস্তব প্রয়োগের কৌশল উদ্ভাবন করেন। 1823 খৃষ্টাব্দে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী ডোবেরেনার (Dobereiner) লক্ষ্য করেন, মুক্ত বায়ুতে স্পঞ্জি-প্লাটিনামের উপরে হাইড্রোজেন গ্যাসের ধারা নিক্ষেপ করলে সেই হাইড্রোজেন ও বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগ-ক্রিয়ায় যে তাপের সৃষ্টি হয় তাতে প্লাটিনাম প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আর ধারা-মুখে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলতে থাকে। ডোবেরেনার এ থেকে অগ্নি-উৎপাদনের একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই যন্ত্রে দস্তা বা জিঙ্কের উপরে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়ে একটা সূক্ষ্ম নলপথে নির্গত হতো। চাবি খুলে দিলে হাইড্রোজেনের এরূপ সূক্ষ্ম ধারা গিয়ে প্লাটিনামের উপরে পড়ে, আর উল্লিখিত বিক্রিয়ায় নলমুখে গ্যাসটা জ্বলতে থাকে। অগ্নি উৎপাদনের জন্যে দেশলাই উদ্ভাবিত হওয়ার আগে এই 'ডোবেরেনার-বাতি' অগ্নি উৎপাদনের সহজ পদ্ধতি হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হতো। 'দহন ও অগ্নি-উৎপাদন' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা অগ্নি উৎপাদনের এরূপ নানারকম প্রাচীন পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি।

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট হিসাবে কাজ করে সত্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ অক্সিডেসন বা জারণ-ঘটিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্লাটিনামই বিশেষ কার্যকরী অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আবার গ্যাস-ম্যাণ্টেল তৈরি করতে যে সিরিয়াম-অক্সাইড বা 'সিরিয়া' সামান্য পরিমাণে (পৃষ্ঠা 212) ব্যবহৃত হয় সেই সিরিয়া কোল-গ্যাসের অক্সি-ডেসন বা দহন-ক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে থাকে। যাহোক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোল-গ্যাসের বাতি প্রজ্জ্বলনের জন্যে প্লাটিনাম-চূর্ণের উপরে কোল-গ্যাসের সূক্ষ্ম ধারা নিক্ষেপ করলেও **প্লাটিনামের অনুঘটনে** গ্যাসটা জ্বলে সত্য, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ প্লাটিনামের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। প্লাটিনামের অনুঘটন-শক্তির এরূপ বিনাশ (যাকে প্লাটিনামের 'পয়জনিং' বা বিষাক্ত হওয়া বলা হয়) ও তার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া কেবল বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই নয়, পরন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প-পদ্ধতিতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্লাটিনামের অনুঘটন-শক্তি এরূপ লোপ পায়; এ বিষয় আমরা পরে এই অধ্যায়েই সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদনে 'সংস্পর্শ পদ্ধতি' (কন্‌ট্যাক্ট প্রোসেস) প্রসঙ্গে যথোচিত আলোচনা করবো।

আধুনিক শিল্প-প্রগতির যুগে অনুঘটন-পদ্ধতি রসায়নের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে-কোন শিল্পে, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্প-কারখানায় অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব করে শিল্প-প্রচেষ্টাকে লাভজনক করে তুলতে উপযুক্ত অনুঘটকের প্রয়োজন ও কার্যকারিতার তুলনা নেই। তাই বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপযুক্ত অনুঘটক পদার্থের অনুসন্ধান করা এ-যুগে রাসায়নিক গবেষণার এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সব সময় বিধিবদ্ধ গবেষণা ও যুক্তিসিদ্ধ রাসায়নিক তৎপরতার ফলেই যে বিভিন্ন অনুঘটক আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন নয়; অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ কার্যকরী অনুঘটকের আবিষ্কার ঘটেছে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এর একটা চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; এ থেকে অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তাৎপর্যেরও ধারণা করা যাবে। ইংল্যাণ্ডের এক রং-এর কারখানায় এক সময় বিশেষ একটা 'অ্যালিজারিন' রং ('রাসায়নিক সংশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রস্তুত করা হচ্ছিল; কয়লা বা কোল-টার থেকে 'অ্যান্‌থ্রাসিন' নামক যে রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালিজারিন-শ্রেণীর বহুবিধ কৃত্রিম রং প্রস্তুত করা হয়। একটা বিশেষ রং প্রস্তুত করতে সংগঠক পদার্থগুলিকে একটি লোহার পাত্রে উত্তপ্ত করা হতো; এক সময় পাত্রটা নষ্ট হয়ে যেতে অনুরূপ আর একটা লোহার পাত্র তৈরি করা হলো। কিন্তু দেখা গেল, এ পাত্রে আর সেই নির্দিষ্ট রং-টা তৈরি হয় না, হয় আর একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রং। কারখানার রসায়নবিদ্‌রা

অবাক হয়ে গেলেন ; একই পদার্থ, একই প্রক্রিয়া, কোন দিকে কোন প্রভেদ নেই, অথচ সে-রং আর হয় না! অনেক অনুসন্ধানের পরে দেখা গেল, নতুন পাত্রটা লোহার বটে, কিন্তু তার ঢাকনাটা করা হয়েছে তামার। পরীক্ষায় বুঝা গেল, ঢাক্‌নার থেকে যে সামান্য তামার সংস্পর্শ পেয়েছে তাতেই এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে। তামার বিশেষ শক্তিশালী অনুঘটন-ক্রিয়ার প্রভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধারা বদলে গিয়ে নির্দিষ্ট রং-টার পরিবর্তে আর একটা সম্পূর্ণ নতুন রং উৎপাদিত হয়ে গেছে। এই আকস্মিক ঘটনা থেকে এই শ্রেণীর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তামা বা কপারের অনুঘটন-প্রভাবের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তা থেকে নানারকম মূল্যবান নতুন 'অ্যালিজারিন' শ্রেণীর কৃত্রিম রং উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

জৈব ক্রিয়ায় প্রাকৃতিক অনুঘটন

অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম তত্ত্বাদি ও বিভিন্ন অনুঘটকের ব্যবহার রাসায়নিক গবেষণা ও শিল্প-প্রচেষ্টায় যেমন গুরুত্বপুর্ণ, তেমনি প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতেও এর কার্যকারিতা কেবল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণই নয়, অধিকতর বিস্ময়কর ও তাৎপর্যপুর্ণ। প্রাণিদেহ যেন একটা জটিল রসায়নাগার, যেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থের আশ্চর্য সব রূপান্তর-ক্রিয়া অহরহঃ ঘটে চলেছে। জীবদেহে ভুক্ত খাদ্য ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে রক্ত, মাংস ও হাড় গঠিত হয় ; আবার সেই খাদ্যের মৃদু দহনে দেহের তাপ বজায় থাকে, কর্মশক্তি উপজাত হয়। অপর পক্ষে উদ্ভিদ-দেহেও অনুরূপ জটিল সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে, ফল-শস্য জন্মায়, যা আবার প্রাণীদের খাদ্য জোগায়। কেবল ফল-শস্যই নয়, কোন-কোন উদ্ভিদের সুমিষ্ট রস, পাতা ও ফুলের নানা সুদৃশ্য রং ও সুগন্ধ উদ্ভিদের মাধ্যমে প্রকৃতির রসায়নাগারে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হচ্ছে। এ-সব প্রাকৃতিক জৈব যৌগিকগুলির অধিকাংশই আজ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তাঁদের রসায়নাগারে তৈরি করছেন বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায়। প্রাকৃতিক জৈব যৌগিকগুলির অনুরূপ কৃত্রিম পদার্থ উৎপাদিত হয়ে এ-যুগে রসায়ন-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু একটা কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, মানুষের ও প্রকৃতির রাসায়নিক পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের মধ্যে কত বিভিন্নতা! রাসায়নিক তাঁর পরীক্ষাগারে বা কারখানায় কত পরিশ্রমে, কত বুদ্ধি খাটিয়ে, উচ্চ তাপ ও

চাপ সৃষ্টি করেন, কত রকম জটিল বিক্রিয়া ঘটিয়ে আকাঙ্খিত যৌগটা উৎপাদন করেন ; আর প্রকৃতি নিঃশব্দে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সাধারণ তাপ ও চাপের সাহায্যেই অতি জটিল সব জৈব যৌগিক গঠন করে ফেলে। প্রাণী-দেহের অভ্যন্তরস্থ রাসায়নিক রূপান্তরগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা চলে। এ-সবের মূলে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অনুঘটন-ক্রিয়ার প্রভাব। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা বিভিন্ন অনুঘটক পদার্থের সাহায্যে তাদের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়। বস্তুতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের জীবকোষ-গুলির ভিতরে এ-সব অনুঘটক পদার্থ স্বতঃই উৎপন্ন হয়, যাদের বলা হয় **এন্‌জাইম**। প্রাণীদের পাকস্থলীতে নিঃসৃত জারক-রসের 'পেপ্‌সিন', মুখের লালার 'টায়ালিন', অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াসের 'ট্রিপ্‌সিন' প্রভৃতি ও বার্লি শস্যদানার 'ডায়াস্টেস', ঈস্টের 'জাইমেস' প্রভৃতি সবই এন্‌জাইম শ্রেণীর অনুঘটক পদার্থ। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে এরূপ অসংখ্য অনুঘটকের সন্ধান পাওয়া গেছে ; আর পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রকৃতি তার অভিনব রাসায়নিক সংশ্লেষণ-ক্রিয়ায় এদের সাহায্যে নিঃশব্দে কার্যোদ্ধার করে।

প্রকৃতির রাজ্যে উল্লিখিত বিশেষ শ্রেণীর বিভিন্ন অনুঘটক বা এন্‌জাইমের প্রভাবে যে-সব জটিল রাসায়নিক সংশ্লেষণ-ক্রিয়া চলছে তা যতই গুরুত্বপুর্ণ ও মূল্যবান হোক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মে তা স্বতঃই ঘটে চলেছে, মানুষের তাতে কোন হাত নেই। কিন্তু রাসায়নিক উৎপাদন-শিল্পে মানুষ উপযুক্ত অনুঘটকের সাহায্যে যে-সব বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে তারও তুলনা নেই ; মানব-কল্যাণে রসায়নের এ এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। শিল্প-উৎপাদনে যত দ্রুতগতিতে উৎপাদন সম্ভব করা যায় ততই সময় বাঁচে, লাভ বেশি হয় ; **সময়ই অর্থ,**— এ কথাটা এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সাহায্যেই রাসায়নিক শিল্পে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় ; তাই রসায়নে অনুঘটকের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণার ফলে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন নতুন অনুঘটক উদ্ভাবিত হয়ে নানা গুরুত্বপুর্ণ রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠেছে, পুরাতন শিল্পগুলির উৎপাদন-পদ্ধতি বদলে গেছে। বস্তুতঃ আধুনিক রাসায়নিক শিল্পে অনুঘটনের যুগ চলছে, এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের প্রভাব সম্বন্ধে বহু আলোচনা এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ছড়িয়ে আছে ; বিশেষতঃ জ্বালানীর আলোচনা (পৃঃ 226) প্রসঙ্গে কয়লার হাইড্রোজেনেসন, ওয়াটার-গ্যাস থেকে কৃত্রিম পেট্রল প্রভৃতির

উৎপাদন-পদ্ধতিতে বিভিন্ন অনুঘটকের শিল্পভিত্তিক ব্যবহারের কথা আমরা আলোচনা করেছি। এখানে শিল্প-জগতে যুগান্তকারী অতি গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি অনুঘটন-প্রক্রিয়ার আলোচনা করা যেতে পারে।

উদ্ভিজ্জ তেলের হাইড্রোজেনেসন

আজকাল উদ্ভিজ্জ বনস্পতি ঘৃতে বাজার ছেয়ে গেছে, প্রকৃত ঘৃতের বিকল্প হিসেবে এ-যুগে যা বহু প্রচলিত। জিনিসটা আসলে ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তেল; তরল তেলকে ঘনীভূত করে কঠিন চর্বিজাতীয় স্নেহ-পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়। তেলের সঙ্গে অতিরিক্ত হাইড্রোজেনের সংযোগে এই রূপান্তর-ক্রিয়া বিশেষ অনুঘটকের প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে, আর এটা এ-যুগে একটা বিরাট রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। তাই এই পদ্ধতিটাকে বলা হয় 'তেলের হাইড্রোজেন-সংযোগ ; ইংরেজিতে 'হাইড্রোজেনেসন অব অয়েল।'

আমরা জানি, সব রকম জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল হলো মূলতঃ **গ্লিসারাইড** যৌগিক, অর্থাৎ গ্লিসারিনের সঙ্গে পামিটিক, স্টিয়ারিক ও অলেয়িক অ্যাসিডের বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগ। সাবান-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সব কথা আগেই বিশদভাবে বলা হয়েছে। স্টিয়ারিক ও পামিটিক অ্যাসিডের গ্লিসারিন-যৌগিকগুলি সবই কঠিন পদার্থ, জান্তব চর্বির মূল উপাদান। আর অসম্পৃক্ত অলেয়িক অ্যাসিডের গ্লিসারিন-যৌগিক হলো তরল পদার্থ, যা সব রকম উদ্ভিজ্জ তেলের মুখ্য উপাদান। বস্তুতঃ জান্তবই হোক, বা উদ্ভিজ্জই হোক, তরল তেল মাত্রই অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের সংযোগে উৎপন্ন গ্লিসারাইড যৌগ। বিভিন্ন চর্বি ও তেলের ব্যবহার প্রধানতঃ দু'রকম — দেহের শক্তি ও তাপ উৎপাদক কার্বন-ঘটিত খাদ্যরূপে ও সাবান শিল্পে। নারিকেল, বাদাম প্রভৃতির উদ্ভিজ্জ তেল যদিও সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গো-মহিষাদির দুধের স্নেহপদার্থ মাখন ও ঘি স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর হিতকারী বলে এগুলি স্নেহজাতীয় খাদ্য হিসাবে উৎকৃষ্ট। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই ঘৃত, মাখন প্রভৃতি স্নেহখাদ্য প্রয়োজনানুরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া কঠিন, সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্মূল্যও বটে। অথচ জীব-জন্তুর চর্বি মূলতঃ একই স্নেহপদার্থ (ফ্যাট), পাওয়াও যায় প্রচুর ; কিন্তু প্রধানতঃ দুর্গন্ধের জন্য একক তা খাওয়া যায় না। অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান হিসাবে স্নেহ-জাতীয় পদার্থের এই অভাব দূর করবার জন্যে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এর একটা

বিকল্প মাখনজাতীয় স্নেহ-খাদ্যের প্রচলন হয়েছে, যাকে বলা হয় **মার্গারিন**। ফরাসী দেশেই এটা প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে এবং 1870 খৃষ্টাব্দ থেকে এই কৃত্রিম মাখন বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলির স্নেহ-খাদ্যের অভাব মিটিয়েছে। গরু, শূকর প্রভৃতির কঠিন চর্বিকে উত্তাপে গলিয়ে ছেঁকে পরিষ্কার করে তার সঙ্গে নারিকেল, বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতির তরল উদ্ভিজ্জ তেল যন্ত্রের সাহায্যে ঘুঁটে-মিশিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়। এর সঙ্গে আবার কিছুটা দুধও মেশানো হয়, যাতে মিশ্রণটা যথেষ্ট অবদ্রবিত (ইমাল্‌সিফাইড) হয়, আর তার গন্ধটাও ভাল হয়। মিশ্রিত দুধে জীবাণুর বিক্রিয়ায় ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে মার্গারিনের স্বাদ ও গন্ধের উন্নতি ঘটায়। দেহের তাপ ও শক্তি উৎপাদক স্নেহপদার্থ হিসাবে জিনিসটার যথেষ্ট উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যোপাদান ভিটামিন না থাকায় উনবিংশ শতাব্দীতে এর খাদ্যমূল্য আশানুরূপ ছিল না। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে ভিটামিন-এ ও ভিটামিন-ডি ('হর্মোন ও ভিটামিন শীর্ষক' অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মিশিয়ে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যপ্রাণ-সমৃদ্ধ করে মার্গারিন উৎকৃষ্ট স্নেহ-খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মার্গারিন-শ্রেণীর এরূপ কৃত্রিম মাখন উৎপাদন করতে প্রধানতঃ জান্তব চর্বি বিপুল পরিমাণে ব্যয়িত হতে থাকে; কাজেই ক্রমে সাবান-শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চর্বি সরবরাহে ঘাট্‌তি দেখা দেয়। এই অভাব দূর করবার জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তেলকে কঠিন চর্বিতে রূপান্তরিত করবার রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে যত্নবান হন। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই রূপান্তরের একটা শিল্প-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন ফরাসী রসায়নবিদ্‌ পল স্যাবাটিয়ার ও ব্যাপ্টিষ্ট সেণ্ডারিন্‌স। অল্পকালের মধ্যেই এটা মানব-কল্যাণে রসায়নের একটা বিশেষ অবদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে; আর তার মূলে রয়েছে নিকেল-ধাতুর অনুঘটন প্রভাব। রাসায়নিক তত্ত্বের দিক দিয়ে তেলের রূপান্তর-ক্রিয়ার এই পদ্ধতিটা বিশেষ কিছু জটিল নয়। আমরা আগেই বলেছি, কঠিন ফ্যাট বা **চর্বি** হলো সম্পৃক্ত স্টিয়ারিক অ্যাসিডের গ্লিসারাইড যৌগিক, আর তরল উদ্ভিজ্জ **তেল** হলো অসম্পৃক্ত অলেয়িক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের সংযোগে গঠিত একটি যৌগিক পদার্থ। ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড থেকে অলেয়িক অ্যাসিডের প্রভেদ মাত্র এই যে, এটা একটা অসম্পৃক্ত অ্যাসিড, অর্থাৎ অলেয়িক অ্যাসিডের গঠনে হাইড্রোজেনের

ভাগ যথোপযুক্ত থাকে না, থাকে সম্পৃক্ত স্টিয়ারিক অ্যাসিডের চেয়ে পরিমাণে কম। কাজেই অসম্পৃক্ত অলেয়িক অ্যাসিডের সঙ্গে যথোপযুক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটালে তা কঠিন স্টিয়ারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তরল গ্লিসারিন-অলিয়েট যৌগিকের, অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটিয়েও পাওয়া যায় কঠিন চর্বি বা গ্লিসারিন- স্টিয়ারেট। এই রাসায়নিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা তেমন কিছু কঠিন নয়; রসায়নাগারে তরল অলিয়েট বা উদ্ভিজ্জ তেলের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে তা ঘনীভূত হয়ে স্টিয়ারেটে রূপান্তরিত হয় সত্য, কিন্তু এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত ধীর-গতি বলে এভাবে শিল্পোৎপাদন সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বহু গবেষণার পরে উল্লিখিত দু'জন ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী অনুঘটক হিসাবে **নিকেল** ধাতুর চূর্ণ ব্যবহার করে উদ্ভিজ্জ তেলের এরূপ রূপান্তর-ক্রিয়া ত্বরান্বিত করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। এই ধাতু-চূর্ণের উপস্থিতিতে তিসি, তুলা-বীজ, সয়াবিন প্রভৃতির তরল তেলের অলেয়িক গ্লিসারাইড রাসায়নিক সংযোগে দ্রুত হাইড্রোজেন গ্যাস আত্মস্থ করে চর্বি-সদৃশ কঠিন স্টিয়ারেট যৌগিকে রূপান্তরিত হয় এবং তা খাদ্য হিসাবে ও সাবান-শিল্পে ব্যবহার করা চলে।

বিভিন্ন তরল উদ্ভিজ্জ তেলকে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজে ও অল্প সময়ে চর্বি বা ফ্যাটের অনুরূপ ঘনীভূত (প্রায়) কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়; এই পদ্ধতিকেই বলা হয় **হাইড্রোজেনেসন** প্রক্রিয়া। তেলের এরূপ রূপান্তর-ক্রিয়ার ফলে কেবল সাবান-শিল্পেরই প্রয়োজনীয় ফ্যাটের সমস্যা দূর হয় নি, পরন্তু মানুষের প্রয়োজনীয় স্নেহজাতীয় খাদ্যোপাদানের সমস্যাও বহুলাংশে মিটেছে। এ-যুগে দাল্‌দা জাতীয় যে-সব বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ঘৃত বাজারে চলছে এবং আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করছি তা এই হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঘনীভূত উদ্ভিজ্জ তেল ছাড়া আর কিছুই নয়। জান্তব চর্বি বা ঘৃত-মাখনের মত যথোপযুক্ত প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ না হলেও রাসায়নিক বিচারে জিনিসটা মূলতঃ ফ্যাটের মতই **গ্লিসারিন-স্টিয়ারেট**।

নিকেল ধাতুর অনুঘটন প্রভাবে তেলের এই হাইড্রোজেনেসন পদ্ধতি আজ-কাল একটি বিশেষ লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এর সাহায্যে, এমন কি, তিসি, রেড়ি প্রভৃতির দুর্গন্ধ ও অখাদ্য উদ্ভিজ্জ তেলও গন্ধহীন হয়ে ঘনীভূত স্নেহ জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়, যা স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে

তিমি মাছের দুর্গন্ধ তেলকে এই প্রক্রিয়ায় ফ্যাটে রূপান্তরিত করে খাদ্য হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। বিস্বাদ ও বিদ্‌ঘুটে গন্ধের জন্যে আগে তিমির তেলের বস্তুতঃ কোন ব্যবহারই ছিল না। সয়াবিনের এক রকম অরুচিকর গন্ধযুক্ত তেলও এভাবে জমিয়ে একটি গন্ধহীন উৎকৃষ্ট স্নেহ-খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সয়াবিনে তেল থাকে শতকরা প্রায় বিশ ভাগ; আর তাতে খাদ্যের আমিষ উপাদান প্রোটিনও যথেষ্ট থাকে।

সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন

সালফিউরিক অ্যাসিড বা 'অয়েল অব ভিট্রিয়ল, (H_2SO_4) আধুনিক শিল্প-সভ্যতায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অ্যাল্‌কেমিস্টদের রাসায়নিক তৎপরতার ফলেই এটা আবিষ্কৃত হয়েছিল। সালফিউরিক অ্যাসিডকে সব রকম অ্যাসিডের জনক বলা হয়, আর অধিকাংশ রাসায়নিক শিল্প-বিক্রিয়ায় এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে। বস্তুতঃ যে দেশে সালফিউরিক অ্যাসিড যত বেশি উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয় সে-দেশই এ-যুগে বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনে তত বেশি উন্নত হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতে বছরে কম করেও প্রায় দু' কোটি টন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদিত হয়ে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসিডটার শিল্পোৎপাদনে **অনুঘটন প্রক্রিয়ার** প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিষ্কৃত হয়ে বস্তুতঃ সমগ্র রাসায়নিক শিল্পে যুগান্তর এনেছে।

সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের মূল রাসায়নিক বিক্রিয়া হলো অক্সিডেসন বা জারণ। সালফারের (গন্ধকের) জারণ বা দহনে উৎপন্ন হয় সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস, যা আবার অক্সিজেন-সংযুক্ত বা জারিত হয়ে সাল্‌ফার ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) যৌগিক উৎপন্ন করে। এই সালফার-ট্রাইঅক্সাইড সহজেই জলে দ্রবিত হয়ে রাসায়নিক সংযোগে যে যৌগিক ($SO_3+H_2O=H_2SO_4$) সৃষ্টি করে তাকেই বলা হয় **সালফিউরিক অ্যাসিড**। বিক্রিয়াটার মধ্যে কোন জটিলতা নেই, সহজ বলেই মনে হয়; কিন্তু বিপদ হলো এই যে, সাধারণ তাপমাত্রায় সাল্‌ফার-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটে অতি সামান্য; এই জারণ-ক্রিয়া এত ধীরগতি যে তা লক্ষিতই হয় না। উত্তাপ বাড়ালে স্বভাবতঃই এই রাসায়নিক সংযোগ কিছুটা ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু তাতে আবার আর এক বিপদ! অধিক উত্তাপে অধিকতর পরিমাণে সালফার-

ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই বর্ধিত তাপমাত্রায় তা আবার বিয়োজিত হয়ে যায়। কথাটা হলো, তাপ বৃদ্ধির ফলে বিক্রিয়াটা হয় **দ্বিমুখী** ; তাই উৎপন্ন সালফার-ট্রাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ে না, ফলও কিছু পাওয়া যায় না। এই সমস্যা দূর করবার জন্যে অনেক গবেষণা হয়েছে, —এমন কোন অনুঘটক পদার্থের প্রয়োজন যার প্রভাবে অল্প তাপমাত্রায়ই সালফার-ডাইঅক্সাইড দ্রুত জারিত (অক্সিডাইজ্ ড) হয়ে সালফার-ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন হবে, কিন্তু সেই নিম্ন তাপমাত্রায় বিক্রিয়াটা দ্বি-মুখী হবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই এরূপ অনুঘটকের সন্ধান পাওয়া গেছে , পদার্থটা হলো **নাইট্রোজেন-অক্সাইড**। 1746 খৃষ্টাব্দ থেকেই সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে অনুঘটক হিসাবে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন গ্যাসীয় অক্সাইডের মিশ্রণ ('নাইট্রাস ফিউম্‌স' ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের এই শিল্প-পদ্ধতিটা মোটামুটি এরূপ : লেড বা সীসার পাতে তৈরী সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে গন্ধক বা সালফারের দহনে উৎপন্ন সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে বায়ু, নাইট্রোজেন-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প একসঙ্গে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন অক্সাইডের অনুঘটনে সালফার-ডাইঅক্সাইড বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সালফার-ট্রাইঅক্সাইড (SO_3) উৎপন্ন করে, যা আবার জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপন্ন করে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4)। এই **সীসক প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে** উৎপন্ন অ্যাসিড-দ্রবণে শতকরা প্রায় 65 ভাগ বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একে বিশোধিত ও ঘনীভূত করলে ব্যবহারোপযোগী তীব্রতা-বিশিষ্ট সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেন-অক্সাইড কোন অংশ গ্রহণ করে না ; অথচ প্রক্রিয়াটার সাফল্য নাইট্রোজেনের এই গ্যাসীয় অক্সাইডের উপস্থিতি ও অনুঘটন-প্রভাবের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের আর একটা পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, যা **সংস্পর্শ পদ্ধতি** বা 'কনট্যাক্ট প্রোসেস' নামে পরিচিত। এর মূল তথ্যটা হলো এই যে, প্লাটিনাম ধাতুর সংস্পর্শে, অর্থাৎ তার অনুঘটন-প্রভাবে সালফার-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের সংযোগ-ক্রিয়া অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় ; আর উৎপন্ন সালফার-ট্রাইঅক্সাইড জলে দ্রবিত হয়ে উৎপন্ন করে সালফিউরিক অ্যাসিড। শতাধিক বছর আগে 1817 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত

বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভি এই তথ্যটার উল্লেখ করেছিলেন—প্লাটিনাম-স্পঞ্জ, অর্থাৎ **প্লাটিনাম** ধাতুর চূর্ণ অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করলে সালফার-ডাই-অক্সাইডের অক্সিডেসন বা অক্সিজেন-সংযোগ ক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে ; কিন্তু পদ্ধতিটা তখন বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। এই প্রক্রিয়ায় সালফিউারক অ্যাসিড উৎপাদনের চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতেই কোথাও কোথাও হয়েছে, কিন্তু এর লাভজনক শিল্প-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় জার্মানির এক বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। যাহোক, প্লাটিনামের অনুঘটনে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগ যে বিশেষ ত্বরান্বিত হয় সে-কথা আগেই বলা হয়েছে ; সালফার ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের ক্ষেত্রেও তেমনি হয়ে থাকে।

সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্প-উৎপাদনে সীসক-প্রকোষ্ঠ পদ্ধতির চেয়ে এই সংস্পর্শ-পদ্ধতি অধিকতর সুবিধাজনক। এর জন্যে সীসার প্রকাণ্ড সব প্রকোষ্ঠের দরকার হয় না ; মোটা নলের ভিতরে বিশেষ ব্যবস্থায় চূর্ণিত প্লাটিনাম দিয়ে সেই নল-পথে সালফার-ডাইঅক্সাইড ও অক্সিজেনের (বা বায়ুর) মিশ্রণ প্রবাহিত করা হয়। অবশ্য নলের মধ্যে গ্যাসীয় প্রবাহের পথে প্লাটিনাম-চূর্ণ রাখা চলে না ; তাই অ্যাস্‌বেস্টসের সঙ্গে প্লাটিনাম-চূর্ণ জড়িয়ে (প্লাটিনাইজ্‌ড অ্যাস্‌বেস্টস), অথবা ম্যাগ্নেসিয়াম-সালফেট বা গলিত সিলিকার সঙ্গে প্লাটিনাম-চূর্ণ মিশিয়ে ঐ নলের মধ্যে রাখা হয়। সালফার-ডাইঅক্সাইডের অক্সিডেসন-ক্রিয়ায় নলের তাপমাত্রা 450° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে মোটামুটি স্থির রাখা হয়। প্লাটিনামের অনুঘটন-প্রভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড অতি দ্রুত ও প্রায় সম্যকভাবে জারিত হয়ে সালফার-ট্রাইঅক্সাইডে পরিণত হয়ে নলের নির্গম-মুখে সাদা ধূমের আকারে নির্গত হয়। সালফার-ট্রাইঅক্সাইডের এই ধূমকে সাধারণতঃ সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু জলীয় দ্রবণের মধ্যে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে দ্রবণটা অতি বিশুদ্ধ ও তীব্র সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, যাকে বলা হয় **অলিয়াম** ; এই অবস্থায় তা থেকে ধূম নির্গত হয়। এই ধূমায়মান বিশুদ্ধ সালফিউরিক অ্যাসিড একটি অতি শক্তিশালী ও বিভিন্ন বিক্রিয়ায় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ।

অনুঘটক হিসাবে প্লাটিনামের বিশেষ কার্যকারিতা থাকলেও এর একটা গুরুতর অসুবিধাও আছে। উল্লিখিত সংস্পর্শ-পদ্ধতিতে সালফিউরিক

অ্যাসিডের শিল্প-উৎপাদনে প্রথম দিকে সালফার-ডাইঅক্সাইড অতি দ্রুত জারিত হয়ে সালফার-ট্রাইঅক্সাইডে পরিণত হয় বটে, কিন্তু কিছুকাল পরে বিক্রিয়ার এই দ্রুততা হ্রাস পায় এবং শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্লাটিনামের অনুঘটন-শক্তি এভাবে নিঃশেষ হওয়াকে বলে **'প্লাটিনামের বিষাক্ততা'** (platinum poisoning); এ-কথার উল্লেখ আমরা আগেও করেছি। যাহোক, অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্লাটিনামের এরূপ শক্তিহীনতা বা বিষাক্ততার মূলে প্রধানতঃ রয়েছে আর্সেনিক, যা সালফার-ডাইঅক্সাইডের মালিন্য হিসাবে তাতে সামান্য পরিমাণে মিশে থাকে। শিল্পোৎপাদনে সচরাচর বিশুদ্ধ সালফার বা গন্ধক পুড়িয়ে সালফার-ডাইঅক্সাইড উৎপাদিত হয় না; খনিজ আয়রন-পাইরাইট, অর্থাৎ লোহার এক রকম প্রাকৃতিক সালফাইড (FeS_2) খনিজ জ্বালিয়ে যে সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় সালফিউরিক অ্যাসিডের শিল্পোৎপাদনে তা-ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই খনিজ সালফাইডের মধ্যে স্বভাবতঃই কিছু **আর্সেনিক** (বাংলায় যাকে সেঁকো-বিষ বলে) থাকে, যা উৎপন্ন সালফার ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে চলে গিয়ে প্লাটিনামের অনুঘটন-ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। নানারকম জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরূপ 'মৃত' বা নিষ্ক্রিয় প্লাটিনামকে পুনরায় অনুঘটন-ক্ষম করা যায় বটে; কিন্তু তার চেয়ে সহজতর ও লাভজনক একটি উপায় ইদানিং উদ্ভাবিত হয়েছে। সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে আজকাল প্লাটিনাম ধাতুর বদলে অনুঘটক হিসাবে **ভ্যানাডিয়াম** ধাতুর অক্সাইড (V_2O_5) যৌগিক ব্যবহার করা হয়। জিনিসটা বস্তুতঃ প্লাটিনামের চেয়ে অনেক সস্তা, অথচ অনুঘটনে যথেষ্ট কার্যকরী; বিশেষতঃ প্লাটিনামের মত ভ্যানাডিয়ামের কোন বিষ-ক্রিয়া ঘটে না।

সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনে আবদ্ধ পাত্রে বায়ু-প্রবাহের মধ্যে খনিজ আয়রন-পাইরাইট (লৌহ-সালফাইড, FeS_2) উত্তপ্ত করে, অথবা খোলা হাওয়ায় গন্ধক পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপাদিত ও সংগৃহীত হয়। উৎপাদন-ব্যয়ের হিসাবে খনিজ পাইরাইট ব্যবহার করাই লাভজনক হলেও খনিজ বিশুদ্ধ গন্ধক বা **সালফার** জ্বালিয়েও অনেক দেশেই সালফার-ডাইঅক্সাইড উৎপাদিত হয়ে থাকে। সিসিলি দ্বীপে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে খনিজের আকারে মোটামুটি বিশুদ্ধ সালফার পাওয়া যায়; আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 700 ফুট নিচে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত অবস্থায় খনিজ সালফারের বিপুল সঞ্চয় রয়েছে। পাম্পের সাহায্যে উত্তপ্ত জল ও বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে ফ্রাস

পদ্ধতিতে এরূপ খনিজ **গন্ধক** উত্তোলন করা হয়। প্রধানতঃ সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সালফার এরূপ প্রাকৃতিক উৎস থেকেই মেটানো হয়। আজকাল আবার তামা ও দস্তার **সালফাইড খনিজ** গলিয়ে ধাতব তামা ও দস্তা নিষ্কাশনের প্রক্রিয়ায় আনুষঙ্গিক উপজাত পদার্থ হিসাবে যে সালফার-ডাই অক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় তা থেকেও সালফার প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করা হয়। অবশ্য এরূপ বিভিন্ন সালফাইড খনিজ থেকে প্রাপ্ত সালফার-ডাই অক্সাইডের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব গ্যাসীয় পদার্থ মিশে আসে সেগুলিকে আগে দূর করে নিতে হয়। এর জন্যে খনিজগুলি থেকে যে মিশ্র গ্যাস বেরিয়ে আসে তাকে একটা জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, যাতে বেসিক অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (অ্যালুমিনিয়াম-সালফেট ও অ্যালুমিনিয়াম-হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণ) যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবিত থাকে।
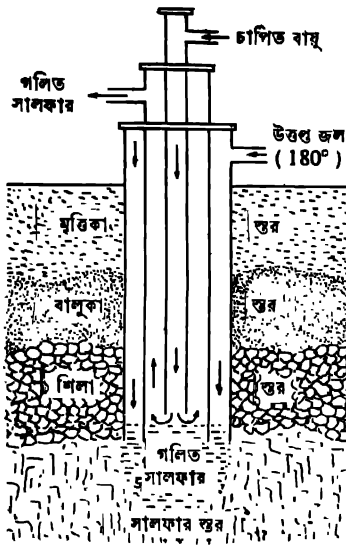
খনিজ সাল্‌ফার উত্তোলনের ফ্রাস-পদ্ধতি

এই দ্রবণে সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস সম্যক শোষিত হয়ে থেকে যায়; পরে তাকে উত্তপ্ত করলে সেই শোষিত (বা দ্রবিত) **সালফার-ডাই-অক্সাইড** গ্যাস দ্রবণের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসে। এই মিশ্র গ্যাসকে প্রকাণ্ড গ্যাসাধারে ঠাণ্ডা করলে জলীয় বাষ্প জমে নিচে পড়ে, উপরে বিশুদ্ধ সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস সঞ্চিত থাকে। এই সালফার-ডাইঅক্সাইড থেকে বিশুদ্ধ সালফার উদ্ধার করবার জন্যে প্রায় 1000° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কোক-কয়লার ভিতরে গ্যাসটাকে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কয়লা জারিত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়, আর সালফার-ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয়ে সালফার বা গন্ধকে পরিণত হয়ে থাকে। এর বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ: $SO_2 + C = CO_2 + S$ (সালফার)। খনিজ সালফাইডগুলি থেকে এভাবে উদ্ধারপ্রাপ্ত

সালফার নিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের উল্লিখিত উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

কেবল ধাতু-নিষ্কাশনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন খনিজ সালফাইড থেকেই নয়, **সিমেন্ট** উৎপাদন-শিল্পেও সালফার ডাইঅক্সাইড উপজাত পদার্থ হিসাবে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিমেন্ট উৎপাদনের জন্যে যখন ক্যালসিয়াম-সালফেট ($CaSO_4$, যাকে বলা হয় অ্যান্‌হাইড্রাইট), বালি (সিলিকা), কোক-কয়লা, বিশেষ এক রকম মাটি প্রভৃতি একসঙ্গে বিরাট পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়, তখনও সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্ভূত হয়; আর তা থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সালফার উদ্ধার করা হয়ে থাকে। পাত্রের অভ্যন্তরে গলিত-মিশ্রিত যে পিণ্ডাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে তার উপাদান হলো ক্যালসিয়াম সিলিকেট ($CaSiO_3$) ও ক্যালসিয়াম-অ্যালুমিনেট ($3CaO, Al_2O_3$)। এই পিণ্ডের অতি মিহি চূর্ণই হলো সিমেন্ট, যা গৃহ-নির্মাণে আমরা ব্যবহার করি।

ওয়াটার-গ্যাসের অনুঘটন

জ্বালানী প্রসঙ্গে কয়লার আলোচনাকালে (পৃষ্ঠা 206) আমরা ওয়াটার-গ্যাসের কথা বলেছি। উত্তপ্ত কোক-কয়লার ভিতরে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে ওয়াটার-গ্যাস উৎপাদিত হয়, যাতে থাকে কার্বন-মনক্সাইড ও হাই-ড্রোজেন গ্যাস; এই গ্যাস-মিশ্রণই 'ওয়াটার গ্যাস' নামে পরিচিত। ওয়াটার-গ্যাস থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ও বিভিন্ন পদার্থের অনুঘটনে নানা রকম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যৌগিক সংশ্লেষিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় **অনুঘটক** পদার্থগুলির প্রভাব কেবল রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি ত্বরান্বিত করবার মধ্যেই নিবদ্ধ; দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ অনুঘটকের প্রভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই পদার্থের রূপান্তর নানাভাবে ঘটানো যায়, আর তা থেকে বিভিন্ন সংশ্লেষিত যৌগিক পাওয়া যেতে পারে। **ওয়াটার-গ্যাস** এর একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। জ্বালানী অধ্যায়ে আমরা আগেই বলেছি যে, কোবাল্ট বা থোরিয়াম ধাতুর অনুঘটন-প্রভাবে ওয়াটার-গ্যাস থেকে বিভিন্ন তরল ও গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন উৎপাদিত হয়; জ্বালানী ও লুব্রিক্যাণ্ট (পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ) হিসাবে যেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। এমন কি, তার কোন কোন অংশ এক শ্রেণীর পেট্রল (পলিমার পেট্রল) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ অনুঘটকের সাহায্যে ওয়াটার-

গ্যাসের এই রূপান্তর-পদ্ধতি তার আবিষ্কারকদের নামানুসারে **'ফিশার-ট্রপস্'** (Fischer-Tropsch) পদ্ধতি নামে খ্যাত (পৃষ্ঠা 227)। কেবল তাই-ই নয়, বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানী এই পদ্ধতিকে নানাভাবে প্রয়োগ করে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওয়াটার-গ্যাস থেকে আরও নানা রকম মূল্যবান পদার্থ উৎপাদন করেছেন, যে-সব পদার্থ মানব-কল্যাণে রসায়নের অমূল্য অবদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH), যার বিশেষ রাসায়নিক নাম মেথানল, একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগিক পদার্থ। পদার্থটা উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসাবে ও ফর্ম্যাল্ডিহাইড ($HCHO$), বিভিন্ন কৃত্রিম রং, সুগন্ধ দ্রব্য প্রভৃতির শিল্প-উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আগের দিনে এই **মেথানল** বা মিথাইল অ্যালকোহল অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় কাঠ থেকে নিষ্কাশিত করা হতো, এজন্যে জিনিসটা **উড্-স্পিরিট** নামেও পরিচিত। কাঁচা কাঠকে পাতিত করে মেথানল উৎপাদন করা যেমন অসুবিধাজনক, তেমন আবার যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে কাঠও চাই প্রচুর। ফরাসী ও জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে 1925 খৃষ্টাব্দ থেকে বিশেষ অনুঘটন প্রক্রিয়ায় ওয়াটার-গ্যাস থেকে প্রচুর পরিমাণে মেথানল অতি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদিত হচ্ছে। অনুঘটক হিসাবে জিঙ্ক-অক্সাইড, অথবা তামা ও জিঙ্ক-অক্সাইডের মিশ্রণের উপর দিয়ে **ওয়াটার-গ্যাস** (কার্বন-মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ) প্রবাহিত করলে এবং বিক্রিয়ার বিশেষ তাপ ও চাপ সুনিয়ন্ত্রিত রাখলে মিশ্রণের ঐ গ্যাস দু'টা সংযুক্ত হয়ে মিথাইল অ্যালকোহল বা মেথানল (CH_3OH) উৎপাদিত হয়। বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ : $2H_2 + CO = CH_3OH$.

আধুনিক যুগে হাইড্রোজেন গ্যাসের শিল্পোৎপাদনের জন্যে প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার-গ্যাস ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। অবশ্য ওয়াটার-গ্যাস তরল করে আংশিক-পাতন ক্রিয়ার সাহায্যে তার কার্বন-মনক্সাইড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পৃথক করা যায় ; যেমন তরল বায়ু থেকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস পৃথক করা হয়। কিন্তু ওয়াটার-গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন পৃথক করা অনুঘটন-প্রক্রিয়ায়ই সহজ ও সুবিধাজনক। প্রায় 500° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় অনুঘটক হিসাবে বিশেষতঃ আয়রন-অক্সাইডের (জারিত লৌহ) উপর দিয়ে ওয়াটার-গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ প্রবাহিত করলে প্রথমে তার কার্বন-মনক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের

বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড। তারপরে ওয়াটার-গ্যাসের হাইড্রোজেন ও এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড একসঙ্গে মিশে বেরিয়ে আসে। এই মিশ্রণকে জলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবিত হয়ে থেকে যায়; আর বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস গ্যাসাধারে সঞ্চয় করে রাখা হয়। বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস এভাবে আজকাল উৎপাদিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত বিভিন্ন আলোচনা থেকে জানা গেল, রসায়ন-শিল্পে ওয়াটার-গ্যাস একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ। সাধারণতঃ আবদ্ধ পাত্রের লোহিত-তপ্ত কোক-কয়লার উপরে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে ওয়াটার-গ্যাস, অর্থাৎ কার্বন-মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণটা পাওয়া যায়। তাছাড়া বিশেষ অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিথেন (CH_4) গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায়ও ওয়াটার-গ্যাস উৎপাদিত হয়ে থাকে। প্রায় 900° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত নিকেল ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর উপরে জলীয় বাষ্প ও মিথেন গ্যাসের ধারা প্রবাহিত করলে ঐ ধাতু দু'টার অনুঘটনে ওয়াটার-গ্যাস উৎপন্ন হয়; বিক্রিয়াটা ঘটে এরূপ : $CH_4+H_2O=CO+3H_2$)। বিভিন্ন অনুঘটকের প্রভাবে ওয়াটার-গ্যাস থেকে মিথাইল অ্যালকোহল, পলিমার পেট্রল প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগিক উৎপন্ন হয়ে থাকে; এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশেষতঃ খনিজ কয়লা ও তেলের হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ার শিল্প-প্রয়োজনে যে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস দরকার হয় তারও অন্যতম প্রধান উৎস হলো ওয়াটার-গ্যাস। কাজেই এই গ্যাসীয় মিশ্রণটার বিপুল চাহিদা মেটাতে উল্লিখিত মিথেন ও জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়াটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খনিজ কয়লার হাইড্রোজেনেসন প্রক্রিয়ায় যে মিথেন গ্যাস অতিরিক্ত উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায় তা থেকেই এই বিক্রিয়ার সাহায্যে ওয়াটার-গ্যাস অতি সহজে উৎপাদিত হয়ে থাকে। তা থেকে আবার উল্লিখিত পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস পৃথক করে তেলের হাইড্রোজেনেসন পদ্ধতির কাজে লাগানো হয়।

বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অনুঘটকের প্রভাব সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করলাম। বিভিন্ন বিক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থের অনুঘটন-শক্তি যেন মন্ত্রশক্তির মত কাজ করে; আর তার ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের নূতন নূতন রাসায়নিক শিল্প এ-যুগে গড়ে উঠেছে। অনুঘটন-ক্রিয়া মানব-কল্যাণে রসায়নের বহুবিধ শিল্পক্ষেত্রে অমূল্য অবদান জুগিয়েছে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

দশম অধ্যায়

পদার্থ ও শক্তি : বিভিন্ন বিস্ফোরক

পদার্থের রূপান্তরে শক্তির উদ্ভব : রাসায়নিক শক্তি, স্থিতি-শক্তি ও চল-শক্তি ; পদার্থের গঠনে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন : জীবের জীবনী-শক্তি ও কার্বনের চক্রগতি, উদ্ভিদ-দেহে সৌর শক্তির সঞ্চয়, অক্সিজেন ও ওজোন : পদার্থের প্রতিরূপ বা অ্যালোট্রপি—কার্বনের প্রতিরূপ হীরক, গ্রাফাইট ও চার কোল : পাইরোলিগ্নিয়াস অ্যাসিড, অ্যাসিটোন ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড, কাঠ-কয়লা ও ভুসা-কালি। বিস্ফোরক ও বিস্ফোরণ : বিস্ফোরণের তাৎপর্য, কার্বন ও তাপশক্তি, বিস্ফোরকের প্রাচীন ইতিহাস ; গ্রীক-ফায়ার ও গান-পাউডার ; গান-কটন বা নাইট্রোসেলুলোজের উৎপাদন-পদ্ধতি ও ব্যবহারে সুবিধা-অসুবিধা ; নাইট্রো-গ্লিসারিন ও ডিনামাইট, কিসেলগার : ব্ল্যাসিং জেলাটিন, জেলিগ্নাইট ও কর্ডাইট ; ট্রাইনাইট্রো-ফেনল ও ট্রাইনাইট্রো-টলুইন : বিস্ফোরক অ্যামাটল ও ট্রাইটোন্যাল : বিস্ফোরক রসায়নের ক্রমোন্নতি—মেথানল, সাইক্লোনাইট বা 'আর-ডি-এক্স' ও টর্পেক্স : বিস্ফোরক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক রূপ : আধুনিক অগ্রগতি — অ্যাটম-বোমা ও রকেট : শক্তির প্রয়োগে মানবজাতির ধ্বংস বা কল্যাণ।

আধুনিক রসায়নের মূল তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে এ-কথা অবশ্যই জানা দরকার যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের কেবল বস্তুগত রূপান্তরই ঘটে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তির উদ্ভব হয় ; যা ক্ষেত্র-বিশেষে তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি কোন-না-কোন শক্তিরূপে দেখা দেয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তরে শক্তির এরূপ উদ্ভব ও তার তাৎপর্য ভৌত রসায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমরা সাধারণতঃ যাকে রাসায়নিক শক্তি (কেমিক্যাল এনার্জি) বলি, প্রকৃতপক্ষে তা পদার্থের সাংগঠনিক আণবিক শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। পদার্থের অভ্যন্তরে শক্তি সাধারণ অবস্থায় সুপ্ত বা নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে ; আর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে তা জাগ্রত বা সপ্রকাশ হয়ে ওঠে। 'রসায়ন ও তড়িৎ-শক্তি' শীর্ষক অধ্যায়ে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত তড়িৎ-শক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আবার জ্বালানীর আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য এক অধ্যায়ে এ-কথাও বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে, অর্থাৎ তাদের দাহ্য উপাদানগুলির সঙ্গে বায়ুর

অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে বা বিক্রিয়ায় অবস্থাবিশেষে তাপ ও আলোকের উৎপত্তি ঘটে। আমরা জানি, তাপ ও আলোক কোন বস্তু নয়, পদার্থের রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত শক্তির বিশেষ রূপ মাত্র। মোমবাতি, তেল বা কোল-গ্যাস যখন জ্বলে তখন তাদের দাহ্য উপাদান স্টিয়ারিন, প্যারাফিন, মিথেন প্রভৃতি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন যৌগের সংগঠক কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের কথা আমরা ভাবি না, দহনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বস্তু-সত্তাহীন তরঙ্গরূপে প্রকাশমান আলোক-শক্তিকেই দহনের মুখ্য সার্থকতা হিসাবে আমরা লক্ষ্য করি। আবার জ্বালানীরূপে কয়লা বা কাঠ যখন জ্বলে, আর তাদের দহনে তাপের উদ্ভব হয়, তখনও জ্বালানীর দাহ্য উপাদান ও তার বস্তুগত রূপান্তরের চেয়ে তা থেকে কতটা তাপশক্তি পাওয়া যায় তা-ই হয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বস্তুতঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার বহু ক্ষেত্রেই, বিশেষতঃ দহন-ক্রিয়ায় পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তরের চেয়ে তার ফলে উদ্ভূত শক্তিই সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পদার্থই শক্তির আধার : কয়লা, তেল প্রভৃতি জ্বালানীর দহনে উদ্ভূত তাপশক্তিকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় যন্ত্র-শক্তি বা তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়; যার সাহায্যে যন্ত্র চলে, নানা কার্য সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে দাহ্য পদার্থের মূল সার্থকতা নিহিত রয়েছে তা থেকে বিমুক্ত তাপ-শক্তি ও তার রূপান্তরে সম্পাদিত কর্মশক্তির পরিমাণের উপরে। এ থেকে বুঝা যায়, পদার্থের সংগঠনে নিহিত যে সুপ্ত শক্তির কথা আগে বলা হয়েছে তা বস্তুতঃ **স্থিতি-শক্তি** (পোটেন্সিয়াল এনার্জি) রূপে পদার্থে অবস্থান করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় (যেমন দহনে) পদার্থের সেই স্থিতি-শক্তি প্রথমে তাপ বা তড়িৎ-শক্তিতে ও পরে উপযুক্ত ব্যবস্থায় **চল-শক্তি**তে (কাইনেটিক এনার্জি) রূপান্তরিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করে। এটা অনেকটা যেন ঊর্ধ্বস্থিত জলের নিম্ন-পতনের (জল-প্রপাত) ফলে স্থিতি-শক্তির চল-শক্তি বা কর্ম-শক্তিতে রূপান্তরের অনুরূপ ব্যাপার। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, পদার্থই মূলতঃ শক্তির আধার; আর সেই পদার্থের অবস্থান্তর বা রূপান্তরে তা থেকে তার অন্তর্নিহিত শক্তিই বিমুক্ত হয়। আবার পদার্থের আধুনিক পারমাণবিক গঠনতত্ত্বের বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয়েছে যে, যাবতীয় পদার্থের মূল সংগঠক **ইলেকট্রন**, **প্রোটন** প্রভৃতি কণিকারাও বস্তুতঃ শক্তি-কণিকা মাত্র; আর তাই পদার্থের সম্যক রূপান্তর বা বিলুপ্তি ঘটলে তার সবটাই শক্তিরূপে দেখা যায়। অবশ্য পারমাণবিক শক্তি রাসায়নিক শক্তির

বিকাশ নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ব্যাপার। মূলগতভাবে পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন; এই মহাসত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন; যার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব প্রমাণ হলো অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণে উদ্ভূত প্রচণ্ড ধ্বংস-শক্তি। এ-সব অবশ্য অন্য কথা; আমরা এখানে কেবল পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তরে, বিশেষতঃ দাহ্য পদার্থের দহনে উদ্ভূত তাপ-শক্তির কথাই আলোচনা করবো। বিভিন্ন বিস্ফোরক পদার্থ বস্তুতঃ বিশেষ এক শ্রেণীর দ্রুত-দাহ্য পদার্থ মাত্র, যাদের আকস্মিক রাসায়নিক রূপান্তরে, অর্থাৎ অতি দ্রুত ও তীব্র দহনে শক্তি সহসা সবেগে বিমুক্ত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। মোট কথা, কোন কোন পদার্থের এরূপ অতি দ্রুত ও সুতীব্র দহনে উদ্ভূত শক্তিই বিস্ফোরণের আকারে দেখা দেয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, দাহ্য পদার্থের দহনে যে শক্তি (তাপ-শক্তি) উৎপাদিত হয় তা সেই পদার্থের অভ্যন্তরেই সুপ্তাবস্থায় নিহিত থাকে, আর তার দাহ্য উপাদানের সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগে পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে তা থেকে সেই শক্তি বিমুক্ত হয়। পৃথিবীতে জীব-জগতের বৃদ্ধি বা জীবনী-শক্তিই হোক, অথবা জড়-জগতের পদার্থাদির রূপান্তরেই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ হয় প্রধানতঃ **কার্বন** ও বিভিন্ন কার্বন-যৌগের দহন থেকে। কয়লার মূল উপাদান কার্বনের দহনে বিমুক্ত তাপ-শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন শিল্পের কল-কারখানা চলে, তাপ-শক্তি চল-শক্তি বা কর্ম-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার খাদ্যবস্তুর মুখ্য উপাদান **কার্বোহাইড্রেট** জীবের দেহাভ্যন্তরে শ্বাস-বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগে জারিত বা দগ্ধ হয়ে তাপ-শক্তি বিমুক্ত করে, যার প্রভাবে দেহ-যন্ত্র চলে, জীবের জীবনী-শক্তি অব্যাহত থাকে। প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে খাদ্যের ঐ কার্বন-যৌগের মৃদু দহনে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে তা বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। কার্বন কিন্তু এর ফলে জীব-জগতের প্রয়োজনের বাইরে চলে যায় না; উদ্ভিদ-জগৎ তাদের পত্র-হরিৎ বা ক্লোরোফিলের মাধ্যমে সূর্যের তেজঃ-শক্তি আহরণ করে, আর সেই শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদেরা বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে ভেঙ্গে তার কার্বন উপাদান আত্মস্থ করে নেয় এবং অক্সিজেন অংশ বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এই কার্বন থেকে আবার প্রকৃতির বিচিত্র রাসায়নিক কৌশলে গ্লুকোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি বিভিন্ন জটিল কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদের দেহ গঠিত হয়। এ-সব যৌগিকের রাসায়নিক গঠন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৌরশক্তি উদ্ভিদ-দেহে স্থিতি-শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে। এ-সব বিষয় আমরা

'বায়ুর উপাদান ও তথ্যাদি' শীর্ষক অধ্যায়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রসঙ্গে যথোচিত আলোচনা করেছি। যাহোক, উদ্ভিজ্জ শাক-সব্‌জি, ফল, মূল, শস্য প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করে প্রাণীরা তা থেকে তাদের দেহগঠনের উপযোগী বিভিন্ন কার্বোহাইড্রেট শ্বেতসার (স্টার্চ), শর্করা প্রভৃতি পায় এবং সে-সব থেকেই প্রাণীদের দেহ পুষ্ট হয়; আর দেহাভ্যন্তরের বিবিধ বিপাকক্রিয়ায় বিমুক্ত রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে প্রাণিদেহে **জীবনী-শক্তি** উপজাত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, মূল পদার্থ হিসাবে কার্বনই সমগ্র জীব-জগতের ধারাবাহিকতা রক্ষার অপরিহার্য উপাদান ও জীবনী-শক্তির উৎস। প্রকৃতির রাজ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে কার্বন এভাবে চক্রাকারে ঘুরছে, আর জীব-জগতের জীবনী-শক্তি জোগাচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে কার্বনের এই **চক্র-গতি** জীব-জগতের জীবনীশক্তি ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

শক্তির উৎস ও রূপান্তর

আগেই বলা হয়েছে, উদ্ভিদের সবুজ-কণিকা বা পত্র-হরিৎ (ক্লোরোফিল) কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে সূর্যালোকের তেজঃশক্তি শোষণ করে। সেই শক্তির প্রভাবেই উদ্ভিদ-দেহে বিভিন্ন কার্বন-যৌগিক বা কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন হয়। কার্বোহাইড্রেট গঠনের এরূপ বিভিন্ন রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে সৌর-শক্তি উদ্ভিদদেহে স্থিতি-শক্তিরূপে সঞ্চিত হয়ে থাকে। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের কার্বন-উপাদানের দহনে বা রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেই স্থিতি-শক্তি (পোটেন্সিয়াল এনার্জি) রূপান্তরিত হয় তাপ-শক্তিতে (হিট্‌ এনার্জি)। সৌর শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে বিভিন্ন কার্বন-যৌগের এই সংশ্লেষণ বা সংগঠন প্রক্রিয়া বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক বেলি তাঁর রসায়নাগারে অনুকরণ করেছিলেন এবং প্রকৃতির এই রহস্য ভেদে কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। পরীক্ষায় তিনি দেখান, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জল, অর্থাৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের জলীয় দ্রবণ কিছুদিন সূর্যালোকে রাখলে উপযুক্ত কোন অনুঘটকের উপস্থিতিতে ঐ দ্রবণের কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে কিছুটা শর্করা (গ্লুকোজ) জাতীয়, অর্থাৎ বিশেষ এক **কার্বোহাইড্রেট** শ্রেণীর পদার্থ উৎপন্ন হয়; দ্রবণের জলের সামান্য মিষ্টত্ব এ-কথা প্রমাণ করে। এই রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় কিছু ফেরিক অক্সাইডের সঙ্গে সামান্য থোরিয়াম অক্সাইড (থোরিয়া) মিশিয়ে অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। [অনুঘটক হলো এমন কোন পদার্থ,

যা রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে নিজে অংশ গ্রহণ না করেও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য পদার্থের রূপান্তরে সহায়তা করে এবং সেই রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্রুততা বাড়ায় বা ক্ষেত্রবিশেষে কমায়। বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন পদার্থ এরূপ অনুঘটক বা **ক্যাটালিস্ট** হিসাবে কাজ করে। বস্তুতঃ উদ্ভিদের সবুজ-কণিকাও সৌরশক্তির প্রভাবে উদ্ভিদের কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে থাকে বলে প্রমাণিত হয়েছে।] যাহোক, অধ্যাপক বেলির ঐ পরীক্ষায় কার্বোহাইড্রেট উৎপাদিত হয়েছিল অবশ্য সামান্যই ; কিন্তু কৃত্রিম কার্বোহাইড্রেটের এই সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে উদ্ভিদ-দেহে সংঘটিত প্রাকৃতিক সংশ্লেষণের বহুলাংশে মিল রয়েছে। কার্বোহাইড্রেট উৎপাদনে এ-প্রক্রিয়ার বাস্তব সার্থকতা সামান্য বটে, কিন্তু রাসায়নিক তত্ত্বের দিক দিয়ে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব কম নয়।

বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তরে যে শক্তির উদ্ভব হয় তা দহন-ক্রিয়ায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়ে থাকে সত্য, কিন্তু কম হোক, বেশি হোক, সব রকম রাসায়নিক ক্রিয়ায়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শক্তির আদান-প্রদান সর্বদাই চলে। যে-সব পদার্থের সমাবেশে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, বুঝতে হবে, তাদের ভিতরে অবশ্যই শক্তি নিরপেক্ষ অবস্থায় **স্থিতি-শক্তি** (পোটেন্সিয়াল এনার্জি) রূপে নিহিত ছিল। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে পদার্থের বস্তুগত যে পরিবর্তন বা রূপান্তর পরিদৃষ্ট হয়, যাকে আমরা বলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল, তা ঐ রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলিতে নিহিত স্থিতি-শক্তির রূপান্তর-জনিত ফলাফল মাত্র। রাসায়নিক ক্রিয়ায় বস্তুগত রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত স্থিতি-শক্তি সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অবস্থা বিশেষে তাপ, আলোক, বা তড়িৎ প্রভৃতির এক বা একাধিক শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। পরীক্ষা করলে দেখা যায়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় যে তাপ-শক্তি উদ্ভূত হয়, যাকে বলা হয় রাসায়নিক **বিক্রিয়া-জনিত তাপ** (হিট অব রিঅ্যাক্সন), তার পরিমাণ সর্বদা সুনির্দিষ্ট থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক রূপান্তরে অংশগ্রহণকারী পদার্থগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে সর্বদাই নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ-শক্তি বিমুক্ত হয়।

এ-বিষয়ে আর একটা কথা জানা দরকার, রাসায়নিক ক্রিয়ায় সর্বক্ষেত্রেই তাপ-শক্তি বিমুক্ত বা উদ্গত হয় না ; কোন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শোষিতও হয়। বিক্রিয়ায় অংশ-গ্রহণকারী পদার্থগুলিতে নিহিত বা সঞ্চিত শক্তির মোট পরিমাণ যে-সব ক্ষেত্রে বিক্রিয়ান্তে নবগঠিত পদার্থের শক্তির চেয়ে

কম হয়, সে-সব ক্ষেত্রে রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় তাপ-শক্তি স্বভাবতঃই শোষিত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো, প্রাথমিক পদার্থগুলিতে বাইরে থেকে তাপ-শক্তি প্রয়োজনানুরূপ সরবরাহ করতে হয় যাতে তাদের রূপান্তর-ক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং রূপান্তরিত পদার্থে অধিকতর শক্তির যোগান সম্ভব হয়। এরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ায় এই কারণেই তাপ হ্রাস পায়, অর্থাৎ তাপ-শক্তি শোষিত হয়ে গিয়ে রূপান্তরিত পদার্থে সঞ্চিত হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাপ-শক্তির বিচারে রাসায়নিক ক্রিয়া দু'রকম: যে-সব বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হয় তাদের বলা হয় তাপোদ্গারী বা **এক্সোথার্মাল** বিক্রিয়া; আর যে-সব ক্ষেত্রে তাপ-শক্তি শোষিত হয়, অর্থাৎ বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থটা তার সংগঠনের প্রয়োজনে তাপ-শক্তি ভিতরে শুষে বা টেনে নেয়, তাদের বলে তাপ-শোষক বা **এণ্ডোথার্মাল** বিক্রিয়া।

পদার্থ ও শক্তির অভিন্নতা: পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন বা রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যন্তরে নিহিত শক্তিরও রূপান্তর ঘটে। শক্তির এই রূপান্তর-ক্রিয়া তাপ-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বাহ্যতঃ প্রকাশ পায় ও লক্ষিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির এরূপ রূপান্তরের তাৎপর্য অনুধাবন করলে এ-কথা মনে করা যেতে পারে যে, কোন ক্রমে যদি কোন পদার্থের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে বাইরে থেকে শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়, অর্থাৎ পদার্থটার ভিতরে যদি অতিরিক্ত শক্তি শোষিত করানো যায়, তাহলে তার নিজস্ব বিশেষ গঠন-প্রকৃতি বদলে যাবে, অধিকতর রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন নতুন একটা পদার্থের অণু গঠিত হবে। পদার্থের রাসায়নিক গঠন-সম্পর্কিত (আণবিক গঠন-প্রকৃতির) এই ধারণাটা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। আমরা জানি, অক্সিজেনের একটি অণু গঠিত হয় দু'টি পরমাণুর সংযোগে, O_2; এই **অক্সিজেন** গ্যাসের ভিতরে বিশেষ পদ্ধতিতে যদি তড়িৎ-ক্ষরণ (**ইলেক্‌ট্রিক** ডিস্‌চার্জ) করা যায়, তাহলে অক্সিজেনের অণুগুলি কিছু তড়িৎ-শক্তি শোষণ করে নেয়, আর এই অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের ফলে অক্সিজেনের অণু রাসায়নিক রূপান্তরের ভিতর দিয়ে **ওজোন** গ্যাসের অণুতে পরিণত হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, অক্সিজেন-অণু কিছু শক্তি শোষণ করে ওজোন-অণুতে (O_3) রূপান্তরিত হতে গিয়ে অক্সিজেনের একটি অতিরিক্ত পরমাণু তাতে সংযোজিত হয়; আর তার ফলে ওজোন গ্যাসের এক-একটি অণুতে তিনটি অক্সিজেন-পরমাণু সংবদ্ধ থাকে। অক্সিজেন-অণু এভাবে শক্তি-কণিকা আত্মস্থ করে নিয়ে বস্তুতঃ একটি নতুন গ্যাস ওজোনে

রূপান্তরিত হয়। এথেকে মনে করা যায়, বিশেষ অবস্থায় শক্তিই পদার্থের রূপ গ্রহণ করে, পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন ও পরস্পর রূপান্তরযোগ্য। তড়িৎ-ক্ষরণের ফলে অক্সিজেন-গ্যাস যে ওজোন-গ্যাসে রূপান্তরিত হয়, রাসায়নিক পরীক্ষাদি ছাড়াও ওজোনের একটা বিশেষ গন্ধে তা ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই গ্যাসটা ওজোন নামে পরিচিত হয়েছে গ্রীক শব্দ 'ওজো' থেকে, যার অর্থ 'গন্ধ পাচ্ছি'। ওজোন যেহেতু অক্সিজেনের চেয়ে অধিকতর শক্তি ধারণ করে, তাই গ্যাসটার জারণ- (অক্সিডাইজিং) ক্ষমতাও স্বভাবতঃ বেশি। বিশেষ শক্তিশালী **জারক পদার্থ** হিসাবে ওজোন গ্যাস বিভিন্ন পদার্থের জারণ-ক্রিয়ায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ পানীয় জল বিশুদ্ধিকরণের প্রক্রিয়ায় তার জীবাণু ধ্বংস করতে এবং আইভরি (গজদন্ত), মোম, শ্বেতসার প্রভৃতি পদার্থ বিরঞ্জিত (ব্লিচিং) করে পরিষ্কার ধব্‌ধবে করতে ওজোন গ্যাস একটি শক্তিশালী জারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পদার্থের পারমাণবিক গঠন-বিন্যাস ও শক্তি

পদার্থের সংগঠনে শক্তি আবদ্ধ থাকে তার পারমাণবিক গঠন-সজ্জা বা পরমাণু-বিন্যাসের মাধ্যমে; আর এই শক্তিই অণুর গঠনে পরমাণুদের অবস্থান-বিন্যাসকে সুনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখে। বস্তুতঃ মৌলিক পদার্থে যে শক্তি নিহিত থাকে তা তার পারমাণবিক সংগঠন-শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই দেখা যায়, পারমাণবিক গঠন-বিন্যাসের বিভিন্নতার জন্যে একই মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক ধর্মে অভিন্ন থেকেও অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ বিভিন্ন রূপে অবস্থান করে, আর তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণও তাই হয় বিভিন্ন। একই মৌলিক পদার্থ **ফস্ফরাস** শ্বেত ও লোহিত দু'রকম আছে; আবার কাঠ-কয়লা, গ্রাফাইট ও হীরক (ডায়মণ্ড) রাসায়নিক বিচারে মূলতঃ **কার্বন** ছাড়া আর কিছুই নয়, অথচ বাহ্যিক চেহারায় ও গঠনে কত বিভিন্নতা। মূলতঃ একই বস্তুর এরূপ ভৌত গঠনের বিভিন্ন অবস্থাকে বলে **অ্যালোট্রপি**; আর পদার্থটার ঐ বিভিন্ন রূপকে বলে **অ্যালোট্রোপ**, বাংলায় বলা যায় 'প্রতিরূপ'। এদের আভ্যন্তরীণ পারমাণবিক গঠন-বিন্যাসের বিভিন্নতার জন্যে মূলতঃ একই পদার্থের বিভিন্ন প্রতিরূপে শক্তির পরিমাণও থাকে বিভিন্ন। কার্বনের উল্লিখিত তিনটি প্রতিরূপ বহির্দৃশ্যে ও ভৌত ধর্মে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাই এগুলির মধ্যে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণও বিভিন্ন হয়ে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, একই ওজন-পরিমাণের কাঠ-কয়লা, গ্রাফাইট

ও ডায়মণ্ড দগ্ধ করলে প্রতি ক্ষেত্রে যে তাপ-শক্তি বিমুক্ত হয় তার পরিমাণ বা **ক্যালরি**-সংখ্যা এক নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ তাপ উদ্‌গত হয়ে থাকে। এ থেকে উল্লিখিত তথ্যের সত্যতা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়।

মৌলিক পদার্থ কার্বনের প্রতিরূপ **হীরক** একটি অতি মূল্যবান মণিক হিসাবে সমাদৃত ; অথচ মূলতঃ এটা কার্বন বা কয়লা মাত্র। কবে কোন অতীত যুগে প্রাকৃতিক রূপান্তরের মাধ্যমে কয়লা ক্রমে অতি কঠিন স্ফটিকাকার রূপ ধারণ করে হীরকে পরিণত হয়েছে। সাধারণতঃ **অষ্টতল স্ফটিক** বা ক্রস্ট্যালের আকারে হীরক প্রধানতঃ আগ্নেয়-শিলাস্তরে সন্নিবিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। এই স্ফটিকাকার পদার্থটা থেকে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে নানা বর্ণোজ্জ্বল ছটা বিকিরণ করে, তাই মূল্যবান মণিক হিসাবে হীরকের এত সমাদর। প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে হীরক সর্বাধিক কঠিন, আর তাই বিশেষ কঠিন পদার্থ এ-দিয়ে কাটা, বা পালিশ করা চলে। হীরকে কাচ কাটে, এটা একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এ-সব কাজে **কার্বোনেডো** বা 'বোর্ট' নামক এক শ্রেণীর অবিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হীরকই সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কার্বনের আর একটা স্ফটিকাকার প্রতিরূপ হলো **গ্রাফাইট ;** পদার্থটা নরম ও তেল্‌তেলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ সিংহল ও ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে খনিজরূপে গ্রাফাইট পাওয়া যায়। মূল বস্তু একই কার্বন ; অথচ হীরক অতি কঠিন, আর গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল পদার্থ, যা যন্ত্রাদিতে তেল্‌তেলে বা **লুব্রিক্যাণ্ট** পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পেন্সিলের শিষ তৈরি করতে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয় ; পদার্থটাকে চূর্ণ করে তার সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণে কেয়োলিন ও ভুসা-কালি মিশিয়ে বিভিন্ন কাঠিন্য-বিশিষ্ট পেন্সিলের শিষ উৎপাদন করা হয়। সচরাচর একে 'লেড পেন্সিল' বলে বটে ; কিন্তু এতে লেড বা সীসা থাকে না, থাকে এই গ্রাফাইট। পদার্থটা আবার বিশেষ তাপসহ বলে অধিক উত্তাপে ধাতব পদার্থাদি গলাতে এ-দিয়ে মুচি তৈরি করা হয়। গ্রাফাইট মোটামুটি উৎকৃষ্ট একটা তড়িৎ-পরিবাহী পদার্থ, আবার সেই সঙ্গে বিশেষ তাপসহও বটে ; তাই এটা দিয়ে বিভিন্ন তড়িৎ-রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত তড়িদ্দ্বার (ইলেক্‌ট্রোড) তৈরি করা

হীরকের অণু গঠনে কার্বন-পরমাণুর সাংগঠনিক বিন্যাস

হয় ও শুষ্ক **তড়িৎ-কোষ** বা ড্রাই-সেলে ব্যবহৃত হয়। নানা কাজে গ্রাফাইটের চাহিদা এ-যুগে এত বেশি যে, কেবল প্রাকৃতিক গ্রাফাইটে চাহিদা পুরণ হয় না ; তাই আজকাল বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট উৎপাদন করা হচ্ছে (পৃষ্ঠা 260)।

হীরক (ডায়মণ্ড) ও গ্রাফাইটের বিভিন্ন ভৌত গুণ ও ধর্মে উল্লিখিত যে-সব গুরুতর বিভিন্নতা দেখা যায়,তার মূলে রয়েছে পদার্থ দু'টার স্ফটিক বা ক্রস্ট্যাল গঠনে কার্বন-পরমাণুদের সংস্থান-বৈচিত্র্য, অর্থাৎ তাদের স্ফটিকের আভ্যন্তরীণ আণবিক গঠনে কার্বন-পরমাণুরা কিভাবে সজ্জিত রয়েছে তার বিভিন্নতা। রঞ্জন-রশ্মির (এক্স-রে) সাহায্যে **গ্রাফাইটের** আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পদার্থটার স্ফটিকের মধ্যে কার্বন-পরমাণুরা স্তরে-স্তরে সজ্জিত রয়েছে, প্রতি স্তরে পরমাণুগুলি ষড়-ভূজের আকারে সমতলে বিন্যস্ত, আর এই স্তরগুলি পরস্পর থেকে অপেক্ষাকৃত ব্যবধানে ও সমান্তরালভাবে আছে। একই স্তরে অবস্থিত কার্বন-পরমাণুদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণজনিত বল পাশাপাশি স্তরগুলির পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে রয়েছে অনেক বেশি ; কাজেই পরমাণুরা নিজ-নিজ স্তরে দৃঢ়-সংবদ্ধ থাকে, আর তাদের বিভিন্ন স্তর পরস্পর থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে সরে যেতে পারে। এই গঠন-বৈশিষ্ট্যের জন্যে গ্রাফাইট তেলতেলে ও পিচ্ছিল অনুভূত হয় এবং পদার্থটা **লুব্রিক্যাণ্ট** হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পক্ষান্তরে হীরক বা **ডায়মণ্ডের** স্ফটিকের গঠনেও কার্বন-পরমাণুরা ষড়-ভূজের আকারে বিন্যস্ত হয়ে স্তরে-স্তরে সজ্জিত থাকে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের পরমাণুরা সমতলে থাকে না, থাকে আকা-বাঁকা ঢেউ-খেলানো অবস্থানে ; যার ফলে প্রতি স্তরের উপরিভাগ যেন কতকটা তরঙ্গায়িত রূপ নিয়েছে। আবার এর প্রতি স্তরের কার্বন-পরমাণুরা রয়েছে যেমন পরস্পরের কাছাকাছি, স্তরগুলিও তেমনি। এভাবে হীরকের অভ্যন্তরে তার সংগঠক কার্বন-পরমাণুগুলি গ্রাফাইটের চেয়ে যথেষ্ট বেশি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকায় এবং প্রতি স্তরের পরমাণুরা সমতলে না থাকায় তাদের মধ্যে পারস্পরিক

গ্রাফাইটের গঠনে কার্বন-পরমাণুদের স্তর-বিন্যাস

আকর্ষণ থাকে প্রবল। পরমাণুদের এরূপ দৃঢ়-সংবদ্ধতার জন্যেই হীরক এত কঠিন। যাহোক, পদার্থের আভ্যন্তরীণ গঠনে পরমাণুদের অবস্থান-বৈচিত্র্যের এরূপ বিভিন্নতার ফলেই তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বল কম-বেশি হয় এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই পদার্থের কাঠিন্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে এই পারমাণবিক আকর্ষণ-বলই স্থিতি-শক্তিরূপে পদার্থের অভ্যন্তরে সঞ্চিত থাকে।

হীরকে কার্বন-পরমাণুদের তরঙ্গায়িত স্তর-বিন্যাস

চারকোলের বৈচিত্র্য ও ব্যবহার ঃ হীরক ও গ্রাফাইট ছাড়া কার্বনের আর একটি প্রতিরূপ (অ্যালোট্রোপ) হলো সাধারণ কাঠ-কয়লা বা **চারকোল**, যা গ্রাফাইট ও হীরকের মত স্ফটিকাকার অবস্থায় থাকে না, থাকে অনিয়তাকার (অ্যামর্ফাস) অবস্থায়। বাংলায় চারকোলকে সাধারণতঃ কাঠ-কয়লা বলা হয় বটে, কিন্তু কেবল কাঠই নয়—কাঠ, জীবজন্তুর হাড়, নারিকেলের খোলা প্রভৃতি কার্বন-বহুল বিভিন্ন পদার্থকে বায়ুসম্পর্কহীন অবস্থায় আবদ্ধ পাত্রে (বক-যন্ত্র বা রেটর্ট) উত্তপ্ত করলে চারকোল পাওয়া যায়। অবশ্য বেশির ভাগ চারকোলই সাধারণতঃ উৎপাদিত হয় এরূপ অন্তর্দহন-প্রক্রিয়ায় কাঠ পুড়িয়ে; এর ফলে কেবল চারকোলই পাওয়া যায় না, কাঠ থেকে তার অন্যান্য নানা উপাদান পাতিত (ডিস্টিল্‌ড) হয়ে বেরিয়ে আসে। বৃহদাকার আবদ্ধ পাত্র বা বক-যন্ত্রে কাঁচা কাঠের কুঁচো উত্তপ্ত করলে তা থেকে **মিথাইল অ্যালকোহল** (উড্‌-স্পিরিট), অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, ঘন কাষ্ঠ-নির্যাস (উড্‌-টার), নানা রকম গ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্বায়ী পদার্থ বেরিয়ে আসে, আর ঐ পাত্রে অবশিষ্ট থাকে কাঠ-কয়লা। কাঠ থেকে নির্গত গ্যাসগুলি স্বভাবতঃই দাহ্য, কাজেই এগুলিকে নিয়ে চারকোল উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ায়ই জ্বালানী হিসাবে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। কাঠের উল্লিখিত পাতন-ক্রিয়ায় যে মিথাইল অ্যালকোহল বা উড্‌স্পিরিট পাওয়া যায় তাতে মিথাইল অ্যালকোহল ছাড়াও অন্যান্য উদ্বায়ী পদার্থ অল্প-বিস্তর মিশ্রিত থাকে; যাদের অধিকাংশই বিস্বাদ ও স্বাস্থ্যহানিকর। আমরা জ্বালানী ও দ্রাবক পদার্থ হিসাবে যে **মিথিলেটেড স্পিরিট** ব্যবহার করি তা ইথাইল অ্যালকোহলের (মদ বা স্পিরিট-অব-ওয়াইন) সঙ্গে এই বিস্বাদ ও অপেয় উড্‌-স্পিরিট মিশিয়ে তৈরি করা হয়, যাতে লোকে তা মদ্যরূপে পান করতে না পারে।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাঠ চোলাই করে যে-সব পাতিত পদার্থাদির জলীয় মিশ্রণ পাওয়া যায় তাকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় **পাইরোলিগ্নিয়াস অ্যাসিড।** বর্তমান বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাষ্ঠ-নির্যাসের এই অবিশুদ্ধ মিশ্র-পদার্থটা থেকেই বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ মিথাইল অ্যালকোহল (মেথানল), অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটোন পৃথক করা হতো; এর সবগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ। আগের দিনে কেবল কাঁচা কাঠ চোলাই করেই এ-সব পদার্থ পাওয়া যেত; আজকাল বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে সহজে এগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। বিশেষ অনুঘটন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিথাইল অ্যালকোহল সংশ্লেষিত হয় ওয়াটার-গ্যাস থেকে; 'রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটন' শীর্ষক অধ্যায়ে এ-বিষয় আমরা (পৃষ্ঠা 286) আলোচনা করেছি। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় যে দাহ্য আসিটিলিন গ্যাস (পৃষ্ঠা 209) পাওয়া যায় তা থেকে উৎপাদিত হয় **অ্যাসিটিক অ্যাসিড;** আবার ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তৈরি হয় **অ্যাসিটোন।** বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর ঘটিয়ে নানা প্রয়োজনীয় যৌগিক উৎপাদনে আধুনিক রসায়নের কৃতিত্বের অন্ত নেই। মানুষের রাসায়নিক জ্ঞান ও শিল্প-তৎপরতা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে — উল্লিখিত রূপান্তর-ক্রিয়াগুলি তারই নিদর্শন। আজকাল অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও মিথাইল অ্যালকোহল উৎপাদনের জন্যে কাঠ চোলাইয়ের আর আবশ্যক হয় না।

চারকোলের ব্যবহার: অতি প্রাচীনকাল থেকেই চার-কোল বা কাঠ-কয়লা জ্বালানী হিসাবে বিশেষতঃ ধাতু-শিল্পে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কাঠ-কয়লা পুড়িয়ে যথেষ্ট উত্তাপ পাওয়া যায়; আজকাল অবশ্য ধাতু-নিষ্কাশনের জন্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক-কয়লা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্বর্ণকারেরা কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে আজও সোনা-রূপার অলংকারাদি তৈরি করে। বর্তমান যুগে কাঠ-কয়লার আরও নানা রকম শিল্প-ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। জিনিসটা অত্যন্ত সচ্ছিদ্র ও হাল্কা এবং এই সচ্ছিদ্রতার জন্যেই কাঠ-কয়লার গ্যাস শোষণের ক্ষমতা প্রবল। এজন্যে কোন স্থানের দুর্গন্ধ বা দূষিত গ্যাস দূর করতে হলে অনেক সময় কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। খনিগর্ভে বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে **গ্যাস-মুখোস** (গ্যাস-মাস্ক) ব্যবহৃত হয় তাতে কাঠ-কয়লার গুঁড়ো

মুখোসে শ্বাস-প্রশ্বাসের ছিদ্রপথে রক্ষিত হয়। এর ফলে কাঠ-কয়লা বাতাসের বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করে নেয় এবং মুখোসধারীর জীবন রক্ষা পায়।

জ্বালানীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের (ন্যাচারাল গ্যাস) কথা বলেছি। কোন কোন দেশের তৈল-কূপ থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে **প্রাকৃতিক গ্যাস**ও যথেষ্ট নির্গত হয়, আর তার সঙ্গে মিশে থাকে অতিদাহ্য গ্যাসোলিন বা পেট্রলের বাষ্প। প্রাকৃতিক গ্যাসকে এই গ্যাসোলিন-বাষ্প থেকে বিমুক্ত করবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থায় চারকোল ব্যবহার করা হয়। চারকোলের, বিশেষতঃ জীবজন্তুর অস্থি-পোড়ানো কয়লার গুঁড়ার বিশেষ বিরঞ্জক-ক্ষমতাও আছে; তাই খাদ্য-লবণ, চিনি প্রভৃতির জলীয় দ্রবণে চারকোলের গুঁড়া মিশিয়ে নাড়া-চাড়া করলে দ্রবণটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তা থেকে ধব্ধবে সাদা লবণ বা চিনি পাওয়া যায়। এ-সব শিল্পে চারকোল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চারকোলের আর একটা বিশেষ ব্যবহার হলো, এর সাহায্যে কোন আবদ্ধ পাত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে **বায়ুশূন্য** (ভ্যাকুয়াম) করা যেতে পারে। দেখা গেছে, তাপমাত্রা যথেষ্ট কমালে, অর্থাৎ বিশেষ ঠাণ্ডা করলে চারকোলের গ্যাস (বায়ু) শোষণের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সাধারণ নিষ্কাষক-পাম্পের (একজস্ট পাম্প) সাহায্যে আধারটাকে মোটামুটি বায়ুশূন্য করে নিয়ে চারকোলের গুঁড়া-ভরতি তার সংলগ্ন নলটাকে তরল বায়ুর (পৃষ্ঠা 62) মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। তরল বায়ুর অত্যধিক ঠাণ্ডায় চারকোলের বায়ু-শোষণের ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ে; কাজেই আধারের অবশিষ্ট বায়ু তাতে বিশেষভাবে শুষে নেয় এবং তার ফলে আধারটা প্রায় সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে।

চারকোল বা কাঠ-কয়লার উল্লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে জিনিসটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়। আগের দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বনাঞ্চলে কাঠ কেটে রাশিকৃত করে জ্বালিয়ে কাঠ-কয়লা উৎপাদন করা হতো। এরূপ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্বালানোর ফলে বাইরের দিকের প্রচুর কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে অপচয় ঘটতো; বিশেষতঃ কাঠের পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন মূল্যবান উদ্বায়ী পদার্থগুলি সংগ্রহের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পরবর্তীকালে প্রচুর কাঠের টুকরা একসঙ্গে বৃহদাকার বক-যন্ত্রে উত্তপ্ত করে পাতন-ক্রিয়া বা চোলাই-পদ্ধতিতে কাঠ-কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি কাঠের উদ্বায়ী পদার্থগুলিও বিভিন্ন

পদ্ধতিতে সংগৃহীত হয়ে থাকে। এভাবে কাঠ-কয়লা উৎপাদন একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। গত 1925 খৃষ্টাব্দে কাঠের ঐ সব উপজাত উদ্বায়ী পদার্থগুলি কৃত্রিম সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে সহজে উৎপাদন করা সম্ভবপর হওয়ার ফলে চারকোলের উৎপাদন-শিল্প কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই।
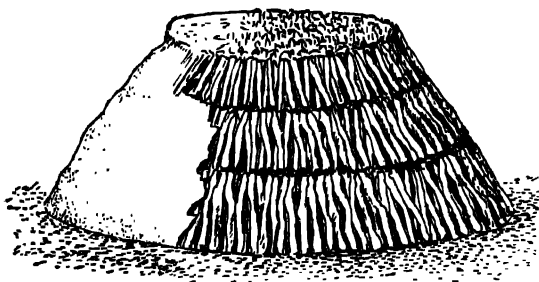
কাঠ-কয়লা উৎপাদনের প্রাচীন পদ্ধতি

কার্বনের অনিয়তাকার (অ্যামর্ফাস) প্রতিরূপ কেবল চারকোলই নয়, ভূসা-কালিও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োজনে। ভূসা-কালিকে ইংরেজীতে বলে **ল্যাম্প-ব্ল্যাক** বা কার্বন-ব্ল্যাক; আল্‌কাতরা থেকে পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে তার বিভিন্ন উদ্বায়ী উপাদান বের করে নেওয়ার পরে পিচ্‌-জাতীয় যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাকে উপযুক্ত ব্যবস্থায় জ্বালিয়ে প্রচুর ভূসা-কালি পাওয়া যায়। তাছাড়া, প্রাকৃতিক গ্যাস, মিথেন গ্যাস, কেরোসিন তেল প্রভৃতি কার্বন-বহুল পদার্থ স্বল্প বায়ুতে জ্বালিয়ে ভূসা-কালি উৎপাদন করা হয়, যা এ-সব পদার্থের জলন্ত শিখার উপরিভাগে স্থাপিত অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ঢাক্‌নার গায়ে জমে। উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুর অভাবে পদার্থগুলির কার্বন-উপাদান আংশিক দগ্ধ হয়ে অধিকাংশই অদগ্ধ অবস্থায় ভূসা-কালি বা কার্বন-ব্ল্যাক আকারে উপরের ঢাক্‌নার গায়ে জমে থাকে। কেরোসিন তেলের কুপি জ্বালিয়ে এভাবে সহজেই জিনিসটা পাওয়া যায়; আর এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশে ভূসা-কালি যথেষ্ট উৎপাদিত হচ্ছে।

বিভিন্ন শিল্পে **ভূসা-কালি** বা ল্যাম্প-ব্ল্যাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; বিশেষতঃ ছাপাখানার কালি, বুট-পালিশ, কাঠের পেইণ্ট প্রভৃতির শিল্প-উৎপাদনে ভূসা-কালি একটি অপরিহার্য উপাদান। তাছাড়া মোটর গাড়ীর রাবারের চাকা (রাবার-টায়ার) তৈরি করতেও ভূসা-কালি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তরল রাবারের সঙ্গে এই কার্বন উপযুক্ত পরিমাণে মেশালে সেই মিশ্র-রাবারের আঁঠালো-দৃঢ়তা যথেষ্ট বাড়ে ও স্থিতিস্থাপকতা কমে; তাই

এই মিশ্র রাবারের ঘর্ষ-ক্ষয় কমে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। রাবারের 'ভ্যালকানাইজিং প্রক্রিয়া আবার অন্য ব্যাপার ; 'রাসায়নিক সংশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে রাবারের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-কথা আমরা পরে যথোচিত আলোচনা করবো। এখানে কার্বনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ প্রতিরূপ ভূসা-কালি মিশিয়ে রাবারের যে কার্যকারিতা বাড়ানো যায় এবং রাবার-টায়ার উৎপাদনের শিল্পে যে এর প্রচুর ব্যবহার আছে, এ-কথা বলেই আমরা কার্বনের প্রসঙ্গ শেষ করছি।

বিস্ফোরক ও বিস্ফোরণ

পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা গেল, রাসায়নিক ক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তরের মাধ্যমে শক্তির উদ্ভব হয়, আর তা ক্ষেত্রবিশেষে তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিরূপে দেখা দেয়। বিশেষতঃ বলা যায়, রাসায়নিক ক্রিয়ায় দাহ্য পদার্থের স্থিতি-শক্তি রাসায়নিক শক্তির মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় তাপ-শক্তিতে, যার পরিমাণ বা তীব্রতা নির্ভর করে পদার্থটার দাহ্য উপাদানের পরিমাণ ও তার পারমাণবিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের উপরে। আগেই বলা হয়েছে, দহনে প্রধানতঃ দাহ্য পদার্থের **কার্বন** উপাদানের রাসায়নিক রূপান্তরেই তাপ-শক্তির উদ্ভব ঘটে ; তাই প্রসঙ্গক্রমে কার্বনের বিভিন্ন প্রতিরূপ ও তাদের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারাদি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। যাহোক, দহন-জনিত রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়া যখন অতিদ্রুত ও সামগ্রিকভাবে সহসা সংঘটিত হয়, আর তার ফলে রূপান্তরিত বিপুল পরিমাণ গ্যাস উদ্ভূত হয়ে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে তখনই ঘটে **বিস্ফোরণ**। বিশেষ বিশেষ দাহ্য পদার্থের অন্তর্নিহিত স্থিতি-শক্তি এভাবে প্রচণ্ড চাপ-শক্তির আকারে সহসা ছাড়া পেয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় ; এ-সব দ্রুতদাহ্য পদার্থকে বলা হয় **বিস্ফোরক**, ইংরেজীতে বলে 'এক্স-প্লোসিভ'। সাধারণতঃ বিস্ফোরক হিসাবে যে-সব পদার্থ ব্যবহৃত হয় দ্রুত দহনে তাদের রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে গ্যাসীয় পদার্থ প্রভূত পরিমাণে উদ্ভূত হয়ে থাকে। উৎপন্ন এই গ্যাসের আয়তন বিস্ফোরণের তাপমাত্রায় অনেক সময় মূল বিস্ফোরক পদার্থটার আয়তনের পনের থেকে বিশ হাজার গুণও হতে পারে।

সচরাচর কোন একক পদার্থে বিস্ফোরণ ঘটে না ; বিস্ফোরক পদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ হয় বিভিন্ন দাহ্য পদার্থের সংমিশ্রণ। অতীতের কোন্ যুগে কোন্ দেশে প্রথম কামান বা বন্দুকের বারুদ বিস্ফোরক হিসাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল তার

কোন সঠিক ইতিহাস নেই। যতদূর জানা যায়. এরূপ এক রকম বারুদ বা **গান-পাউডার** প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল সপ্তম শতাব্দীতে; মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে গ্রীকরা শত্রু-সৈন্যের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করেছিল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। এটা তাই **গ্রীক ফায়ার** নামে পরিচিত; কিন্তু জিনিসটা যে কি ছিল, তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। যাহোক, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক রকম দ্রুত দহনশীল বারুদ-মিশ্রণ ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়; পদার্থটা প্রধানতঃ গন্ধক, পিচ্, ন্যাপ্থা প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি করা হতো। এই বারুদের জ্বলন্ত আগুনে-গোলা শত্রু-সৈন্যের উপর সজোরে নিক্ষিপ্ত হতো; জানা যায়, মুসলমানরা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে এরূপ গোলা ব্যবহার করেছিল। আধুনিক কালের প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও নিক্ষিপ্ত গোলার দুরন্ত গতির তুলনায় অবশ্য সে-যুগের এ-সব বিস্ফোরক বারুদ ছিল নিতান্তই ছেলে-খেলার মত। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে ক্রমে ক্রমে অতি উচ্চ শক্তি-সম্পন্ন **বিস্ফোরক মিশ্রণ** উদ্ভাবিত হয়েছে। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনায় পদার্থের স্থিতি-শক্তিকে অতি শক্তিশালী চল-শক্তিতে (Kinetic energy) রূপান্তরিত করা ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করে কাজে লাগানোর বহুবিধ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে যেখানে কামান থেকে মাত্র কয়েক পাউণ্ড ওজনের লৌহ-গোলক বড় জোর এক মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হতো, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগেই সেখানে বিরাটাকার কামান থেকে প্রায় এক টন ওজনের প্রকাণ্ড গোলা দুরন্ত বেগে হয়তো ত্রিশ মাইল দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সাম্প্রতিক কালে বিস্ফোরকের উৎপাদনে আরও নানা অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এ-যুগে রসায়ন ও যন্ত্র-বিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে হাজার মাইল দূরবর্তী লক্ষ্য স্থলে 'মিসাইল' বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, 'রকেট' ছুটে গিয়ে চাঁদে পৌঁছায়। এসব অবশ্য বিস্ফোরক-বিজ্ঞানের অতি আধুনিক চরম বিকাশ; আমরা বিস্ফোরক পদার্থাদির প্রাথমিক তথ্য ও ক্রমোন্নতির ধারা নিয়েই আলোচনা সুরু করি।

গান-পাউডার: খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কামান-বন্দুক থেকে গোলা নিক্ষেপের জন্যে এক রকম বিস্ফোরক-মিশ্রণ প্রচলিত হয়েছিল, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় **গান-পাউডার**। জিনিসটা **পটাসিয়াম-নাইট্রেট** (নাইটার বা সল্ট-পিটার, যাকে বাংলায় বলে শোরা), **সাল্ফার** (**গন্ধক**) ও কাঠ-কয়লার একটা বিশেষ সংমিশ্রণ; সামান্য

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে, বা আঘাত-জনিত সামান্য উত্তাপেই এই মিশ্রণের দাহ্য উপাদান গন্ধক ও কাঠ-কয়লার (চারকোল) দহন-ক্রিয়া অতি দ্রুত সংঘটিত হয়; আর তার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অক্সিজেন জোগায় সল্ট-পিটার বা শোরা। কথাটা হলো, সল্ট-পিটার বা শোরা হলো একটি অক্সিজেন-বহুল যৌগিক, উত্তাপে তা দ্রুত বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন বেরোয়, যার মাধ্যমে গন্ধক ও কাঠ-কয়লা মুহূর্তমধ্যে সামগ্রিকভাবে দগ্ধ হয়ে সালফার-ডাইঅক্সাইড ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করে। কামান-বন্দুকের আবদ্ধ খোলের মধ্যে এই আকস্মিক রাসায়নিক ক্রিয়া বা বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন ঐ গ্যাস-মিশ্রণের প্রবল চাপে নলের মুখ থেকে গোলা-গোলি ছুটে যায়। এই বিস্ফোরক-মিশ্রণ বা গান-পাউডারের বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এর মধ্যে মিশ্রিত থাকে শতকরা প্রায় 75 ভাগ সল্ট-পিটার বা শোরা, 10 ভাগ গন্ধক ও 15 ভাগ কাঠ-কয়লা। এ-যুগে গান-পাউডারের বিস্ফোরণ-শক্তির যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এর রাসায়নিক উপাদান আজও মোটামুটি ঐ একই আছে; কেবল এর সংমিশ্রণের ভৌত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ক্রমে এর কার্যকরী বিস্ফোরণ-শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলিকে বিশেষভাবে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকায় পরিণত করা হয়। তারপরে সেগুলিকে প্রায় 40° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে শুকিয়ে নিলে ব্যবহারোপযোগী **গান-পাউডার** উৎপাদিত হয়। বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে আজকাল খনি খননের কাজে ও নানা-রকম বাজির বারুদ রূপেই গান-পাউডার প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; যুদ্ধ-বিগ্রহে কামান বন্দুকের বিস্ফোরক-বারুদ হিসাবে ইদানীং এর আর তেমন ব্যবহার নেই। গান-পাউডারের বিস্ফোরণে প্রচুর ধূম নির্গত হয়ে সহসা চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এর ফলে যুদ্ধের তৎপরতা ব্যাহত হয়ে অসুবিধা ঘটায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী আরও শক্তিশালী ও সুবিধাজনক নানা রকম বিস্ফোরক পদার্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

নাইট্রো-সেলুলোজ

বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনের রাসায়নিক শিল্পে গান-পাউডারের পরে প্রথম চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটে 1846 খৃষ্টাব্দে, যখন সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাজেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রেডারিক সোয়েনবি **গান-কটন** আবিষ্কার করেন। তুলা বা উদ্ভিদ-তন্তুগুলি প্রধানতঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত একটা রাসায়নিক যৌগিক, যাকে বলা হয় **সেলুলোজ**। এর কথা আমরা 'সেলুলোজ ও সেলুলোজ-শিল্প' শীর্ষক অধ্যায়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করবো। তুলা বা সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের এক বিশেষ মিশ্রণের বিক্রিয়া ঘটালে সেলুলোজের বিভিন্ন নাইট্রেট যৌগিক উৎপন্ন হয়; এগুলির রাসায়নিক গঠন ও ধর্ম ঐ অ্যাসিড-মিশ্রণের আনুপাতিক ঘনত্ব, বিক্রিয়ার তাপমাত্রা ও সময়-কালের উপরে নির্ভর করে। সেলুলোজের এই নাইট্রেট যৌগিকগুলিকে বলা হয় সেলুলোজ-নাইট্রেট অথবা **নাইট্রো-সেলুলোজ**। কেবল তুলাই নয়, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ আঁশ বা কাঠের তন্তুকেও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করে নিয়ে (উড্ পাল্প) উল্লিখিত পদ্ধতিতে নাইট্রো-সেলুলোজে রূপান্তরিত করা যায় এবং তাকে নানা কাজে (রেয়ন, সেলোফোন প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পে) ব্যবহার করা হয়; উল্লিখিত 'সেলুলোজ' অধ্যায়ে এ-সব কথা আমরা যথোচিত আলোচনা করেছি। যাহোক, উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে তুলাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ সেলুলোজ; কাজেই নাইট্রো-সেলুলোজকে বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করতে হলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তুলা থেকে সেলুলোজের এই নাইট্রেট যৌগিকটা উৎপাদন করা হয়। বিশেষ বিস্ফোরক-ধর্মী বলে নাইট্রো-সেলুলোজের উৎপাদন কালে যথেষ্ট সাবধানতা ও কারিগরি দক্ষতার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

নাইট্রো-সেলুলোজ বা গান-কটন সাধারণতঃ উৎপাদিত হয় কাপড়ের কলের পরিত্যক্ত তুলার ছাঁট থেকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এগুলি থেকে ধুলা-ময়লা বিদূরিত করে পরিষ্কার তুলার ছাঁটগুলি প্রথমে কস্টিক সোডার (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, $NaOH$) জলীয় দ্রবণে বিশেষভাবে ফুটানো হয়, যাতে তুলার গায়ে মাখানো তৈলাক্ত পদার্থ ও সেলুলোজ ছাড়া তুলার অন্যান্য উপাদান সব দ্রবিত হয়ে বিশুদ্ধ সেলুলোজের আঁশ পাওয়া যায়। এর পরে এগুলিকে ক্লোরিন গ্যাস বা ব্লিচিং-পাউডার দিয়ে (বিরঞ্জিত) সাদা ধব্‌ধবে করে দ্রবণের জল থেকে তুলে নিয়ে সেই সিক্ত সেলুলোজ-তন্তুগুলিকে যন্ত্রের সাহায্যে ছাড়িয়ে আল্‌গা করে শুকিয়ে ফেলা হয়। এই শুষ্ক ও বিশুদ্ধ সেলুলোজ-তন্তুগুলিকে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের মধ্যে প্রায় আড়াই ঘণ্টা নিমজ্জিত রেখে সেলুলোজের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো হয়, যার ফলে

উৎপন্ন হয় **নাইট্রো-সেলুলোজ**। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সাধারণতঃ নাতিবৃহৎ গামলার মত অগভীর মৃৎপাত্রে ঘটানো হয়। বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেলে অতিরিক্ত অ্যাসিড পাত্রের তলদেশস্থ নির্গম-নলের পথে বার করে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এখন ঐ গামলা-গুলির মুখে সচ্ছিদ্র ধাতব প্লেট রেখে তার উপরে প্রচুর জল ঢেলে তার অভ্যন্তরস্থ নাইট্রো-সেলুলোজকে বেশ করে ধুয়ে ফেলা হয়, যাতে তার গায়ে অবিকৃত অ্যাসিড কিছু লেগে না থাকে। ঐ সচ্ছিদ্র প্লেট ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো, সোজাসুজি জল ঢাললে তার চাপে জলে-নিমজ্জিত অবস্থায়ও এই গান-কটন বা নাইট্রো-সেলুলোজ বিস্ফোরিত হতে পারে। যাহোক, এর পরে যৌগিকটার রাসায়নিক স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে আবার তাকে কিছুক্ষণ জলে ফুটিয়ে তারপরে শুকিয়ে নেওয়া হয়।
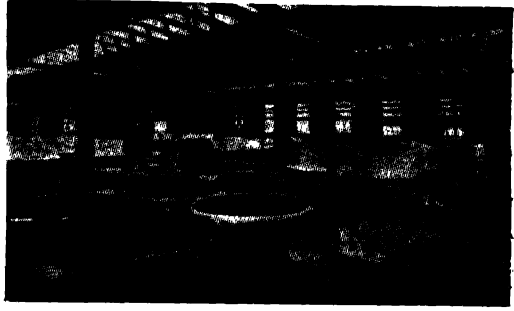
নাইট্রো-সেলুলোজ উৎপাদনের শ্রেণীবদ্ধ ভ্যাট বা গামলা

শুষ্ক ও বিচ্ছিন্ন নাইট্রো-সেলুলোজ জ্বালালে যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে জ্বলতে থাকে সত্য, কিন্তু এভাবে দহন-জনিত রাসায়নিক রূপান্তর বিস্ফোরণ ঘটবার মত তত দ্রুত ও তীব্র হয় না। নাইট্রো-সেলুলোজ বা গান-কটনের অণুগুলি বিস্ফোরণের উপযোগী যথেষ্ট শক্তি-সমৃদ্ধ হলেও কতকটা অস্থায়ী অবস্থায় থাকে; কাজেই সাধারণ দহন-ক্রিয়ায় তা থেকে সহসা সামগ্রিকভাবে শক্তি বিমুক্তি না ঘটে পদার্থটা উত্তাপে বিয়োজিত হয়ে অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে জ্বলতে থাকে। পক্ষান্তরে পদার্থটার কাছে সামান্য পরিমাণ **মার্কারি-ফুলমিনেট** বা লেড-অ্যাজাইড প্রভৃতি কোন বিস্ফোরক পদার্থের মৃদু বিস্ফোরণ ঘটালেও তার আলোড়নের ধাক্কায় নাইট্রো-সেলুলোজ সহসা সামগ্রিকভাবে ও অতি দ্রুত বিয়োজিত হয়ে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিয়োজনের ফলে পদার্থটা থেকে প্রভূত পরিমাণ নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের উদ্ভব ঘটে।

এই গ্যাসীয় পদার্থগুলি সবই বর্ণহীন ও স্বচ্ছ, আর এই রূপান্তর-ক্রিয়ায় কোনরূপ কঠিন পদার্থের কণিকাও উদ্ভূত হয় না; কাজেই নাইট্রো-সেলুলোজের বিস্ফোরণে কোন ধূম-ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়ে গান-পাউডারের মত অসুবিধা ঘটায় না।

বিস্ফোরক হিসাবে গান-কটনের বৈশিষ্ট্য কেবল তার ধূমহীন বিয়োজনেই নয়; পদার্থটা জলসিক্ত অবস্থায়, এমন কি, জলের ভিতরেও বিস্ফোরিত হয়। ভিজা নাইট্রো-সেলুলোজ বা গান-কটন অবশ্য সাধারণভাবে জ্বালাতে গেলে জ্বলে না; কিন্তু পুর্বোল্লিখিত মার্কারি-ফুল্মিনেট, অথবা লেড্-অ্যাজাইডের সহসা দহন-জনিত (ডিটোনেসন) বিস্ফোরণ সংক্রামিত করলে ঐ ভিজা গান-কটনও শুকনোরই মত সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে অলক্ষিতে শত্রু-জাহাজ ঘায়েল করতে সমুদ্রে যে 'মাইন' পাতা হয়, বা জলের তলা দিয়ে যে 'টর্পেডো' ছোঁড়া হয় তাতে বিস্ফোরক হিসাবে গান-কটনই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ-সব কাজে ব্যবহারের জন্যে গান-কটনকে জলসিক্ত অবস্থায় অতি উচ্চ চাপে যন্ত্রের সাহায্যে সাবধানে পিষে কঠিন পিণ্ডে বা চাকৃতির আকারে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়।

বিস্ফোরক হিসাবে গান-কটনের অসুবিধাও আছে। নামে গান-কটন হলেও এর বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ডভাবে ও অতি দ্রুত সংঘটিত হয় যে, সাধারণভাবে একে কামান বা বন্দুকে (গান) ব্যবহার করা চলে না। বিস্ফোরণের সঙ্গে-সঙ্গেই মুহূর্ত মধ্যে গান-কটন সম্যক বিস্ফোরিত ও বিয়োজিত হয়ে সহসা বিপুল পরিমাণ গ্যাসের উদ্ভূত হয়; আর তার প্রচণ্ড চাপে কামান-বন্দুকে গুরুতর ঝাঁকানি ও পশ্চাৎ-ধাক্কা লাগে, অনেক সময় তাতে কামান বা বন্দুক ফেটে গিয়েও বিপদ ঘটাতে পারে। এই বিপত্তির মূল কারণ হলো বিস্ফোরণের দ্রুততা ও আকস্মিকতা। এক পাউণ্ড **গান-পাউডার** বিস্ফোরিত হলে তা সম্যক দগ্ধ ও গ্যাসে রূপান্তরিত হতে যদি এক সেকেণ্ডের এক শ' ভাগের এক ভাগ সময় লাগে, তাহলে সম-পরিমাণ গান-কটনের ক্ষেত্রে এ-কাজে লাগে সেকেণ্ডের পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়। বিস্ফোরণের এরূপ তীব্র দ্রুততা ও উৎপন্ন গ্যাসীয় চাপের আকস্মিকতা ও প্রচণ্ডতার জন্যে বিস্ফোরক হিসাবে সাধারণভাবে **গান-কটন** ব্যবহার করা বিপজ্জনক। কামান-বন্দুকের গোলা-গোলি নিক্ষেপের বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে জিনিসটা অসুবিধাজনক হলেও গান-কটনের অন্যান্য অনেক সুবিধাও আছে; কাজেই এর বিস্ফোরণের দ্রুততা হ্রাস করে উল্লিখিত অসুবিধা দূর

করবার জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বহু চেষ্টার পরে তাতে শেষে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছেন। ইথার ও অ্যালকোহলের মিশ্রণের মধ্যে গান-কটন (নাইট্রো-সেলুলোজ) তেমন ভাল দ্রবিত হয় না, কিন্তু একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এর দ্রাব্যতা বাড়ানো যায়। নাইট্রো-সেলুলোজকে অধিক চাপে জলে নিমজ্জিত অবস্থায় উত্তপ্ত করলে তার নাইট্রোজেনের ভাগ শতকরা হিসাবে অনেকটা হ্রাস পায়; আর তখন তা ইথার-অ্যালকোহলের মিশ্রণে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। গান-কটনের এই দ্রবণ **কোলোডিয়ন** নামে পরিচিত। যাহোক, এখন প্রকৃত (বিশুদ্ধ) গান-কটনের সঙ্গে উক্ত দ্রাব্য নাইট্রো-সেলুলোজ (কম নাইট্রোজেনযুক্ত) কতকটা মিশিয়ে ইথার-অ্যালকোহল মিশ্রণে তাকে গলিয়ে-মিশিয়ে পেস্টের মত আঠালো করা হয়, তারপরে তাকে ছাঁচে চেপে ছোট-ছোট দানার আকারে পরিণত করা হয়। এই দানাগুলি থেকে শেষে উদ্বায়ী ইথার ও অ্যালকোহল দূরীভূত করলে জিলাটিনের মত চক্‌চকে যে দানা পাওয়া যায় তা-ই ধূমহীন বিস্ফোরকরূপে কামান-বন্দুকে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহে ধূমহীন বিস্ফোরক বারুদের প্রচলন এভাবেই প্রথম হয়েছিল। প্রস্তুতির পরে বেশি দিন রেখে দিলে অবশ্য পদার্থটা বিয়োজিত হয়ে তার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এর রাসায়নিক গঠনের স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে পদার্থটার সংগঠনে সামান্য পরিমাণে 'ডাইফিনাইল্যা-মাইন' নামক রাসায়নিক যৌগিক মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

নাইট্রো-গ্লিসারিন ও ডিনামাইট

বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনের রাসায়নিক অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভাবিত হয় নাইট্রো-গ্লিসারিন; এটা গান-কটন বা নাইট্রো-সেলুলোজের চেয়েও উন্নত ধরনের বিস্ফোরক পদার্থ। আমরা জানি, জান্তব চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল থেকে পাওয়া যায় গ্লিসারিন; যা একটি সুমিষ্ট ও ঘন তরল জৈব পদার্থ। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা 123) সাবান-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জৈব পদার্থটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। নাইট্রো-সেলুলোজ উৎপাদনের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিনের বিক্রিয়া ঘটালে পাওয়া যায় **নাইট্রো-গ্লিসারিন;** জিনিসটা একটা তরল পদার্থ ও অত্যন্ত বিস্ফোরক-ধর্মী। বস্তুতঃ এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গ্লিসারিন অবিকল সেলুলোজের অনুরূপ ব্যবহার করে। 1847 খৃষ্টাব্দে এই তরল বিস্ফোরক নাইট্রো-গ্লিসারিন আবিষ্কার করেন

স্থব্রেরো নামক একজন ইটালীয় রসায়ন-বিজ্ঞানী; কিন্তু তিনি এর বাস্তব ব্যবহারের কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন নি। এর কারণ, জিনিসটা এমন মারাত্মক বিস্ফোরক-ধর্মী যে অতি সামান্য নাড়া-চাড়াতেই বিস্ফোরিত হয়; বস্তুতঃ এ থেকে সেকালে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। আবিষ্কারের প্রায় পনের বছর পরে 1862 খৃষ্টাব্দে সুইডেনের রসায়নবিদ **অ্যালফ্রেড নোবেল** বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে নাইট্রো-গ্লিসারিন ব্যবহারের একটা নিরাপদ উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তা শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে তার বিশেষ নাম দেন **ডিনামাইট।** নাইট্রো-গ্লিসারিনের এরূপ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজে ব্যবহারোপযোগী রূপ দান করে বিজ্ঞানী নোবেল প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেন এবং অনেকে তাঁকেই নাইট্রো-গ্লিসারিনের আবিষ্কারক বলে জানেন। অ্যালফ্রেড নোবেল স্মরণীয় হয়ে আছেন অন্য কারণে; ধ্বংসাত্মক বিস্ফোরক ডিনামাইটের উৎপাদন-শিল্প থেকে তিনি যে বিপুল অর্থ অর্জন করেছিলেন তা আবার তিনি মানব-জাতির কল্যাণার্থে 'নোবেল পুরস্কার' দানের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন।

যাহোক, নোবেল তরল নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে **কিসেলগার** নামক এক রকম মৃত্তিকা মিশিয়ে ডিনামাইট উৎপাদন করেছিলেন। এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ সূক্ষ্ম বালু-কণার সঙ্গে মিশে এই বিশেষ মৃত্তিকা বা মাটির সৃষ্টি হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে কিসেলগার। তরল নাইট্রো-গ্লিসারিন কিসেলগারের মধ্যে শোষিত হয়ে যায়; আর এই অবস্থায় বিস্ফোরক পদার্থটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নাড়া-চাড়া বা স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়ে থাকে। ডিনামাইট নামে নাইট্রো-গ্লিসারিনের এই বিস্ফোরকটি নানা কাজে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ডিটোনেটর হিসাবে মার্কারি-ফুল্মিনেটের সাহায্যে এর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ে থাকে। কিসেলগারের পরিবর্তে চার-কোল, কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি শোষক পদার্থের মধ্যে নাইট্রো-গ্লিসারিন শোষিত করেও পরে ডিনামাইটের অনুরূপ বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে।

বিভিন্ন মিশ্র-বিস্ফোরক: গান-কটন ও নাইট্রো-গ্লিসারিনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী বিস্ফোরক হলো **ব্লাস্টিং জিলাটিন;** শতকরা 92 ভাগ নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে 8 ভাগ গান-কটন (নাইট্রো-সেলুলোজ) মিশিয়ে জিনিসটা প্রস্তুত হয়। এর বিস্ফোরণ-শক্তি ডিনামাইটের চেয়ে স্বভাবতঃই বেশি হবে, যেহেতু নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে কিসেলগারের

মত নিষ্ক্রিয় পদার্থ না মিশিয়ে এতে মেশানো হয় **গান-কটন**, যা নিজেই একটা তীব্র বিস্ফোরক। প্রকৃতপক্ষে 'ব্লাস্টিং জিলাটিন' এযাবৎ উদ্ভাবিত সর্বাধিক শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থগুলির অন্যতম। তরল নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে গান-কটন বা নাইট্রো-সেলুলোজের মিশ্রণের ফলে জিনিসটা দেখতে হয় জিলাটিনের মত নরম, চকচকে ও আঠালো। বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহারের সুবিধার জন্যে বিভিন্ন পদার্থ মিশিয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন করে বিভিন্ন নামে 'ব্লাস্টিং জিলাটিন' ব্যবহৃত হয়। সব চেয়ে অধিক প্রচলিত এই শ্রেণীর বিস্ফোরক **জেলিগ্নাইট** নামে পরিচিত; ব্লাস্টিং জিলাটিনের সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে পটাসিয়াম - নাইট্রেট (শোরা), অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, চার-কোল প্রভৃতি মিশিয়ে এটা তৈরি করা হয়।

লোহার পাত্রের মধ্যে ব্লাস্টিং জিলাটিনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে
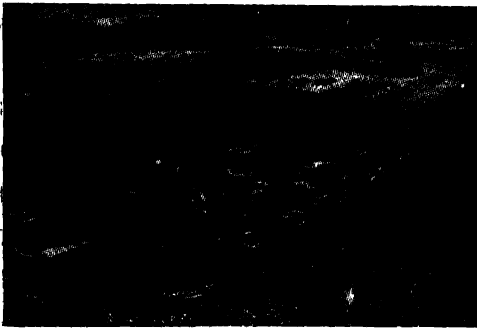
ব্লাস্টিং জিলাটিনের বিস্ফোরণে লোহার পাত্র খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে

এরূপ আর একটা মিশ্র বিস্ফোরক পদার্থ **কর্ডাইড** নামে পরিচিত; এটা যেমন একটা শক্তিশালী বিস্ফোরক, তেমনি ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ও নিরাপদ। শতকরা 65 ভাগ গান-কটন, 30 ভাগ অ্যাসিটোনে-দ্রবিত নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে 5 শতাংশ পরিমাণ ভেসিলিন মিশিয়ে একটা আঠালো মিশ্র-পদার্থ

উৎপাদিত হয়, যাকে যন্ত্রের সাহায্যে চেপে সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে সুতা বা দড়ির (কর্ড) আকারে নিষ্কাশিত করা হয়। এই দড়ি বা কর্ডের আকারের জন্যে পদার্থটার 'কর্ডাইট' নামকরণ করা হয়েছে। এই দড়িগুলি থেকে অ্যাসিটোন বাষ্পীভূত করে দূরীভূত করলে সেগুলি হাড়ের মত কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে সাধারণ নাড়া-চাড়া বা আঘাতে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে না; নিরাপদে ও নির্ভাবনায় ব্যবহার করা চলে। গান-কটন ও নাইট্রো-গ্লিসারিনের মত দু'টো উগ্র বিস্ফোরক পদার্থের সংমিশ্রণকে এরূপ নিরাপদ ও আপাত-নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক পদার্থে রূপান্তরিত করা বিস্ফোরক-রসায়নের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অথচ প্রয়োজনকালে মার্কারি-ফুল্মিনেট, লেড্-অ্যাজাইড প্রভৃতি কোন একটা প্রভাবক-বিস্ফোরকের (ডিটোনেটর) সাহায্যে কর্ডাইট অতি প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হয়। বিভিন্নদেশে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে কামান-বন্দুকের গোলা-গোলি নিক্ষেপক বিস্ফোরক-বারুদ হিসাবে এই কর্ডাইট বিশেষ প্রচলিত।

উল্লিখিত বিস্ফোরক পদার্থগুলি ছাড়া খনিজ কয়লার অন্তর্ধূম-পাতন ক্রিয়ায় (ডেস্ট্রাক্টিভ ডিস্টিলেসন) যে-সব মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ (পৃষ্ঠা 188) পাওয়া যায় তাদের কোন-কোনটি থেকেও উচ্চ শক্তিশালী বিস্ফোরক উৎপাদিত হয়েছে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এই শ্রেণীর বিস্ফোরক পদার্থগুলির মধ্যে পিক্রিক অ্যাসিড ও ট্রাইনাইট্রো-টলুইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান-কটন ও তা থেকে উৎপাদিত বিস্ফোরকগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বিশেষতঃ 'টর্পেডো' জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রে; আর কয়লা বা কোল-টারজাত উক্ত বিস্ফোরকগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় 'শেল' বা আগ্নেয়-গোলার বারুদ হিসাবে। কয়লা থেকে পাওয়া যায় **কার্বলিক অ্যাসিড,** যার রাসায়নিক নাম **ফেনল।** এই ফেনলের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড-মিশ্রণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপাদিত হয় **ট্রাইনাইট্রো-ফেনল,** যা **পিক্রিক অ্যাসিড** নামে সমধিক পরিচিত। এই বিক্রিয়ায় সাধারণতঃ যে পিক্রিক অ্যাসিড পাওয়া যায়, তা এক রকম ঈষৎ হল্‌দে রঙের ক্ষুদ্র স্ফটিকাকার পদার্থ; এক সময় এটা রেশম-বস্ত্রে হল্‌দে রঙ ধরাবার জন্যে রঞ্জক পদার্থ হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে এটা মেলিনাইট, ডানাইট, সিমোসাইট প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত হয়েছে। এর পরে ট্রাইনাইট্রো-টলুইন নামে আরও সুবিধাজনক ও বিশেষ শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মূল উপাদান হলো কয়লা থেকে উপজাত পদার্থ 'টলুইন'।

খনিজ কয়লা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মধ্যে **টলুইন** বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খনিজ কয়লার পাতন-ক্রিয়ার আলোচনা কালে 'বিভিন্ন জ্বালানী : তাপ ও আলোক' শীর্ষক অধ্যায়ে এর কথা আমরা বলেছি। এই হাইড্রোকার্বন টলুইনের ($C_6H_5.CH_3$) সঙ্গে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড-মিশ্রণের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় **ট্রাইনাইট্রো-টলুইন** উৎপাদিত হয়, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় **টি-এন-টি**, অথবা 'ট্রোটাইল'। জিনিসটা একটা কঠিন পদার্থ এবং বিশেষভাবে আপাত-নিষ্ক্রিয়; যথেচ্ছ নাড়া-চাড়া বা আঘাতে, এমন কি, জিনিসটার উপরে বুলেটের গুলি ছুঁড়লেও কোন বিস্ফোরণ ঘটে না। বিস্ফোরক হিসাবে এটা টি-এন-টির একটা আশ্চর্য গুণ। কেবলমাত্র মার্কারি-ফুল্মিনেট, লেড-অ্যাজাইড প্রভৃতি কোন উত্তেজক-বিস্ফোরকের (ডিটোনেটর) আকস্মিক দহনের সংস্পর্শে পদার্থটা অতি দ্রুত বিস্ফোরিত হয়; এর বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা পিক্রিক অ্যাসিডের চেয়ে কম তো নয়ই, অনেক সময় অধিকও হতে পারে। টি-এন-টির একটি ত্রুটি বা অসুবিধা এই যে, যৌগিকটার বিস্ফোরণে তার কার্বন উপাদানের অক্সিডেসন বা জারণ-ক্রিয়া নিঃশেষে সম্পূর্ণ হয় না; কাজেই অদগ্ধ কার্বন-কণিকা প্রচুর পরিমাণে উদ্‌গত হয়ে কালো ও ঘন ধূমে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। অবশ্য পদার্থটার সংগঠক কার্বন উপাদানের দহন বা জারণ-ক্রিয়া সম্পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করে এর এরূপ বিস্ফোরণ-জনিত ধূম উদ্‌গীরণ বন্ধ করা যেতে পারে। এজন্যে টি-এন-টির সঙ্গে **অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট** উপযুক্ত পরিমাণে মেশানো হয়; অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) হলো একটা অক্সিজেন-বহুল যৌগিক, যা টি-এন-টির বিস্ফোরণের সময়ে বিয়োজিত হয়ে কার্বনের সম্যক ও সম্পূর্ণ দহনের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন জোগায়। এর ফলে টি-এন-টি'র বিস্ফোরণ-জনিত ধূম উদ্‌গীরণ প্রায় নিঃশেষে নিবারিত হয়। এভাবে বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে ধূমহীন ও শক্তিশালী এক রকম বিস্ফোরক-মিশ্রণ প্রচলিত হয়েছে, যা **অ্যামাটল** নামে পরিচিত; এটা শতকরা 20 ভাগ টি-এন-টি ও 80 ভাগ অ্যামোনিয়াম-নাইট্রেট মিশিয়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। এরূপ মিশ্রণে অল্প পরিমাণ টি-এন-টি ব্যবহার করেও মোটামুটি সমান কাজ পাওয়া যায়, পদার্থটার অপচয় হয় না। আবার টি-এন-টির সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ মিশিয়ে আর এক রকম বিস্ফোরক-মিশ্রণ উৎপাদিত হয়, যাকে বলে **ট্রাইটোন্যাল**; বিশেষ এক শ্রেণীর শক্তিশালী 'বোমা' তৈরি করতে এই বারুদ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রচলিত বিস্ফোরক পদার্থগুলির মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ও তীব্র বিস্ফোরকধর্মী যৌগিকটি **সাইক্লোনাইট** নামে প্রচলিত; একে কোন কোন দেশে বলে 'আর-ডি-এক্স'। এটা কোল-টারের (আল্‌কাতরা) কোন হাইড্রোকার্বন থেকে তৈরি হয় না; এর মূল উপাদান হলো **মেথানল** বা 'মিথাইল অ্যালকোহল', যা 'চারকোল' উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় কাঠের অন্তর্ধূম-পাতনের ফলে পাওয়া যায়। এই মেথানলকে জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড) করে উৎপাদিত হয় **ফর্ম্যাল্‌ডিহাইড**; যার জলীয় দ্রবণ বীজবারক বা এন্টিসেপ্টিক পদার্থ হিসাবে 'ফর্ম্যালিন' নামে বাজারে বিক্রয় হয়। ফর্ম্যাল্‌ডিহাইডের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার (NH_3) বিক্রিয়া ঘটিয়ে পাওয়া যায় 'হেক্সামিন' নামক একটা যৌগিক পদার্থ। তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হেক্সামিনের যে জটিল নাইট্রেট যৌগিক $(CH_2.N.NO_2)_3$ উৎপন্ন হয় তাকেই বলা হয় সাইক্লোনাইট। দেখা গেল, মেথানল থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় এই শক্তিশালী বিস্ফোরক যৌগিক **সাইক্লোনাইট**; এটা বিস্ফোরক-রসায়নের এক কৃতিত্বপুর্ণ অধ্যায়। আবার টি-এন-টি, সাইক্লোনাইট (আর-ডি-এক্স) ও অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ বিভিন্ন অনুপাতে একসঙ্গে মিশিয়ে একটা বিশেষ শক্তিশালী বিস্ফোরক-মিশ্রণ উৎপাদিত হয়েছে, যাকে বলা হয় **টর্পেক্স**; এটা জলের তলায়ও বিশেষ কার্যকরীভাবে বিস্ফোরিত হয় এবং ডুবো-জাহাজ ধ্বংসের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে আমরা পদার্থ ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ও রূপান্তর সম্পর্কে এবং রাসায়নিক পদার্থের বিস্ফোরণ-জনিত রূপান্তরের ফলে শক্তির উদ্ভব সম্বন্ধীয় তথ্যাদির মোটামুটি আলোচনা করেছি। বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদনে মানুষের রাসায়নিক তৎপরতার আদি পর্ব থেকে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে-সব অগ্রগতি ঘটেছে এবং মানুষ ধীরে ধীরে যে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হলো। শক্তির সন্ধানে মানুষের প্রচেষ্টা ও বিস্ফোরক-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটেই চলেছে; যার ফলে সাম্প্রতিক কালে রাসায়নিক পদার্থের বিস্ফোরণে বিমুক্ত শক্তির বলে ও প্রযুক্তি-বিদ্যার নানা কৌশলে হাজার মাইল দূরেও আগ্নেয় গোলা (মিসাইল) অনায়াসে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, হাজার-হাজার মাইল ঊর্ধে রকেট উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। আবার অ্যাটম-বোমা ও হাই-ড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণে কল্পনাতীত ধ্বংস-শক্তি বিমুক্ত হয়ে পদার্থের রূপান্তরে শক্তির চরম বিকাশের ভয়াবহতা প্রমাণ করছে। এ-সবের জন্যে প্রয়োজনীয়

বিপুল শক্তির উৎস উদ্ভাবনে রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বহু জটিল তথ্যের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে ; এ-সবের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা কেবল বিভিন্ন রাসায়নিক বিস্ফোরক পদার্থগুলির মূলগত তথ্যাদির কিছু পরিচয় দিয়েছি মাত্র ; এগুলি থেকেও মানুষ যে বিপুল শক্তি অর্জন করেছে তা-ও কিছু কম ভয়াবহ নয়।

মানুষ আজ তার রাসায়নিক জ্ঞান ও তৎপরতার বলে এই যে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী হয়েছে, তাকে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসের কাজেই নয়, শান্তি ও সমৃদ্ধির কাজেও নিয়োজিত করা যায়। মানুষ কোন্ পথ বেছে নেবে, তা তার বিবেক ও শুভবুদ্ধির উপরে নির্ভর করে। এ-কথা মনে রাখা দরকার যে, শক্তিশালী বিস্ফোরকগুলির ব্যবহার কেবল মানুষের অস্ত্র-শক্তি বৃদ্ধি ও শত্রু-নিধনের কাজেই সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের বহু কল্যাণকর কাজেও এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে ও হচ্ছে। ডিনামাইটের বিস্ফোরণ-শক্তিতে পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ করে নানা দেশে বহু পার্বত্য সুরঙ্গ-পথ নির্মিত হয়েছে, কত পার্বত্যভূমি সমতল করে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে। বিস্ফোরণের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ খনি খননের কাজও সহজতর হয়েছে। সুয়েজ খাল, পানামা খাল প্রভৃতি খননের বিরাট প্রচেষ্টায় মানুষ যন্ত্র-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ বিস্ফোরণ-শক্তিরও সাহায্য নিয়ে সাফল্য লাভ করেছে। তাই বলি, কেবল মারণাস্ত্রের জন্যেই নয় ; বিভিন্ন শিল্প ও স্থাপত্য কাজের বহুবিধ প্রয়োজন মেটাতেও বিস্ফোরক পদার্থের আবশ্যকতা আজও অপরিহার্য ও অপরিসীম। এযুগে প্রতি বছর হাজার হাজার টন বিভিন্ন শ্রেণীর বিস্ফোরক পদার্থ উৎপাদিত হচ্ছে একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শিল্প হিসাবে। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের নিরলস অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে বিভিন্ন শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে ; মানব-কল্যাণে রসায়নের এ-ও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

একাদশ অধ্যায়

সেলুলোজ ও সেলুলোজ-শিল্প

সেলুলোজের উৎস ও রাসায়নিক গঠন — গ্লুকোজ, লার্জ মলিকিউল, বিশেষ কার্বোহাইড্রেট ; নাইট্রো-সেলুলোজ ও কৃত্রিম রেশম ঃ কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি—ভিস্কস পদ্ধতি, সেলুলোজ-রেয়ন ও অ্যাসিটেট-রেয়ন ঃ হাইড্রোলিসিস পদ্ধতি, ফর্টিসান, মার্সিরাইজেসন ; সেলোফেন-পেপার উৎপাদন ও ব্যবহার ; সেলুলয়েড —উপাদান, উৎপাদন ও ব্যবহার ; সেলুলয়েডের বিকল্প সেলোন ও লুমারিথ ঃ নাইট্রো-সেলুলোজ থেকে অয়েল-ক্লথ, কৃত্রিম চামড়া বা রেক্সিন, কলোডিয়ন, বিভিন্ন ল্যাকার ও ভার্নিস ঃ কাঠের সেলুলোজ থেকে অ্যালকোহল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও জাইলোস। কাগজ-শিল্প ঃ কাগজের বিভিন্ন প্রাচীন বিকল্প — শিলা-লিপি, পোড়া-মাটির বই, তাম্রলিপি, ভূর্জপত্র, তালপাতার পুঁথি, পেপিরাস, পার্চমেণ্ট ও তুলোট-কাগজ। সেলুলোজ-ভিত্তিক আধুনিক কাগজ-শিল্প —সোডা পাল্প, সালফেট পাল্প, ও উড্পাল্প ; কাগজের বিভিন্ন উপাদান ও রাসায়নিক পদ্ধতি— কুকিং, সাইজিং ও ক্যালেণ্ডারিং ; রকমারি কাগজ ও রকমারি পদ্ধতি।

সেলুলোজ হলো একটি জটিল জৈব-রাসায়নিক যৌগ, প্রকৃতির রসায়নাগারে যা উৎপন্ন হয় উদ্ভিদ-দেহে। উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাত্রই প্রধানতঃ সেলুলোজ পদার্থে গঠিত ; কাঠের তন্তু, নানা রকম উদ্ভিজ্জ আঁশ, তুলা প্রভৃতির মুখ্য উপাদান হলো এই কার্বন-যৌগিক। কার্বন-আত্মীকরণ (ফোটোসিন্থেসিস, পৃষ্ঠা 44) প্রক্রিয়ায় বায়ুর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের কার্বন উপাদানের সঙ্গে জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে উদ্ভিদ-দেহে প্রথমে **গ্লুকোজ** ও পরে তা থেকে **সেলুলোজ** উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেলুলোজ হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগিক পদার্থ ; আর তার মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত হলো 2 : 1, যেমন রয়েছে জলের (H_2O) অণু গঠনে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত কেবল সেলুলোজেই নয়, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ যৌগিক, যেমন—ইক্ষু, বিট্ প্রভৃতির গ্লুকোজ, সুক্রোজ প্রভৃতি শর্করা (সুগার), চাল-গম প্রভৃতির শ্বেতসার (স্টার্চ) ও আরও অনেক জৈব যৌগিকের অণু গঠনে মৌলিক এই গ্যাস দু'টির অনুরূপ (2 : 1) অনুপাত রয়েছে। এথেকে সাধারণভাবে মনে হয় যে, কার্বনের সঙ্গে জলের রাসায়নিক সংযোগে এই শ্রেণীর জৈব যৌগিক

উৎপন্ন হয়; আর তাই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-ঘটিত এই শ্রেণীর যৌগিকগুলি সাধারণভাবে **কার্বোহাইড্রেট** নামে পরিচিত। বস্তুতঃ এই কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর যৌগিকের অণু-গঠনে গ্যাসীয় উপাদান দু'টির অনুপাত জলের অনুরূপ হলেও এগুলি কার্বনের হাইড্রেট (জল-সংযুক্ত) যৌগিক নয়।

সেলুলোজের অণু গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত হলো ছয়টি কার্বন-পরমাণু, দশটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও পাঁচটি অক্সিজেন-পরমাণু; তাই $C_6H_{10}O_5$ হলো এর আণবিক সংকেতের উপাদানিক অনুপাত। একটি সেলুলোজ-অণুর গঠনে এই অনুপাতে উক্ত উপাদানগুলির শত-শত গুণিতকে সংযোগ ঘটে এবং সেলুলোজের এক-একটি বৃহদাকার অণু (লার্জ বা ম্যাক্রো মলিকিউল) গঠিত হয়। আমরা আগেই বলেছি, উদ্ভিদ-দেহে প্রথমে উৎপন্ন হয় **গ্লুকোজ,** তা-ই ক্রমে সেলুলোজে রূপান্তরিত হয়। গ্লুকোজ-অণুর গঠন হলো $C_6H_{12}O_6$; প্রকৃতির বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহে গ্লুকোজের এরূপ শত-শত অণু পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে এক-একটি বৃহদাকার
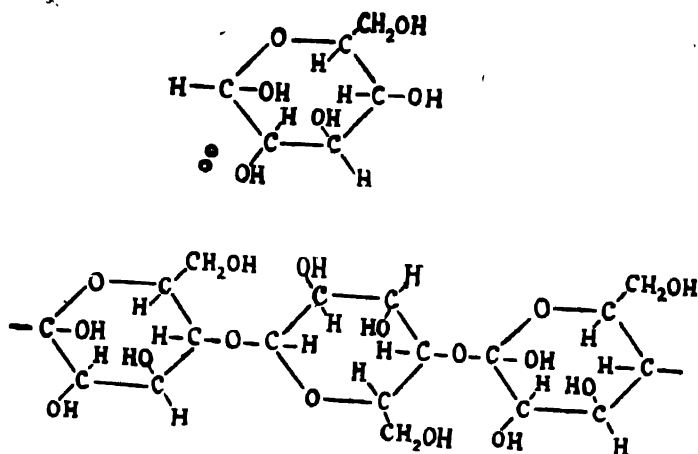
উপরে একটি গ্লুকোজ-অণু; নিচে সেলুলোজ-অণুর গঠনে গ্লুকোজ-অণুর সংযোগ দেখানো হয়েছে

সেলুলোজ-অণু গঠিত হয়। এই সংযোগ-কালে দু'-দুটি পাশাপাশি গ্লুকোজ-অণু থেকে এক-এক অণু জল (H_2O) বিমুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়, আর তাদের বাকী অংশ পরস্পর জুড়ে যায়। শত শত গ্লুকোজ-অণু এভাবে শৃঙ্খলাকারে জুড়ে সেলুলোজের এক-একটি বৃহৎ অণু গঠিত হয়। সেলুলোজের আণবিক গঠন তাই এভাবে প্রকাশ করা হয় $(C_6H_{10}O_5)n$; এখানে n

হলো সংবদ্ধ গ্লুকোজ-অণুর সংখ্যা। যাহোক, এটা জৈব যৌগিকের **অতিকায় অণুর গঠন** সম্পর্কিত কিছুটা জটিল তথ্য, যার বিশদ আলোচনায় আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এটুকু মাত্র বলা হলো যে, প্রকৃতির রাসায়নিক নৈপুণ্যে উদ্ভিদ-দেহে স্বভাবতঃই বহু সংখ্যক গ্লুকোজ-অণু একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে সেলুলোজের এক-একটি বৃহদাকার অণু গঠিত হয়; আর এই সেলুলোজই সব রকম উদ্ভিদের দেহ-কাঠামোর মুখ্য উপাদান।

উদ্ভিদ-দেহের কাঠ, আঁশ বা তন্তু, তুলা প্রভৃতি সবই মুখ্যতঃ সেলুলোজ; এটা প্রকৃতির একটি অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগিক পদার্থ, মানুষের নানা প্রয়োজনে যার অবদান অনেক। কাঠ মানুষের প্রধান জ্বালানী; বস্তুতঃ এর সেলুলোজই দগ্ধ হয়ে তাপ উৎপাদন করে। আবার ভূ-গর্ভস্থ চাপ ও তাপে যুগ যুগ ধরে বিকৃত হতে হতে উদ্ভিদ-দেহের সেলুলোজই রূপান্তরিত হয় কয়লায়, যা আধুনিক শিল্প-সভ্যতায় সর্বাধিক গুরুত্বপুর্ণ জ্বালানী। 'বিভিন্ন জ্বালানী: তাপ ও আলোক' শীর্ষক অধ্যায়ে বিভিন্ন জ্বালানীর আলোচনা প্রসঙ্গে কয়লা থেকে উপজাত যে-সব মূল্যবান পদার্থের কথা বলা হয়েছে সেগুলি উদ্ভিদ-দেহের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির রাসায়নিক রূপান্তর মাত্র; মূল কয়লা রূপান্তরিত সেলুলোজ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে উদ্ভিদের সেলুলোজই কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে; আর বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ সেলুলোজের রূপান্তর ঘটিয়ে তার প্রয়োজন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বহুবিধ উপকরণ উৎপাদন করেছে। সেলুলোজ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠে আধুনিক মানব-সভ্যতার বহুমুখী অগ্রগতি ঘটিয়েছে। কেবল বস্ত্রশিল্প ও কাগজ-শিল্পই নয়, **নাইট্রো-সেলুলোজ** শ্রেণীর বিস্ফোরক, কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন, সেলুলয়েড, সেলোফেন, রেক্সিন প্রভৃতি নানারকম অত্যাশ্চর্য ও অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের উৎপাদন-শিল্প মূলতঃ উদ্ভিজ্জ সেলুলোজের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিজ্জ সেলুলোজের নানা রকম প্রকার-ভেদ আছে; কাঠের তন্তু, বিভিন্ন উদ্ভিদের আঁশ, তুলা, পাট, ঘাস, লতাপাতা সবই মূলতঃ সেলুলোজে গঠিত। প্রকৃতির রাজ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ সেলুলোজ হলো তুলা; কার্পাসজাতীয় উদ্ভিদের বীজাধারে লম্বা আঁশযুক্ত যে সাদা পদার্থ জন্মায়। সাধারণ বস্ত্রশিল্পে এই উদ্ভিজ্জ তুলাই মূল উপাদান; তুলা দিয়ে যে সূতীবস্ত্র বোনা হয় তাতে সেলুলোজের তেমন কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্থান নেই। অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণীর সেলুলোজ থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে নানা রকম কাগজ উৎপাদিত হয়।

কাগজের রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো। তুলার সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে **নাইট্রো-সেলুলোজ** বা সেলুলোজ-নাইট্রেট নামক যে শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ উৎপন্ন হয়, সে সম্পর্কে আমরা 'পদার্থ ও শক্তি: বিভিন্ন বিস্ফোরক' শীর্ষক অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করেছি। এই নাইট্রো-সেলুলোজ কেবল বিস্ফোরকই নয়, এটি সেলুলোজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নাইট্রেট-যৌগিক, যা থেকে **কৃত্রিম রেশম, সেলুলয়েড** প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদিত হয়। তাই আমরা নাইট্রো-সেলুলোজের রাসায়নিক কাহিনী দিয়েই সেলুলোজ-শিল্পের আলোচনা সুরু করছি।

কৃত্রিম রেশম বা সিল্ক

সেলুলোজ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের একটা সম্ভাবনার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত বিজ্ঞানী রবার্ট হুকের 'মাইক্রোগ্রাফিয়া' নামক পুস্তকে। এ নিয়ে অনেকেই হয়তো সেই থেকে নানাভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু উণবিংশ শতাব্দীর আগে কেউ সফল হন নি।

1883 খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম রেশম বা সিল্ক উৎপাদনের প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করেন বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী স্যার জোসেফ সোয়ান। বিভিন্ন রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি নাইট্রো-সেলুলোজের সূক্ষ্ম ও শক্ত সুতা তৈরি করেন, আর তার বিস্ফোরক-ধর্মী সহজ-দাহ্যতা দোষও দূর করেন; অর্থাৎ এই সুতার নাইট্রো-সেলুলোজকে পুনরায় সাধারণ সেলুলোজের আকারে রূপান্তরিত করা হয়। এই রূপান্তরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সেলুলোজ-সূত্রগুলি আসল রেশমের অনুরূপ চাকচিক্য-

রেশম উৎপাদক গুঁটিপোকা ও রেশম-তন্তুর গুঁটি (উপরে বাঁ-দিকে)

বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। দৃশ্যতঃ এক রকম হলেও রাসায়নিক গঠনে এই কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে গুঁটিপোকার আসল রেশমের রাসায়নিক গঠনের কোন মিল

নেই। আসল রেশম হলো গুঁটিপোকার দেহ-নিঃসৃত এক রকম **প্রোটিন** পদার্থ, যার গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন-পরমাণুও যুক্ত থাকে; কিন্তু সেলুলোজের অণুর গঠনে নাইট্রোজেন থাকে না, এ কথা আমরা আগেই বলেছি।

নাইট্রো-সেলুলোজ থেকে **কৃত্রিম রেশম** উৎপাদনে জোসেফ সোয়ান যে-সব রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সংক্ষেপে এভাবে তার উল্লেখ করা যায়। অ্যালকোহল ও ইথারের মিশ্র-দ্রাবকে নাইট্রো-সেলুলোজ দ্রবীভূত করলে এক রকম আঠালো অর্ধ-তরল পদার্থ পাওয়া যায়। যন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে এই ঘন আঠালো পদার্থটাকে পাত্রের অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বাইরে জলের ভিতরে বের করে দেওয়া হয়। এই সূক্ষ্ম ধারাগুলি জলের সংস্পর্শে জমে গিয়ে সরু সূতার আকার ধারণ করে। নাইট্রো-সেলুলোজের (পৃষ্ঠা 304) এই সূতা স্বভাবতঃই সহজদাহ্য হয়ে থাকে; সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রেট (NO_3) মূলকের সংযোগই এই সহজ-দাহ্যতার মূল কারণ। অ্যামোনিয়াম সালফাইডের বিক্রিয়ায় এই সূতার নাইট্রেট-মূলক বিদূরিত হয়ে অবশিষ্ট থাকে কেবল সেলুলোজ। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এরূপ সূতার রূপান্তরিত সেলুলোজের চেহারা বর্ণে ও চাকচিক্যে গুঁটিপোকার তৈরী আসল রেশম বা সিল্কের মত দেখায় এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি বুনলে আসল সিল্কের মত কোমল ও মনোরম হয়। ইংল্যাণ্ডে এই কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন-শিল্প প্রথম গড়ে ওঠে।

সেলুলোজ থেকে কৃত্রিম রেশম

নাইট্রো-সেলুলোজ থেকে জোসেফ সোয়ান কৃত্রিম সিল্ক উৎপাদনের উল্লিখিত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন 1883 খৃষ্টাব্দে। এর কয়েক বছর পরেই 1889 খৃষ্টাব্দে ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী কাউন্ট শারদোনে এর এক সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কৃত্রিম রেশম-শিল্পে যুগান্তর আনেন। ইনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের ছাত্র ও সহকর্মী। শারদোনের পদ্ধতির মূল উপাদান নাইট্রো-সেলুলোজ নয়; তিনি কাঠ, তুলা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সেলুলোজকেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি কৃত্রিম রেশমে রূপান্তরিত করেন। পদ্ধতিটি মোটামুটি হলো এই যে, সেলুলোজ-বহুল বিভিন্ন নরম কাঠের (ফার, বার্চ প্রভৃতি) কুঁচি থেকে প্রথমে কাঠের বিশুদ্ধ **সেলুলোজ-তন্তু** উদ্ধার করা হয়। এর জন্যে কাঠের কুঁচিগুলির সঙ্গে অ্যাসিড সালফাইট নামক

রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে প্রকাণ্ড আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পের সাহায্যে সেগুলিকে সিদ্ধ করা হয়; এর ফলে কাঠের বিভিন্ন জৈব ও ধাতব উপাদান গলে বেরিয়ে যায়, আর তার সেলুলোজ বা কাষ্ঠ-তন্তুগুলি ছেড়ে গিয়ে কতকটা তুলার মত নরম ও ফুস্‌ফুসে হয়ে পড়ে। এই সেলুলোজ-তন্তুগুলিকে কষ্টিক সোডার উত্তপ্ত জলীয় দ্রবণে ফুটিয়ে পিশে ফেললে সেলুলোজের এক রকম নরম পিণ্ড পাওয়া যায়। এরপর কার্বন-ডাইসালফাইডের বিক্রিয়ায় এই সেলুলোজ-পিণ্ড গলিয়ে পাওয়া যায় জিলেটিনের মত এক রকম আঠালো ঘন তরল পদার্থ। যান্ত্রিক কৌশলে চাপ দিলে এই আঠালো পদার্থের অতি সূক্ষ্ম ধারা বাইরে অ্যাসিড-জলের ভিতরে বেরিয়ে আসে, ফলে সেগুলি জমে শক্ত সূতায় পরিণত হয়। এই সূতার উপাদান মূলতঃ বিশুদ্ধ সেলুলোজ; কিন্তু উল্লিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির ফলে তা বর্ণে, ঔজ্জ্বল্যে ও কোমলতায় গুঁটিপোকার তৈরী আসল রেশম-তন্তুর অনুরূপ হয়ে ওঠে। ফরাসী দেশে শারদোনের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে **নকল সিল্ক** উৎপাদনের বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে সস্তা, দেখতে সুদৃশ্য এর বস্ত্রাদির ব্যবহার দ্রুত বেড়ে যায় এবং ক্রমে বিভিন্ন দেশে এই শিল্পের প্রসার ঘটে।

সেলুলোজ থেকে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে শারদোনেই পথপ্রদর্শক; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই আমেরিকা, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রেশম তৈরির আরও নানারকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সারা পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই এই শিল্প ব্যাপকভাবে চালু হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই **কৃত্রিম রেশম** (আর্টিফিশিয়াল সিল্ক) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত; কোথাও এর নাম 'গ্লান্‌স', কোথাও 'লাস্ট্রন', আবার কোথাও বলে 'কেমিক্যাল সিল্ক'। কৃত্রিম রেশম-শিল্পে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর; আর সে-দেশের কৃত্রিম রেশম **'রেয়ন'** নামে পরিচিত। আমাদের দেশে আমেরিকার 'রেয়ন' সিল্কের প্রচলনই বেশি।

ভিস্‌কস পদ্ধতি: ইদানিং কৃত্রিম রেশম বা 'রেয়ন' উৎপাদনে যে পদ্ধতিটি সাধারণতঃ প্রচলিত তাকে বলা হয় ভিস্‌কস পদ্ধতি। বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী বিভান ও ক্রশ যুগ্মভাবে এই পদ্ধতির উদ্ভাবক; এটা অবশ্য শারদোনের উদ্ভাবিত পদ্ধতিরই প্রায় অনুরূপ। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠ থেকে যে সেলুলোজ-তন্তু পাওয়া যায় তাকে কষ্টিক সোডার জলীয় দ্রবণে সিদ্ধ করলে তা যথেষ্ট নরম ও চক্‌চকে হয়। কেবল কাঠের তন্তুই নয়, তুলাও এতে

ব্যবহৃত হতে পারে। এই নরম সেলুলোজকে কার্বন-ডাইসালফাইডে দ্রবিত করলে পাওয়া যায় ঘন সিরাপের মত তরল পদার্থ, যাকে বলা হয় সেলুলোজ **'ভিস্‌কস'।** অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে পদার্থটা নিয়ে পাম্পের সাহায্যে চাপ দিয়ে জিনিসটার সূক্ষ্ম ধারা-প্রবাহ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাইরের একটা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের ভিতরে। এই দ্রবণে থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট ও গ্লুকোজ। এসব রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় ভিস্‌কসের সূত্রগুলি জমে আবার সেলুলোজ-তন্তুর আকার ধারণ করে। এই পুনর্গঠিত সেলুলোজের চেহারা দাঁড়ায় আসল রেশমের মত চক্‌চকে উজ্জ্বল; যার অতিসূক্ষ্ম তন্তুগুলি পাকিয়ে সূতা করে নকল সিল্কের বস্ত্রাদি বোনা হয়।

কোন কোন দেশে আবার কার্বন-ডাইসালফাইডের বদলে সেলুলোজ তন্তুর দ্রাবক হিসাবে 'কুপ্রা-অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড' নামক রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এতেও সেলুলোজ গলে এক রকম নরম আঠালো পিণ্ডে পরিণত হয়, আর পাম্পের সাহায্যে চাপ দিয়ে তার সূক্ষ্ম সূত্রগুলিকে সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু জলীয় দ্রবণের মাধ্যমে জমিয়ে কৃত্রিম রেশম-সূত্র পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর এসব নকল সিল্কের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এর স্বল্প মূল্য; অথচ আসল সিল্কের মত হয় এর চাক্‌চিক্য ও বর্ণোজ্জ্বলতা। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে **'রেয়ন'** সিল্ক আসল সিল্কের চেয়েও চক্‌চকে হয়। নকলের এই অতিরিক্ত চাক্‌চিক্য ও চমক কমিয়ে আসল রেশমের অনুরূপ করবার রাসায়নিক উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এরূপ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল রেয়ন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর জন্যে সেলুলোজের ভিস্‌কস-পিণ্ডের সূক্ষ্ম সূত্রগুলিকে সাধারণতঃ টিটানিয়াম অক্সাইডের দ্রবণের ভিতরে চেপে বের করা হয়। কৃত্রিম রেশমের ভিস্‌কস মূলতঃ রূপান্তরিত সেলুলোজ ছাড়া আর কিছুই নয়; কাজেই সাধারণ সূতীবস্ত্রের মত এতেও রং ধরে। উপযুক্ত রং মিশিয়ে সূতা তৈরির আগেই ভিস্‌কস-পিণ্ডকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করা হয় এবং তা থেকে **রঙীন রেয়ন** সূত্র তৈরি করে বর্ণোজ্জ্বল শৌখিন বস্ত্রাদি বোনা হয়।

অ্যাসিটেট রেয়ন: উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর নকল সিল্ক বস্তুতঃ রূপান্তরিত সেলুলোজ মাত্র; রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজের বাহ্যিক চেহারা বদলায়, রাসায়নিক গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। এই শ্রেণীর কৃত্রিম

রেশমকে তাই **'সেলুলোজ রেয়ন'** বলা হয়; পক্ষান্তরে 'অ্যাসিটেট রেয়ন' হলো সেলুলোজের একটা রাসায়নিক যৌগিক। সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপাদন করা হয় **সেলুলোজ-অ্যাসিটেট,** যেমন নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় হয় নাইট্রো-সেলুলোজ বা সেলুলোজ-নাইট্রেট। এই সেলুলোজ-অ্যাসিটেটকে অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করলে জেলির মত এক রকম ঘন থকৃথকে পদার্থ পাওয়া যায়। পাম্পের সাহায্যে চেপে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে এই পদার্থের সুতা বের করে সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে উষ্ণ বায়ু-প্রবাহ চালালে তার দ্রাবক অ্যাসিটোন উবে দূরীভূত হয়ে যায়, আর সেলুলোজ-অ্যাসিটেটের সূক্ষ্ম সুত্রগুাল জমে কৃত্রিম রেশমের আকার ধারণ করে। এই শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম **অ্যাসিটেট রেয়ন** নামে পরিচিত। কোন কোন দেশে এই পদ্ধতিতেও আজকাল কৃত্রিম সিল্ক প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বস্ত্র ছাড়াও অ্যাসিটেট রেয়নের আর একটা বিশেষ ব্যবহার আছে। কস্টিক সোডা বা পটাসের মৃদু জলীয় দ্রবণের বিক্রিয়ায় এই সুতার উপাদান সেলুলোজ-অ্যাসিটেট বিয়োজিত হয়ে তার অ্যাসিডাংশ বিমুক্ত হয়ে গিয়ে তা আবার সেলুলোজে রূপান্তরিত হয়। ক্ষারীয় দ্রবণের জলের সঙ্গে অ্যাসিটেট যৌগকের **হাইড্রোলিসিস** প্রক্রিয়ায় এরূপ রূপান্তর ঘটে। এই রূপান্তরিত সেলুলোজ-সূত্রগুলিকে লম্বালম্বিভাবে টেনে বাড়ালে তাদের ভিতরকার শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃহদাকার অণুগুলির আণবিক গঠন-সজ্জায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আসে যাতে সুতাগুলির দৃঢ়তা অত্যধিক বেড়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ-সূত্রের দৃঢ়তা সমপরিমাণ ইস্পাতের তারের চেয়েও বেশি হয়; এ এক অদ্ভুত শক্তিশালী সুদৃঢ় সুতা। এরূপ পুনর্গঠিত টান-করা সেলুলোজ-সূত্রের বিশেষ নাম **ফর্টিসান**; এর হাল্‌কা অথচ সুদৃঢ় দড়ি বেলুন, এরোপ্লেন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জিনিসটা কাচের মত স্বচ্ছ; তাই এর পাতকে **কাচের বিকল্প** হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। বিশেষতঃ ভিতরে তারের জালি দিয়ে সেলুলোজ-অ্যাসিটেটের পাত জমিয়ে দরজা-জানালায় কাচের শার্সির মত ব্যবহৃত হয়, যা শিল্পক্ষেত্রে 'উইণ্ডোলাইট' নামে পরিচিত।

উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর কৃত্রিম রেশমের বিরাট শিল্প এ-যুগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে, আর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড এরূপ রাসায়নিক রেশম-সূত্রের সুদৃশ্য বস্ত্রাদি উৎপাদিত হয়ে আধুনিক মানুষের রুচি ও শখ-সৌখিনতা বাড়িয়েছে। ঔজ্জ্বল্য ও চাকৃচিক্যে আসল রেশমের মত, অথচ দামে সস্তা এ-সব নকল

সিল্কের কেবল সুদৃশ্য শাড়িই নয়, এ-দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, মোজা, রুমাল প্রভৃতি এ-যুগে বিশেষ জনপ্রিয়। আবার তুলা বা পশমের (উল) আঁশের সঙ্গে এই কৃত্রিম রেশম-সূত্র মিশিয়েও এক রকম মিশ্র সূতা পাকিয়ে তা দিয়ে নানা রকম কাপড় বোনা হয়, যা অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য ও উপযোগী হয়ে থাকে। কৃত্রিম রেশমের রকমারি বস্ত্র-শিল্পের বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

একটা কথা এখানে বলা দরকার, অনেকটা কৃত্রিম রেশমের মত কিছুটা চাকচিক্য-বিশিষ্ট এক রকম সূতী বস্ত্রের প্রচলন আছে, যাকে বলা হয় **মার্সেরাইজ্‌ড** কাপড়। এটা কৃত্রিম রেশম নয়, সাধারণ সূতী বস্ত্রকেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরূপ করা হয়। 1844 খৃষ্টাব্দে জন মার্সার নামক ইংলণ্ডের জনৈক কাপড়-ছাপাওলা এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেন; আর তাঁর নামানুসারে এরূপ সূতী বস্ত্রকে 'মার্সেরাইজ্‌ড' কাপড় বলা হয়। পদ্ধতিটা হলো এই যে, **কস্টিক সোডার** জলীয় দ্রবণে সূতী বস্ত্র কিছুক্ষণ নিমজ্জিত রাখলে তার পাকানো সূতাগুলি ফুলে ওঠে এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সঙ্কুচিত হয়ে কাপড়টা যথাসম্ভব খেপে যায়; এর ফলে ব্যবহারের সময় তার আর সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তাই এরূপ কাপড়ে তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদের মাপ ঠিক থাকে। কস্টিক-সোডার বিক্রিয়ায় এরূপ সূতী বস্ত্রে কৃত্রিম রেশমের মত কিছুটা চাকচিক্যও দেখা দেয়। পরবর্তী কালে এর আর একটা উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কাপড় নয়, বোনার আগে তার সূতাগুলিকেই কস্টিক-সোডার দ্রবণে যথাসম্ভব টান-টান করে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত রেখে, তার পরে তা ধুয়ে শুকিয়ে সেই সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ব্যবহারের সময় যেমন সংকুচিত হয় না, তেমন আবার অধিকতর চাকচিক্যবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরূপ মার্সেরাইজ্‌ড কাপড়ের মসৃণতায় আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে তা প্রায় রেশমের অনুরূপ উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য হয়ে ওঠে।

নাইলন, ডেক্রন প্রভৃতি যে-সব সুদৃশ্য বস্ত্র ইদানীং প্রচলিত হয়েছে সেগুলি কৃত্রিম রেশমের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ-সব বস্তুতঃ সেলুলোজ-ভিত্তিক সূত্র দিয়ে উৎপাদিত হয় না, এগুলি সম্পূর্ণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত পদার্থের সূতা দিয়ে তৈরি হয়। এ বিষয়ে আমরা 'রাসায়নিক সংশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে পরে যথোচিত আলোচনা করবো। কৃত্রিম রেশম বা আর্টিফিশিয়াল সিল্কের মূল উপাদান উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ; সেই সেলুলোজের বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের কথাই এখানে আমাদের আলোচ্য।

সেলোফেন

বিভিন্ন সৌখিন দ্রব্যাদি, খাদ্যবস্তু, ঔষধপত্র প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে এক রকম স্বচ্ছ ও পাত্‌লা পর্দার মত কাগজে মুড়ে বিক্রয় হয়, যাকে বলা হয় 'সেলোফেন পেপার।' জিনিসটার মূল উপাদান হলো সেলুলোজ; কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে যে 'ভিস্‌কস' পিণ্ডের কথা বলা হয়েছে তা থেকেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সেলোফেন কাগজও তৈরি হয়ে থাকে। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন-সূত্রের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ভিস্‌কসের সূত্র চেপে বের করা হয়; আর **সেলোফেন পেপার** উৎপাদনের জন্যে যান্ত্রিক কৌশলে পাত্রের অতি সূক্ষ্ম, অথচ চওড়া কাটা-পথে ভিস্‌কসের পাতলা পর্দার মত ধারা নির্গলিত করা হয় বিশেষ একটা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের ভিতরে। সেলোফেনের এই স্বচ্ছ ও পাতলা পর্দাকে তার পরে হাইড্রোজেন-পারঅক্সাইড দিয়ে বিশেষভাবে বিরঞ্জিত (ব্লিচ্‌) করে, ধুয়ে নিয়ে, উষ্ণ বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

সেলোফেন কাগজের শিল্প-উৎপাদনে সচরাচর যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে সংক্ষেপে তার কিছু আলোচনা করা যাক্। কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে যোসেফ সোয়ানের অবলম্বিত পদ্ধতির সঙ্গে এর মূল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কাঠ, তুলা প্রভৃতি থেকে বিশুদ্ধ সেলুলোজ উদ্ধার করবার রাসায়নিক পদ্ধতির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপন্ন করা হয় নাইট্রো-সেলুলোজ। এই নাইট্রো-সেলুলোজকে অ্যালকোহল ও ইথারের মিশ্র দ্রাবকে গলিয়ে-মিশিয়ে কয়েক দিন রেখে দিলে তা এক রকম চট্‌চটে জেলির মত আঠালো পদার্থে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন-পারক্সাইডের বিক্রিয়ায় পদার্থটাকে বিরঞ্জিত (ব্লিচ্‌) করে ও জলে ধুয়ে পরিষ্কৃত করলে তা বেশ স্বচ্ছ ও চক্‌চকে হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ জিনিসটা কৃত্রিম রেশমের গলিত পিণ্ড বা **ভিস্‌কস** ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্বচ্ছ ও আঠালো পদার্থটাকে পাম্পের সাহায্যে চেপে পাত্রের অতি সূক্ষ্ম, অথচ চওড়া একটা কাটা-পথে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে পদার্থটা পাত্‌লা পর্দার মত হয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে গ্লিসারিনের জলীয় দ্রবণ-ভরতি একটা পাত্রের মধ্যে পড়ে। গ্লিসারিনের সংস্পর্শে ঐ পাত্‌লা পর্দা বা আস্তরণটা জমে অনেকটা শক্ত হয়, আর বেশ চকচকে ও স্বচ্ছ কাগজের মত দেখায়। কৌশলে ঐ গ্লিসারিন-দ্রবণ

থেকে সাবধানে বের করে নিয়ে এই স্বচ্ছ পর্দা বা কাগজকে উষ্ণ বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে শুকিয়ে ফেললে এর চট্‌চটে আঠালো ভাব অনেকটা দূর। এর পরে তাকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোলারের গায়ে কয়েক দিন জড়িয়ে রাখা হয় এবং উপযুক্ত সাইজে কেটে এই সেলোফোন কাগজ বাজারে বিক্রয় হয়।

সেলোফেনের মূল পদার্থ-পিণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন রং মিশিয়ে নানা রকম রঙীন সেলোফোন-কাগজও প্রস্তুত করা হয়, দেখতে তা আরও সুদৃশ্য ও বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকে। এ কাগজ তেমন মজবুত না হলেও এর স্বচ্ছতা ও ঔজ্জ্বল্যের জন্যে কোন জিনিস এই কাগজে জড়ালে তার চাক্‌চিক্য বাড়ে। কেবল চাক্‌চিক্যই নয়, সেলোফেন-পেপার পাত্‌লা হলেও অরন্ধ্র বলে এ দিয়ে মুড়লে ভিতরের জিনিস মোটামুটি বায়ু-সম্পর্কশূন্য হয়ে অনেকটা পরিষ্কার, তাজা ও জীবাণুমুক্ত থাকে। সিগারেটের বাক্স, চকোলেট প্রভৃতি খাদ্যবস্তু ও বিভিন্ন সৌখীন দ্রব্যাদি মুড়তে সেলোফোন-পেপার আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেলুলয়েড

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রো-সেলুলোজ থেকে জীব-জন্তুর হাড়ের মত সাদা ও শক্ত এক রকম পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে সেলুলয়েড। নাইট্রো-সেলুলোজ ও অ্যালকোহলের মিশ্রণের সঙ্গে **ক্যাম্ফর** বা কর্পূরের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থটা উৎপন্ন হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সেলুলয়েড দেখতে হয় জেলির মত থক্‌থকে ও সাদাটে; কিন্তু ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে সেটা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। উপযুক্ত পরিমাণে বিভিন্ন রং মিশিয়ে বিভিন্ন রঙীন সেলুলয়েডও প্রস্তুত করা হয়। সেলুলয়েডের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, উত্তপ্ত করলে জিনিসটা নরম হয়ে পড়ে, ঠাণ্ডা করলে আবার কঠিন হয়; এরূপ ধর্মবিশিষ্ট পদার্থকে বলা হয় থার্মো-প্লাস্টিক; 'সংশ্লেষণী রসায়ন' শীর্ষক অধ্যায়ে প্লাস্টিক প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে সেলুলয়েড দিয়ে নানা রকম জিনিস সহজে তৈরি করা যায়। বিভিন্ন রং মিশিয়ে যেমন রঙীন **সেলুলয়েড** প্রস্তুত হয়, তেমনি আবার বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় একে হাতির দাঁতের মত ধব্‌ধবে সাদা ও অনচ্ছ করেও ফেলা যায়। বস্তুতঃ মূল্যবান গজ-দন্তের বিকল্প পদার্থ উৎপাদনের প্রচেষ্টায়ই আমেরিকার রসায়ন-বিজ্ঞানী হায়েট ভ্রাতৃদ্বয় 1869 খৃষ্টাব্দে সেলুলয়েড

আবিষ্কার করেন। অবশ্য এর মূল রাসায়নিক তথ্যটি 1865 খৃষ্টাব্দে উদ্ভাবন করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের রসায়ন-বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পার্কেস।

সেলুলয়েড দেখতে সুদৃশ্য, ওজনে হাল্কা, আবার সহজে ভাঙ্গে না। বিশেষতঃ উত্তাপে নরম হয় বলে ছাঁচে চেপে সেলুলয়েড দিয়ে চিরুণী, ছুরির বাট, সাবান-দান প্রভৃতি বহুবিধ নিত্যব্যবহার্য জিনিস তৈরি করা হয়। উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে তরল সেলুলয়েডকে বায়ুসম্পর্কশূন্য অবস্থায় বিশেষ কৌশলে সূক্ষ্ম পর্দার মত করে ঢেলে আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফির **ফিল্ম** তৈরি করা হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্পে সেলুলয়েডের চাহিদা প্রচুর; কিন্তু এর ব্যবহারে বিপদও আছে; কারণ এর মূল উপাদান হলো সহজদাহ্য নাইট্রো-সেলুলোজ। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে উত্তপ্ত করতে গিয়ে সেলুলয়েড জ্বলে উঠে কারখানায় গুরুতর অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে। সেলুলয়েডের দহনে অনেক সময় উন্মুক্ত অগ্নিশিখারও দরকার হয় না; আবদ্ধ কক্ষে কিছু সময় ইলেকট্রিক বাতির সামান্য উত্তাপে, এমন কি, বিশুদ্ধ সেলুলয়েডের উপরে কিছুক্ষণ সামান্য সূর্যরশ্মি এসে পড়লেও আগুন জ্বলে উঠতে পারে।

সেলুলয়েডের সঙ্গে ডেক্সট্রিন প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ মিশিয়ে দিলে তার সহজদাহ্যতা অনেকটা কমে। আবার গুণে ও কার্যকারিতায় সেলুলয়েডের অনুরূপ কয়েকটি বিকল্প পদার্থও উদ্ভাবিত হয়েছে, যেগুলি অদাহ্য। নাইট্রো-সেলুলোজের বদলে সেলুলোজ-অ্যাসিটেট ব্যবহার করলে ও তার সঙ্গে প্লাষ্টিক শ্রেণীর কোন পদার্থ মেশালে সেলুলয়েডের একটি অদাহ্য বিকল্প পদার্থ উৎপাদিত হয়, যার বিশেষ নাম **সেলোন**, কোথাও কোথাও বলে **লুমারিথ**। জিনিসটা সেলুলয়েডের চেয়েও কোন কোন বিষয়ে অধিকতর উপযোগী, অদাহ্য তো বটেই। এই সেলোন বা লুমারিথ প্রকৃত সেলুলয়েডের চেয়ে সহজে গলে, আর ঠাণ্ডায় জমে এক রকম স্থিতিস্থাপক কাঠিন্য লাভ করে। এ-সব ধর্মের জন্যে পদার্থটা গাটাপার্চা, ভ্যাল্‌কেনাইট ('সংশ্লেষণী রসায়ন' অধ্যায়ে রাবার প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতির বিকল্প হিসাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অপরিবাহী আবরক, সিনেমার ফিল্ম প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পে আজকাল সেলুলয়েডের পরিবর্তে সেলোন ব্যবহৃত হয়। তরল অবস্থায় ছাঁচে ঢেলে জিনিসটা দিয়ে ব্রাসের কৃত্রিম (ঘোড়ার লেজের অনুরূপ) কুঁচি, চিরুণী প্রভৃতি নানারকম জিনিস তৈরি হয়ে থাকে। তরল অবস্থায় জিনিসটা ধাতুর বা কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদির উপরে লাগিয়ে ভার্নিসের মত ব্যবহার করাও চলে।

অন্যান্য সেলুলোজ-শিল্প

সেলুলোজ-ভিত্তিক বৃহত্তম রাসায়নিক শিল্প কাগজের কথা আমরা পরে পৃথকভাবে আলোচনা করবো। তা ছাড়া কৃত্রিম রেশম, সেলোফেন, সেলুলয়েড প্রভৃতি যে-সব সেলুলোজ-শিল্পের আলোচনা করা হলো তা-ই শেষ নয়; রসায়ন-বিজ্ঞানীদের উদ্যম ও প্রচেষ্টায় সেলুলোজ থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় আরও নানা রকম মূল্যবান পদার্থের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সেলুলোজ-ভিত্তিক এরূপ আরও দু'-একটি শিল্পের কথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

আগেই বলা হয়েছে, নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে ক্যাম্ফর বা কর্পূরের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সেলুলয়েড; আবার নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূরের বদলে তিসির তেল (লিন্‌সিড অয়েল, যা দিয়ে তেল-রং তৈরি করা হয়) ও বিশেষ বিশেষ রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে ঘেঁটে মিলিয়ে দিলে এক রকম অর্ধ-তরল আঠালো পদার্থ পাওয়া যায়। মোটা কাপড়ের উপরে এই আঠালো পদার্থের আস্তরণ লাগালে তৈরি হয় এক রকম **অয়েল-ক্লথ**, যা জলে ভেজে না, বা তাতে জল শোষে না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দু'টা রোলারের ভিতর দিয়ে এই আস্তরণযুক্ত কাপড় চেপে নিলে রোলারের গায়ে কাটা নক্সা বা দাগগুলি ওই অয়েল-ক্লথের উপরে স্থায়ীভাবে পড়ে যায়; যার ফলে বর্ণ ও চেহারায় জিনিসটা অনেকটা চামড়ার মত দেখায়। এই কৃত্রিম চামড়াকে সাধারণতঃ বলা হয় **রেক্সিন**; নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র রেক্সিন তৈরি হয়ে থাকে। আসবাব-পত্রের ঢাক্‌না, যান-বাহনের বসবার গদি তৈরি প্রভৃতি নানা কাজে এই **কৃত্রিম চামড়া** বা রেক্সিন এ-যুগে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে নাইট্রো-সেলুলোজের বহুবিচিত্র ব্যবহারের আর শেষ নেই; অ্যালকোহল ও ইথারের মিশ্র-দ্রাবকে নাইট্রো-সেলুলোজ গলিয়ে যে আঠালো তরল পদার্থ পাওয়া যায় শিল্পক্ষেত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছে **কলোডিয়ন**। ধাতু, কাঠ ও চামড়ার জিনিসের উপরে চক্‌চকে ও সুদৃশ্য ভার্নিস ধরাতে যে সব ল্যাকার ও এনামেল জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়, সেগুলির মূল উপাদান হলো এই কলোডিয়ন। মোটরগাড়ীর কাঠামোর উপরে যে-সব ভার্নিস লাগানো হয় সেগুলি তৈরি করতে নাইট্রো-সেলুলোজকে উপযুক্ত কোন দ্রাবকে দ্রবিত করে তাতে রজন-জাতীয় (সেল্যাক, ব্যাকেলাইট প্রভৃতি) প্লাস্টিক পদার্থ

ও বিভিন্ন রং মেশানো হয়। এর ফলে ভার্নিসের পাত্‌লা পর্দার মত আবরণটার ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, তাড়াতাড়ি শুকোয়, আর তা ফেটে উঠে যায় না। বিভিন্ন শ্রেণীর **নাইট্রো-সেলুলোজ ল্যাকার** বা ভার্নিস তৈরি করতে ইথাইল অ্যাসিটেট, অ্যাসিটোন, অ্যামাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রাবক এবং প্লাষ্টিক পদার্থ হিসাবে ট্রাই-ফিনাইল ফসফেট, ডাই-ইথাইল থ্যালেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকাল নাইট্রো-সেলুলোজের ল্যাকার-ভার্নিস উৎপাদন একটা বিরাট রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। উন্নত মানের ল্যাকার উৎপাদনে গভীর রাসায়নিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

সেলুলোজের আর একটা বিশেষ শিল্প-ব্যবহার সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা বলেছি যে, উদ্ভিদ-দেহে উৎপন্ন গ্লুকোজের অনেকগুলি অণু পরস্পর শৃঙ্খলাকারে জুড়ে সেলুলোজের এক-একটি বৃহদাকার অণু (ম্যাক্রো মলিকিউল) গঠিত হয়; প্রতি জোড়া গ্লুকোজ-অণুর মধ্যেকার এক-এক অণু জল বিমুক্ত হয়ে গিয়ে এই সংযোগ ঘটে। রাসায়নিক গবেষণায় এই সেলুলোজকে বিশ্লেষিত করে আবার গ্লুকোজে পরিণত করবার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের মৃদু জলীয় দ্রবণের মধ্যে সেলুলোজকে উচ্চ চাপে ও উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত করলে সেলুলোজের অণুগুলি আবার এক-একটি জলের অণু আত্মস্থ করে গ্লুকোজের অণুতে ভেঙ্গে যায়: সেলুলোজ পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে পচন বা গাঁজন ক্রিয়ার সাহায্যে এভাবে উৎপন্ন গ্লুকোজ থেকে উৎপাদিত হয় **অ্যালকোহল।** করাত-কলের কাঠের গুঁড়া ও অব্যবহার্য কুঁচো-কাঠ প্রভৃতি মৃদু সালফিউরিক অ্যাসিডে সিক্ত করে আবদ্ধ পাত্রে রেখে তার ভিতরে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করা হয়; এভাবে ভিতরের বাষ্পীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় সাধারণ চাপের 6-7 গুণ হলে কাঠের সেলুলোজ-অণু গ্লুকোজ-অণুতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এই বিক্রিয়াটা মুখ্যতঃ ঘটে জলের আণবিক সংযোজনের ফলে, তাই এরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে বলা হয় **হাইড্রোলিসিস** ('হাইড্রো' মানে জলসম্পর্কীয়)। পাত্রের অভ্যন্তরে এভাবে উৎপন্ন গ্লুকোজ অ্যাসিড-মিশ্রিত জলে দ্রবিত হয়ে থাকে; আর এই দ্রবণ থেকে অ্যাসিড দূরীভূত করে বিশেষ পচন-ক্রিয়ার (ফার্মেন্টেসন) সাহায্যে দ্রবিত গ্লুকোজকে অ্যালকোহলে রূপান্তরিত করা হয়। গ্লুকোজ হলো শর্করা শ্রেণীর একটি জৈব যৌগিক পদার্থ, যেমন চিনি, গুড় প্রভৃতি; সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পদার্থ থেকেই বিশেষ ফার্মেন্টেসন পদ্ধতিতে **অ্যালকোহল**

উৎপাদিত হয়ে থাকে। মূলতঃ এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কাঠের সেলুলোজ থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থায় অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তরের এটা একটা চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। আবার কাগজ-শিল্পে ব্যবহৃত কাঠের সেলুলোজ নিষ্কাশনের কোন কোন পদ্ধতিতেও আনুষঙ্গিক হিসাবে কিছু অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুইডেন প্রভৃতি দেশে এভাবে কাঠ থেকে উৎপাদিত অ্যালকোহল খনিজ পেট্রলের সঙ্গে মিশিয়ে মোটরগাড়ীর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে অ্যাসিডের সংস্পর্শে কাঠের সেলুলোজ থেকে হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় আবার অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও **জাইলোজ** নামক এক প্রকার শর্করাও পাওয়া যায়। এই জাইলোজ শর্করার বিশেষ গুণ হলো এই যে, মিষ্টত্ব সত্ত্বেও বহুমূত্র রোগীর পক্ষে সাধারণ শর্করার মত এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।

রসায়ন-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে রসায়ন-শিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে বিভিন্ন সেলুলোজ-শিল্প তার অন্যতম। মানব-সেবায় পদার্থের রাসায়নিক রূপান্তর সাধনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেলুলোজ-ভিত্তিক শিল্পগুলির সামান্য কিছু আলোচনা এখানে করা হলো মাত্র। সেলুলোজ-ভিত্তিক শিল্পগুলির মধ্যে কাগজ-শিল্পই নিঃসন্দেহে মানব-সভ্যতায় সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। আমরা এখন এই কাগজ-শিল্পের রাসায়নিক পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করবো।

কাগজ-শিল্প

বর্তমান যুগ-সভ্যতায় কাগজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; বস্তুতঃ কাগজ সুলভ ও সস্তা হওয়ার ফলেই এ-যুগে মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার এরূপ ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয়েছে। কাগজের কল্যাণে সস্তায় বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার আজ সবার জন্য উন্মুক্ত; সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবর ও জ্ঞাতব্য তথ্যাদি আজ অতি অল্পমূল্যে মানুষ ঘরে বসে জানছে; কেবল তা-ই নয়, এযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য, আপিস-আদালত প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কাগজের প্রয়োজন অপরিসীম। কাগজ ছাড়া মানুষের আধুনিক জীবন-যাত্রা অচল; নানা কাজে নানাশ্রেণীর কাগজের চাহিদাও তাই বিপুল। সারা পৃথিবীতে আজ প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন কাগজ উৎপাদিত হচ্ছে। রসায়নের অগ্রগতির ফলেই এটা ব্যাপকভাবে সম্ভব হয়েছে মাত্র খৃষ্টীয় উনবিংশ

শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তু বা আঁশের মুখ্য উপাদান সেলুলোজ থেকে নানা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ-যুগে অতি অল্প ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ কাগজ উৎপাদিত হচ্ছে। এর ফলে কাগজ হয়েছে স্বল্পমূল্য ও সুলভ; আর তাই শিক্ষাবিস্তারে ও দৈনন্দিন নানা কাজে কাগজ আজ মানুষের একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে। আধুনিক কাগজ-শিল্প বস্তুতঃ রসায়নেরই দান; মানব-কল্যাণে রসায়নের অজস্র অবদানের মধ্যে কাগজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাগজের প্রাচীন ইতিহাস

রাসায়নিক পদ্ধতিতে কলে-তৈরী কাগজের সুলভ ও ব্যাপক প্রচলনের আগেও অবশ্য কোন কোন দেশে এক রকম হাতে-তৈরী মোটা কাগজ লোকে ব্যবহার করতো, যাকে বলা হতো **তুলোট-কাগজ**। এরূপ কাগজের প্রথম প্রচলন হয়েছিল নাকি চীন দেশে এখন থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের (খৃঃ পূঃ 327) সময়ে এক রকম তুলোট-কাগজে লোকে হিসাব-পত্র রাখতো বলে তৎকালের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। কাজেই ভারতেও এরূপ কাগজের প্রচলন অতি সুপ্রাচীন এবং তা চীনের সমসাময়িক মনে করা যেতে পারে। আমাদের বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও আগের দিনে তুলোট-কাগজ তৈরি হতো; 'কাগজী' বলে খ্যাত এক সম্প্রদায়ের লোক হাতে-গড়া এরূপ কাগজ তৈরি করেই জীবিকা অর্জন করতো বলে জানা যায়। আজকালও কিছু কিছু তুলোট-কাগজ তৈরি হয়, সংস্কার-বশে দেশজ ও পবিত্র জ্ঞানে বিশেষ শুভ কাজে লোকে তা ব্যবহার করে। এরূপ কাগজের প্রস্তুত-প্রণালীটা নেহাৎ সেকেলে ও সাধারণ, জিনিসটাও হয় অমসৃণ ও মোটা। নানা কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তুলা থেকেই এই কাগজ তৈরি হয় বলে একে তুলোট-কাগজ বলা হয় বটে; কিন্তু তুলার সঙ্গে পুরানো ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাঁথা, চট প্রভৃতিও এই কাগজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ এগুলি সব মূলতঃ তুলা ও তন্তুজাতীয় উদ্ভিজ্জ আঁশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ-সব জিনিস টেনে-ছিঁড়ে কয়েকদিন চুনের জলে ভিজিয়ে রাখা হয়; তারপর যথেষ্ট নরম হয়ে গেলে তাকে ঢেঁকিতে কুটে আবার কয়েক দিন চুনের জলে ভিজিয়ে চটকালে সবটা গলে-মিশে অনেকটা মণ্ডের মত হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে কিছু ভাতের মাড়, তেঁতুলের

বিচীর ক্বাথ, গঁদের আঠা ও তুঁতের জল মিশিয়ে প্রয়োজনানুরূপ পাত্‌লা করা হয়; আর সেই আঠালো ও পাত্‌লা মণ্ডটাকে কাঠের মসৃণ পাটাতনের উপর ঢেলে যথাসম্ভব সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর একে কয়েক-দিন রোদে শুকিয়ে নিলে তুলার মণ্ডের যে আস্তরণ বা পর্দা পাওয়া যায় তা-ই তুলোট-কাগজ। একে আবার নরম তেলা-পাথর, বড় কড়ি, মসৃণ কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি দিয়ে ঘসে কিছুটা মসৃণ করা হতো। সেই কাগজের পাতগুলিকে তারপরে সমান সাইজে কেটে পর-পর সাজিয়ে কাঠের তক্তার নিচে কয়েকদিন ভারী চাপে রাখা হতো, যাতে সেগুলি বেঁকে-কুঁচকে না যায়।

কাগজের নানা বিকল্প: তুলোট-কাগজ তৈরির উল্লিখিত পদ্ধতিটা নিঃসন্দেহে বিশেষ কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ। তাই এরূপ কাগজের উৎপাদন ছিল অত্যন্ত সীমিত; কাজেই তা ছিল দুষ্প্রাপ্য ও সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে দুর্মূল্য। তথাপি একে কাগজ-শিল্পের ভিত্তি বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ লেখার উপকরণ হিসাবে এটা অবশ্যই সেকালের পক্ষে ছিল একটা উন্নত ব্যবস্থা। এর আগে লেখার কাজে এ-জাতীয় কোনরূপ কাগজের ব্যবহারই মানুষ জানতো না; লেখা চলতো মাটি, পাথর, গাছের ছাল-পাতা প্রভৃতির উপরে। প্রাচীন কালের রাজা-রাজড়ারা তাঁদের আদেশ ও অনুশাসনগুলি পর্বত-গাত্রে খুদে লিখে রাখবার ব্যবস্থা করতেন; একে বলা হয় **শিলা-লিপি।** আড়াই হাজার বছর আগের লিখিত সম্রাট অশোকের এরূপ শিলা-লিপি উত্তর ভারতের নানাস্থানে আজও দেখা যায়। আবার যে-সব অঞ্চলে পাহাড়-পর্বত নেই, সেখানে লোহার বা পাথরের স্তম্ভ বসিয়ে তার গায়ে রাজকীয় নানা অনুশাসন ও ধর্মীয় উপদেশ খোদাই করে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হতো। সম্রাট অশোকের নির্মিত এরূপ স্তম্ভ দিল্লী, এলাহাবাদ, সারনাথ প্রভৃতি নানাস্থানে আজও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে; এগুলি **অশোক-স্তম্ভ** নামে পরিচিত। আবার নরম কাদামাটির চাক্‌তি বা টালির উপরে শক্ত সরু কাঠি দিয়ে লিখে সেগুলিকে পুড়িয়ে স্থায়ী করা হতো। প্রাচীন যুগে কোন কোন দেশে লেখার এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; এরূপ পোড়া-মাটির এক-একখানা চাক্‌তি হতো এক-একটি পৃষ্ঠা, অনেকগুলি চাক্‌তি মিলিয়ে হতো সে-কালের এক-এক খানা বই বা পুঁথি। প্রাচীন ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সে-কালের এক রাজার গ্রন্থাগারে এরূপ শত শত **পোড়া-মাটির বই** আবিষ্কার করেছেন। এর পরবর্তীকালে এক সময়

আবার তামা, পিতল প্রভৃতি ধাতুর পাতের উপরে সূক্ষ্মাগ্র ছেনি দিয়ে কেটে লেখার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। এ-সব ধাতুতে তেমন মরচে ধরে না, কাজেই লেখাগুলি দীর্ঘকাল অক্ষত অবস্থায় থাকতো। সে-যুগের বহু প্রাচীন দলিল ও দানপত্র প্রভৃতি এরূপ ধাতব পাতে লিখিত অবস্থায় নানাস্থানে পাওয়া গেছে। এগুলি প্রধানতঃ তামার পাত বা ফলকে খোদিত দেখা যায়, তাই এগুলিকে বলা হয় **তাম্রলিপি**। লেখার উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি স্বভাবতঃই ছিল কঠিন ও ব্যয়সাধ্য; কাজেই বিত্তশালী ব্যক্তি ও রাজা-রাজড়াদের পক্ষেই লেখার কাজে এ-সব কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। তাই সাধারণ লোকের মধ্যে কোন কোন গাছের ছাল ও পাতার উপরে লেখার প্রচলন গড়ে উঠেছিল।

হাজার হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম গাছের ছাল ও পাতার উপরে লেখার প্রচলন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে লেখার কাজে ভূর্জ-পত্রের ব্যবহার অতি সুপ্রাচীন, প্রাচীন পুঁথিপত্রে এর অনেক উল্লেখ আছে। **ভূর্জ-পত্র** বলা হলেও এটা ভূর্জ নামক এক রকম গাছের পাত্‌লা ছাল, যাকে সংস্কৃতে বলে 'ভূর্জত্বচ'। পার্বত্য অঞ্চলে এই ভূর্জ-গাছ এখনও নানা স্থানে দেখা যায়। এই ভূর্জ-পত্র বা ভোজপাতার উপরে সেকালে চিঠিপত্র, নব-জাতকের জন্ম-পত্রিকা প্রভৃতি লিখিত হতো। এ-দেশে তালপাতার উপরে লেখার প্রচলনও বহুকালের; বস্তুতঃ ভারতের প্রায় সব প্রাচীন কাব্য ও ধর্মগ্রন্থাদি তালপাতার উপরে লিখিত। বহু শতাব্দী আগের অনেক **তালপাতার পুঁথি** আজও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। পবিত্র মনে করে আজও পূজার্চনায় ব্রাহ্মণেরা গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি তালপাতার পুঁথি পাঠ করেন। তালগাছের চওড়া পাতা কয়েকদিন পুকুরের পাঁকে রেখে ধুয়ে শুকিয়ে নিলে যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়; আজও পল্লীগ্রামের পাঠশালায় কোথাও কোথাও শিশুরা তালপাতায় লেখে। সে যাই হোক, প্রাচীন মিশরে প্রধানতঃ **পেপিরাস** নামক এক রকম উদ্ভিদের ছালের উপরে পুঁথিপত্র লেখা হতো। এগুলি নল-খাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ, নিচের দিকটা কিছু মোটা ও মোচার খোলার মত পর-পর পাতলা ছালে গঠিত। অবশ্য এই ছালগুলি তেমন চওড়া নয়; কিন্তু পাশাপাশি রেখে জলের ছিটে দিয়ে চাপ দিলে এক রকম আঠালো রস
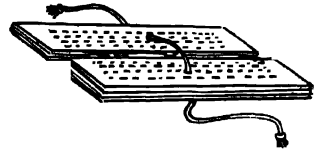
সেকালের তালপাতার পুঁথি

বেরিয়ে সেগুলি পরস্পর জুড়ে চওড়া হয়ে যায় বলে তার উপরে লেখার কাজ বেশ চলতো। বিভিন্ন দেশে সে-যুগে এই পেপিরাস 'কাগজের' যথেষ্ট প্রচলন ছিল, এর ব্যবহার মিশর থেকে ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজীতে কাগজকে বলা হয় **'পেপার',** এই ইংরেজী শব্দটা বস্তুতঃ 'পেপিরাস' থেকেই এসেছে।

মিশরের 'পেপিরাস' উদ্ভিদ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে লেখার কাজে পেপিরাস ছাড়াও জীবজন্তুর চামড়া এক সময় যথেষ্ট ব্যবহৃত হতো। কচি ছাগল বা ভেড়ার চামড়াকে নানা কৌশলে কাগজের মত নরম ও পাতলা করে তার উপরে মূল্যবান দলিলপত্র লেখা হতো; একে বলা হতো **পার্চমেণ্ট**। আজও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এক রকম শক্ত কাগজকে বলা হয় 'পার্চমেণ্ট পেপার'; বিশেষতঃ 'কারেন্সী নোট' এই কাগজেই ছাপা হয়। যাই হোক, বর্তমান যুগের প্রকৃত কাগজের ব্যবহার পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতেও সুরু হয়েছে মাত্র কয়েকশ' বছর আগে। মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারে কাগজের চাহিদা ক্রমে বিপুলভাবে বেড়ে গেছে; এর ফলে হাতে-তৈরি তুলোট-কাগজ, পেপিরাস,

পেপিরাসের ছাল জুড়ে কাগজ তৈরি করা হচ্ছে

পার্চমেণ্ট প্রভৃতি দিয়ে সে-চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিকে মানুষের রাসায়নিক জ্ঞান ও কারিগরী নৈপুণ্যও সমান তালে বৃদ্ধি পেতে থাকে; এর ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আধুনিক কাগজ কলে তৈরি হতে সুরু করে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে বড়-বড় কারখানায় আধুনিক কাগজ তৈরির ব্যবস্থা প্রথমে প্রবর্তিত হয়, যা আজ পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে প্রায় সব কাগজই রাসায়নিক পদ্ধতিতে ও যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হয়; আর তার উৎপাদনের পরিমাণ যেমন বিপুল, কার্যকারিতায়ও তেমনি বিভিন্ন কাজের বিশেষ উপযোগী ও সুবিধাজনক। যান্ত্রিক ব্যবস্থাদির কথা ছেড়ে দিলে আধুনিক কাগজ-শিল্প বস্তুতঃ রসায়নের উপরেই নির্ভরশীল এবং নিঃসন্দেহে একে মানব-কল্যাণে রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বলা যেতে পারে।

পশু-চর্মের 'পার্চমেণ্ট' তৈরির প্রাচীন পদ্ধতি

আধুনিক কাগজ-শিল্প ঃ আমরা আগেই বলেছি, কাগজের মূল উপাদান হলো বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ; আর সব রকম উদ্ভিদ-তন্তুই প্রকৃতপক্ষে সেলুলোজে গঠিত। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে তুলা সর্বাধিক বিশুদ্ধ সেলুলোজ, যা সে-কালে বস্ত্র-শিল্পের ছিল একমাত্র উপকরণ। আধুনিক কাগজ-শিল্পের প্রথম যুগে এই তুলা ও তুলাজাত পুরাতন ছেঁড়া কাপড়-চোপড় থেকেই কাগজ তৈরি করা হতো। শিক্ষা ও সভ্যতার ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রকাশের জন্যে কাগজের চাহিদা ক্রমে অত্যধিক বৃদ্ধি পায়; এর ফলে তুলা দিয়ে কাগজ তৈরি করে সে-চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার বস্ত্র-শিল্প ব্যাহত হয় বলে কাগজ উৎপাদনে তুলার ব্যবহার বিভিন্ন দেশে সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। কাগজ-শিল্পের এই দুর্দিনে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সহজেই এই সমস্যার সমাধান করেন এবং তুলার পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ, ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে কাগজ

উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। তুলার মত অতটা বিশুদ্ধ সেলুলোজ না হলেও সব রকম উদ্ভিদের দেহ-কাঠামো প্রধানতঃ সেলুলোজে গঠিত। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ, ঘাস, খড় প্রভৃতি থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সেলুলোজ নিষ্কাশিত করে আজকাল নানাশ্রেণীর কাগজ বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। কেবল কাগজই নয়, কাঠের সেলুলোজ থেকে নাইট্রো-সেলুলোজ, কৃত্রিম রেশম বা 'রেয়ন' প্রভৃতি নানা জিনিস উৎপাদিত হয়। এ-সব বিষয়ের আলোচনা আমরা আগেই করেছি।

আগেই বলেছি, কাগজের মূল উপাদান হলো উদ্ভিদের আঁশ বা তন্তু, যা মূলতঃ সেলুলোজ উপাদানে গঠিত। কাজেই যে-সব কাঠে আঁশ বা তন্তু বেশি ও অপেক্ষাকৃত নরম, সেগুলিই কাগজ তৈরির পক্ষে সুবিধাজনক। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সাধারণতঃ বার্চ, পপ্‌লার, ম্যাপল প্রভৃতি কাঠের টুকরা কাগজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও কদম ও বাবলা জাতীয় কাঠ কাগজ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; তা ছাড়া বাঁশ, খড় ও 'সাবাই' প্রভৃতি ঘাসও কাগজ-কলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার চিনির কারখানার পরিত্যক্ত আঁখের ছিবড়ে, পাট-কাঠি প্রভৃতিও আজকাল কাগজ-শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এ-সব থেকে উৎকৃষ্ট কাগজ উৎপাদিত হয়ে থাকে। এরূপ আঁশ-বহুল উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ যে-দেশে যে-শ্রেণীর বেশি পাওয়া যায় তা-ই সে-দেশের কাগজ-কলে ব্যবহার করা হয়। এ-সব ছাড়া পুরানো ছেঁড়া কাপড়, চট্‌, ময়লা ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতিও কাগজ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। মোট কথা, যে-কোন রকম উদ্ভিজ্জ তন্তু বা সেলুলোজ-বহুল পদার্থই আধুনিক কাগজ-শিল্পে মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সেলুলোজের উল্লিখিত বিভিন্ন উৎসের মধ্যে কাঠই এ-যুগের কাগজ-শিল্পে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাঠের তন্তু প্রধানতঃ সেলুলোজের সঙ্গে 'লিগ্‌নিন' নামক এক রকম জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে গঠিত; আর সেই তন্তুগুলির মাঝে-মাঝে বিভিন্ন রজন-জাতীয় পদার্থ বিন্যস্ত থেকে সেগুলিকে পরস্পর সংবদ্ধ রাখে, যার ফলে কাঠে আসে কাঠিন্য। কাঠ থেকে বিশুদ্ধ সেলুলোজ পৃথক করে পেতে হলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাঠের যৌগিক রূপ ভেঙ্গে ফেলতে হয়, যাতে তার তন্তুগুলি থেকে অন্যান্য পদার্থ বিমুক্ত হয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ সেলুলোজ পৃথক হয়ে পড়ে। এর জন্যে মোটামুটি দু'রকম রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন

করা যায়। আগের দিনে কলের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কাঠকে ছোট-ছোট খণ্ডে কেটে সেই কুঁচোগুলিকে কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণে সিদ্ধ করা হতো। এর ফলে কাঠের আঁশ বা সেলুলোজ-তন্তুগুলি পৃথক হয়ে এক রকম নরম ফুস্‌ফুসে ও হাল্‌কা পদার্থে পরিণত হতো, যাকে কাগজ-শিল্পে বলা হয় **সোডা পাল্‌প।** এই প্রক্রিয়া আজকাল আর তেমন অবলম্বিত হয় না; অধিকাংশ কাগজ-কলেই এ-যুগে কষ্টিক সোডার পরিবর্তে 'ক্যালসিয়াম-বাইসালফাইট' নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। জলীয় চুন, অর্থাৎ ক্যালসিয়াম-হাইড্রক্সাইডের জলীয় মিশ্রণের (যাকে বলে 'মিল্ক অব লাইম') ভিতরে সালফার-ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে ক্যালসিয়াম-বাইসালফাইট পাওয়া যায়। আবদ্ধ পাত্রে কাঠের কুঁচোগুলিকে এই রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের মধ্যে সাধারণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তিন-চার গুণ অধিক চাপে সিদ্ধ করলে কাঠের সেলুলোজ আলাদা হয়ে যায়। কেবল তা-ই নয়, কাঠের তন্তুগুলির রাসায়নিক গঠন ভেঙ্গে সেলুলোজ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার ঐ সালফাইটের বিক্রিয়ায় সেগুলি বিরঞ্জিত (ব্লিচিং) হয়ে অনেকটা পরিস্কারও হয়। এই বিরঞ্জিত সেলুলোজ-তন্তুগুলিকে সালফাইটের দ্রবণ থেকে তুলে নিয়ে, জলে ধুয়ে ঘেটে-ঘুটে মিশিয়ে ফেলা হয়, যাতে সেগুলি ক্ষুদ্রতর তন্তুতে পরিণত হয়ে ফেঁপে-ফুলে ফুস্‌ফুসে হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় জিনিসটাকে বলা হয় **উড পাল্‌প,** কোথাও কোথাও বলে **সালফাইট পাল্‌প।**

কাঠ থেকে কাগজ ও বই

অনেক সময় আবার যে-সব কাঠে রজন-জাতীয় পদার্থের আধিক্য থাকে সেগুলির কুঁচোকে কস্টিক সোডা ও সোডিয়াম সালফেটের মিশ্র-দ্রবণে সিদ্ধ করা হয়; এই প্রক্রিয়ায় যে সেলুলোজ-তন্তু পাওয়া যায়, তাকে বলে **সালফেট**

পাল্‌প। বিশেষতঃ 'ক্র্যাফ্‌ট পেপার' নামক প্যাকেট বাঁধবার উপযোগী শক্ত কাগজ তৈরি করতে এই 'সালফেট পালপ' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেবল এ-সব রাসায়নিক পদ্ধতিতেই নয়, যান্ত্রিক পদ্ধতিতেও কাঠের তন্তু বা 'পাল্‌প' তৈরি করে তা থেকেও এক শ্রেণীর সস্তা কাগজ তৈরি হয়ে থাকে। এর জন্যে ভিজা কাঠকে ঘূর্ণায়মান শক্তিশালী যাঁতা-কলে পিষে জল মিশিয়ে মণ্ডের মত করে ফেলা হয়; এই পদ্ধতিতে অবশ্য কাষ্ঠ-তন্তুতে সেলুলোজের সঙ্গে কাঠের লিগ্‌নিন ও রজন সবই মিশে থেকে যায়। এভাবে পিষ্ট কাষ্ঠ-তন্তুর মণ্ডে আবার আঁশের ভাব যথোপযুক্ত না থাকায় তাতে পুরাতন ছেঁড়া কাপড়, তুলা, খড় প্রভৃতি আঁশযুক্ত পদার্থ মিশিয়ে একসঙ্গে মণ্ড করে কাগজ তৈরি করা হয়। এরূপ কাগজে সেলুলোজের স্বল্পতা ও লিগ্‌নিন ও রজনের উপস্থিতির জন্যে তা অপেক্ষাকৃত অল্প দিনে হল্‌দে হয়ে পড়ে, আর দৃঢ়তার অভাবে সহজে ছিঁড়ে যায়। কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর ঘাস পিষেও এরূপ সস্তা কাগজ তৈরি হয়ে থাকে। একে সাধারণতঃ বলে 'নিউজ প্রিণ্ট' কাগজ; দৈনিক সংবাদপত্র প্রভৃতি অস্থায়ী ও সাময়িক ব্যবহারের কাগজ এই শ্রেণীর।

আধুনিক কাগজ-শিল্পে লেখা ও ছাপার ভাল কাগজ প্রায় সবই কাঠের 'সালফাইট পাল্‌প' (উড-পাল্‌প) থেকে উৎপাদিত হয়। ভাল কাগজ তৈরি করতে উড-পাল্‌পের সঙ্গে কখন কখন ছেঁড়া কাগজ, কাপড়, ঘাস প্রভৃতি মিশিয়ে বড়-বড় আবদ্ধ পাত্রে সেগুলিকে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের প্রচণ্ড চাপে সিদ্ধ করা হয়। কাগজের কারখানার ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলে 'কুকিং' বা রান্না করা। এভাবে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ সব জিনিস গলে-মিশে ঘন মণ্ডে পরিণত হয়; তখন তাকে ক্লোরিন গ্যাস বা
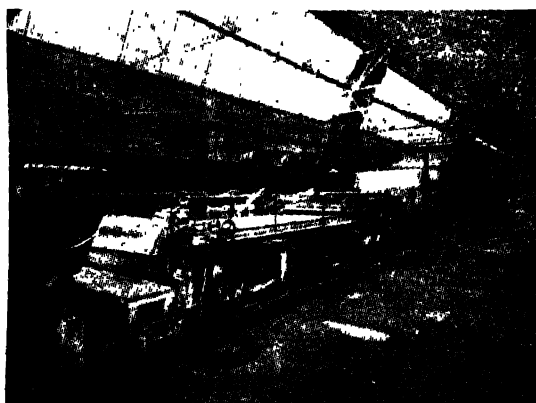
আধুনিক কাগজ-শিল্পের কারখানায় যান্ত্রিক ব্যবস্থাদি

ব্লিচিং পাউডার দিয়ে বিরঞ্জন-প্রক্রিয়ায় (ব্লিচিং) সাদা ধব্‌ধবে করে ফেলা হয়। এর পরে সেলুলোজের এই সাদা মণ্ডকে আর একটা প্রকাণ্ড পাত্রের জলে অপসারিত করা হয় এবং তার ভিতরে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘূর্ণায়মান অনেকগুলি ধারালো ছুরির ফলক চালিয়ে ঐ জলীয় মণ্ডের ভিতরকার সেলুলোজ-তন্তুগুলিকে কেটে-ছেঁটে আরও ছোট করে জলের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় প্রচুর জলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তুগুলি মিশে দুধের মত সাদা দেখায়। সেলুলোজের এই জলীয় মিশ্রণের সুনিয়ন্ত্রিত ধারা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবিরাম চলমান সূক্ষ্ম তার-জালির উপরে প্রবাহিত করা হয়। এই তার-জালির সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে অধিকাংশ জল বেরিয়ে গিয়ে সেলু-লোজ-তন্তুর পাতলা একটা পর্দা তার-জালির উপরে সমানভাবে জমে ওঠে। যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার-জালির অপসয়মান ফিতেটা সব সময়েই কম্পমান রাখা হয়, যার ফলে ঐ পর্দা বা কাগজের তন্তুগুলি পরস্পর এঁটে কিছুটা দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় চওড়া ফিতের মত সেলুলোজের ঐ পর্দাটাকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় দু'টা রোলারের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়, যাদের চাপে ঐ কাগজের পর্দার অতিরিক্ত জল অধিকাংশ বেরিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা কিছুটা সমতল ও মসৃণ হয়ে পড়ে। এর পরে আবার তাকে উত্তপ্ত দু'টা রোলারের ভিতর দিয়ে চালিয়ে কাগজের পর্দাটাকে একেবারে শুকিয়ে জলশূন্য করা হয়। মোটামুটি এই হলো কাগজ উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি।

আধুনিক কাগজ-শিল্পে বিবিধ যন্ত্রের সাহায্যে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলি অল্প সময়ে অতি নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে ; বস্তুতঃ এ-যুগে কাগজ উৎপাদনে রসায়ন ও যন্ত্র-বিদ্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত পদ্ধতিতে সেলুলোজ-মণ্ডের যে আস্তরণ বা কাগজ পাওয়া যায় তার গঠনে বিশেষ দৃঢ়তা থাকে না, ব্লটিং-কাগজের মত তা থাকে নরম ও ফুস্‌ফুসে ; কাজেই এর উপরে লিখতে গেলে কালি চুপ্‌সে ছড়িয়ে যায়। এই কাগজকে লেখার বা ছাপার উপযোগী করবার জন্যে এর উপরে আবার নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয় ; এ-সব প্রক্রিয়াকে কাগজ-শিল্পে বলা হয় **সাইজিং**। এর জন্যে উৎপন্ন এই কাগজের সুদীর্ঘ ফালিকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমাগতভাবে চালিয়ে নেওয়া হয় প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে রক্ষিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের একটা জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়ে, যাতে দ্রবিত থাকে অ্যালাম (পটাসিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম সালফেট) অর্থাৎ ফিট্‌কিরি ও রজন-জাতীয় এক রকম সাবান (সাবান-শিল্পের আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

দ্রবণের এই পদার্থ দু'টার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাগজের ঐ দীর্ঘ ফালির উপরে সর্বত্র সমানভাবে রজন ও অ্যালুমিনিয়ামের একটা যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্ম আস্তরণ পড়ে; যার ফলে কাগজের সেলুলোজ-তন্তুগুলি পরস্পর এঁটে যায়। এই প্রক্রিয়ায় এক-দিকে কাগজ যেমন আরও মসৃণ ও দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়, অপরপক্ষে কাগজের উপরে লিখতে গেলে কালি ছড়ায় না, চুপ্‌সে যায় না। কোন-কোন কাগজ-কলে সাইজিং-এর এই প্রক্রিয়া পরে না করে উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থ দু'টির জলীয় দ্রবণ উড-পাল্‌পের মণ্ডের সঙ্গে আগেই মিশিয়ে দেওয়া হয়; ফল প্রায় একই রূপ দাঁড়ায়। সাইজিং-এর আরও নানা রকম পদ্ধতি আছে। কোথাও কোথাও কাগজের সাইজিং-প্রক্রিয়ায় কেয়োলিন, জিপ্‌সাম, টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড, কেজিন প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থের সূক্ষ্ম চূর্ণও অনেক সময় উড-পাল্‌পের সঙ্গে মেশানো হয়, যার ফলে উৎপন্ন কাগজের ফালিটাকে উত্তপ্ত রোলারের ভিতর দিয়ে চেপে বের করে নেওয়ার সময় কাগজ যথেষ্ট মসৃণ, চকচকে ও রন্ধ্রহীন হয়। এভাবে সাইজিং-এর বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির পরে কাগজের ফালিকে আবার উত্তপ্ত দু'টা রোলারের ভিতর দিয়ে চেপে নেওয়ার বিশেষ প্রক্রিয়াকে কাগজ-শিল্পে বলা হয় **ক্যালেণ্ডারিং**। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোন কোন কাগজ উৎপাদনে সাইজিং-প্রক্রিয়ায় জিলাটিনের জলীয় দ্রবণও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
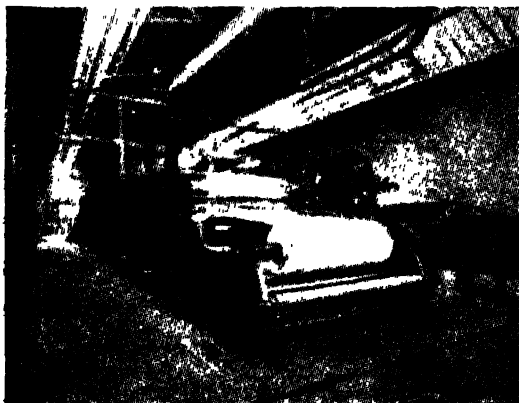
কাগজ-কলে রোলারের গায়ে কাগজ জড়াচ্ছে

আমরা আগেই বলেছি, প্রাচীনকালে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কচি ছাগল-ভেড়ার পাত্‌লা চামড়ার উপরে লেখবার ব্যবস্থা ছিল, যাকে বলা হতো **পার্চমেণ্ট**। আধুনিক কাগজ-শিল্পে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনেকটা

পার্চমেণ্টের মত মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী এক রকম **কাগজ** তৈরি হয়, যাকে বলে **পার্চমেণ্ট পেপার**। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উড-পাল্‌পে তৈরী সাধারণ কাগজকে অল্প সময়ের জন্য সালফিউরিক অ্যাসিডের (H_2SO_4) কিছুটা তীব্র জলীয় দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত রাখলে কাগজের উপরিভাগের সেলুলোজ-তন্তুগুলি অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় গলে-মিশে জিলাটিনের মত হয়ে কাগজের সূক্ষ্ম রন্ধ্রগুলি বন্ধ করে এবং এর ফলে কাগজটা দৃঢ় ও মসৃণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই কাগজকে ভাল করে জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিলে 'পার্চমেণ্ট কাগজ' পাওয়া যায়। আবার জিঙ্ক-ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়েও অনেকটা এই শ্রেণীর কাগজ উৎপাদন করা যেতে পারে। বিশেষ এক রকম পার্চমেণ্ট কাগজে 'কারেন্সী নোট' ছাপা হয়; এই ধরণের কাগজ যথেষ্ট মজবুত বলে কারেন্সী নোট হাতে হাতে অনেক দিন ব্যবহারেও সহজে ছেঁড়ে না। আবার এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সাধারণ পার্চমেণ্ট কাগজের অনেকগুলি 'তা' আঠা দিয়ে জুড়ে যন্ত্রে চেপে অনেকটা মোটা ও সুদৃঢ় করা যেতে পারে, আর তা দিয়ে হাল্‌কা স্যুটকেস, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি তৈরি করা হয়। একে ইংরেজীতে বলা হয় **হার্ড ফাইবার**।

বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ গলিয়ে জিলাটিনের মত করে তার জলীয় দ্রবণের একটা পাত্‌লা আস্তরণ কাগজের উপরে ধরালে 'আর্ট পেপার' শ্রেণীর উৎকৃষ্ট এক রকম কাগজ তৈরি হয়। এই আস্তরণের দ্রবণে আবার কিছু কেয়োলিন ও কেজিন (দুধের ছানা) মেশালে আর্ট কাগজের চাক্‌চিক্য ও মসৃণতা আরও বাড়ে। সেলুলোজের উক্ত দ্রবণ তৈরি করতে অ্যাসিডে, বিশেষতঃ নাইট্রিক অ্যাসিডে সেলুলোজ গলে যায় বটে, কিন্তু তাতে সেলুলোজের নাইট্রেট যৌগিক (সেলুলোজ-নাইট্রেট) উৎপন্ন হয়, সেলুলোজ আর থাকে না; কাজেই এর জন্যে অ্যাসিড-দ্রাবক ব্যবহৃত হয় না। সেলুলোজের উৎকৃষ্ট দ্রাবক হলো কুপ্র্যামোনিয়াম-হাইড্রক্সাইড নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ। সাধারণ তুঁতে, যাকে রসায়নের ভাষায় বলে কপার-সালফেট (ব্লু-স্টোন), তার জলীয় দ্রবণের ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রবাহিত করলে হাল্‌কা নীল রঙের একটা অধঃক্ষেপ পড়ে, জিনিসটা হলো কপার-হাইড্রক্সাইড। একে আবার অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণে (লাইকার অ্যামোনিয়া) দ্রবীভূত করলে গাঢ় নীলবর্ণের একটা দ্রবণ পাওয়া যায়, এটাই হলো কুপ্র্যামোনিয়াম-হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ। এই দ্রবণে সেলুলোজ গলে মিশে যায়; তার একটা আস্তরণ কাগজের উপরে ধরিয়ে শুকিয়ে নিলে এবং

তাকে আবার যে-কোন অ্যাসিডের মৃদু দ্রবণে ডুবালে আগেকার দ্রবিত সেলুলোজ জিলাটিনের আকারে পুনরাবির্ভূত হয়; আর তাতে কাগজের উপরে অতি মসৃণ একটা আস্তরণ ধরে। এই বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাগজ অতি মসৃণ, চক্‌চকে ও জলাভেদ্য নিরন্ধ্র হয়ে পড়ে। এ-সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে **আর্ট পেপার** জাতীয় উৎকৃষ্ট কাগজ কোথাও কোথাও উৎপাদিত হয়ে থাকে।

আধুনিক কাগজ-শিল্পের রাসায়নিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলির মোটামুটি পরিচয় এখানে দেওয়া হলো মাত্র। বিভিন্ন কারখানায় রকমারি কাগজ উৎপাদনে রকমারি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়ে থাকে। কাঠ, বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে নিষ্কাশিত সেলুলোজ-তন্তুর (পাল্‌প) জলীয় মণ্ড থেকে যান্ত্রিক কৌশলে কাগজ তৈরি করতে নিউজ-প্রিণ্ট, ক্র্যাফট প্রভৃতি কাগজের বেলায় মণ্ডকে বিরঞ্জিত বা ব্লিচ্ করবার দরকার হয় না; উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লেখার বা ছাপার কাগজের মণ্ডকে ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দিয়ে বর্ণহীন সাদা ধব্‌ধবে করা হয়। আবার তাতে কিছুটা নীল রঙ মিশিয়ে সাদার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা হয়; যেমন কাচা-কাপড়ে উপযুক্ত পরিমাণে নীল দিলে বেশি ধব্‌ধবে দেখায়। উল্লিখিত সাইজিং ও ক্যালেণ্ডারিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিতেও কাগজের উপযোগিতা ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এ-সব প্রক্রিয়ার পরে সর্বশেষ উৎপন্ন কাগজকে নির্দিষ্ট মাপমত কেটে বিভিন্ন সাইজের ডিমাই, ক্রাউন, ফুল্‌স ক্যাপ প্রভৃতি বিভিন্ন মাপের কাগজ 'রিম' হিসাবে প্যাক করে বাজারে বিক্রয় হয়। বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদনের মাল-মশলা ও রাসায়নিক পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্যে কাগজের গুণ ও চেহারার বিভিন্নতা হতে পারে; কিন্তু সব কারখানায় একই মাপে কাগজ কাটা হয়; নির্দিষ্ট **কাগজের মাপ** সর্বত্রই সুনির্দিষ্ট থাকে। আবার নিউজ-প্রিণ্ট শ্রেণীর কাগজ সুদীর্ঘ লম্বা ফালিতে কেটে রোল করে জড়িয়ে রাখা হয়; এর এক-এক থান কাগজ দৈর্ঘ্যে অনেক সময় হাজার মিটারও হতে পারে। সংবাদ-পত্র ছাপার আধুনিক 'রোটারি মেসিনে' এরূপ রোল-করা কাগজে ছাপার কাজ অতি দ্রুত ও সুবিধাজনক হয়ে থাকে।

কেবল রাসায়নিক কলা-কৌশলই নয়, আধুনিক কাগজ-শিল্পে যান্ত্রিক ব্যবস্থাদিও থাকে বিপুল ও বিরাট। কাগজ-কলের আধুনিক যন্ত্র কোন-কোনটা সব যন্ত্রাংশ মিলিয়ে লম্বায় অন্ততঃ 300 ফুট ও চওড়ায় 25-30 ফুট হয়ে থাকে; তার বিভিন্ন অংশের কাজ বিভিন্ন রকমের। এক দিকে প্রকাণ্ড তার-জালির

চলমান পাটাতনের উপরে নিয়ন্ত্রিত ধারাকারে দুধের মত সাদা ও তরল অবস্থায় সেলুলোজের মণ্ড গড়িয়ে পড়ে, কাগজের (সেলুলোজের) পর্দা গিয়ে রোলারের চাপে ও উত্তাপে পরবর্তী অংশে শুকোয়; তারপর ক্রমে এক-এক অংশে সাইজিং, ক্যালেণ্ডারিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া চলে, কাগজের গায়ে জল-ছাপ পড়ে, সর্বশেষ অংশে শুষ্ক 'ফিনিশ্‌ড' কাগজের থান ক্রমাগত বেরিয়ে রোলারের গায়ে জড়ায়। আধুনিক কাগজ-শিল্পে যান্ত্রিক কলা-কৌশলেরও এক চমকপ্রদ নিদর্শন মেলে। কোন কোন উন্নত শ্রেণীর মেশিনে 25-30 ফুট চওড়া কাগজের প্রায় দু'হাজার ফুট লম্বা থান প্রতি মিনিটে বেরিয়ে আসে। কেবল উৎপাদনের পরিমাণের কথাই নয়, এ-যুগে কলে তৈরী কাগজের রকমারি গুণ ও বৈশিষ্ট্যেরও শেষ নেই। সাধারণ লেখা বা ছাপার কাগজ ছাড়াও অতি মসৃণ, পাত্‌লা ও টেকসই 'বাইবেল-কাগজ' যেমন হয়, তেমনি পাত্‌লা ঘুড়ির কাগজ, পোস্টার কাগজ, প্যাকিং-এর কাগজ প্রভৃতি বহুবিধ কাগজ কলে তৈরি হচ্ছে। রসায়নের আলোচনায় এ-সব বিষয়ের শিল্প-ভিত্তিক বিস্তৃত বর্ণনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না, তাই কাগজ-শিল্পের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

দ্বাদশ অধ্যায়

পদার্থের পারমাণবিক গঠন ও তেজস্ক্রিয়তা

ডালটনের পরমাণু-বাদে সংশয়; উইলিয়াম প্রাউটের তথ্য — মূল বস্তু হাইড্রোজেন; মেণ্ডেলিফের পর্যায়সূত্র ও পদার্থের গুণাগুণ বিচার; ক্যাথোড-রশ্মি — প্লাকার ও ক্রুক্‌স, ইলেকট্রনের পরিচয়; টমসন ও বেকারেলের আবিষ্কার, পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার মূল তথ্যাদি; মাদাম কুরি ও রেডিয়াম: আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মি; র‍্যাডন ও রেডিও-থেরাপি; রাদারফোর্ড ও সোডির আবিষ্কার — ইলেকট্রন ও প্রোটন কণার বিচ্ছুরণ; হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম: পদার্থের পারমাণবিক গঠনতত্ত্ব — ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও পজিট্রন কণিকার আবিষ্কার; পরমাণুর কেন্দ্রীণ ও তার আভ্যন্তরীণ গঠন; পরমাণুর গঠন-বৈচিত্র্যে সৌর পরিবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ; বিভিন্ন মৌলের সাংগঠনিক প্রভেদ ও মৌলিক অভিন্নতা। মৌলের রূপান্তরের রহস্য — পারদ ও সোনার প্রভেদ; রাদারফোর্ডের পরীক্ষা — আইসোটোপ, অক্সিজেন-17; আইসোটোপের গঠন-তত্ত্ব; হেভি হাইড্রোজেন 'ডয়টেরিয়াম' ও ভারী জল; বিভিন্ন আইসোটোপ ও ট্রেসার এলিমেন্ট। পারমাণবিক শক্তি — পদার্থের কেন্দ্রীণ বিদারণে শক্তির উদ্ভব, ইউরেনিয়াম থেকে প্লুটোনিয়াম; কেন্দ্রীণ বিভাজনে নিউট্রনের চেইন-রিয়্যাকসন; মডারেটর — বেরিলিয়াম ও ভারী জল: পারমাণবিক বোমা ও তার বিস্ফোরণ-শক্তি; ফিসন ও ফিউসন; হাইড্রোজেনের রূপান্তরে হিলিয়াম — হাইড্রোজেন-বোমা। পারমাণবিক শক্তির দান — ধ্বংস ও সমৃদ্ধি।

বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেবার জন্যে 1803 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডাল্‌টন তাঁর পরমাণু-বাদ প্রচার করেন; আর তা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেকটা সহজ করে তোলে। তাই ভৌত রসায়নের একটি কার্যকর দিশারী হিসাবে যদিও ডালটনের পরমাণু-বাদ সাধারণভাবে বিজ্ঞানী-সমাজে গৃহীত হয়; কিন্তু অনেকেই এটাকে কেবল একটা সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত বলে মনে করতেন, পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। এর কারণ, প্রত্যক্ষ কোন পরীক্ষার সাহায্যে সে-যুগে পরমাণুর প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি। তারপর থেকে এ সম্পর্কে নানাভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান চলেছে। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে **পরমাণুবাদ** ক্রমে একটা প্রামাণ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরমাণুর

বস্তুগত অস্তিত্ব ও পদার্থের আদি কণিকা-রূপের সন্ধান পাওয়া যায় নানা পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। দ্রবিত অবস্থায় পদার্থ-কণিকার (বিশেষতঃ গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে) ব্যাপন বা 'ডিফিউসন' পদ্ধতি, তরল পদার্থের মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণিকার বিচিত্র গতিবিধি (ব্রাউনিয়ান মুভমেণ্ট), ঊর্ধাকাশের স্বল্প চাপে গ্যাসীয় কণিকাগুলোর নীল বর্ণ বিচ্ছুরণের রহস্য প্রভৃতি বিবিধ তথ্য থেকে পদার্থের পরমাণু-সত্তার আভাস পাওয়া গেছে; বিশেষতঃ বিভিন্ন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা (রেডিও-অ্যাক্টিভিটি) ধর্মের তাৎপর্য পর্যবেক্ষণের ফলে বস্তুর সংগঠনে কণিকা সমন্বয়, অর্থাৎ পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা বা পরমাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন;—পদার্থ নিরেট নয়, ক্ষুদ্রতম কণিকা বা পরমাণুর সমাবেশে গঠিত। এমন কি, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মধ্যেই কেবল পরমাণুর অস্তিত্বই নয়, তার আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্যও প্রায় সম্যক জানা গেছে। এ-সব কথা এই অধ্যায়েই পরে বিশদ-ভাবে আলোচনা করা হবে; এখন পদার্থের এই পরমাণু-বিষয়ক আলোচনাটা সংক্ষেপে গোড়া থেকে সুরু করা যাক।

ডালটনের অনেক আগেই সপ্তদশ শতাব্দীতে মহাবিজ্ঞানী নিউটনও পদার্থের পরমাণু-বাদ সম্বন্ধে অভিমত পোষণ করতেন; এমন কি, তাঁরও আগে ভারতীয় ঋষি কণাদ, গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস, লিউপিপসাস প্রভৃতি মনীষীরা পদার্থের কণিকা-তত্ত্বের কথা উল্লেখ করে গেছেন। সে যাই হোক, ডালটনই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরমাণু-তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন সূত্র প্রথম প্রচার করেন। তাঁর মতে পদার্থের **পরমাণু** কঠিন, অভেদ্য ও অবিভাজ্য বস্তু-কণিকা; যাকে আর ভাঙ্গা যায় না, যেহেতু তা পদার্থের সর্বশেষ ক্ষুদ্রতম কণিকা। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর বিভিন্ন পরীক্ষায় ডালটনের উক্ত মতবাদ ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পরমাণুর অবিভাজ্যতা-বাদ একেবারেই পরিত্যক্ত হয়; দেখা দেয় রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের এক নব দিগন্ত। এর পর থেকে সুরু হয় পারমাণবিক যুগ বা 'অ্যাটমিক এজ'। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই তথ্যের ক্রমবিকাশের ধারা আমাদের কিছুটা পর্যালোচনা করতে হবে।

পদার্থের স্বরূপ ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন ক্রমে নির্ণীত হতে থাকে। এতদ্বিষয়ক পরীক্ষাদিতে দেখা গেল, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর বা ওজনকে একক ধরে নিয়ে

তুলনামূলক ভাবে বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক ওজন-জ্ঞাপক যে-সব সংখ্যা পাওয়া যায় সেগুলি হয় পূর্ণসংখ্যা, নয়তো প্রায় তার কাছাকাছি। এ থেকে স্বভাবতঃ একটা ধারণার উদ্ভব হয়, যা 1816 খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ করেন বৃটিশ রসায়নবিদ্ **উইলিয়াম প্রাউট**। তিনি বলেন, বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুরা কোন-এক আদি বা মূল বস্তুর বিভিন্ন পরিমাণ নিয়ে গঠিত; আর সেই আদি বস্তুটা হলো **হাইড্রোজেন**। এই মতবাদটা অনেকেই সমর্থন করেন নি; কারণ, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন 'এক' ধরে অনেক মৌলেরই পারমাণবিক ওজন তার পূর্ণ গুণিতক হয় না, হয় ভগ্নাংশ; কাজেই তাঁদের মতে হাইড্রোজেন আদি মৌল-কণিকা বা পরমাণু হতে পারে না। এই যুক্তিতে প্রাউটের মতবাদটা পূর্ণ সমর্থিত না হলেও এর মধ্যে কিছু সত্যতা রয়েছে বলে অবশ্য অনেকেই মনে করতেন। এর বহু বছর পরে 1901 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্ট্রাট ও **লর্ড র‍্যালে** বিভিন্ন পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রাউটের উক্ত মতবাদই সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, কোন কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন পূর্ণ সংখ্যা না হলেও তার এত কাছাকাছি যে, একে অকারণ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; কোন-না-কোনভাবে হাইড্রোজেনই বিভিন্ন পদার্থের আদি সংগঠক হবে, কারণ মৌলিক পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন হলো লঘুতম। এর পরবর্তী গবেষণায় জানা গেছে, হাইড্রোজেন-পরমাণুর সংগঠনে এক-একটি মাত্র **ইলেকট্রন** ও **প্রোটন** কণিকা রয়েছে। কাজেই হাইড্রোজেনই আদি বস্তু, যার বিভিন্ন সমন্বয়ে, অর্থাৎ বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমাবেশে বিভিন্ন পদার্থ গঠিত হয়েছে; এ-কথা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন হলো তড়িতাহিত শক্তি-কণা, যা পৃথিবীর যাবতীয় মৌলিক পদার্থের মূল সংগঠক। সে-যুগে পদার্থের সংগঠন সম্পর্কে প্রাউটের উল্লিখিত মতবাদটা ছিল কিছুটা যুক্তিসহ একটা ধারণা মাত্র; কিন্তু তা আধুনিক প্রমাণসিদ্ধ পারমাণবিক গঠন-তত্ত্বের সঙ্গে যে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, এ-কথা ভাবলে বস্তুতঃ বিস্মিত হতে হয়।

মৌলের পর্যায়-সূত্র ঃ পরমাণু-তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে মৌলিক পদার্থ বা মৌলগুলির পারস্পরিক পর্যায়-ক্রমের কথা বলতে হয়। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে প্রাউটের সিদ্ধান্ত যদিও অনেকেই সমর্থন করেন নি; কিন্তু হাইড্রোজেনের ওজনের অনুপাতে বিভিন্ন মৌলের যে পারমাণবিক ওজন নির্ণীত হয় সেগুলি পর্যালোচনা করে তাদের মধ্যে

নানা রকম পারস্পরিক মিল ও একটা সুনিয়মিত পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হতে থাকে। ক্রমে তা থেকে বুঝা যায় যে, মৌলগুলির, তথা তাদের পরমাণুদের সংগঠনের মধ্যে একটা যোগসূত্র বা নিয়ম-শৃঙ্খলা বর্তমান রয়েছে। বিভিন্ন মৌলের গঠনে এরূপ পারস্পরিক পর্যায়-শৃঙ্খলার মূল তাৎপর্য নির্ধারণে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরিখ হলো **মেণ্ডেলিফের পর্যায়-সূত্র**, রাশিয়ার রসায়ন-বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ যা আবিষ্কার করেন 1869 খৃষ্টাব্দে। অবশ্য জার্মান রসায়নবিদ্ লোথার মেয়ারও স্বতন্ত্রভাবে ঐ একই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তার পরবর্তী বছর 1870 খৃষ্টাব্দে। তাহলেও প্রথম আবিষ্কর্তা হিসাবে মৌলের পর্যায়-সূত্র মেণ্ডেলিফের নামেই পরিচিত। বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ও লোথার মেয়ার উভয়েই লক্ষ্য করেন যে, মৌলগুলিকে তাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রম-বর্ধমান পর্যায়ে সাজালে তাদের রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের মধ্যে একটা ধারা-বাহিকতা বা পর্যায়ক্রমিক মিল দেখা যায়। বিশেষ যুক্তিতে হাইড্রোজেন (পাঃ ওজন 1·008) ও হিলিয়াম (পাঃ ওজন 4) মৌল দুটিকে বাদ দিয়ে এভাবে লিথিয়াম থেকে সুরু করে প্রতি 8-টি মৌলের এক-একটি পর্যায় আমরা পাই, যেমন—

আইভানোভিচ মেণ্ডেলিফ

(ক) লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, ফ্লুয়োরিন ও নিয়ন ;

(খ) সোডিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, ফস্ফরাস, সালফার, ক্লোরিন ও আর্গন ;

এই পর্যায় দু'টির মধ্যে সংখ্যানুপাতে মৌলগুলির গুণ ও ধর্ম পরস্পর একই রূপ, অর্থাৎ দুই পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি মৌলদ্বয় অনুরূপ গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট;—লিথিয়াম সোডিয়ামের মত, বেরিলিয়াম ম্যাগ্নেসিয়ামের মত; এভাবে দুই পর্যায়ের সর্বশেষ মৌল নিয়ন ও আর্গন সমধর্মী।

মেণ্ডেলিফ এভাবে তৎকালীন আবিষ্কৃত সবগুলি মৌলকে [মৌলিক পদার্থসমূহের তালিকা (পৃষ্ঠা 2১) দ্রষ্টব্য] তাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে একটি ছক্ তৈরি করেছিলেন; আর মোটামুটি সর্বত্রই মৌলগুলির উল্লিখিতরূপ পর্যাবৃত্তি রক্ষিত হয়েছে বলে দেখা গেছে। মেণ্ডেলিফের এই ছক্ মৌলের **পর্যায়-সারণী** (পিরিয়ডিক টেব্‌ল) নামে পরিচিত; যার একটা তালিকা-রূপ, মৌলগুলির পরমাণু-ক্রমাঙ্ক ও নামের সংকেত সহ, নিম্নে দেওয়া হলো :

মেণ্ডেলিফের পর্যায়-সারণী বা মৌলিক পদার্থের পর্যায়ক্রমিক ছক

মৌলগুলির এই পর্যায়-সারণীতে দেখা যায়, উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ মৌল (A) আর্গনের (যা হিলিয়াম ও নিয়নের সমধর্মী) পরে রয়েছে

পটাসিয়াম (K), যা থেকে একটা নূতন পর্যায় সুরু হয়েছে ; কিন্তু পূর্ববর্তী দু'টি পর্যায়ের মত আটটির বদলে এ-পর্যায়ে রয়েছে 18-টি মৌল, যার শেষ মৌল **ক্রিপ্টন**। এর পরবর্তী পর্যায়েও রুবিডিয়াম থেকে **জেনন** পর্যন্ত 18টি মৌল। তারপর সিজিয়াম (Cs) থেকে সুরু করে র‍্যাডন (Rn) পর্যন্ত 32-টি মৌলের একটি দীর্ঘ পর্যায়, যার মধ্যে **বিরল মৃত্তিকা** বা 'রেয়ার আর্থ' ধাতু-গোষ্ঠীর সংখ্যাই 14-টি। সর্বশেষ ফ্রান্সিয়াম (Fr) থেকে ইউরেনিয়াম (U) পর্যন্ত অতিগুরু পারমাণবিক ওজনবিশিষ্ট 6-টি মৌলের একটি আংশিক পর্যায়ে মেণ্ডেলিফের মৌল-বিভাগের পর্যায়-সারণী শেষ হয়েছে। (উপরোক্ত ছকে 92-ক্রমাঙ্কের ইউরেনিয়ামের পরবর্তী মৌলগুলি মেণ্ডেলিফের পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত)।

এই পর্যায়-সারণীর প্রত্যেকটি পর্যায়ের মৌলগুলির রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের পর্যাবৃত্তি ঘটেছে পরবর্তী পর্যায়ের মৌলগুলির সঙ্গে, যার পর্যায়ক্রমিক সমধর্মিতা রেখা-সংযোগের দ্বারা দেখানো হয়েছে ; যেমন, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রথম স্তম্ভে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি হলো সমগুণাপন্ন গোষ্ঠি-ভুক্ত ধাতব মৌল ; আর শেষ স্তম্ভের হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন প্রভৃতি সবই নিষ্ক্রিয় গ্যাসীয় মৌল-গোষ্ঠি। এদের মধ্যবর্তী বিভিন্ন মৌলগুলিও পরস্পরের অনুরূপ সমধর্মী। মৌলের এই পর্যায়-সারণীর তথ্যাদির পর্যালোচনা কিছুটা জটিল, কিন্তু এর তাৎপর্য রসায়ন-বিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। এর ফলে কেবল যে রাসায়নিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ পাওয়া গেছে, তাই-ই নয় ; মৌলগুলির গুণ ও ধর্মের পর্যায়ক্রমিক ব্যবধান এত নিয়মিত যে, কোথাও নির্দিষ্ট গুণ-সম্পন্ন কোন মৌল আবিষ্কৃত না হলেও তার গুণ ও ধর্ম কিরূপ হবে তা বলে দেওয়া যায়। বস্তুতঃ তৎ-কালাবধি অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত অনেক মৌলের গুণ ও ধর্ম মেণ্ডেলিফ তাঁর পর্যায়-সারণী থেকে বলে গিয়েছিলেন এবং সেরূপ মৌলের অস্তিত্বের ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন। পরবর্তীকালে সেরূপ গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট নূতন অনেক মৌলের আবিষ্কার ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে সম্ভব হয়েছে। যাহোক, মৌলের এই পর্যায়সূত্রের রাসায়নিক তাৎপর্য বহুমুখী ও ব্যাপক ; এর সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এখানে মৌলের পারমাণবিক গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে পর্যায়-সূত্রের উপযোগিতার কথা সংক্ষেপে কিছু বলা হলো মাত্র।

বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় দেখা গেছে, মেণ্ডেলিফের পর্যায়-সারণী

বস্তুতঃ মৌলগুলির ভ্যালেন্সি বা যোজ্যতা বিভাগেরও একটি ছক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মৌলগুলির তড়িৎ-রাসায়নিক (ইলেক্‌ট্রো-কেমিক্যাল) ধর্মের ও তাদের অক্সাইডের ক্ষার ও অম্ল-ধর্মিতার সঠিক ব্যাখ্যা উক্ত পর্যায়-সূত্রের সাহায্যে সহজে পাওয়া যায়। মোট কথা, সব দিক দিয়ে এই পর্যায়-সূত্র রসায়নের গবেষণা ও চর্চাকে সবিশেষ সরল, যুক্তিসিদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করেছে। এর ফলে রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপ, বিশেষতঃ মৌলগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা সহজতর হয়েছে। তাই সারা উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে এমন সব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, পরমাণুর গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ডালটন, প্রাউট প্রভৃতির পুরাতন মতবাদের সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ক্রমে বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন গবেষণার ফলে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের সংযোগ-বিয়োগের একক হিসাবে ডালটনের পরমাণু-বাদ অবাস্তব; কারণ, পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণিকাই নয়, পরন্তু আরও বহুগুণে ক্ষুদ্রতর বিভিন্ন কণিকার একত্র সমাবেশে এক-একটি পরমাণু গঠিত হয়। তাই পরমাণুর জটিল সংগঠনে এরূপ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাসমূহের প্রকৃতি ও সমাবেশ সম্বন্ধে সঠিক তথ্যের অনুসন্ধান বহু বছর ধরে চলেছে নানাভাবে। যে-সব পরীক্ষার মাধ্যমে পরমাণুর মূল গঠন-প্রকৃতি নির্ণীত হয়েছে এখানে সেগুলির কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

ক্যাথোড রশ্মি ঃ পদার্থের মূল গঠন সম্পর্কে একটা বিস্ময়কর তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় গত শতাব্দীর শেষ দিকে পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে। পরীক্ষাটা হলো এই যে, বায়ুশূন্য কোন আবদ্ধ পাত্রের অভ্যন্তরস্থ অতি সামান্য (লঘু চাপের) গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালালে পাত্রটার ভিতরে এক রকম আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে। ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করেন জার্মান বিজ্ঞানী **প্লাকার** 1859 খৃষ্টাব্দে; একটা আবদ্ধ কাচ-নলের অভ্যন্তর ভাগ যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করে তিনি অবশিষ্ট সেই লঘু চাপের বায়ুর ভিতরে তড়িৎ-প্রবাহ চালান এবং লক্ষ্য করেন যে, ঐ প্রবাহের ঋণ-তড়িদ্দ্বার বা **ক্যাথোড** প্রান্ত থেকে এক বিস্ময়কর রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে গিয়ে পাত্রটার বিপরীত দিকের কাচকে প্রতিপ্রভ করে তোলে। এভাবে বিকিরিত সেই অজানা রশ্মিকে **ক্যাথোড-রশ্মি** নাম দেওয়া হয় এবং দেখা যায়, এই রশ্মি সাধারণ আলোক-রশ্মির মতই সরল রেখায় প্রবাহিত হয়। এই

রশ্মি-পথে কোন কঠিন বস্তু প্রতিবন্ধকরূপে স্থাপন করলে ক্যাথোডের বিপরীত দিকে পাত্রের গায়ে তার ছায়া পড়ে (চিত্র : ক্রুক্স টিউব)। আবার ঐ রশ্মি-পথে একখানা অবতল (কন্‌কেভ) লেন্স স্থাপন করলে রশ্মিগুলি লেন্সের 'ফোকাস' বিন্দুতে (আলোক-রশ্মির মত) সংহত হয়, আর সেই ফোকাসে স্থাপিত কোন ধাতব পাত ঐ কেন্দ্রীভূত রশ্মির তেজে তপ্ত-প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, এমন কি, গলেও যেতে পারে। এ থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ঐ রশ্মিধারার সংগঠক কোন বিশেষ কণিকাসমূহের পরস্পর সংঘাতের প্রচণ্ডতায়ই এরূপ তাপ-শক্তির উদ্ভব হয়। 1879 খৃষ্টাব্দে স্যার **উইলিয়াম ক্রুক্স** এই পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্যাদি সবিশেষ পর্যালোচনা করেন এবং এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছান যে, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কণিকা-ধারায় এই **ক্যাথোড-রশ্মি** গঠিত। তারপরে 1897 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক স্যার জে. জে. টমসন প্রমাণ করেন যে, ঋণ-তড়িতাহিত অগণিত অতিসূক্ষ্ম কণিকার দ্রুত প্রবাহের ফলেই ক্যাথোড-রশ্মির উদ্ভব হয়; আর এই তড়িতাহিত কণাগুলি তড়িৎ-প্রবাহের ক্যাথোড প্রান্ত থেকে বেরিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে 10,000 থেকে 1,00,000 মাইল বেগে ধাবিত হয়। কণাগুলির এই দুরন্ত গতিবেগ আলোকের গতির অর্ধেকেরও বেশি।
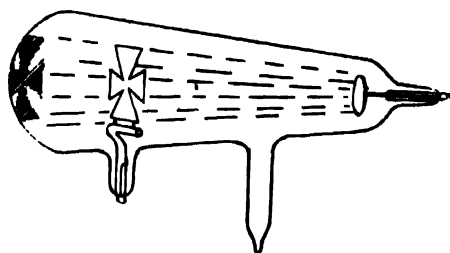
ক্রুক্স টিউব বা ক্যাথোড টিউবের পরীক্ষা

ঋণ-তড়িতাহিত এই সূক্ষ্ম কণিকাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে **ইলেকট্রন**। অধ্যাপক টমসনের গবেষণায় এরূপ নির্ণীত হয়েছে যে, এই ইলেকট্রন কণিকাগুলির বস্তু-ভর সব চেয়ে হাল্‌কা মৌল হাইড্রোজেনের এক-একটি পরমাণুর ভরের 1840 ভাগের একভাগ মাত্র। ইলেকট্রন-কণার এই ক্ষুদ্রত্ব কল্পনা করাও দুঃসাধ্য; একে তো লঘুতম হাইড্রোজেন-গ্যাসের পরমাণু, তার আবার 1840 ভাগের এক ভাগ, সেটা কি বস্তু! যাহোক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর-ও ভর নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে; হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভর হিসাব করা হয়েছে $1{\cdot}67 \times 10^{-24}$ গ্রাম, অর্থাৎ 1·67-কে 24 বার 10 দিয়ে ভাগ

করলে যে-সংখ্যা হয় তত গ্রাম। এরূপ হিসাবে একটি ইলেকট্রন-কণার ভর দাঁড়ায় $9{\cdot}11 \times 10^{-28}$ গ্রাম মাত্র, অর্থাৎ বহু কোটি ইলেকট্রন কণার সমবায়ে এক গ্রাম হাইড্রোজেনের সৃষ্টি হয়। মোট কথা, উল্লিখিত ক্যাথোড-রশ্মির গবেষণায় অধ্যাপক টমসনের আবিষ্কৃত ইলেকট্রন-কণার অস্তিত্ব থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় কেবল পদার্থের পরমাণুরাই নয়, পরন্তু তাদের সংগঠক ইলেকট্রন-কণিকারাও অংশ গ্রহণ করে। দেখা যায়, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থ থেকে ইলেকট্রন কণিকা বিচ্যুত হয়ে বেরিয়ে আসে ; যেমন—পদার্থের প্রদীপ্ত অবস্থা, রাসায়নিক দ্রবণ প্রভৃতি। এভাবে ক্রমে পদার্থের, তথা তার সংগঠক পরমাণুর ইলেকট্রন-ভিত্তিক গঠন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা গড়ে ওঠে।

অধ্যাপক টমসনের সমসাময়িক কালে পদার্থ-বিজ্ঞানী বেকারেল, কুরি দম্পতি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণায়ও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পদার্থের পরমাণুরা কোন একক, অবিভাজ্য বা অপরিবর্তনীয় কণিকা নয় ; পরন্তু বিভিন্ন কণিকার সমবায়ে গঠিত ; আর তার অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ স্থিতিশক্তি (পোটেন্সিয়াল এনার্জি) নিহিত রয়েছে। একেই বলা হয় পদার্থের পারমাণবিক শক্তি। বিশেষ বিশেষ পদার্থের (তেজস্ক্রিয়) এই পারমাণবিক শক্তিই বিভিন্ন কণিকা-ধারা বা রশ্মির আকারে বিকিরিত হয়ে যায় এবং মূল পদার্থটার রূপান্তর ঘটে ; এক পদার্থের পরমাণু আর এক পদার্থের পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি কোন কোন পদার্থের এরূপ শক্তি-বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তা-ধর্মের আবিষ্কার থেকেই পরমাণুর গঠনে শক্তি-কণিকার সমাবেশ সম্পর্কীয় উল্লিখিত ধারণা সুদৃঢ় হয়েছে।

তেজস্ক্রিয়তা

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা থেকে শক্তিকণা বা তেজঃ বিকিরণের ধর্ম প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল 1896 খৃষ্টাব্দে। গবেষণা-সূত্রে তিনি লক্ষ্য করেন, **ইউরেনিয়াম** ধাতুর যৌগিকগুলি থেকে অনবরত এক রকম অদৃশ্য তেজঃ-রশ্মি ধারাকারে বিকিরিত হয় ; আর তা কাঠ, কাগজ প্রভৃতি অনচ্ছ পদার্থ ভেদ করে গিয়ে ফোটোগ্রাফির প্লেটের উপরে (আলোক-রশ্মির মত) বিক্রিয়া

ঘটাতে পারে। বিশেষ বিশেষ পদার্থের এরূপ তেজঃ-বিকিরণের ধর্মকে আমরা বলি তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity); আর সেই সব পদার্থকে বলা হয় **তেজস্ক্রিয় পদার্থ (radioactive substance)**। বেকারেলের এই আবিষ্কারের কিছু আগে জার্মান বিজ্ঞানী রন্টগেন **এক্স-রশ্মি** (রঞ্জন - রশ্মি) আবিষ্কার করেছেন। বেকারেল ইউরেনিয়াম থেকে উদ্ভূত তাঁর আবিষ্কৃত রশ্মির ক্রিয়া-কলাপ এক্স-রশ্মির প্রায় অনুরূপ বলে লক্ষ্য করেন। এর মাত্র দু'-বছর পরে 1898 খৃষ্টাব্দে প্যারিসে অধ্যাপক প্যারি কুরি ও তাঁর পত্নী **মাদাম কুরি** বিভিন্ন পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা ধর্মের গবেষণা করতে গিয়ে ইউরেনিয়ামের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী নূতন একটি তেজস্ক্রিয় মৌল **রেডিয়াম** আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়ামের উৎস পিচ-ব্লেণ্ড নামক খনিজ থেকেই রেডিয়াম আবিষ্কৃত হয় ; কিন্তু পরিমাণে অতি সামান্য, প্রায় এক কোটি ভাগে এক ভাগ মাত্র। বহু বছরের বহু কষ্টসাধ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাদাম কুরি পিচব্লেণ্ড থেকে রেডিয়াম ধাতুর একটা লবণ, **রেডিয়াম-ক্লোরাইড**
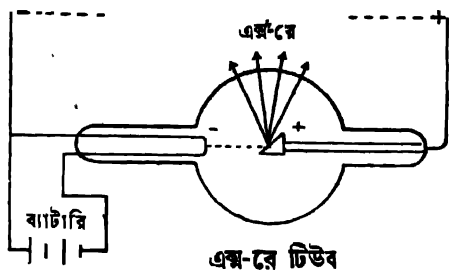
এক্স-রে টিউব

রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরি

সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করেছিলেন, যা দেখতে সাধারণ খাদ্য-লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মত সাদা। যদিও পরে মৌলিক পদার্থ হিসাবে রেডিয়াম ধাতুও পৃথক করা সম্ভব হয়েছে; আর দেখা গেছে, তা তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম ব্যতীত বিভিন্ন রাসায়নিক গুণ ও ধর্মে ক্যালসিয়াম ও বেরিয়াম ধাতুর অনুরূপ। সাধারণতঃ অবশ্য রেডিয়াম বলতে মাদাম কুরির প্রথম আবিষ্কৃত রেডিয়াম-ক্লোরাইডই বুঝায় এবং এই ক্লোরাইড লবণের আকারেই রেডিয়াম সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তীব্র তেজস্ক্রিয়তার জন্যে রেডিয়াম বা তার কোন লবণ নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক; তাই এর পরীক্ষাদিতে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। এর কারণ, রেডিয়ামের সংস্পর্শে, এমন কি, কাছাকাছি থাকলেও অল্প সময়ের মধ্যেই দেহের চামড়া লাল হয়ে ফুলে ওঠে; পরে সেখানে একরকম দুরারোগ্য ক্ষত দেখা দেয়। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করলে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত মাংস-কোষগুলি বিনষ্ট হয়ে রোগের প্রসার রোধ করে। এরূপ রেডিয়াম-চিকিৎসা পদ্ধতি ইদানিং যথেষ্ট প্রচলিত হয়েছে। অবশ্য বিশেষ দুষ্প্রাপ্য বলে রেডিয়াম অত্যন্ত মূল্যবান, তাই এর ব্যবহার সীমিত।

ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম ছাড়া থোরিয়াম ধাতুও কিছুটা তেজস্ক্রিয় মৌল। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, এদের সংগঠক পরমাণুরা অনবরত ভেঙ্গে ভেঙ্গে ধন-তড়িৎ ও ঋণ-তড়িতাহিত অতি সূক্ষ্ম বিভিন্ন কণিকা-ধারায় বিচ্ছুরিত হয়, আর সেই তড়িতাহিত কণিকাগুলির ধারা-প্রবাহই রশ্মির আকারে সবেগে ছড়িয়ে পড়ে। এর ধন-তড়িতাহিত কণিকা-ধারাকে বলা হয় **আলফা রশ্মি**, আর ঋণ-তড়িৎ কণিকার ধারাকে বলে **বিটা রশ্মি**; তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে আরও এক রকম রশ্মি নির্গত হয়, যাকে বলা হয় **গামা রশ্মি**। পরীক্ষায় দেখা গেছে, গামা-রশ্মি বস্তুতঃ তড়িদ্বিহীন, এটা আবার কণিকা-ধারাও নয়, ইথারের তরঙ্গ বা কম্পন মাত্র; আর এর প্রকৃতি হলো এক্স-রশ্মির অনুরূপ। বিশেষ কৌশলে চুম্বকীয় আকর্ষণের প্রভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত এই তিন রকম রশ্মি পৃথক করে ফেলা যায়। এগুলির গতি প্রকৃতিও আলাদা। বিটা-রশ্মির ঋণ-তড়িতাহিত **ইলেকট্রন**
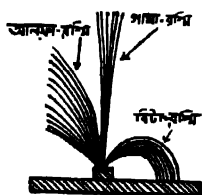
আলফা, বিটা ও গামারশ্মি

কণিকাগুলি (নিস্তড়িৎ গামা-রশ্মিও) অতি তীব্র গতিশীল এবং বিভিন্ন পদার্থ ভেদ করে যাওয়ার শক্তিসম্পন্ন। পক্ষান্তরে আল্‌ফা রশ্মির গতি-পথে সামান্য একখানা কাগজ ধরলে, অথবা কয়েক সেন্টিমিটার (2·54 সেঃ মিটার = 1 ইঞ্চি) বায়ুর ব্যবধানেও তার গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তাহলেও আল্‌ফা-রশ্মির ধনাত্মক প্রোটন-কণিকাগুলি বিটা-কণিকা বা ইলেকট্রন-কণাগুলির চেয়ে অধিকতর তড়িৎ-শক্তিসম্পন্ন; আর তাই আল্‌ফা-রশ্মি বায়ুতে উপস্থিত গ্যাসীয় অণুদের সহজেই বিশ্লিষ্ট ও তড়িতাহিত করে এবং এর প্রভাবে বায়ু তড়িৎ-পরিবাহী হয়ে ওঠে। অবশ্য কাচ বা কোন ধাতুনির্মিত যে আবদ্ধ নলে রেডিয়াম বা অপর কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখা হয় তার দেয়াল ভেদ করে আলফা-রশ্মি বাইরে বেরুতে পারে না; বিটা-রশ্মি কাচ ভেদ করে অবাধে বাইরে বেরোয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির মধ্যে যদিও ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ও থোরিয়াম মৌল তিনটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এগুলি থেকে বিচ্ছুরিত বিভিন্ন রশ্মির বৈদ্যুতিক পরিমাপ নিয়ে দেখা গেছে, এগুলি থেকে আরও অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় মৌলের উদ্ভব হয়, যাদের অস্তিত্ব অবশ্য বিশেষ ক্ষণস্থায়ী। রেডিয়াম থেকে যে তেজঃ-বিকিরণ ঘটে তাতে এক রকম গ্যাসীয় উপাদান থাকে, যাকে বলা হয় **র‍্যাডন**। এই র‍্যাডন গ্যাস একটি ক্ষণস্থায়ী তেজস্ক্রিয় মৌল; রেডিয়ামের মত এটাও আলোক বিকিরণ করে এবং তা অন্ধকারে লক্ষ্য করা যায়। র‍্যাডন ছাড়া রেডিয়াম থেকে আরও কয়েকটি অধিকতর অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থের উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। থোরিয়াম থেকেও এরূপ অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় গ্যাস উদ্ভূত হয়। এ-সব তেজস্ক্রিয় গ্যাস অতি ধীর গতিতে মূল তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে বেরিয়ে যায় এবং তারা ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয়তা-ধর্ম হারায়। হিসাব করে জানা গেছে যে, তেজঃ বিকিরণের ফলে রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা-শক্তি 1590 বছরে অর্ধেক হ্রাস পায়, আর র‍্যাডনের ক্ষেত্রে এই সময়কাল হলো মাত্র 3·8 দিন। স্বল্পস্থায়ী হলেও যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় বলে 'রেডিও-থেরাপি' বা তেজঃ বিকিরণের চিকিৎসা-পদ্ধতিতে অনেক সময় রেডিয়ামের (রেডিয়াম ক্লোরাইডের) বদলে র‍্যাডন ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি, গ্যাস-ম্যান্টেল (পৃঃ 212) তৈরি করতে থোরিয়াম ব্যবহৃত হয়; এই শিল্পে থোরিয়ামের বিকিরণ বা বিভাজনের ফলে **মেসোথোরিয়াম** নামক এক রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থের

উদ্ভব হয়, এর তেজস্ক্রিয়তা 5¼ বছরে আধাআধি কমে যায়।
হলেও তেজস্ক্রিয় মেসোথোরিয়ামের নানা রকম শিল্প-ব্যবহার আছে; তার মধ্যে একটা হলো, কোন আঠালো রঙে এ-জিনিসটা মিশিয়ে ঘড়ির কাঁটায় মাখিয়ে দিলে তা অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে, যার ফলে রাত্রির অন্ধকারেও ঘড়ি দেখা চলে।

আজকাল যদিও পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা-ধর্ম সম্পর্কে সকলেরই অল্প-বিস্তর কিছুটা ধারণা আছে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও ব্যাপারটা ছিল বিশেষ চমকপ্রদ ও দুর্বোধ্য। এর প্রকৃত তথ্য ব্যাখ্যা করেন 1902 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লর্ড **রাদারফোর্ড** ও অধ্যাপক ফ্রেডারিক **সোডি**; এঁরা প্রমাণ করেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রমাগত ভেঙ্গে যায় ও তার সংগঠক তড়িতাহিত কণাসমূহের স্বয়ংক্রিয় বিচ্ছুরণের ফলেই তেজস্ক্রিয়তার উদ্ভব হয়। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ সংগঠনের ব্যাপারে এটা আজ সর্বজনস্বীকৃত তথ্য। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির পরমাণুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে গিয়ে ঋণ-তড়িতাহিত **ইলেকট্রন-কণা** (বিটা-রশ্মি), ও অপেক্ষাকৃত ভারী ধন-তড়িতাহিত হিলিয়াম-কেন্দ্রীণ বা **প্রোটন-কণা** (আলফা-রশ্মি) বিমুক্ত করে; মূল পদার্থ থেকে এ-সব কণিকার ধারা তীব্র গতিতে ছুটে বেরোয়; এ-সব কথা আমরা আগেই বলেছি। আর একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য হলো, কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের সব পরমাণুরা একই সঙ্গে ভাঙ্গে না; পর্যায়ক্রমে অতি সামান্য ভগ্নাংশ (লক্ষ-লক্ষ পরমাণুদের মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে হয়তো একটি মাত্র) ভেঙ্গে গিয়ে তার ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকা (হিলিয়াম-কেন্দ্রীণ) বিমুক্ত করে দেয়। ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে পরমাণুদের এই বিস্ফোরণ বা বিভাজন-পদ্ধতি অত্যন্ত ধীরগতি; তা যদি না হতো তাহলে ইতিমধ্যেই হয়তো এই মৌলটা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে যেত। আজও পৃথিবীতে
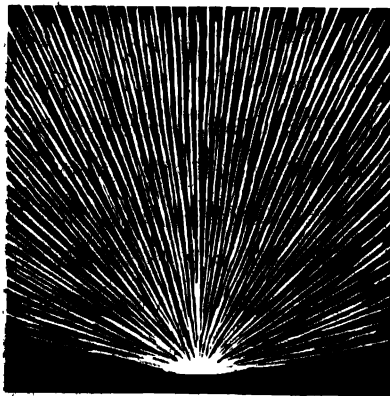
তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজঃ বিকিরণ

যে পরিমাণ **ইউরেনিয়াম** রয়েছে তা তেজঃ-বিকিরণের মাধ্যমে ক্রমে রেডিয়াম ও পরে অন্যান্য মৌলে রূপান্তরিত হতে হতে কয়েক লক্ষ বছরে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে **রেডিয়াম** আজ যতটা আছে তার অর্ধাংশ বিলুপ্ত হবে 1590 বছরে, অবশিষ্টের অর্ধাংশ আবার পরবর্তী 1590 বছরে রূপান্তরের মাধ্যমে লোপ পাবে। অবশ্য রেডিয়াম আবার ধীরে ধীরে উৎপাদিত হচ্ছে তার জনক-মৌল ইউরেনিয়াম থেকে। তেজস্ক্রিয় গ্যাস **র‍্যাডন**, যা রেডিয়াম থেকে বিমুক্ত হয়, তা অবশ্য অতি দ্রুত অন্তর্হিত হয়। তার অর্ধাংশ মোটামুটি 4 দিনে, অবশিষ্টের অর্ধাংশ আবার পরবর্তী প্রায় 4 দিনে বিলুপ্ত হয় ; আর এভাবে তার বিলুপ্তি বা রূপান্তরের ধারা চলতে থাকে। এভাবে র‍্যাডন যেমন লোপ পায়, তেমনি রেডিয়াম থেকে নূতন র‍্যাডন আবার উদ্ভূত হয় ; কাজেই রেডিয়াম পৃথিবীতে যতকাল থাকবে, র‍্যাডন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এমনি ভাবে অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌলও নিয়ত ভেঙ্গে চলেছে এবং বিভিন্ন মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির ক্রমাগত তেজঃ বিকিরণের শেষ পরিণতিতে (অন্তিম দশায়) তারা নিস্তেজ ও ভারী ধাতু সীসা বা লেডে রূপান্তরিত হয়ে থাকে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই তথ্যের উপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে পৃথিবীর বয়সও নিরূপণ করেছেন। তেজস্ক্রিয় মৌলের তেজস্ক্রিয়তা-সম্ভূত এরূপ বিভিন্ন রূপান্তরের ধারা পর্যালোচনা করলে প্রাকৃতিক পদার্থের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মৌলের আভ্যন্তরীণ গঠন-রহস্যের কিছুটা হদিশও মেলে।

বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড ও স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পারমাণবিক বিভাজন ও পরমাণুদের কণিকা-বিচ্ছুরণ সম্বন্ধীয় তথ্যাদি নানাভাবে প্রমাণ করেন। তাঁদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে ধন-তড়িতাহিত যে আল্‌ফা-কণিকা বিমুক্ত হয় তা বস্তুতঃ **হিলিয়াম** গ্যাসের ধন-তড়িতাবিষ্ট কেন্দ্রীণ ছাড়া আর কিছুই নয়, অর্থাৎ এক-একটি আল্‌ফা-কণিকা হলো এক-একটি ধন-তড়িতাবিষ্ট হিলিয়াম-কেন্দ্রীণ, অর্থাৎ হিলিয়াম-পরমাণু থেকে তার পারমাণবিক গঠনের উপাদান স্বরূপ ঋণ-তড়িতাহিত দু'টি ইলেকট্রন-কণা বিচ্যুত হয়ে গেছে। রাদারফোর্ড তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরিত কণিকাসমূহ থেকে আল্‌ফা-কণিকাগুলিকে কৌশলে আলাদা করে তার সঙ্গে আবার দুটি ইলেকট্রন (বিটা) কণিকা যুক্ত করে দেখিয়েছেন যে, তা সাধারণ হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়।

কেবল তা-ই নয়, বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে রাদারফোর্ড নির্দিষ্ট পরিমাণ রেডিয়াম থেকে কতগুলি আল্‌ফা-কণিকা বিচ্যুত ও বিকিরিত হয় তা-ও নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ-সব জটিল তথ্যের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; আমরা কেবল তাঁর গবেষণার মূল কথাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করলাম মাত্র।

পারমাণবিক গঠন: ডালটনের মতবাদ অনুযায়ী রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের পরমাণুরাই অংশ গ্রহণ করে। এরূপ ধারণা গত কয়েক শতাব্দী ধরে চলছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে পদার্থের বৈদ্যুতিক ও তেজস্ক্রিয় ধর্ম এবং পদার্থের রূপান্তর সম্বন্ধীয় যে-সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি জানা গেছে, তা থেকে পদার্থের গঠন সম্বন্ধীয় ডালটনীয় মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরিত কণাসমূহের বিশ্লেষণ ও রাদারফোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমাণুর অবিভাজ্যতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর কণিকার সমবায়ে পরমাণু গঠিত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাহলে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন ও পরিবেশটা কিরূপ হবে তার সঠিক চিত্র নির্ধারণের জন্যে বিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে ওঠেন। আমরা আগেই ক্রুকের পরীক্ষায় গ্যাসীয় পরমাণুর বিভাজনে উৎপন্ন ঋণ-তড়িতাহিত **ইলেকট্রন**-কণার কথা বলেছি। যে-হেতু এই ইলেকট্রন বা ঋণতড়িৎ-কণাগুলি পরমাণুর সংগঠক উপাদান, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পদার্থ বা তার ক্ষুদ্রতম অংশ তড়িদ্বিহীন; কাজেই এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পরমাণুর ভিতরে অবশ্যই কোন ধন-তড়িতাহিত কণা থাকবে, যার ধনতড়িৎ-আধান (চার্জ) অবশ্যই ইলেকট্রনের ঋণতড়িৎ-আধানের সমান হবে; নতুবা পদার্থ নিস্তড়িৎ হতে পারে না। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন তাহলে কিরূপ হবে, এই হয়েছিল সমস্যা।

বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় এ সমস্যার সমাধান হয়। তেজস্ক্রিয় কোন পদার্থ (যেমন রেডিয়াম) থেকে বিকিরিত আল্‌ফা-রশ্মির (ধন-তড়িতাহিত কণিকা-ধারা) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে একটি অতি সূক্ষ্ম কেন্দ্রীয় বিন্দুতে ধনতড়িৎ-আধান পুঞ্জীভূত হয়ে অবস্থান করে; আর সেই কেন্দ্রীণেই (nucleus) পরমাণুটার প্রায় সম্যক বস্তু-ভর নিবদ্ধ থাকে। ধন-তড়িতাহিত এই সূক্ষ্ম কেন্দ্রীণের চারদিকে ঋণ-তড়িতাহিত **ইলেকট্রন** কণিকারা বিভিন্ন সমকেন্দ্রীক কক্ষপথে দুরন্ত গতিতে নিয়ত পরিভ্রমণ করে; যেমন সূর্যের

চারদিকে গ্রহগুলি ঘুরছে। পরমাণুর গঠন সম্পর্কীয় রাদারফোর্ডের এই ধারণা বস্তুতঃ পরবর্তী সব রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন বুঝা গেল বটে, কিন্তু ঐ ধনাত্মক কেন্দ্রীণের গঠন-প্রকৃতি কিরূপ, তা নিয়ে আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির পরমাণু বা তার কেন্দ্রীণ ভেঙ্গে যে **আল্ফা-কণিকা** বিকিরিত হয় সেগুলি ধন-তড়িতাহিত হিলিয়াম-কেন্দ্রীণ বলে প্রমাণিত হয়েছে।
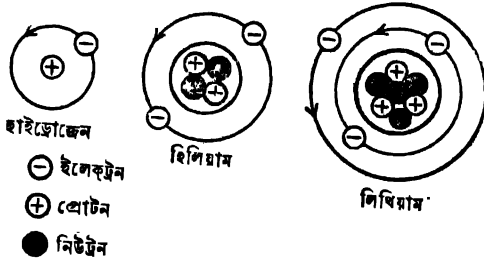
পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন : প্রোটন ও নিউট্রনে গঠিত কেন্দ্রীণের চারদিকে ইলেক্‌ট্রন কণিকারা ঘুরছে

তেজস্ক্রিয় মৌলের বিকিরিত রশ্মিতে ঐ ধনাত্মক হিলিয়াম-কেন্দ্রীণ ছাড়া ঋণাত্মক ইলেক্‌ট্রন-কণিকা বা বিটা-রশ্মিও থাকে। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির পরমাণু-কেন্দ্রীণের গঠনে তাহলে হিলিয়াম-পরমাণুর ধন-তড়িতাহিত কেন্দ্রীণ রয়েছে; কিন্তু পরীক্ষায় পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিলিয়ামের পরমাণুর বা তার কেন্দ্রীণের ভর হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভর বা ওজনের চার গুণ; কাজেই আল্ফা-কণিকা বা হিলিয়াম-কেন্দ্রীণকে কোন একক কণিকা বলা যায় না, তারও মিশ্র সংগঠন। এরূপ বিভিন্ন পরীক্ষা ও জটিল যুক্তির ভিত্তিতে শেষে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, লঘুতম মৌল হাইড্রোজেন-পরমাণুর ধন-তড়িতাহিত **কেন্দ্রীণ-ই** হলো যে-কোন পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ধনতড়িৎ-আধানের (চার্জ) একক। আর পরমাণুর কেন্দ্রীণস্থিত এই একক তড়িৎ-কণার নাম দেওয়া হয়েছে **প্রোটন**।

পরমাণুর গঠন সম্পর্কে রাদারফোর্ডের এ-সব সিদ্ধান্তের পরে বহু বছর যাবৎ পরমাণু-কেন্দ্রীণের প্রোটন-কণিকাই ধনতড়িৎ-কণিকার একক বলে স্বীকৃত ছিল; কিন্তু 1933 খৃষ্টাব্দে আবার একটা নূতন তথ্য প্রকাশ পায়।

পরমাণু-বিভাজনের বিশেষ পরীক্ষায় আর এক রকম কণিকার সন্ধান পাওয়া যায়, যার ভর ইলেক্‌ট্রন-কণিকার ভরের সমান ; অথচ তা ইলেক্‌ট্রনের মত ঋণ-তড়িতাহিত না হয়ে ধন-তড়িৎবিশিষ্ট। এই ধনতড়িৎ-কণিকার নাম দেওয়া হয়েছে **পজিট্রন** ; একেও তাহলে ধন-তড়িতের একক বলতে হবে, যেমন ইলেক্‌ট্রন ঋণ-তড়িতের একক। এই পজিট্রন-কণিকারা পরমাণুর কেন্দ্রীণের সংগঠনে তড়িৎ-আধানের একটা এককরূপে বর্তমান থাকে সত্য, কিন্তু তা অত্যন্ত অস্থায়ী। গবেষণার ফলে আবার ধন-তড়িতাহিত প্রোটন ও পজিট্রন-কণিকা, আর ঋণ-তড়িতাহিত ইলেক্‌ট্রন-কণিকা ছাড়াও পরমাণুর সংগঠনে এক রকম তড়িদ্বিহীন কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে **নিউট্রন**। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে নিউট্রন কণিকা একটি প্রোটন ও একটি ইলেক্‌ট্রন কণিকার দৃঢ় সংবন্ধনে গঠিত ; আর তাই বিপরীত আধানের তড়িৎ-কণার সংযোগে উৎপন্ন নিউট্রন কণিকারা হচ্ছে তড়িদ্বিহীন। আল্‌ফা-রশ্মির (প্রোটন-কণিকার) সংঘাতে বেরিলিয়াম, বোরন প্রভৃতি মৌলের পরমাণুদের বিভাজিত করে নিউট্রন-কণিকা বিমুক্ত করাও সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় আবার প্রমাণিত হয়েছে, কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিভাজন-প্রক্রিয়ায় এই তড়িদ্বিহীন নিউট্রন-কণিকারা বস্তুতঃ সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে কাজ করে থাকে।
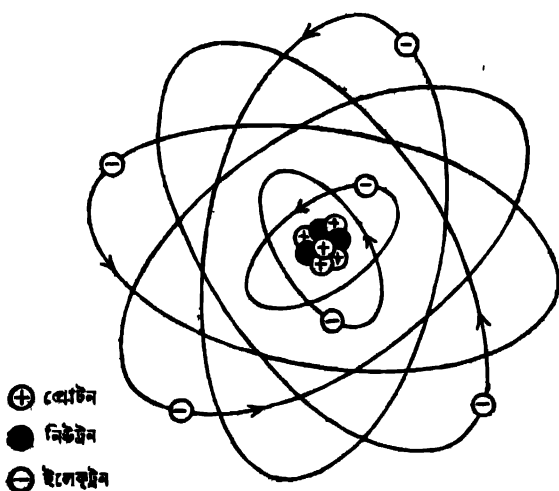
পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনে সৌর-মণ্ডলের ছায়া

উল্লিখিত বিভিন্ন আলোচনা থেকে বুঝা গেল, পদার্থের অন্তিম একক পরমাণু নয় ; বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি সূক্ষ্মাতসূক্ষ্ম পদার্থ (শক্তি)-কণিকার সমবায়ে গঠিত। আর সেই পরমাণুর

অভ্যন্তরে প্রোটন ও নিউট্রন-কণিকার সংঘবদ্ধ পিণ্ডবিন্দু অর্থাৎ কেন্দ্রীণকে ঘিরে ইলেকট্রন-কণিকারা বিভিন্ন কক্ষপথে নিয়ত প্রদক্ষিণ করে। পরমাণুর সংগঠক এ-সব কণিকারা পারস্পরিক আকর্ষণের আওতার মধ্যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, তাদের মাঝে থাকে যথেষ্ট ব্যবধান। এর অর্থ হলো এই যে, যত ক্ষুদ্রই হোক, সমগ্র পরমাণুর তুলনায় সংগঠক কণিকাগুলির আয়তন বা ব্যাস অতি নগণ্য। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কীয় এ-সব তথ্য বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বিভিন্ন জটিল পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন এবং তার আভ্যন্তরীণ চিত্ররূপ বিশাল সৌর-জগতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে দেখিয়েছেন। পরমাণুর কেন্দ্রীণে অবস্থিত নিউট্রনসহ ধনতড়িৎ-কণা প্রোটনকে ঘিরে ঋণ-তড়িতাহিত ইলেকট্রন-কণিকারা প্রদক্ষিণ করছে; যেমন আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি নিয়ত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই সাদৃশ্যটা সত্যিই বিস্ময়কর! যে পরমাণুর পৃথক সত্তা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না; এত ক্ষুদ্র যে একটা আলপিনের মাথায়ও কোটি কোটি পরমাণুর অবস্থিতি সম্ভব, সেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর অভ্যন্তরে আবার অতি বৃহৎ সৌরমণ্ডলের ছায়া! এ থেকে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একই নিয়ম-সূত্রে গ্রথিত, একই বিধি-বিধানে পরিচালিত, তার আভাস পাওয়া যায়।

পরমাণুর ধন-তাড়িতাহিত কেন্দ্রীণের প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাসমষ্টির চারিদিকে ঋণ-তড়িতাহিত ইলেকট্রন-কণিকারা বিভিন্ন কক্ষপথে নিয়ত প্রদক্ষিণ করছে, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। সমগ্র পরমাণুর তুলনায় তার সংগঠক কণিকাগুলি বহুগুণ ক্ষুদ্রতর ও নিয়ত পরিভ্রমণশীল; কাজেই পরমাণুর অভ্যন্তর-ভাগ অবশ্যই ফাঁপা; আর সেই শূন্যস্থানে ঋণতড়িৎ-কণিকারা ধন-তড়িতাহিত কেন্দ্রীণকে ঘিরে পারস্পরিক আকর্ষণে সৌর পরিবারের মত ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে আছে। পারমাণবিক গঠনের এই সূত্রানুসারে একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণে একটি মাত্র ধন-তড়িৎবিশিষ্ট বস্তু বা শক্তিকণিকা (প্রোটন) রয়েছে, আর তার চারদিকে অপেক্ষাকৃত ব্যবধানে একটিমাত্র ঋণতড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করছে। এখানে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ বা প্রোটন-কণাটিকে মনে করা যায় সূর্য, আর তার চারদিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন-কণাটি যেন আমাদের পৃথিবী। এই এক-জোড়া ইলেকট্রন ও প্রোটন কণিকা নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন-পরমাণু পৃথিবীর যাবতীয় মৌলের মধ্যে লঘুতম পরমাণু। পারমাণবিক ওজনের

হিসাবে হাইড্রোজেনের পরবর্তী ভারী মৌল হলো **হিলিয়াম,** যার কেন্দ্রীণে রয়েছে দুই মাত্রা ধন-তড়িৎ, অর্থাৎ দুটি প্রোটন-কণিকা; আর তার চারদিকে ঘুরছে দুই মাত্রা ঋণ-তড়িৎ বা দুটি ইলেক্ট্রন-কণিকা। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে-কোন পরমাণুর সমগ্র ভর বা ওজন তার কেন্দ্রীণে নিবদ্ধ থাকে বলে ধরা হয়; কারণ,

হাইড্রোজেন-পরমাণু হিলিয়াম-পরমাণু

ইলেকট্রন-কণার ভর অতি নগণ্য, হিসাবে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এর যুক্তি হলো এই যে, ইলেক্‌ট্রনের ভর লঘুতম মৌল হাইড্রোজেন-পরমাণুর ভরেরও 1840 ভাগের এক ভাগ মাত্র। কাজেই যে কোন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রীণের ওজনকেই বস্তুতঃ সমগ্র পরমাণুটার ওজন বলে ধরা যায়। এখন যে-হেতু হিলিয়ামের পারমাণবিক ওজন পাওয়া গেছে হাইড্রোজেনের **চার গুণ ;** কাজেই হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে দুটি মাত্র প্রোটন থাকলে ওজনের হিসাব মেলে না। এ-জন্যে হিলিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণে দুটি প্রোটনের সঙ্গে সম-ভারী, অথচ নিস্তড়িৎ দুটি **নিউট্রন**-কণিকা সংবদ্ধ রয়েছে বলে ধরা হয়েছে; আর বিভিন্ন পরীক্ষায় তার সত্যতার প্রমাণও পাওয়া গেছে। এভাবে দেখা গেল, কেন্দ্রীণে সংবদ্ধ দুটি **প্রোটন** ও দুটি **নিউট্রনের** চারদিকে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় দুটি **ইলেকট্রন** নিয়ে হিলিয়ামের এক-একটি পরমাণু গঠিত।

এভাবে পারমাণবিক ওজনের ক্রম অনুসারে পর্যায়ক্রমে ভারী মৌলগুলির কেন্দ্রীণে এক-একটি প্রোটন-কণিকা বৃদ্ধি পায়; আর সাধারণতঃ প্রাথমিক লঘু মৌলগুলির ক্ষেত্রে সমসংখ্যক ধন-তড়িৎ প্রোটন-কণা ও নিস্তড়িৎ নিউট্রন-কণা কেন্দ্রীণে নিবদ্ধ থাকে; আর তাকে ঘিরে প্রোটনের সমসংখ্যক ঋণতড়িৎ ইলেকট্রন-কণা পৃথক পৃথক কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। হাইড্রোজেন-পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন নেই; কারণ তার কেন্দ্রীণে প্রোটন রয়েছে মাত্র একটি। প্রোটনের সংখ্যা একাধিক হলেই তাদের সংবদ্ধ রাখতে নিউট্রনের দরকার হয়। আগেই বলা হয়েছে, হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে দুটি প্রোটনকে সামলাতে দুটি নিউট্রন রয়েছে। এর ঠিক পরবর্তী ভারী মৌল হলো **লিথিয়াম,** যার পরমাণুর কেন্দ্রীণে রয়েছে তিনটি প্রোটন; কাজেই তাদের সংবদ্ধ রাখতে তিনটি (কখন চারটি, আইসোটোপের ক্ষেত্রে) নিউট্রনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এখানে লক্ষ্য করা দরকার, হাইড্রোজেন

ও হিলিয়াম গ্যাসীয় পদার্থ; আর লিথিয়াম হলো একটা হাল্কা কিন্তু কঠিন ধাতু; একটি মাত্র প্রোটন বৃদ্ধি পাওয়াতেই পদার্থটা গ্যাস থেকে একেবারে কঠিন অবস্থায় এসে গেল! যাহোক, পরমাণুর গঠন-বিন্যাসে কার্বনের কেন্দ্রিণে রয়েছে ছ'টা প্রোটন ও ছ'টা নিউট্রন, নাইট্রোজেনে সাতটা করে, অক্সিজেনে আটটা করে, সালফার বা গন্ধকে ষোলটা করে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। এভাবে ক্রমে বেড়ে-বেড়ে ক্যালসিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণে রয়েছে কুড়িটা প্রোটন ও কুড়িটা নিউট্রন। এর পরবর্তী ভারী মৌলগুলির কেন্দ্রীণে প্রোটনের সংখ্যা যখন কুড়ির বেশি হয়ে যায়, তখন তার সমসংখ্যক নিউট্রন দিয়ে আর কাজ চলে না, নিউট্রনের সংখ্যা প্রোটনের চেয়ে বেড়ে গিয়ে পরমাণুর তথা তার কেন্দ্রীণের স্থায়িত্ব বিধান সম্ভবপর হয়। যেমন, লোহার পরমাণুতে ছাব্বিশটা প্রোটনকে সংবদ্ধ রাখতে দরকার হয়েছে আটাশটা নিউট্রন, দু'টি বেশি; তামার পরমাণুতে উনত্রিশটা প্রোটনের সঙ্গে চৌত্রিশটা নিউট্রন রয়েছে; সোনার পরমাণুতে প্রোটন-সংখ্যা উনআশি—নিউট্রন-সংখ্যা বারোটা বেশি, 91-টা। এভাবে প্রোটনের সংখ্যা যত বেড়ে যায়, অর্থাৎ পদার্থের পারমাণবিক ওজন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তার পরমাণুকে স্থিতিশীল (স্টেব্‌ল) করে রাখার জন্যে নিউট্রনের সংখ্যাও অতিরিক্ত বাড়তে থাকে। এভাবে দৈনন্দিন জীবনের সর্বাধিক ভারী ধাতু সীসার পরমাণুকে স্বপ্রতিষ্ঠ রাখতে তার 82-টি প্রোটনের সঙ্গে দরকার হয় একশ' বাইশ থেকে একশ' ছাব্বিশটি নিউট্রনের (বিভিন্ন আইসোটোপের ক্ষেত্রে)। পরমাণু-কেন্দ্রীণকে স্থিতিশীল রাখতে **নিউট্রনের ক্ষমতা** এখানেই শেষ। কোন মৌলের কেন্দ্রীণে প্রোটনের সংখ্যা বিরাশির (82) বেশি হলে, অর্থাৎ **সীসার চেয়ে** সেটা অধিক ভারী হলে তা আর স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে না; পরমাণুর গঠন-কাঠামো সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। এরূপ অতি-ভারী পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণে যতই নিউট্রন সরবরাহ করা যাক্ না কেন, তার পরমাণু স্থিতিশীল থাকবে না। কিন্তু এর জন্যে কোন বিস্ফোরণ ঘটে না, পরমাণুর গঠন-কাঠামো অতি ধীরে নীরবে ক্রমাগত ভাঙ্গতে থাকে; আর তার সংগঠক প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণিকাসমূহ ধারাকারে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। এ-সব অতিভারী অপ্রতিষ্ঠ মৌলগুলিই হলো তেজস্ক্রিয় বা **রেডিও-অ্যাকটিভ** পদার্থ ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি। এদের স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনের ফলে বিচ্ছুরিত আল্‌ফা, বিটা ও গামা রশ্মির আচার-আচরণ ও গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি।

মৌলের রূপান্তর

মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধীয় উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, পৃথিবীর যাবতীয় মৌলিক পদার্থ বা মৌলের উপাদান শেষ পর্যন্ত একই। পদার্থের পরমাণু মাত্রই প্রধানতঃ প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণিকার সমবায়ে গঠিত—এই কণিকাগুলির সংখ্যাগত বিভিন্নতায় বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে বিচ্ছুরিত কণিকা-ধারা বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ফলে ক্রমাগত বিলুপ্তির মাধ্যমে তাদের মৌলিক রূপান্তর ঘটে; এ-সব বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পরে কোন মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করবার প্রশ্নটিকে আর অলীক বলা যায় না। প্রাচীন কালের কিমিয়াবিদ্ বা অ্যাল্‌কেমিস্টরা পারাকে সোনায় রূপান্তরিত করবার 'পরশ পাথর' আবিষ্কারে বিফল হয়েছেন; কারণ সে-যুগে পদার্থের মূল গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। আজ আমরা জানি, সোনার কেন্দ্রীণে প্রোটন-সংখ্যা উণআশি, আর 91-টা নিউট্রন তাদের সংবদ্ধ করে রেখেছে এবং সেই কেন্দ্রীণের চারদিকে উনআশিটা ইলেকট্রন ঘুরছে। পক্ষান্তরে পারা বা মার্কারি হলো সোনার চেয়েও ভারী—এর কেন্দ্রীণে আশিটা প্রোটন, 120-টা নিউট্রন রয়েছে এবং আশিটা ইলেক্‌ট্রন তাকে ঘিরে পারার পরমাণুর ভিতরে ঘুরছে। কাজেই সোনা ও পারার মধ্যে তফাৎ মাত্র একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও উনত্রিশটি নিউট্রন-কণিকার। পারার পরমাণু থেকে এদের বিচ্যুত করতে পারলে পারা অবশ্যই সোনায় রূপান্তরিত হবে; কিন্তু এই বিচ্যুতির কোন সহজসাধ্য কৌশল উদ্ভাবন করা আজও সম্ভব হয় নি। যদিও অন্য কোন কোন মৌলের এরূপ কৃত্রিম রূপান্তর ঘটানো ইতিমধ্যেই সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক্।

পৃথিবীতে যে-সব সাধারণ মৌল আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করছি, সেগুলি প্রধানতঃ সবই স্থিতিশীল বা স্বপ্রতিষ্ঠ পারমাণবিক সংগঠনে রয়েছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে কোটি কোটি বছরে এগুলি হয় অধিকতর জটিল মৌল ভেঙ্গে, অথবা অপেক্ষাকৃত সরল মৌলিক উপাদানসমূহ পরস্পর জুড়ে গঠিত হয়েছে। কেবলমাত্র তেজস্ক্রিয় মৌলগুলির ক্ষেত্রে আজও দেখা যায়, তাদের পারমাণবিক গঠন স্বয়ংক্রিয় বিভাজন-প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে ক্রমান্বয়ে অপেক্ষাকৃত সরল পারমাণবিক গঠনের মৌলে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়

মৌলগুলির পরমাণুরা অপ্রতিষ্ঠ বা অস্থির। তেজস্ক্রিয় মৌলের ক্ষেত্রে এই রূপান্তর ঘটে জটিল গঠনের অতিভারী মৌল থেকে অপেক্ষাকৃত সরল ও হাল্‌কা মৌলে; যেমন রেডিয়াম বা থোরিয়াম তেজঃ বিকিরণের ফলে শেষ অবধি সীসায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সীসা কখনও সোনায় রূপান্তরিত হয় না; কারণ সীসা সুস্থায়ী পারমাণবিক গঠনের মৌল। তেজস্ক্রিয় অস্থায়ী মৌলের স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর-প্রক্রিয়া মানুষ রোধ করতে পারে না। আবার কোন কোন মৌলের ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও সব স্বপ্রতিষ্ঠ মৌলের (বিশেষতঃ ভারী মৌল-গুলির) প্রত্যক্ষ রূপান্তর ঘটানো এখনও রয়েছে মানুষের সাধ্যাতীত।

কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণ ভেঙ্গে এক মৌল থেকে অপর মৌলে রূপান্তর প্রথম ঘটিয়েছিলেন লর্ড **রাদারফোর্ড** 1919 খৃষ্টাব্দে। আমরা জানি, পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরভাগে যথেষ্ট শূন্যস্থান রয়েছে; প্রোটন ও নিউট্রনের অতি ক্ষুদ্র পিণ্ড বা কেন্দ্রীণকে ঘিরে ইলেক্‌ট্রন-কণিকারা বিভিন্ন কক্ষপথে সেই শূন্যস্থানে ঘুরছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন রেডিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণে নির্গত আল্‌ফা-রশ্মির তীব্রগতি কণিকা-ধারা চালিয়ে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেন-পরমাণুদের উপরে আঘাত হানবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অতি-সূক্ষ্ম আল্‌ফা-কণিকারা সরল রেখায় সবেগে ধাবিত হয়ে অধিকাংশই নাইট্রোজেন-পরমাণুগুলির অভ্যন্তরস্থ শূন্যস্থান ভেদ করে চলে যায়। কেবল তার সামান্য কয়েকটি মাত্র আল্‌ফা-কণিকা ইতস্ততঃ কয়েকটি নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণকে সোজাসুজি আঘাত হেনে ভাঙ্গতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ কেন্দ্রীণের স্বপ্রতিষ্ঠ গঠন বিপর্যস্ত করে তার সংগঠক দু-একটি কণিকা বার করে দেয়। এর ফলে নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণ থেকে কয়েকটি প্রোটন ও নিউট্রন কণিকা বিচ্যুত হয়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন পরমাণু গঠিত হয়, যার পারমাণবিক ওজন 17। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই নবগঠিত পদার্থটা হলো অক্সিজেনের একটি স্বপ্রতিষ্ঠ **আইসোটোপ**। (আইসোটোপ সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো)। এভাবে আল্‌ফা-কণিকার আঘাত হেনে ক্রমে আরও অনেকগুলি হাল্‌কা মৌলের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এর পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেন স্যার জেম্‌স্ চ্যাড্‌উইক; তিনি প্রমাণ করেন, আল্‌ফা-কণিকার আঘাতে **বেরিলিয়াম** নামক মৌলের রূপান্তরে উৎপন্ন হয় কার্বন; কিন্তু এক্ষেত্রে প্রোটনের বিচ্যুতি ঘটে না, বেরিলিয়ামের পরমাণু-কেন্দ্রীণ থেকে বেরিয়ে যায় কেবল নিস্তড়িৎ নিউট্রন-কণিকা। নিউট্রন-কণিকারা প্রোটনের

চেয়েও অত্যধিক গতিশীল ও বিভিন্ন পদার্থ ভেদ করবার শক্তিসম্পন্ন; আবার তড়িৎবিহীন বলে কেন্দ্রীণের ধন-তড়িতের প্রভাবে নিউট্রন-কণিকারা বিকর্ষিত (রিপেল্‌ড) হয় না; কাজেই প্রোটনের (আল্‌ফা-কণিকার) চেয়ে নিউট্রন-কণিকারা অধিকতর দ্রুত গতিতে যে-কোন পরমাণু-কেন্দ্রীণ ভেদ করতে পারে। পদার্থের পরমাণু বিদারণ ও নূতন পরমাণুর উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় নিউট্রন-কণিকারা তাই সর্বাধিক শক্তিশালী ও সবিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিউট্রন কণিকার আঘাতে পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি বিপর্যস্ত হয়ে এক পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে অন্য পদার্থের পরমাণুতে সহজে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কোন কোন প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থের ভিতরে আজও এরূপ রূপান্তর-ক্রিয়া হয়তো স্বভাবতঃই ঘটে চলেছে।

কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের রূপান্তর ঘটানোর জন্যে **সাইক্লোট্রন** নামক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে, যার অভ্যন্তরস্থ শক্তিশালী তড়িৎ-ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রোটন ও **ডয়টেরন** (ডয়টেরিয়ামের ধন-তড়িতাহিত কেন্দ্রীণ, 'আইসোটোপ' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য) কণিকার গতি অত্যধিক ত্বরান্বিত করা হয়। যাহোক, সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে আল্‌ফা-কণিকা, নিউট্রন, প্রোটন,

পরমাণু-কেন্দ্রীণ বিদারণের জন্যে উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রন যন্ত্র

ডয়টেরন প্রভৃতি দ্রুতগতিশীল কণিকার সংঘাতে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিদীর্ণ করে পদার্থের মৌলিক রূপান্তর সাধন সম্ভব হয়েছে; এমন কি, এই যন্ত্রে নূতন তেজস্ক্রিয় মৌলও উৎপাদন করা গেছে, যা স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলের (রেডিয়াম, র‍্যাডন প্রভৃতির) মত **রেডিও-থেরাপি** চিকিৎসায় ব্যবহার

করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রাচীন যুগের অ্যালকেমিস্টরা পদার্থের গঠন সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে পদার্থের রূপান্তর সাধনের জন্যে যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল সত্য; কিন্তু আধুনিক অ্যাল্‌কেমিস্টদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি ও সুনির্দিষ্ট সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে,—পদার্থের মৌলিক গঠন ও রূপান্তর সাধন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তথ্যাদি আজ প্রায় সবই জানা গেছে। সীসা বা পারদকে প্রত্যক্ষভাবে ও লাভজনক পরিমাণে সোনায় রূপান্তরিত করা যদিও আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিভিন্ন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এরূপ মৌলিক রূপান্তর কোন-কোন ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে লক্ষ্য করা গেছে। মোট কথা, এ-যুগে পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ ও পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে প্রায় সম্যক জ্ঞান আমরা লাভ করেছি এবং কোন-কোন মৌলের স্থায়ী রূপান্তর সাধন ও নূতন মৌলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সব চেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে, পদার্থের তথা তার পরমাণুদের অভ্যন্তরে যে অপরিমিত শক্তি লুক্কায়িত আছে তারও সন্ধান আমরা পেয়েছি। অদূর ভবিষ্যতে পদার্থের এই পারমাণবিক শক্তি আহরণ ও ব্যবহার করে সমগ্র মানব-সমাজের জীবন-ধারাই হয়তো পরিবর্তিত হবে—হয় ধ্বংসের পথে, নয়তো শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথে। এই পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করবো।

আইসোটোপ

মৌলের রূপান্তর প্রসঙ্গে নাইট্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রীণ বিদারণের ফলে 'অক্সিজেন-17' আইসোটোপের উৎপত্তির কথা আমরা আগেই বলেছি; আইসোটোপ জিনিসটা কি, সেটা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। বস্তুতঃ বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকেই পরমাণুর, তথা পদার্থের মৌলিক গঠন সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের গণ্ডি দ্রুত বাড়তে থাকে। নানা রকম বৈদ্যুতিক পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বৃটিশ বিজ্ঞানী **টমসন** ও **অ্যাস্টন** বিভিন্ন মৌলের ধন-তড়িতাহিত কেন্দ্রীণের ভর (ইলেকট্রনের নগণ্য ভরকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে যাকে বস্তুতঃ পরমাণুর ভর বা ওজন বলা যায়) সুনির্দিষ্ট-ভাবে নিরূপণ করেন। তাঁরা দেখান যে, অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন 16 ধরে হিসাব করলে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মৌলের পারমাণবিক ওজন (বা কেন্দ্রীণের ভর) প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই এক-একটি পূর্ণ সংখ্যা হয়; যেমন—

হিলিয়ামের 4, কার্বনের 12, নাইট্রোজেনের 14 প্রভৃতি। তড়িচ্চৌম্বকীয় পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত পারমাণবিক ওজনের এ-সব সংখ্যা রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত সংখ্যার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যে সব মৌলের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত পারমাণবিক ওজনের সংখ্যা ভগ্নাংশ হয়ে পড়ে তাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন যে, এ-সব মৌলের পরমাণুরা সর্বাংশে অনুরূপ নয়, তারা একই গোত্রীয় বিভিন্ন পরমাণুর সংমিশ্রণে গঠিত এবং তাদের প্রত্যেকের পারমাণবিক ওজন বা ভর অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যায় রয়েছে। এই যুক্তি প্রথমে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণিত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে ক্লোরিনের পারমাণবিক ওজন পাওয়া যায় 35·46 (অক্সিজেনের পারমাণবিক ওজন 16 ধরে তুলনা করলে)। 'ধনতড়িৎ-রশ্মি বিশ্লেষণ' (**positive ray analysis**) পদ্ধতির সাহায্যে অ্যাস্টন দেখান, সাধারণ ক্লোরিন গ্যাস দু' রকম ক্লোরিন-পরমাণুর সংমিশ্রণ, যার একটির পারমাণবিক ওজন 35 এবং অপরটির 37; আর সাধারণতঃ এই দু'রকম পরমাণু মোটামুটি 3 ভাগ ও 1 ভাগ অনুপাতে মিশ্রিত থাকে। রাসায়নিক কোন প্রক্রিয়ায়ই এই দু' রকম পরমাণুর মধ্যে কোন প্রভেদ ধরা যায় না, উভয়ই ক্লোরিন। এই দু'রকম ক্লোরিনকে তাই বলা হয় ক্লোরিনের **আইসোটোপ**—ক্লোরিন-35 ও ক্লোরিন-37।

তেজস্ক্রিয় বা রেডিও-অ্যাক্টিভ পদার্থের ক্ষেত্রেই অবশ্য আইসোটোপের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল। তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু-কেন্দ্রীণের গঠন ও তা থেকে বিকিরিত বিভিন্ন ধরনের কণিকার গতি-প্রকৃতি ও তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে-কোন মৌলের পারমাণবিক ওজন তার কেন্দ্রীণের ভরের সমান; কেন্দ্রীণের চারদিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন-কণিকাগুলির ভর বা ওজন বস্তুতঃ কিছুই নয়। অপর পক্ষে মৌলের রাসায়নিক গুণ ও ধর্ম নির্ভর করে ঐ ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন-কণিকাগুলির সংখ্যার উপরে, অর্থাৎ কেন্দ্রীণের সংগঠক প্রোটন-কণিকার ধনতড়িৎ-বিভবের উপরে। কাজেই কোন পরমাণুর কেন্দ্রীণে যদি একটি নিউট্রন-কণিকা কোন উপায়ে প্রবেশ করানো যায় তাহলে পরমাণুটির ভর বা ওজন এক একক বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু তার কেন্দ্রীণের ধনতড়িৎ-বিভবের কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কাজেই তার রাসায়নিক গুণ ও ধর্মও অপরিবর্তিত থাকবে। সাধারণ ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো 17; কিন্তু তার উল্লিখিত দু'রকম আইসোটোপের ক্ষেত্রে একটার কেন্দ্রীণে 18-টা নিউট্রন ও 17-টা প্রোটন থাকে; আর অপরটার কেন্দ্রীণে থাকে 20-টা নিউট্রন ও

17-টা প্রোটন। বিশেষ পরীক্ষায় দেখা গেছে, কেন্দ্রীণের প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার বিভিন্নতা হেতু অধিকাংশ প্রাকৃতিক মৌলের মধ্যেই এরূপ একাধিক আইসোটোপ রয়েছে ; কিন্তু তাদের পৃথক করা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃসাধ্য।

ডয়টেরিয়াম ও হেভি ওয়াটার : 1932 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার অধ্যাপক উরে একটি অতি চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, সাধারণ **হাইড্রোজেন** গ্যাস দু'রকম আইসোটোপের সংমিশ্রণ। হাইড্রোজেনের এই আইসোটোপ দু'টির একটি অপেক্ষাকৃত অধিকতর হাল্‌কা, যার পারমাণবিক ওজন হলো এক ; আর অপেক্ষাকৃত ভারী আইসোটোপটির পারমাণবিক ওজন হলো 2, যার কেন্দ্রীণে রয়েছে একটি নিউট্রন ও একটি প্রোটন। আমরা আগেই বলেছি, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন এক ; সুতরাং তার পরমাণু-কেন্দ্রীণে কোন নিউট্রন থাকে না। সাধারণ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এ-কথা প্রযোজ্য। অধ্যাপক উরের আবিষ্কৃত হাল্‌কা হাইড্রোজেন আইসোটোপটি এরূপ ; আর তা-ই সাধারণতঃ হাইড্রোজেন নামে পরিচিত। হাইড্রোজেনের ভারী আইসোটোপটির নাম দেওয়া হয়েছে 'হেভি হাইড্রোজেন' বা **ডয়টেরিয়াম**, যার পারমাণবিক ওজন 2। অন্যান্য সব অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলের বিভিন্ন আইসো-টোপের মধ্যে গুণ ও ধর্মের তেমন বিশেষ কোন বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না ; কিন্তু হাইড্রোজেনের এই ভারী আইসোটোপ 'ডয়টেরিয়াম' সাধারণ হাইড্রোজেন থেকে গুণ ও ধর্মে অনেকাংশে বিভিন্ন। এটা অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ ডয়টেরি-য়ামের পারমাণবিক ওজন সাধারণ হাইড্রোজেনের দ্বিগুণ। হাইড্রোজেন চেয়ে ডয়টেরিয়ামের রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি অনেক কম ; আর তাই ডয়টে-রিয়ামের যৌগিক, বিশেষতঃ অক্সিজেন-যৌগিক D_2O সাধারণ হাইড্রোজেনের অনুরূপ যৌগিক H_2O অপেক্ষা অনেক কম ক্রিয়াশীল। ডয়টেরিয়াম-অক্সাইড D_2O-কে বলা হয় **ভারী জল** ; হাইড্রোজেন-অক্সাইড H_2O হলো সাধারণ জল। ডয়টেরিয়াম-অক্সাইড বা ভারী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (ডেন্সিটি) 1·11, অর্থাৎ হাইড্রোজেন-অক্সাইড বা জলের গুরুত্ব অপেক্ষা শতকরা 11 ভাগ বেশি। এই ভারী জলের দ্বারা প্রাণী-দেহে প্রয়োজনীয় জলের কাজ সিদ্ধ হয় না ; সাধারণ জলে তা রূপান্তরিতও হয় না। দেখা গেছে, ভারী জলে ব্যাঙাচি রাখলে অল্প কালের মধ্যেই তা মরে যায়। অবশ্য সাধারণ জল, যা আমরা ব্যবহার করি, তা-ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন-অক্সাইড, H_2O, নয় ; সামান্য ভারী জল বা ডয়টেরিয়াম-অক্সাইড তাতে স্বভাবতঃই মিশ্রিত থাকে।

তবে জীব-জগতের সৌভাগ্য এই যে, তার পরিমাণ অতি নগণ্য; স্বাভাবিক জলের প্রায় সাত হাজার ভাগে এক ভাগ মাত্র ভারী জল থাকে। ভারী জল নিয়ে নানা গুরুত্বপুর্ণ গবেষণা হয়েছে এবং বহু জটিল ও চমকপ্রদ তথ্যাদি পাওয়া গেছে; সে-সব আলোচনা অবশ্য এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ যে একাধিক আইসোটোপের সংমিশ্রণের আকারে রয়েছে তা তাদের পারমাণবিক গঠন-তত্ত্বের দিক থেকেই কেবল গুরুত্ব-পূর্ণ নয়; বহু রাসায়নিক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণায়ও আইসোটোপের ব্যবহার ও কার্যকারিতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মৌলের আইসোটোপগুলি ব্যবহৃত হয় অনুসন্ধানকারী (ট্রেসার) মৌল হিসাবে। এর অর্থ হলো, কার্বন, নাইট্রোজেন বা ফস্‌ফরাস ঘটিত কোন খাদ্য-বস্তু বা যৌগিক পদার্থ যদি কোন মৌলের স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত আইসোটোপের রাসায়নিক সংযোগে উৎপাদিত হয় এবং তা যদি প্রাণী-দেহে প্রবেশ করানো যায়,তাহলে দেহাভ্যন্তরে সেই আইসোটোপ-যৌগিকের গতিপথ নির্ধারণ করা যায় 'গাইগার কাউন্টার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে। এভাবে দেখা গেছে, কোন খাদ্যের সঙ্গে ফস্‌ফরাস-আইসোটোপ সামান্য মাত্রায় মিশিয়ে কোন লোককে গলাধঃকরণ করালে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লোকটির দেহের হাড়ের ভিতরে সেই ফস্‌ফরাস অনুপ্রবেশ করেছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির বিশেষ সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। কোন মৌলের আইসোটোপগুলি রাসায়নিক বিচারে পরস্পর অনুরূপ হলেও বিভিন্ন ভৌত পদ্ধতিতে তাদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, বিশেষতঃ যদি সেই আইসোটোপগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের হয়। এরূপ ক্ষেত্রে 'ট্রেসার' বা অনুসন্ধানকারী মৌল হিসাবে বিভিন্ন আইসোটোপের উপযোগিতা আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অনেক মৌলের আইসোটোপগুলি সুপ্রতিষ্ঠ (স্টেবল) ও স্থায়ী; কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের আইসোটোপগুলি অনেকটা অপ্রতিষ্ঠ ও স্বল্পস্থায়ী, তাদের স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন মাত্র। ইদানিং **সাইক্লোট্রন** যন্ত্র, বিশেষতঃ পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদক চুল্লী বা **রিয়্যাক্টর** যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ মৌলগুলিরও অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কিছু কিছু উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে উৎপাদিত তেজস্ক্রিয় আইসো-টোপের মধ্যে কার্বন-14 (C^{14}), সালফার-35 (S^{35}), আয়োডিন-131 (I^{131}) প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মৌলের নামের সংলগ্ন সংখ্যাটিতে

তার পারমাণবিক ওজন বুঝাচ্ছে। এই কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয় মৌলগুলি কেবল 'ট্রেসার' মৌল হিসাবেই নয়, পরন্তু বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায়ও বিশেষ ফলপ্রদ হয়ে উঠেছে। ফসফরাসের একটি কৃত্রিম তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ দুরারোগ্য 'লিউকেমিয়া' রোগের চিকিৎসায় একটি সার্থক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আয়োডিনের তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপও কোন-কোন রোগে বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তি

পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণের সংগঠক কণিকাগুলি (প্রোটন ও নিউট্রন) অতি প্রবল শক্তির বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীণের এই কণিকা-বন্ধন কোন উপায়ে শিথিল করতে পারলে তার সংগঠক কণিকাগুলির বিচ্ছুরণ বা তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীণের রূপান্তর ঘটে এবং সেই সঙ্গে তার অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত শক্তির উৎস খুলে যায়। প্রত্যেকটি পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিভাজন বা ভাঙ্গার ফলে পদার্থ-কণিকা শক্তি-কণিকারূপে বিকিরিত হয়ে গিয়ে পদার্থের ভর কমে। মোট কথা, এভাবে পদার্থের আংশিক বিলুপ্তি ঘটে, আর সেই লুপ্ত পদার্থই শক্তি-কণিকারূপে বিচ্ছুরিত হয়।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন গত 1905 খৃষ্টাব্দে তাঁর আপেক্ষিকতা-সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, পদার্থ ও শক্তির মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নেই ; পদার্থের বিলুপ্তিতে শক্তির উদ্ভব, আর শক্তির কেন্দ্রীভূত স্থিতিতে পদার্থের সৃষ্টি। এই তথ্যের ভিত্তিতে সূর্য থেকে ক্রমাগত তাপ-শক্তির বিকিরণ বস্তুতঃ সৌর দেহের সংগঠক পদার্থের বিলুপ্তি বা রূপান্তর বলে মনে করা যায় ; অবশ্য সৌর দেহের সেই লুপ্ত পদার্থ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আবার পুনর্গঠিত হয় বলে সূর্য অনাদিকাল ধরে প্রায় সমান শক্তিধর রয়েছে। যাহোক, পদার্থের, অর্থাৎ তার পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিভাজন-জনিত বিলুপ্তি বা রূপান্তরের ফলে যে অপরিমেয় শক্তির বিমুক্তি ঘটে তার ধারণা করাও দুঃসাধ্য ; মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে যে, মাত্র এক আউন্স পদার্থ সম্যকরূপে শক্তিতে রূপান্তরিত হলে তাতে উদ্ভূত তাপ-শক্তির প্রভাবে প্রায় দশ লক্ষ টন জল মুহূর্তে বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে। এ থেকে বুঝা যায়, পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিভাজনে যে বিপুল শক্তি বিমুক্ত হয় তার তুলনায় সমপরিমাণ পদার্থের বিস্ফোরণ-জনিত শক্তিশালী রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিমুক্ত শক্তির পরিমাণও অতি নগণ্য। এর মূল কারণ,

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর বহিরাবরণের ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন-কণিকাগুলিই কেবল অংশ গ্রহণ করে; কেন্দ্রীণে পুঞ্জীভূত বিপুল শক্তির বিমুক্তি বা রূপান্তর ঘটে না। অবশ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বয়ংক্রিয় কেন্দ্রীণ-বিভাজন ও স্বতঃস্ফূর্ত
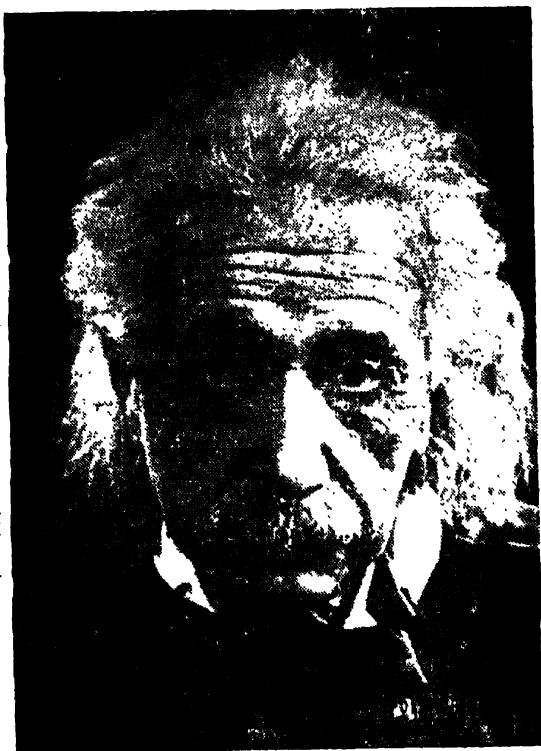
মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

শক্তি-বিকিরণের কথা স্বতন্ত্র। তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্বয়ংক্রিয় বিভাজনের উপরে মানুষের কোন হাত নেই; এদের থেকে ধীরে ধীরে নীরবে বিপুল শক্তির বিকিরণ সর্বদা ঘটেই চলে।

পদার্থের সংগঠক পরমাণুদের অভ্যন্তরে অপরিমেয় স্থিতি-শক্তি বা পারমাণবিক শক্তি সঞ্চিত রয়েছে, এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বিজ্ঞানীরা এই শক্তি আহরণ করে কাজে লাগাবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হয়ে ওঠে যে, পরামাণুর অভ্যন্তরস্থ অতিসূক্ষ্ম

কণিকা-বিন্যাসে (তখনও অজ্ঞাত) যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নিহিত আছে তার তুলনায় পৃথিবীর যাবতীয় জ্বালানীর সমকালীন ও সামগ্রিক দহন-শক্তিও অতি নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। এই শক্তিকে যদি ইচ্ছানুযায়ী বিমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায় তাহলে পৃথিবীর কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি প্রাকৃতিক জ্বালানী-সম্পদ সম্যক নিঃশেষিত হয়ে গেলেও মানুষের শক্তির অভাব ঘটবে না। পক্ষান্তরে এই বিপুল শক্তি করায়ত্ত হলে, আর মানুষ তাকে অকল্যাণের পথে চালিত করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, মানব-জাতির বিপর্যয় ঘটবে। এই জল্পনা-কল্পনা দীর্ঘ দিন ধরে চলেছে; কিন্তু 1939 খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত পরমাণুকে বিভাজিত করে শক্তির নিয়ন্ত্রিত বিমুক্তি ঘটানো সম্ভব হয় নি, আর তাই বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত আশা বা আশঙ্কা বহু দিন কল্পনাতেই থেকে গেছে।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিপুল উৎসাহে পরমাণু-শক্তির গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। আমরা জানি, লর্ড রাদারফোর্ড 1919 খৃষ্টাব্দে আল্‌ফা-কণিকার আঘাতে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীণ বিদারণ করে অক্সিজেনের একটি আইসোটোপ (অক্সিজেন-17) গঠন করেছিলেন (পৃষ্ঠা 363); কিন্তু তাঁর প্রক্রিয়ায় বহু সহস্র আল্‌ফা-কণিকার মধ্যে হয়তো একটি মাত্র কণিকা নাইট্রোজেন-পরমাণুদের কোন একটির কেন্দ্রীণ বিদারণে সক্ষম হতো। এর ফলে কিছু শক্তির উদ্ভব হতো বটে, কিন্তু এভাবে সামান্য দু'চারটা পরমাণু ভেঙ্গে যে পরিমাণ শক্তি বিমুক্ত হতো তার চেয়ে আঘাতকারী আল্‌ফা-কণিকা উৎপাদনে শক্তি ও সময় ব্যয়িত হতো অনেক বেশি; কাজেই এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি আহরণের চেষ্টা বিফল হলো। কোন দাহ্য পদার্থ এক বার জ্বালিয়ে দিলে তা যেমন ধারাবাহিকভাবে জ্বলতে থাকে, তেমনি একটা পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিদারণে যে শক্তি উদ্ভূত হয় তার প্রভাবে সন্নিহিত পরমাণুগুলিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পর্যায়ক্রমে ভাঙ্গতে থাকবে, আর মুহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ পরমাণু ভেঙ্গে পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি সামগ্রিকভাবে বিপুল পরিমাণে বিমুক্ত হবে; এরূপ কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করবার জন্যে গবেষণা চলতে থাকে।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা পরমাণু-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে নানাভাবে গবেষণা করছিলেন। ইটালীয় বিজ্ঞানী এনরিকো **ফার্মি** নিউট্রন-কণিকার সংঘাতে ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীণ ভেদ

করতে সক্ষম হন। এর ফলে নিউট্রন-কণিকা প্রোটনে পরিবর্তিত হয়ে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীণের প্রোটন-সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়; আর তাতে ইউরেনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণে স্বাভাবিক 92-টি প্রোটনের স্থলে 93-টি প্রোটনের উৎপত্তি হয়ে তার মৌলিক রূপান্তর ঘটায় এবং একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই নবগঠিত 93-টি প্রোটনযুক্ত মৌলটির নাম দেওয়া হয় **প্লুটোনিয়াম।** ফার্মির এই যুগান্তকারী পরীক্ষার ফলাফল প্রচারিত হয় 1934 খৃষ্টাব্দে। পরমাণুর কেন্দ্রীণ বিদারণে নিউট্রনের এরূপ অমোঘ শক্তির পরিচয় জেনে বিজ্ঞানীরা বিশেষ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং বছর পাঁচেক গবেষণার পরে পরমাণু-বিজ্ঞানের এক নূতন দিগন্ত দেখা দেয় 1939 খৃষ্টাব্দে। পরমাণু-বিদারণের কাজে রাদারফোর্ডের
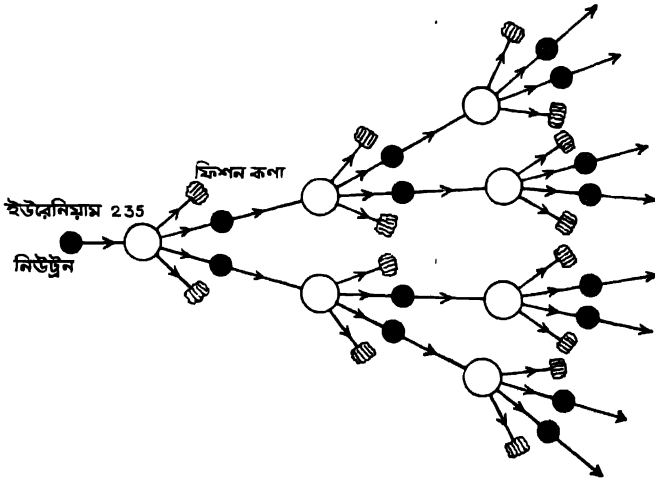
ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীণ বিভাজন-প্রক্রিয়া বা 'চেইন রিঅ্যাক্সন'

আল্ফা-কণিকা বা প্রোটনের বদলে ফার্মির প্রদর্শিত পথে, অর্থাৎ নিউট্রন-কণিকার সংঘাতে ইউরেনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণকে দ্বি-খণ্ডিত করা অবশেষে সম্ভব হলো। এ-কাজে বিশ্ববিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীলস বোর-এর তত্ত্বাবধানে জার্মান বিজ্ঞানী লাইজ মার্টিনার ও অটো ফ্রিশ সাফল্য লাভ করেন। অদ্ভুত কৌশলে ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীণের উপরে নিউট্রন-কণিকার আঘাত হানা হয় মুহুর্মুহু; যার ফলে তার কেন্দ্রীণ থেকে এবারে কোন কণিকা ছিটকে বেরয় না, ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীণটি সম্পূর্ণ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ফল এই পাওয়া গেল যে, একটি ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীণের ঐরূপ **দ্বিখণ্ড-করণ** প্রক্রিয়াকালে **ত্ব'টি নিউট্রন** বিমুক্ত হয়; আর তারা আবার সন্নিহিত আর ত্ব'টি পরমাণুর কেন্দ্রীণকে আঘাত হেনে দ্বিখণ্ডিত করে। এভাবে কেন্দ্রীণ-বিভাজন ও নিউট্রন সৃষ্টির ব্যাপার ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে; একেই ইংরেজীতে বলে **চেইন রিঅ্যাকসন।** নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ামের প্রত্যেকটি কেন্দ্রীণ বিভাজিত হয়ে প্রচুর শক্তি বিমুক্ত হয়, আর মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ পরমাণু ভেঙ্গে যে বিপুল শক্তি নির্গত হয় তার সামগ্রিক পরিমাণ অতি ভয়াবহ। মাত্র 1 গ্র্যাম ইউরেনিয়াম এই প্রক্রিয়ায় বিদীর্ণ করলে তা থেকে কমপক্ষে কুড়ি টন গ্যাসোলিনের (মোটর-স্পিরিটের) জ্বালানী-শক্তির সমান শক্তি বিমুক্ত হয় বলে মোটামুটি হিসাবে বলা যায়। পারমাণবিক শক্তির পরিমাণের হিসাব বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অনেকদিন আগেই দিয়েছিলেন, $E=mc^2$; অর্থাৎ পরমাণু ভেঙ্গে পদার্থের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটালে যে শক্তির (E) উদ্ভব ঘটবে তার পরিমাণ হবে পদার্থটির ভরকে (m) আলোকের গতি-বেগের ($c^2=1,86,000^2$) বর্গ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত শক্তি-একক। পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ কি বিরাট তা এই হিসাব থেকে ধারণা করা যেতে পারে।

পারমাণবিক-শক্তি অর্জন করবার জন্যে বিপুল উদ্যম ও অর্থব্যয়ে যে বহুমুখী গবেষণা হয়েছে এবং যে-সব তথ্যাদির সন্ধান মানুষ পেয়েছে তার নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র এখানে বলা হলো। নিউট্রনের সংঘাতে যে ইউরেনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণ বিদারণের কথা বলা হলো তার ভিতরেও কত সমস্যা! পৃথিবীতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে ইউরেনিয়ামের ত্বটি **আইসোটোপ** ইউরেনিয়াম-235 ও ইউরেনিয়াম-238 স্বভাবতঃই মিশ্রিত থাকে; শেষোক্ত ভারী আইসোটোপটির পরিমাণই বেশি, প্রতি হাজার পরমাণুর মধ্যে 993-টিই হলো ইউরেনিয়াম-238। ইউরেনিয়ামের এই ভারী আইসোটোপটি বিদারণ-ক্ষম নয়; কারণ এর পরমাণু-কেন্দ্রীণের মধ্যে তিনটি নিউট্রন অতিরিক্ত রয়েছে, আর তাই বহিরাগত নিউট্রনের আঘাতে তা দ্বিখণ্ডিত হয় না, বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতাও বজায় থাকে না। ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীণ-বিভাজনের বিক্রিয়ায় পূর্বোল্লিখিত স্বয়ংক্রিয় ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে অপেক্ষাকৃত হাল্কা আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-235 চাই। কিন্তু প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে এর পরিমাণ অতি কম, হাজার পরমাণুর মধ্যে সাতটি মাত্র,

আর এদের আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে বিক্রিয়ায় বাধাদানকারী 993-টি ইউরে-নিয়াম-238 আইসোটোপের পরমাণু। এই ভারী আইসোটোপটিকে হাল্কা আইসোটোপ ইউরেনিয়াম-235এ (যেটি দরকার) রূপান্তরিত করাও দুঃসাধ্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে বহু পরীক্ষার পরে জানা যায়, এই প্রাকৃতিক মিশ্র-ইউরেনিয়ামের উপরে প্রাথমিক যে নিউট্রন-কণিকার ধারা বর্ষণ করা হবে তার গতিবেগ কমিয়ে ফেলা দরকার। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ধীরগতি নিউট্রন-কণিকা ইউরেনিয়াম-238-এর উপরে বিশেষ কাজ করে না, হাল্কা ইউরেনিয়াম-235-এর পরমাণু-কেন্দ্রীণগুলিকেই বিভাজিত করে বেশি। প্রচণ্ড বেগবান নিউট্রনের গতি স্তিমিত করবার জন্যে **মডারেটর** হিসাবে বেরিলিয়াম ও ভারী জল (পৃঃ 367) ব্যবহার করা হয়। ভারী জলের গঠনে ভারী-হাইড্রোজেন অর্থাৎ হাইড্রোজেন-2 আইসোটোপ (যাকে বলে **ডয়টেরন**) থাকে ; নিউট্রনের গতিবেগ মন্দীভূত করতে এর প্রভাব যথেষ্ট। যাহোক, এ-সব মডারেটর মিশিয়ে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের (যাতে ইউরেনিয়াম-238 ও ইউরেনিয়াম-235 দুই-ই রয়েছে) উপরে নিউট্রনের ধারা নিক্ষেপ করলে তার কেন্দ্রীণের বিদারণ-প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে চলে (চেইন রিঅ্যাকসন) এবং মুহূর্তে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত হয়।

এভাবে বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি, নীলস বোর প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টায় ও বিপুল অর্থব্যয়ে আমেরিকায় সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণু বিদারণের বিক্রিয়া ঘটিয়ে সর্ব প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরক বোমা প্রস্তুত হয় 1945 খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে। পদার্থের সংগঠক পরমাণুদের অভ্যন্তরে যে অপরিমেয় শক্তি সঞ্চিত রয়েছে তার বিমুক্তি ঘটাবার এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এক চরম নিদর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই শক্তির প্রথম ব্যবহার বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে 1945 খৃষ্টাব্দের 6-ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমাতে, পারমাণবিক (অ্যাটমিক) বোমার বিস্ফোরণে। একটি মাত্র বোমার বিস্ফোরণে যে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা ঘটেছিল মুহূর্ত মধ্যে, মানব-জাতির ইতিহাসে তার তুলনা নেই। একটি অ্যাটম বোমার ধ্বংস-শক্তি কমপক্ষে 20,000 টন টি-এন-টি প্রভৃতি উচ্চ বিস্ফোরক পদার্থের সমান, যাতে প্রায় দশ লক্ষ ডিগ্রি-সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে আশেপাশের প্রায় দশ বর্গ মাইল অঞ্চলের সবকিছু জ্বলে-পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আরও মারাত্মক হলো, পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণে আল্‌ফা ও বিটা কণিকা, শক্তিশালী গামারশ্মি ও রঞ্জনরশ্মি উদ্‌গত হয়ে আকাশ

বাতাস তেজস্ক্রিয় করে ফেলে; যার ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ সেখানকার জীব-জগতে বিপর্যয় চলতে থাকে। মুহূর্ত মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির এই যে ভয়াবহ বিকাশ ঘটে, তা মূলতঃ নিউট্রনের সংঘাতে আপাত শক্তিহীন ইউরেনিয়াম-পরমাণুর কেন্দ্রীণ বিদারণের ফলেই উদ্ভূত হয়।

ফিসন ও ফিউসন: পারমাণবিক শক্তি বিমুক্ত করবার যে প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম তার মূল কথা হলো পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রীণের বিদারণ; যাকে ইংরেজীতে বলে **ফিসন**। যে-সব মৌলের পারমাণবিক ওজন অপেক্ষাকৃত বেশি, অর্থাৎ অধিক সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রনের সমবায়ে গঠিত কেন্দ্রীণটি যাদের যথেষ্ট ভারী, সে-সব মৌলই বিদারণ-ক্ষম; যেমন, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা গেল। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, যে-সব মৌলের পারমাণবিক ওজন রূপা বা সিল্‌ভার (পাঃ ওঃ 107·88) থেকে বেশি, উপযুক্ত কৌশলে তাদেরই পরমাণু ভাঙ্গা যেতে পারে, অর্থাৎ তাদের উপরে 'ফিসন' প্রক্রিয়া সম্ভব। আর রূপার চেয়ে হাল্‌কা মৌলগুলি থেকে শক্তি পেতে হলে কেন্দ্রীণ বিদারণ করলে চলবে না, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীণ সংযোজন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাকে ইংরেজিতে বলে **ফিউসন**। এ-কথার অর্থ হলো, কোন হাল্‌কা মৌলিক পদার্থের দুটি কেন্দ্রীণকে পরস্পর জুড়ে দিতে পারলে একটি নূতন পদার্থের সৃষ্টি হবে এবং সেই সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ শক্তি বিমুক্ত হয়ে যাবে।

আমরা জানি, যে-কোন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণু-কেন্দ্রীণ এক বা একাধিক প্রোটন ও নিউট্রনের সমবায়ে গঠিত; কেবল (সাধারণ) হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণে নিউট্রন নেই। প্রোটনের ধন-তড়িৎ বিভবের জন্যে সমগ্র কেন্দ্রীণটি হলো ধন-তড়িতাহিত; কারণ নিউট্রনের কোন তড়িৎ-বিভব থাকে না। কাজেই কেন্দ্রীণ-সংযোজন বা 'ফিউসন' প্রক্রিয়ার প্রধান সমস্যা হলো, সমতড়িৎ-বিভবের দুটি কেন্দ্রীণকে পরস্পর কাছাকাছি আনতে গেলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে, জুড়তে চায় না। আগেই বলা হয়েছে, কেবল হাল্‌কা পরমাণুর ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীণ-সংযোজন সম্ভব, ভারী হলে নয়। এজন্যে সবচেয়ে হাল্‌কা মৌল হাইড্রোজেন নিয়েই ফিউসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রীণে একটি মাত্র প্রোটন রয়েছে, কাজেই এর তড়িৎ-বিভবও সব চেয়ে কম, পরস্পর বিকর্ষণের পরিমাণও তাই সর্বনিম্ন। কিন্তু এ-সব সুবিধা সত্ত্বেও সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণু-কেন্দ্রীণের ফিউসন

বা সংযোজন নানা কারণে সম্ভব হলো না। তখন বহু পরীক্ষার পরে হাইড্রোজেনের দুটি আইসোটোপ হাইড্রোজেন-2 (ডয়েটেরিয়াম) ও হাইড্রোজেন-3 (ট্রাইটিয়াম) নিয়ে তাদের ফিউসন বা সংযোজন-ক্রিয়া সফল হলো। এর কারণ, এই আইসোটোপ দুটির কেন্দ্রীণে একটি প্রোটনের সঙ্গে যথাক্রমে দুটি ও তিনটি নিউট্রন যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী হয়েছে ; অথচ তাদের তড়িৎ-বিভব বাড়ে নি। হাইড্রোজেনের এই ভারী আইসোটোপ দুটির কেন্দ্রীণ জুড়ে, অর্থাৎ ফিউসন ঘটাবার ফলে **হাইড্রোজেন** রূপান্তরিত হয়েছে **হিলিয়াম** পরমাণুতে ; আর এই রূপান্তরের ফলে বিপুল শক্তি বিমুক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সূর্যের প্রচণ্ড তাপ-শক্তি এভাবে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীণ সংযোজন বা ফিউসন ক্রিয়ার ফলেই উদ্ভূত হচ্ছে, আর সৌর দেহে হাইড্রোজেন অহরহঃ এভাবে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

হাইড্রোজেন

ডয়েটেরিয়াম

ট্রাইটিয়াম

গবেষণার ফলে ক্রমে জানা গেল, হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়ামকে সংযোজিত করতে হলে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড উত্তাপ সৃষ্টি করতে হবে ; আর এই **অসম্ভব উচ্চ তাপে** আইসোটোপ দুটি গলে-মিশে পরস্পর জুড়ে যাবে। মাত্র 6—7 হাজার ডিগ্রি তাপ-মাত্রায়ই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু গলে বাষ্পীভূত হয়ে যায় ; কাজেই এক কোটি ডিগ্রি তাপ উৎপাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। একমাত্র ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীণ বিদারণের (ফিসন) প্রক্রিয়ায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে মুহূর্তের জন্য ঐ রকম অভাবনীয় উচ্চ তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার সাহায্যেই ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম পরমাণুদের সংযোজন-ক্রিয়া সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে একটি অতি কঠিন ও সুদৃঢ় আধারের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত ইউরেনিয়াম-(পারমাণবিক) বোমার সাজ-সরঞ্জাম স্থাপিত হলো, আর তারই কাছে একটি পাত্রের ভিতরে ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম কতকটা রাখা হলো। তারপর ঐ ইউরেনিয়াম (ফিসন) বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতেই প্রয়োজনীয় প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপাঙ্কের সৃষ্টি হলো, আর সেই অভাবনীয় উত্তাপে সন্নিহিত ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম গলে-মিশে (ফিউসন) হিলিয়ামে রূপান্তরিত হলো ; আর

এই সংযোজনের ফলে প্রচণ্ড শক্তি মুক্তি পেল। তত্ত্বগতভাবে এই হলো **হাইড্রোজেন-বোমা** উৎপাদনের মোটামুটি পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কিন্তু এর পশ্চাতে যে বিপুল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও নৈপুণ্য কাজ করেছে তার ধারণা করাও কঠিন। পরমাণুবিদ্ ফার্মি, ওপেন হাইমার প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে শত শত বিজ্ঞান-কুশলীর সমবেত প্রচেষ্টায় কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম হাইড্রোজেন-বোমা প্রস্তুত হয়েছিল আমেরিকায়। 1952 সালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের জনশূন্য মার্শাল দ্বীপে এই বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়; এর ফলে যে ভয়াবহ বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়েছিল এবং যে প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল পৃথিবীতে তার তুলনা নেই। 1945 সালে হিরোশিমায় যে পারমাণবিক (ইউরেনিয়াম) বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তার চেয়ে একটি হাইড্রোজেন-বোমা প্রায় আড়াই হাজার গুণ অধিক শক্তিশালী! একটি হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণে কি ভয়াবহ ও ব্যাপক ধ্বংসলীলা ঘটতে পারে তা এ-থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

পদার্থের বিলুপ্তি বা রূপান্তর ঘটিয়ে পারমাণবিক শক্তি আহরণের সাধনায় মানুষ আজ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে; বিপুল শক্তি এ-যুগে মানুষের করায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু মানব-জাতির পরম দুর্ভাগ্য এই যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির তাগিদে ধ্বংসের কাজেই এই শক্তির ব্যবহার স্বরু হয়েছে। পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহতা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে হিরোসিমায় প্রথম অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণে, আর তাতেই মানুষের টনক নড়েছে। হাইড্রোজেন-বোমার ধ্বংস-শক্তি তার চেয়েও প্রায় আড়াই হাজার গুণ বেশি; কাজেই এর যথেচ্ছ ব্যবহারে সমগ্র মানব-জাতির দারুণ বিপর্যয় ঘটবে, মানব-সভ্যতা হয়তো বিলুপ্ত হবে। পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলির মধ্যে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং পারমাণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত না করে মানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করবার পরিকল্পনা চলছে। ইতিমধ্যে কোন কোন দেশে পারমাণবিক শক্তির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে জনহিতকর বহু প্রচেষ্টা সফল করা হয়েছে। জ্বালানী রূপে ব্যবহার করে এই শক্তির সাহায্যে জাহাজ চলছে, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। আশা করা যায়, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারে পৃথিবীর শিল্প-সভ্যতা এক নতুন রূপ নেবে। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আজ এক নবযুগের সূচনা হয়েছে, আর তা হলো 'পারমাণবিক যুগ'।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আণবিক গঠন-তত্ত্ব ও রাসায়নিক সংশ্লেষণ

ডালটনের মতে 'এক গঠন, এক যোগ' ; সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে—এক গঠন, একাধিক যোগ : আইসোমেরিজ্‌ম ও আইসোমার তত্ত্ব থেকে আণবিক গঠন-তত্ত্বের সন্ধান : কার্বনের বৈশিষ্ট্য, জৈব-রসায়ন বা কার্বন-রসায়ন ; আণবিক গঠন ও কেকিউলের সংকেত ; পরমাণুর যোজ্যতা বা ভ্যালেন্সি : আইসোমেরিক যৌগ উৎপত্তির ব্যাখ্যা ; অণু গঠনে পরমাণু-বিন্যাসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত—শৃঙ্খল-বিন্যাস ও ষড়ভুজ-বিন্যাস : আইসল্যাণ্ড স্পার ও পোলারাইজ্‌ড আলোক, পদার্থের আলোক-সক্রিয়তা ; পোলারাইজ্‌ড আলোক উৎপাদনের পরীক্ষা, পোলারাইজ্‌ড আলোক-ধারার ঘূর্ণন — দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী স্ক্রু-প্যাচ (স্পাইরাল), আলোক-সক্রিয় ও আলোক-নিষ্ক্রিয় যৌগ—টার্টারিক ও রেসিমিক অ্যাসিড : পাস্তুরের আবিষ্কার — জৈব যৌগের দ্বি-মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক গঠন ; স্টিরিও-কেমিস্ট্রি ; আণবিক গঠন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতির উদ্ভব ; আণবিক গঠন-তত্ত্বের ভিত্তিতে জৈব রসায়নের অগ্রগতি ও রাসায়নিক-শিল্পের প্রসার !

মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যথোচিত আলোচনা করেছি। আমরা জানি, বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ বা মৌলের পরমাণুরা একই ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কণিকার সমবায়ে গঠিত ; বিভিন্ন মৌলের গুণ ও ধর্মগত পার্থক্য আসে প্রধানতঃ সংগঠক ঐ কণিকাদের পারস্পরিক বিন্যাস ও সংখ্যাগত প্রভেদ থেকে। মূল বস্তু-সত্তায় বস্তুতঃ সব মৌলই অভিন্ন ; সোনা ও লোহার মধ্যে প্রভেদ মাত্র তাদের পরমাণু-সমূহের সংগঠক ঐ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদের সংখ্যা ও বিন্যাসগত বিভিন্নতায়। পদার্থের মূল স্বরূপ সম্বন্ধীয় আধুনিক এ-সব তথ্য ডালটনীয় যুগে ছিল অজ্ঞাত ও অভাবনীয় ; ডালটনের পরমাণু ছিল অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণিকা। বিভিন্ন মৌলের এরূপ ক্ষুদ্রতম কণিকা বা পরমাণুরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরস্পর যুক্ত হয়ে বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন যৌগের উৎপত্তি ঘটায় ; এই ছিল ডালটনীয় রাসায়নিক তত্ত্বের মূল কথা। ডালটনের মতে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুরা সুনির্দিষ্ট সংখ্যানুপাতে পরস্পর যুক্ত হয়ে এক-একটি সুনির্দিষ্ট যৌগ গঠন করে (পৃষ্ঠা 29)। সংক্ষেপে বলা যায়, সংখ্যাগত হিসাবে সংগঠক পরমাণুদের সুনির্দিষ্ট সংযোগে এক-একটি

সুনির্দিষ্ট যৌগ গঠিত হয় —'এক গঠন, এক যৌগ'। আমরা জানি, ডালটনের রাসায়নিক তত্ত্ব, যার উপরে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান মুখ্যতঃ গড়ে উঠেছে, তাতে এই সূত্রটি আজও মোটামুটিভাবে অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত রয়েছে সত্য, কিন্তু এর সঙ্গে অনেক নূতন তথ্য এ-যুগে সংযোজিত হয়েছে।

যাহোক, সাধারণভাবে ডালটনের এই পারমাণবিক সংখ্যানুপাত সূত্রটি সঠিক হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানের (বিশেষতঃ জৈব রসায়নের) দ্রুত অগ্রগতির ফলে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হতে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, নির্দিষ্ট কয়েকটি মৌলিক পদার্থ একই অনুপাতে যুক্ত হয়েও অবস্থা বিশেষে একাধিক যৌগ গঠন করে, যাদের গুণ ও ধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, 2-টি কার্বন পরমাণু, 6-টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 1-টি অক্সিজেন পরমাণুর পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে গঠিত হয় কখন ইথাইল অ্যালকোহল (CH_3CH_2OH), আবার কখন ডাই-মিথাইল ইথার (CH_3OCH_3)। গুণ ও ধর্মে এ দু'টি যৌগ সম্পূর্ণ আলাদা; কিন্তু সাংগঠনিক মূল বস্তু-সত্তায় একই (C_2H_6O)। জৈব রসায়নে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই;— একই অনুপাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট মৌলের সংযোগে বহু সংখ্যক যৌগ গঠিত হতে পারে, যেমন—9-টি কার্বন পরমাণু, 10-টি হাইড্রোজেন পরমাণু ও 3-টি অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক মিলনে শতাধিক বিভিন্ন যৌগ গঠিত হয়ে থাকে। রসায়নে এরূপ একই উপাদানিক সংগঠনে বিভিন্ন যৌগ উৎপত্তির ব্যাপারটাকে বলা হয় **আইসোমেরিজ্‌ম,** বাংলায় বলা যায় 'সমাস্থানিকতা'; আর বস্তুতঃ একই উপাদানিক সংগঠনের এরূপ বিভিন্ন যৌগগুলিকে বলে **আইসোমার,** বা সমাস্থানিক যৌগ। এ যেন অনেকটা ইমারত তৈরির মত; একই সংখ্যক ইট নানাভাবে সাজিয়ে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন গঠনের বাড়ি নির্মাণ করা যায়, তেমনি নির্দিষ্ট কয়েকটি মৌলের নির্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগ ও সাংগঠনিক সংস্থানের বিভিন্নতায় বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন হয়। অন্যভাবে বলা যায়, অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনে পরমাণুদের বিভিন্ন বিন্যাসের ফলে বিভিন্ন-গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট বিভিন্ন আইসোমার যৌগ গঠিত হয়।

ডালটনের যুগে রাসায়নিক গঠনে যৌগিক পদার্থের এই আইসোমেরিজ্‌ম তথ্য জানা ছিল না; পরবর্তী কালে এর আবিষ্কারের ফলে রসায়নে এক যুগ-বিপ্লব ঘটে যায়। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, কোন পদার্থ বা যৌগের গুণ ও ধর্ম কেবলমাত্র তার উপাদানিক সংযোগের উপরেই নির্ভর

করে না; পরন্তু তার অণুর অভ্যন্তরে সংগঠক মৌলগুলির পরমাণুদের বিভিন্ন সংস্থান বা অবস্থান-বিন্যাসের উপরেও যৌগের গুণ ও ধর্ম বহুলাংশে নির্ভরশীল। কাজেই কোন পদার্থ বা যৌগের পরিপূর্ণ রাসায়নিক জ্ঞান লাভ করতে হলে তার অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুদের সংযোগ-বিন্যাস, অর্থাৎ তার **আণবিক গঠন** জানা দরকার।

নির্দিষ্ট কয়েকটি মৌলের নির্দিষ্ট অনুপাতে, অর্থাৎ তাদের একই সংখ্যক পরমাণুর নানা সংযোগ-বৈচিত্র্যের ফলে এরূপ বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগ গঠনের দৃষ্টান্ত কার্বন-ঘটিত জৈব-রাসায়নিক যৌগে প্রায়ই দেখা যায়। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মধ্যে 'কার্বন' মৌলটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাহ্য ভৌত ধর্মে কার্বনের তিনটি পৃথক সত্তা—কয়লা, গ্রাফাইট ও হীরকের মধ্যে কোন রাসায়নিক প্রভেদ নেই, একই **কার্বন** (পৃষ্ঠা 295)। অপরাপর মৌলের সঙ্গে কার্বনের রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও বৈচিত্র্যময়; বস্তুতঃ কার্বন-যৌগের সংখ্যা অগণিত,— স্বভাবজ ও সংশ্লেষিত প্রায় তিন লক্ষাধিক কার্বন-যৌগের সন্ধান এযাবৎ মিলেছে। কার্বনের এরূপ বিপুল সংখ্যক যৌগের রাসায়নিক তথ্যাদি পর্যালোচনার জন্যে তাই রসায়নের একটি পৃথক শাখাই গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় **জৈব রসায়ন,** ইংরাজীতে বলে 'অর্গ্যানিক কেমিষ্ট্রি'। একে কার্বন বা কার্বো রসায়নও বলা যেতে পারে। যাহোক, 'জৈব রসায়ন' কথাটা আগেকার দিনের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অজৈব বা খনিজ পদার্থের যৌগগুলি থেকে জৈব, অর্থাৎ প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থের যৌগগুলির যে প্রভেদ বুঝতেন, তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ জীব-জগতের প্রায় সব যৌগই কার্বন-ঘটিত পদার্থ; আর এগুলি এক বিশেষ প্রাকৃতিক শক্তি বা জীবনী-শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হয় বলে সে-যুগে মনে করা হতো, যেন সেই শক্তি কেবল উদ্ভিদ বা প্রাণী-দেহের জীবন্ত কোষেই নিহিত রয়েছে। রসায়নের অগ্রগতির ফলে জৈব-অজৈবের এই তথাকথিত প্রভেদ লোপ পেয়েছে। জীব-জগতের যৌগগুলি থেকে অপ্রাণিজ বা খনিজ পদার্থের যৌগগুলির রাসায়নিক গঠনে মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই, উভয়ই একই রাসায়নিক গঠন-সূত্রে গ্রথিত; এ তথ্য ক্রমে বিজ্ঞানী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজাত যে-সব যৌগকে আগেকার দিনে জীবনী শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন বিশেষ **জৈব যৌগ** বলে মনে করা হতো, আজ সেরূপ হাজার হাজার যৌগ অজৈব বা খনিজ উপাদানের সংযোগে রসায়নাগারেই

প্রস্তুত করা হচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত করে এরূপ বহুবিধ তথাকথিত জৈব যৌগিক বিভিন্ন কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদনের বিরাট সব শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।

এ-সব সত্ত্বেও জৈব রসায়ন বা 'অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি' কথাটা আজও রয়ে গেছে এবং রসায়নের একটি পৃথক শাখা হিসাবে এর চর্চা চলছে। তবে আজকাল জৈব-রসায়ন বলতে কেবল কার্বন-ঘটিত অসংখ্য যৌগিকের চর্চাই বুঝায়; কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ যৌগিকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ-যুগে কার্বনের সঙ্গে অন্যান্য মৌলের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে রাসায়নিকরা এমন কত শত তথাকথিত জৈব যৌগ উৎপাদন করেছেন, যাদের কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতে মেলে না। আধুনিক যুগে তাই জৈব রসায়নকে **'কার্বন-রসায়ন'** বলাই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। বস্তুতঃ জীব-জগতে প্রকৃতির সূক্ষ্ম রাসায়নিক কলা-কৌশল আজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হয়েছে, জৈব-অজৈবের পার্থক্য ঘুচেছে। যাহোক, এখানে জৈব রসায়নের বা কার্বন-যৌগের বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকটা বলা হলো সত্য; কিন্তু কোন কার্বন-যৌগের গুণাগুণ বা উৎপাদন-পদ্ধতির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এখানে কেবল রাসায়নিক যৌগের আণবিক গঠনে পূর্বোল্লিখিত **আইসো-মেরিজ্‌ম** বা 'সমাস্থানিকতা' ধর্মের তাৎপর্য আলোচনা করতে চাই, যে ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য মৌলের সংযোগে গঠিত যৌগগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও কার্বনের যৌগে, অর্থাৎ জৈব-রাসায়নিক পদার্থে আশ্চর্যজনকভাবে বহুতর সংখ্যায় প্রায়শই দেখা যায়। মূল উপাদানের অভিন্নতায় ও আণবিক গঠনে পরমাণু-সংস্থানের বিভিন্নতায় যে সম্পূর্ণ পৃথক গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট বহু সংখ্যক যৌগিক গঠিত হতে পারে এবং 'আইসোমেরিজ্‌ম' বলতে কি বুঝায়, সংক্ষেপে তার কিছু আলোচনা করা হলো মাত্র।

বিভিন্ন যৌগের আণবিক গঠন-বিন্যাসের জ্ঞান লাভ করা কেবল তাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাদি জানবার জন্যেই নয়, পরন্তু কৃত্রিম উপায়ে নূতন নূতন যৌগ গঠন, অর্থাৎ রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার জন্যেও অণুর গঠন-বিন্যাস সংক্রান্ত জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞান ও রাসায়নিক যুক্তির সাহায্যে সরল গঠনের বিভিন্ন যৌগকে সংযুক্ত বা সংশ্লেষিত করে বিভিন্ন জটিল যৌগ গঠন করতে হলে তাদের আণবিক গঠনের জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। এভাবে বিভিন্ন (কৃত্রিম) সংশ্লেষিত যৌগ গঠন বা **রাসায়নিক সংশ্লেষণ** পদ্ধতির

আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু করা হবে। বস্তুতঃ জৈব রসায়ন-বিদ্যায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক যৌগের আণবিক গঠন নির্ধারণ করার প্রশ্নটিই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; জটিল জৈব যৌগগুলির ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়। কি করে, কি উপায়ে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তার আভাস মাত্র এখানে দেওয়া যেতে পারে। দেশে দেশে অগণিত রসায়ন-বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘ ও অক্লান্ত গবেষণার ফলে বিভিন্ন যৌগিকের **আণবিক গঠন** সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কেবল বিচ্ছিন্নভাবে এক-একটি যৌগের আণবিক গঠন-বিন্যাসই নয়; বিভিন্ন শ্রেণীর যৌগের বিভিন্নরূপ আণবিক গঠনে পরমাণুদের পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্ক এবং তার বিভিন্নতায় যৌগগুলির ভৌত ও রাসায়নিক গুণ ও ধর্মের বিভিন্নতা প্রভৃতি নানা তথ্য ক্রমে জানা গেছে। কাজেই অজানা কোন যৌগের অণুর গঠন জানতে হলে তার বিভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম ও গুণাগুণ পর্যালোচনা করতে হয়; তার পরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে তার বিক্রিয়া ঘটিয়ে যৌগটাকে ভেঙ্গে অধিকতর সরল গঠনের বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর যৌগে রূপান্তরিত করা হয়। মোট কথা, জটিল গঠনের অজানা যৌগকে বিশ্লেষিত ও বিয়োজিত করে এমন সব সরল যৌগে পরিণত করা হয়, যাদের আণবিক গঠন জানা আছে। এভাবে সেই অজানা যৌগটার আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জিত হয় তার সাহায্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিভিত্তিক কল্পনার বলে ঐ সব ক্ষুদ্রতর যৌগাংশগুলি কিভাবে পরস্পর যুক্ত হয়ে জটিল যৌগটি গঠিত হয়েছিল, তা জানতে পারেন। এভাবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন অজানা যৌগের আণবিক গঠন জানা গেছে এবং তাদের সংগঠক উপাদান-গুলিকে আবার সংশ্লেষিত বা সংযুক্ত করে নূতন নূতন যৌগ উৎপাদনের পদ্ধতি ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছে।

যৌগের আণবিক গঠন নির্ণয়ের পদ্ধতিটা মোটামুটি এই বটে, কিন্তু জটিল জৈব যৌগগুলির ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো, যদি না অণুর সংগঠনে পরমাণুদের সংযোগ-সূত্রের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারিত হতো। অন্য কথায় বলা যায়, যৌগের আণবিক গঠন প্রকাশ করবার কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি যদি নির্ণীত না হতো তাহলে যৌগের গঠন-রহস্যের সমাধান দুঃসাধ্য হতো। এই সমস্যা সমাধানে জার্মানীর রসায়ন-বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক কেকিউলের দান অসামান্য; 1858 খৃষ্টাব্দে তিনি যৌগিক পদার্থের আণবিক গঠন প্রকাশ

করবার একটি সুচিন্তিত কৌশল উদ্ভাবন করেন। অণুর সংগঠনে পরমাণুরা কিভাবে পরস্পর যুক্ত থাকে, কোন পরমাণু অপরাপর পরমাণুদের কতগুলিকে সংবদ্ধ রেখে অণু গঠন করে, কেকিউল তার তাৎপর্য নির্ধারণ করেন। বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাৎপর্য ও সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি আণবিক গঠনের এক রকম চিত্রভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। এর মূল কথা হলো মৌলিক পদার্থের **ভ্যালেন্সি** বা যোজ্যতা; যার উপরে পরমাণুদের সংযোগ ও অণুর গঠন নির্ভর করে। প্রত্যেকটি মৌলের এই যোজ্যতা বা রাসায়নিক সংযোগ-শক্তি (ভ্যালেন্সি) থাকে সুনির্দিষ্ট। বিভিন্ন যৌগের আণবিক গঠনে তাদের সংগঠক পরমাণুদের এই ভ্যালেন্সি বা যোজ্যতা বিষয়ে কিছু-কিছু আলোচনা আমরা বিভিন্ন সূত্রে আগেও করেছি।
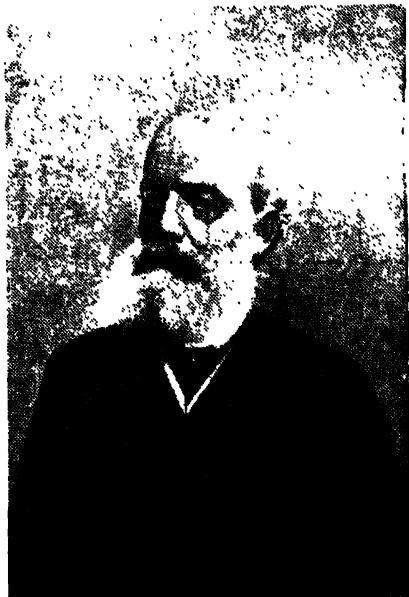
জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক কেকিউল

অণুর গঠনে বিভিন্ন পরমাণুর পারস্পরিক সংযোগ-শক্তি বা ভ্যালেন্সি যদিও বন্ধন-রজ্জুর মত এক-একটি রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বস্তুতঃ পরমাণুদের পারস্পরিক সংযোগের ব্যাপারে এরূপ কোন রেখা বা শৃঙ্খলের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই; এটা ভ্যালেন্সি প্রকাশের চিত্রভিত্তিক একটা কৌশল মাত্র। এভাবে আমরা **মিথেন** বা মার্স গ্যাসের (CH_4) আণবিক গঠনের রাসায়নিক সংকেত পার্শ্ববর্তী নক্সার সাহায্যে প্রকাশ করতে পারি। এর যুক্তি হলো এই যে, বহুবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেখা গেছে, কার্বনের ভ্যালেন্সি বা সংযোগ-শক্তি চার (টেট্রাভ্যালান্ট), আর হাইড্রোজেনের এক (মনোভ্যালান্ট)। কাজেই
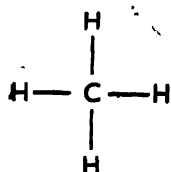
```
     H
     |
H —  C — H
     |
     H
```

মিথেনের আণবিক গঠন

কার্বন ও হাইড্রোজেনের সবচেয়ে সরল যৌগ মিথেন বা মার্স-গ্যাসের আণবিক গঠন রাসায়নিক যুক্তি অনুসারে এরূপই হতে হবে। আবার অনুরূপ গঠনের বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস **প্রোপেন** (C_3H_8) নামক হাইড্রোকার্বন-অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনও এভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রোপেনের এই নক্সাভিত্তিক সংকেতেও দেখা যাচ্ছে, কার্বন টেট্রাভ্যালাণ্ট ও হাইড্রোজেন মনোভ্যালাণ্ট। যাহোক, বিভিন্ন কার্বন-যৌগের এরূপ আণবিক সংকেত আর এক ভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে; যেমন, প্রোপেনের সংকেত হলো $CH_3.\ CH_2.\ CH_3$। এখানে কার্বনের পারমাণবিক সংযোগ ভ্যালেন্সি-বোধক রেখার বদলে একটা বিন্দু দিয়ে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন জৈব যৌগের অণুর গঠনে পরমাণুদের সংযোগ-বিষয়ক
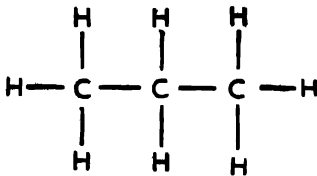
প্রোপেন-অণুর গঠন-বিন্যাস

এই ধারণা থেকে অজানা যৌগের আণবিক গঠনই কেবল নয়, পরন্তু অণুর অভ্যন্তরে পরমাণুদের সংযোগ-বিন্যাসের বিভিন্নতার ফলে একই অণুর বিভিন্ন 'আইসোমেরিক' বা সমাস্থানিক গঠনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও অনুমান করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রোপেনের ($CH_3.\ CH_2.\ CH_3$) কথাই ধরা যাক্; এই যৌগের যে-কোন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে বিয়োজিত করে, তার জায়গায় অন্য একটি পরমাণুকে (ধরা যাক, ক্লোরিন-পরমাণু) প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে **দুই ভাবে;** যেমন— $CH_3.CHCl.\ CH_3$, অথবা $CH_3.CH_2.\ CH_2Cl$ যৌগ। প্রথমটিতে ক্লোরিন (Cl)-পরমাণু মধ্যবর্তী একটি কার্বন-পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে; আর দ্বিতীয়টিতে ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে পার্শ্ববর্তী একটি কার্বন-পরমাণুর সঙ্গে। প্রোপেনের সঙ্গে ক্লোরিনের (বা অন্য কোন মনোভ্যালাণ্ট মৌলের) সংযোগে এরূপ দু'টি মাত্র **আইসোমেরিক যৌগ** গঠিত হতে পারে, উল্লিখিত আণবিক সংকেত থেকে এ-কথা বুঝা যায়। বস্তুতঃ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে এরূপ দু'রকম যৌগই মাত্র পাওয়া গেছে; প্রোপেনের ক্ষেত্রে এরূপ দু'টির বেশি যৌগের গঠন সম্ভব নয়, পাওয়াও যায় নি।

অসাধারণ রাসায়নিক অন্তর্দৃষ্টির বলে বিজ্ঞানী কেকিউল জৈব বা কার্বন-যৌগগুলির আণবিক গঠনে পরমাণুদের সংযোগ-বিন্যাসের এই যে পরিকল্পনা করেছিলেন; বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষায় তার সত্যতা সম্পূর্ণ প্রমাণিত

হয়েছে। আবার কার্বন-পরমাণুরা কেবল পরস্পর শৃঙ্খলাকারে যুক্ত হয়ে প্রোপেনের মত দীর্ঘাকার অণুই গঠন করে না; তারা পরস্পর চক্রাকারে যুক্ত হয়েও বলয়ের মত আণবিক গঠনের যোগ উৎপন্ন করে থাকে; যেমন **বেঞ্জিন** যৌগের আণবিক বিন্যাস। বেঞ্জিনে **(C_6H_6)** ছয়টি কার্বন-পরমাণু পরস্পর বলয়ের আকারে যুক্ত থাকে, আর প্রত্যেকটি কার্বনের সঙ্গে যুক্ত থাকে এক-একটি হাইড্রোজেন পরমাণু। চক্র বা বলয়ের আকার বলা হলেও বেঞ্জিনের গঠনে কার্বনের পারস্পরিক সংযোগ ঠিক গোলাকার নয়; এর সংযোগ-বিন্যাস ষড়ভূজ ক্ষেত্রের আকারে থাকে। বেঞ্জিনের আণবিক গঠনের পার্শ্ববর্তী সংকেত-নক্সাটি থেকে কার্বন-পরমাণুর **ষড়ভুজ-বিন্যাস** বুঝা যাবে। এ থেকে আরও বুঝা যাবে, কার্বনের ভ্যালেন্সি বা যোজ্যতা যে 'চার' তা-ও রক্ষিত হয়েছে, এক-একটি অন্তর যুগ্ম-যোজ্যতার জোড়া বন্ধন-রেখা দিয়ে কার্বন-পরমাণুগুলি পরস্পর সংবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ পরবর্তীকালে বেঞ্জিনের এই ষড়ভূজাকৃতি গঠন রঞ্জন-রশ্মির (এক্স-রে) পরীক্ষায়ও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

H
C
H.C C.H
H.C C.H
C
H
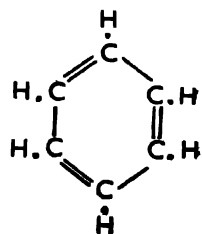
বেঞ্জিন-অণুর গঠন

যৌগিক পদার্থের আণবিক গঠন-তত্ত্বের উল্লিখিত মতবাদ ও সিদ্ধান্তের সফল গবেষণায় কেকিউলের মত স্কটল্যাণ্ডের রসায়নবিদ আর্কিবল্ড কুপারের অবদানও বড় কম নয়। রাসায়নিক যৌগের গঠনে বিভিন্ন মৌলের ভ্যালেন্সি বা যোজ্যতা সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও আণবিক গঠন প্রকাশের জন্যে এঁদের উদ্ভাবিত নক্সা-ভিত্তিক পদ্ধতিটি প্রচলিত হওয়ার ফলে জৈব রসায়নের দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে এবং তার সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক তথ্যের ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ জৈব পদার্থের বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগ গঠনের তাৎপর্য অনেক সময় কুপার বা কেকিউলের প্রবর্তিত আণবিক গঠন-বিন্যাসের উল্লিখিত সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমস্যা দাঁড়ায় এই যে, একই রাসায়নিক গঠনের বিভিন্ন যৌগের সংগঠক পরমাণুদের বিভিন্ন বিন্যাসে যে বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগ উৎপন্ন হয় তাদের সবগুলিকে উল্লিখিত আণবিক সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। এরূপ কোন কোন জৈব যৌগের গঠন নির্ধারণের জন্যে ক্রমে **আইসোমেরিজ্‌ম**-এর এক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন-কোন

আইসোমেরিক যৌগের এরূপ বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য প্রথম প্রকাশ পায় সেগুলির উপরে আলোক-রশ্মির বিশেষ ক্রিয়ার (অপ্‌টিক্যাল অ্যাক্‌টিভিটি) মাধ্যমে। রাসায়নিক যৌগের গঠন-পদ্ধতির এটি একটি জটিল বিষয়; এর মোটামুটি কিছু ধারণা দিতে আমরা চেষ্টা করবো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলোক-বিজ্ঞানের একটি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। আমরা জানি, উৎস থেকে আলোক-রশ্মি ইথার-তরঙ্গের আকারে চারদিকে অতি দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়; আর সাধারণতঃ সেই আলোক-তরঙ্গের কম্পন-তল সর্বদা আলোক-রশ্মির প্রবাহ-পথের সঙ্গে লম্বভাবে চলতে থাকে (ট্রান্সভার্স ওয়েভ)। এরূপ সাধারণ আলোক-রশ্মিকে যদি ক্যালসিয়াম-কার্বনেটের স্বচ্ছ ক্রস্ট্যাল বা স্ফটিকের (যাকে বলা হয় **আইসল্যাণ্ড স্পার**) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয় তাহলে কিন্তু রশ্মিগুলির কম্পন-তল আর লম্বভাবে থাকে না, আলোক-তরঙ্গ প্রবাহ-পথের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ একই সমতলে আসে। এই অবস্থার আলোককে বলা হয় **পোলারাইজ্‌ড** আলোক, বাংলায় বলা যায় 'সমতলী আলো'। এরূপ আলোক-রশ্মিকে আবার কোয়ার্টজ (সিলিকা) ক্রষ্ট্যাল, তার্পিন তেল, চিনির জলীয় দ্রবণ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলে দেখা যায়, ঐসব পদার্থের মাধ্যমে প্রতিসরিত হয়ে এরূপ আলোক-রশ্মির কম্পন-তল ঘুরে ঘুরে 'স্ক্রু'-এর মত জড়িয়ে-জড়িয়ে অগ্রসর হয়; আবার সেই ঘূর্ণনের বা প্যাঁচের গতিপথ কোন কোন পদার্থের বেলায় হয় ডান-দিকে ঘুরানো, কোন-কোন পদার্থের ক্ষেত্রে বাঁ-দিকে। এরূপ পদার্থের ভিতরে পোলারাইজ্‌ড আলোক-ধারা পরিচালিত করলে তার গতিপথের বিভিন্ন স্থানে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে আলোক-রশ্মির উক্ত দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাতে একটা সাধারণ
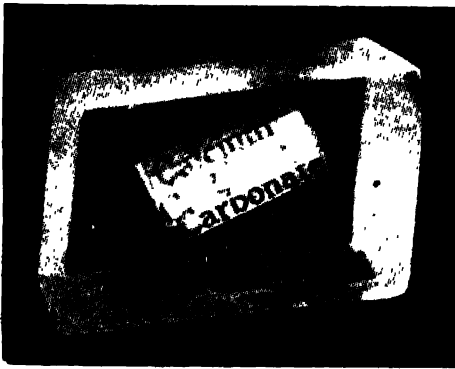
আইসল্যাণ্ড স্পার

দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। কিছু মোটা কাগজের লম্বা একটা সরু ফালিকে একটা পেন্সিল বা সরু রডের গায়ে ডান-হাতি বা বাঁ-হাতি পাকে জড়িয়ে নিয়ে পরে যদি ফালিটাকে আস্তে-আস্তে টেনে ধরা যায় তাহলে তার যে আকার হয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের অভ্যন্তরে পোলারাইজ্‌ড আলোক-রশ্মিকেও অনেকটা সেরূপ আকারের দেখায়। যাহোক, কোন-কোন পদার্থের অভ্যন্তরে পোলোরাইজ্‌ড আলোক-রশ্মির কম্পনতল যে এভাবে ঘুরে যায় বস্তুতঃ তা তাদের আণবিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্যেই হয়ে থাকে। যে-সব পদার্থে এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তাদের বলা হয় **অপ্‌টিক্যালি অ্যাকৃটিভ** বা আলোক-সক্রিয় পদার্থ।
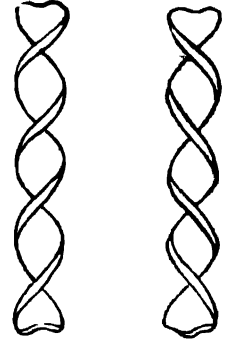
দক্ষিণাবর্তী ও বামাবর্তী প্যাঁচের নমুনা

যান্ত্রিক কৌশলে বিভিন্ন পদার্থের এরূপ আলোক-সক্রিয়তা ধর্ম সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আলোক-রশ্মি নিক্ষেপক-যন্ত্র বা প্রোজেকসন ল্যাণ্টার্ণের (প্রদত্ত চিত্র) মুখ (P) থেকে নির্গত রশ্মিগুলিকে একখানা উত্তল লেন্সের (L) মাধ্যমে সমান্তরাল করে নিয়ে হেলানো একখানা
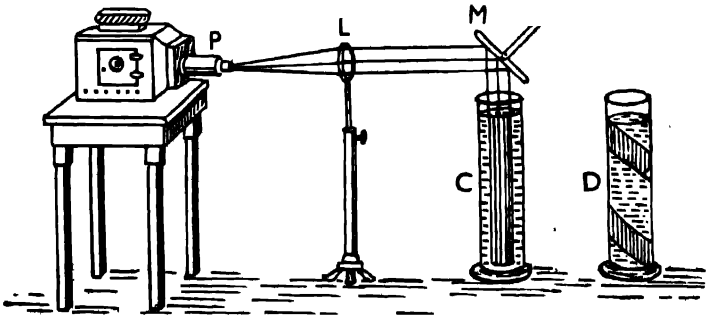
পোলারাইজ্‌ড আলোকের সাহায্যে আণবিক গঠনের পরীক্ষা

দর্পণে (M) প্রতিফলিত করা হয়, যাতে রশ্মিগুলি লম্বভাবে নিচের দিকে চালিত হবে। এখন একটা কাচের জারে জল নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা রজন-দ্রবিত অ্যালকোহল মেশালে রজনের অসংখ্য সূক্ষ্ম কণিকা জলে মিশে জারের জলটাকে সামান্য ঘোলাটে করে তুলবে। জারের (C) এই জলে পুর্বোল্লিখিত নিম্নমুখী লম্বমান আলোক-রশ্মি প্রবেশ করালে জারের জল-স্তম্ভের ভিতরে আলোকের

গতিপথটা উজ্জ্বল দেখায়। জলে মিশ্রিত রঞ্জন-কণিকাগুলির গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ঐ আলোক-ধারা সর্বত্র সমভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ যেন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে ঘরের ভিতরে আলোক-রশ্মি প্রবেশ করলে ঘরের অদৃশ্য ধূলি-কণাগুলি যেমন ঔজ্জ্বল্যে দৃশ্যমান (টিণ্ড্যাল এফেক্ট) হয়ে আলোক-ধারার সৃষ্টি করে, অনেকটা তেমনি ব্যাপার। যাহোক, সাধারণ আলোক-রশ্মির ক্ষেত্রেই এরূপ হয়ে থাকে। এখন যদি ঐ ল্যাণ্টার্নের মুখে পূর্বোল্লিখিত আইসল্যাণ্ড স্পারের কৃষ্ট্যাল (যাকে সাধারণতঃ বলে 'নিকল প্রিজম') লাগানো হয়, তাহলে তার ভিতর দিয়ে যে **পোলারাইজ্‌ড** বা সমতলী আলোক-রশ্মি বেরিয়ে আসে তার সাহায্যে আগের ঐ পরীক্ষাটা করলে দেখা যায়, জারের জল-স্তম্ভের ভিতরে সর্বত্র সমানভাবে আলোকিত রশ্মি-ধারা আর সৃষ্টি হয় না। এক্ষেত্রে ঐ আলোক-ধারার বিপরীত দু'ধার মাত্র উজ্জ্বল দেখায়, অপর দু'ধার অনুজ্জ্বল থাকে। ল্যাণ্টার্নের ঐ মুখের নিকল-প্রিজ্‌মটাকে ঘুরালে জল-স্তম্ভের (D) ভিতরের আলোক-ধারাও পর্যায়-ক্রমে আলো-আঁধারিভাবে ঘুরতে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, নিকল-প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে পরিচালিত হওয়ার ফলে আলোক-রশ্মিগুলি পোলারাইজ্‌ড হয়ে সমতলে চ্যাপ্‌টা **ফিতের মত** হয়ে যায়, যার বিপরীত দু'ধার মাত্র আলোকোজ্জ্বল হয়, অন্যত্র আলোকবিহীন থাকে। পোলারাইজ্‌ড আলোকের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সামান্য আভাস মাত্র এই পরীক্ষা থেকে জানা যাবে।

এখন উল্লিখিত পরীক্ষায় জারের জলে যদি ইক্ষু চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$) দ্রবিত থাকে (অবশ্য আগের মত রঞ্জন-কণিকাও তাতে ভাসমান থাকবে), আর তার ভিতরে পোলারাইজ্‌ড আলোক-রশ্মি উল্লিখিত উপায়ে প্রবিষ্ট করানো হয়, তাহলে দেখা যাবে, ঐ জল-স্তম্ভের ভিতরে আলোক-ধারা 'স্ক্রু'-র প্যাঁচের আকারে ঘুরানো হয়ে দেখা দিয়েছে (পূর্ববর্তী চিত্রে D-চিহ্নিত জার)। আবার এই আলোক-রশ্মি যার মাধ্যমে 'পোলারাইজ্‌ড' হয়েছে সেই নিকল-প্রিজ্‌মটাকে ঘুরালে দেখা যায়, ঐ ঘুরানো আলোক-ধারার প্যাঁচটাও যেন স্ক্রু-র প্যাঁচের মত ঘুরতে থাকে। এক্ষেত্রে আবার একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ে, যে সাতটা রঙীণ আলোক-রশ্মির সংমিশ্রণে সাধারণ আলোক গঠিত, সেগুলি ঐ আলোক-ধারার ঘূর্ণনের ফলে বিভিন্ন মাত্রায় ঘোরে (নীল-রশ্মি লাল-রশ্মির চেয়ে দ্রুততর বেগে ঘোরে); আর তাই ঐ প্যাঁচানো আলোক-ধারা রামধনুর সপ্তবর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন বর্ণের প্যাঁচানো আলোকের মত দেখায়।

পোলারাইজ্‌ড আলোকের প্রভাবে চিনি, তারপিন তেল প্রভৃতি কতকগুলি

আলোক-সক্রিয় (অপ্‌টিক্যালি অ্যাক্‌টিভ) রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে যে উল্লিখিতরূপ প্যাঁচানো (স্পাইরাল) আলোক-ধারা দেখা যায় প্রথমে অনেকদিন তার কোন ব্যাখ্যা জানা যায় নি। অনেক রাসায়নিক পদার্থের আবার এই বৈশিষ্ট্য থাকে না, সেগুলিকে বলা হয় আলোক-নিষ্ক্রিয়। পোলারাইজ্‌ড আলোকের প্রভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের এরূপ বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্য মূলতঃ পদার্থের আণবিক গঠন ও পারমাণবিক সংস্থানের বিভিন্নতাই যে দায়ী সে-তথ্য **1848** খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্লেষণ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। তিনি যখন জৈব-রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠন-সম্বন্ধীয় এই নূতন তথ্যের গবেষণা সুরু করেন তখন **টার্টারিক** ও **প্যারাটার্টারিক** অ্যাসিড (যা পরে **রেসিমিক** অ্যাসিড নামে পরিচিত হয়েছে) নামক একই রাসায়নিক গঠনের দুটি আইসোমেরিক জৈব যৌগের পরিচয় সেকালের বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। এ'দুটি আইসোমেরিক যৌগের মধ্যে পাস্তুর দেখলেন, টার্টারিক অ্যাসিড 'অপ্‌টিক্যালি অ্যাক্‌টিভ' বা আলোক-সক্রিয়, কিন্তু প্যারাটার্টারিক বা রেসিমিক অ্যাসিড হলো আলোক-নিষ্ক্রিয়। কেন এই বিভিন্নতা? তিনি এই কঠিন অ্যাসিড দু'টার ও তাদের বিভিন্ন রাসায়নিক লবণের
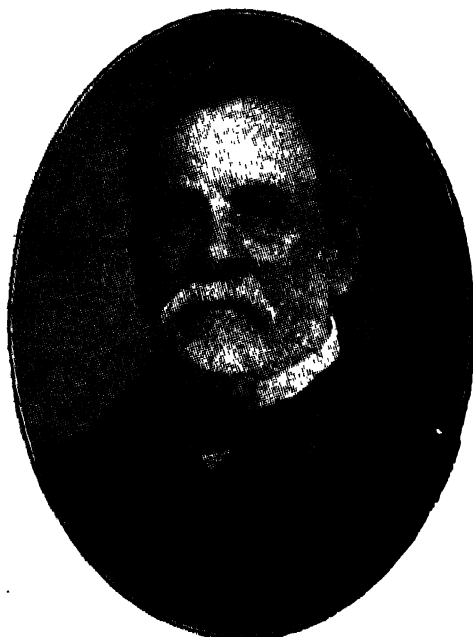
বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর

স্ফটিক বা ক্রিস্ট্যালের আকার-আকৃতি পরীক্ষা করে তাদের গঠনের বৈশিষ্ট্যাদি সবিশেষ লক্ষ্য করেন, যার বিভিন্নতার ফলেই একটা আলোক-সক্রিয় ও অপরটা আলোক-নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। পাস্তুরের এ-সব সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও যুক্তির

বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব বা সমীচীন হবে না; এখানে কেবল এ-কথা বলাই যথেষ্ট যে, এ-দু'টি অ্যাসিডেরই ক্রস্ট্যালসমূহ বিশেষ আকারের অনুরূপ অনেকগুলি তলবিশিষ্ট (হেমিহেড্রাল) হয়, অথচ তাদের একটার সামগ্রিক গঠন অপরটার বিপরীত; একটা যেন অপরটার প্রতিরূপ। আবার দেখা গেল, টার্টারিক অ্যাসিডের ক্রস্ট্যাল কোয়ার্টজ- (সিলিকা) ক্রস্ট্যালের মতই আলোক-সক্রিয়, কিন্তু কোয়ার্টজ কেবল ক্রষ্ট্যাল অবস্থায়ই সক্রিয়, চূর্ণ করলে বা গলিয়ে ফেললে তা আর আলোক-সক্রিয় থাকে না। অপর পক্ষে টার্টারিক অ্যাসিড চূর্ণিত বা দ্রবিত অবস্থায়ও আলোক-সক্রিয় থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, কোয়ার্টজের ধর্মে এই বিভিন্নতা আসে তার বাহ্যিক ক্রস্ট্যাল-আকৃতির জন্যেই; পরন্তু টার্টারিক অ্যাসিডের আলোক-সক্রিয়তা তার আভ্যন্তরীণ আণবিক গঠনের বৈশিষ্ট্যেরই ফল।

যাহোক, এই গবেষণায় পাস্তর টার্টারিক ও রেসিমিক অ্যাসিডের সমগোত্রীয় দু'টা লবণ (সোডিয়াম-অ্যামোনিয়াম টার্টারেট ও সোডিয়াম-অ্যামোনিয়াম রেসিমেট) নিয়ে নানা ভাবে নানারকম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা করেন এবং তাদের ক্রস্ট্যালের গঠন ও দ্রবণের আলোক-সক্রিয়তা ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এই শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। আগেই জানা ছিল, টার্টারিক অ্যাসিড ও তার লবণের জলীয় দ্রবণ সর্বদাই আলোক-সক্রিয় হয়, আর রেসিমিক অ্যাসিড বা তার কোন লবণে এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তর উক্ত সোডিয়াম-অ্যামোনিয়াম রেসিমেট লবণের আলোক-নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। নানা পরীক্ষার পরে তিনি প্রমাণ করেন যে, উক্ত রেসিমেট লবণের জলীয় দ্রবণ আলোক-নিষ্ক্রিয় বটে, কিন্তু তার মধ্যে দু'রকম গঠনের ক্রস্ট্যাল বা স্ফটিক রয়েছে; তার এক রকম ক্রস্ট্যালের প্রভাবে পোলারাইজ্‌ড আলোকের ধারা-তল বাঁ-দিকে ঘুরে যায়, আর অপরশ্রেণীর ক্রস্ট্যালের প্রভাবে ঐ আলোক-তল সমভাবে ও সমপরিমাণে ডান-দিকে ঘোরে। কাজেই সাধারণ অবস্থায়
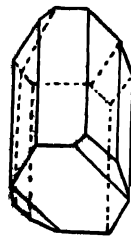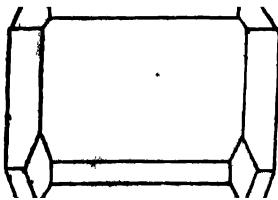
সোডিয়াম-অ্যামোনিয়াম টার্টারেট ও রেসিমেট ক্রস্ট্যালের গঠন

রেসিমেট লবণের দ্রবণ আলোক-নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে পাস্তুর প্রমাণ করেন, টার্টারেটের মত রেসিমেট লবণও বস্তুতঃ আলোক-সক্রিয়; কিন্তু তাতে দু'রকম বিপরীত গঠনের (অ্যাসিমেট্রিক্যাল) ক্রিস্ট্যাল মিশ্রিত থাকে বলে রেসিমেট লবণ সামগ্রিকভাবে আলোক-নিষ্ক্রিয় হয়। এর প্রমাণস্বরূপ পাস্তুর ঐ দু'রকম রেসিমেট ক্রিস্ট্যাল পৃথক করে আবার সমান অনুপাতে তাদের মিশিয়ে দেখান, সেই মিশ্রণের জলীয় দ্রবণের ভিতরে পোলারাইজ্‌ড আলোকের ধারা-তল কোন দিকেই ঘোরে না, আলোক-নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন সাধারণ রেসিমেট লবণের বেলায় হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানী পাস্তুরের আবিষ্কৃত এ-সব তথ্য এতই বিস্ময়কর ও বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠনের বিশ্লেষণে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, জৈব রসায়নের তৎকালীন ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে পাস্তুর এভাবে আইসোমেরিক যৌগের এক নূতন আণবিক গঠন-সংস্থানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন; যার আণবিক সংকেত কেকিউলের প্রবর্তিত পরমাণুর 'যোজ্যতা-বন্ধন সূত্রের' সাহায্যে সঠিক প্রকাশ করা যায় না। অণুর সংগঠক পরমাণুগুলি যদি একই সমতলে পরস্পর যুক্ত না হয়ে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রভৃতি আকারে **ঘনতলিক ক্ষেত্রে** সন্নিবিষ্ট হয় তাহলেও বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগ গঠিত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আইসোমেরিক যৌগের আণবিক গঠন আর **দ্বিমাত্রিক** (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) থাকে না, হয়ে পড়ে **ত্রিমাত্রিক** (দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ)। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে অণুর গঠনে পরমাণুরা ঐ ঘনতলিকের বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে সংস্থাপিত হয়ে বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগ গঠন করতে পারে। এরূপ অবস্থায় অণুর গঠন-বিন্যাসে কেকিউলের উদ্ভাবিত আণবিক-সংকেতের মত সংগঠক পরমাণুরা সমতলে বিন্যস্ত থাকে না; থাকে ত্রিমাত্রিক সংস্থানে; কাজেই কেকিউলের আণবিক সংকেতে এরূপ যৌগের গঠন প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আণবিক গঠন-তত্ত্বের এই নূতন ধারা আবিষ্কৃত হওয়ায় একই উপাদানিক গঠনের হয়েও পরমাণুদের সম্ভাব্য বহুবিধ বিন্যাসের ফলে যে বহু সংখ্যক আইসোমেরিক যৌগ গঠিত হতে পারে তার ব্যাখ্যা সহজসাধ্য

আইসোমেরিক যৌগের ত্রিমাত্রিক গঠনের চিত্ররূপ

হয়েছে। এভাবে জৈব-যৌগের আণবিক গঠনে পাস্তুরের উক্ত নতুন তথ্যের ভিত্তিতে রসায়নের এক নতুন শাখাই গড়ে উঠেছে, যাকে বলা হয় **স্টিরিও-কেমিস্ট্রি**, বাংলায় বলা যায় 'ত্রিমাত্রিক রসায়ন'। পরবর্তীকালে ডাচ্ রাসায়নিক ভ্যাণ্ট হফ্ এই রাসায়নিক তত্ত্বের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের আণবিক গঠন-বিন্যাসের বিভিন্নতায় তাদের বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগের আলোক-সক্রিয়তা ধর্মের বৈশিষ্ট্যাদি বিশ্লেষণ করে বহু প্রাকৃতিক যৌগের আণবিক গঠন ক্রমে সঠিক নির্ধারিত হয়েছে। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন জটিল জৈব যৌগের গঠন-প্রকৃতি এভাবে জেনে নিয়ে অনুরূপ গঠনের একাধিক সরল যৌগকে সংযোজিত করে কৃত্রিম সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে রসায়নাগারেই তাদের উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এভাবে কৃত্রিম সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন-কৌশল সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনা করবো।

স্টিরিও-কেমিস্ট্রির বিবিধ জটিল তত্ত্বের সামান্য আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হলো। বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগের আণবিক গঠনে বিভিন্ন সমরূপ ও বিষমরূপ (সিমেট্রিক্যাল-অ্যাসিমেট্রিক্যাল) ক্রিস্ট্যালের ক্ষেত্রে আলোক-সক্রিয়তা ধর্মের বিভিন্নতায় 'ডেক্স্ট্রো-রোটেটরি' ও 'লিভো-রোটেটরি' যৌগ গঠনের বিবিধ জটিল তত্ত্বের বিশদ আলোচনা সাধারণ পাঠকের পক্ষে উপযোগী নয়, কাজেই এ আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। সংশ্লেষণী রসায়নের অগ্রগতির পক্ষে উল্লিখিত তথ্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-সব তথ্য পরবর্তীকালে অসংখ্য অজানা যৌগ গঠনের প্রয়াসে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। বস্তুতঃ পাস্তুরের আবিষ্কৃত আণবিক গঠন-তত্ত্বগুলি বহু আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ। প্রথম দিকে যৌগিক পদার্থের গঠন সম্পর্কে কেকিউলের আণবিক সংকেতের কল্পনা ও পাস্তুরের আবিষ্কৃত আণবিক তত্ত্বের উল্লিখিত তথ্যাদিতে পদার্থের গঠন-রহস্যের কেবল একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র দিয়েছিল; এ-সব জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষের কি কাজে লাগবে, অনেকেরই এরূপ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়; এ-সব তথ্যের উপরে নির্ভর করে ক্রমে বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানী বহু সংখ্যক জৈব যৌগিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে রসায়নাগারেই উৎপাদন করেন, যাদের অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না। কেবল তা-ই নয়, বহু প্রাকৃতিক যৌগ কৃত্রিম পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়ে অল্প কালেই রসায়নের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

সংশ্লেষণী রসায়ন (প্রথমাংশ)

আণবিক গঠন ও পদার্থের বৈচিত্র্য ; রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার মূল কথা : সংশ্লেষিত কৃত্রিম যৌগ — প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রসায়ন : কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে উপজাত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে অসংখ্য মূল্যবান যৌগ গঠন ; আলকাত্‌রা বা 'কালো সোনা'র প্রধান উপাদান : বেঞ্জিন ও তার রাসায়নিক পরিচয় ও ব্যবহার ; টলুইন থেকে টি-এন-টি ; ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিড, ন্যাপ্‌থলিন ও অ্যান্‌থ্‌রাসিন ; আলকাত্‌রা থেকে রঞ্জক পদার্থ অ্যালিজারিন, অ্যানিলিন প্রভৃতি প্রাকৃতিক রং-এর বিকল্প ; কৃত্রিম নীল ইণ্ডিগোটিন ও সাদা-নীল ; টাইরিয়ান পার্পল, ইণ্ড্যান্‌থ্রিন রং : সংশ্লেষিত ঔষধপত্র— আয়েট্রো-কেমিষ্ট্রি ও প্রাকৃতিক ভেষজ ; বিভিন্ন সংশ্লেষিত বীজবারক ঔষধ—ক্লোর‍্যামাইন, অ্যাক্রিফ্লেভিন প্রভৃতি ; রোগ-জীবাণুধ্বংসী ঔষধ পেনিসিলিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ; সংজ্ঞাহারক ঔষধ—ক্লোরোফর্ম, ইথার প্রভৃতি ; উদ্ভিজ্জ কোকেইন ও সংশ্লেষিত নোভোকেইন, অ্যামিথোকেইন, অ্যাড্রিনেলিন প্রভৃতি ; হিপ্‌নটিক ঔষধ—ক্লোর‍্যাল, লুমিন্যাল, ভেরোনল প্রভৃতি বার্বিচুরেট যৌগ, ট্রাঙ্কুইলাইজার : কুইনিনের বিকল্প ফেনাসিটিন, অ্যাস্পিরিন প্রভৃতি ও জীবাণুধ্বংসী ঔষধ মেপাক্রিন, অ্যাটিব্রিন প্রভৃতি ; স্যালভার্সান আবিষ্কার, কালাজ্বরে ইউরিয়া-ষ্টিবামিন ; রোগ-জীবাণুনাশক বিভিন্ন সাল্‌ফা-ড্রাগসমূহ ; কীটনাশক ঔষধ—পাইরেথ্রিন ; সংশ্লেষিত যৌগ ডি-ডি-টি, গ্যামাক্সেন প্রভৃতি।

রসায়নের দৃষ্টিতে পদার্থের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা মূলতঃ তার আণবিক গঠন-কাঠামো, অর্থাৎ যৌগের অণুর সংগঠক পরমাণুদের পারস্পরিক সংযোগ-বিন্যাসের বিভিন্নতার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ; রাসায়নিক গবেষণার ফলে এ-কথা ক্রমে প্রমাণিত হয়েছে। কোন পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ ও নতুন-নতুন যৌগের সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার নানামুখী গবেষণার ফলে পদার্থের আণবিক গঠন সম্পর্কীয় তথ্যাদি ধীরে ধীরে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের হাতে পদার্থের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি-কাঠি এনে দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যৌগের আণবিক গঠন সম্পর্কে যখন কেকিউলের পরিকল্পনা, ভ্যাণ্ট হফের যুক্তি ও পাস্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল (পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত) প্রচারিত হয়, তখন অনেকেই আণবিক গঠন-তত্ত্বের সে-সব

গবেষণাকে পদার্থের গঠন-রহস্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ বলেই মনে করেছেন; বাস্তব জীবনের কোন কাজে এ-সব জ্ঞান লাগবে বলে কেউ ভাবতে পারেন নি। কিন্তু বিগত শতাধিক বছরে বিভিন্ন দেশের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ঐ তত্ত্বের ভিত্তিতে অদম্য উৎসাহ ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির বলে রসায়নের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের আণবিক গঠন নির্ধারণ ও তারই আলোকে নতুন নতুন যৌগের সংশ্লেষণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীরা মানব-কল্যাণে রসায়নের অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটিয়েছেন। সৃষ্টি হয়েছে **সংশ্লেষণী রসায়ন** বা 'সিন্থেটিক কেমিস্ট্রি' নামে রসায়নের এক নতুন শাখা। মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থের বহু বিকল্প-যৌগ গঠিত হয়েছে ও সম্পূর্ণ কৃত্রিম পদার্থ সংশ্লেষিত হয়েছে। বিশেষতঃ সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় জৈব রাসায়নিক যে-সব নতুন যৌগ উৎপাদিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে আণবিক গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পূর্বসূরীদের অর্জিত বিবিধ জ্ঞান ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল।

পদার্থের আণবিক গঠন-বিন্যাসের বৈচিত্র্য ও পদার্থের অন্তর্নিহিত পরমাণু-সংযোগের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কেবল যে অসংখ্য অজ্ঞাত ও অপ্রাকৃত কৃত্রিম যৌগই গঠন করেছেন, তা-ই নয়; তাঁরা প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে প্রকৃতিজাত বহু পদার্থের রাসায়নিক বিকল্প, এমন কি, উৎকৃষ্টতর কৃত্রিম পদার্থও উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রমে যৌগের আণবিক গঠন সম্পর্কিত রাসায়নিক জ্ঞানের ও নতুন যৌগ উৎপাদন-পদ্ধতির এত উন্নতি ঘটেছে যে, সংশ্লেষিত কৃত্রিম পদার্থগুলি অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর ও সুলভ হয়ে প্রাকৃতিক পদার্থের উৎপাদন ও ব্যবহার চিরতরে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এদেশে উদ্ভিজ্জ নীল উৎপাদনের জন্যে এক সময় বিদেশীদের যে উদ্যম ও অত্যাচার ছিল রাসায়নিক পদ্ধতিতে (ন্যাপ্থলিনের সংশ্লেষণে) **কৃত্রিম নীল** উৎপাদিত হওয়ায় সে নীলের চাষই সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ক্রমে রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতির বিপুল ও বহু-ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে; আর তার ফলে এ-যুগে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সুখ-সম্ভোগের বিবিধ উপকরণ উৎপাদনের বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠেছে। এভাবে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। যাহোক, রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও কৃত্রিম যৌগ উৎপাদনের বিষয় আমরা এই অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিজাত পদার্থই হোক, বা রসায়নাগারে প্রস্তুত কৃত্রিম যৌগই হোক, সর্বক্ষেত্রেই আণবিক গঠনের পরিবর্তন ও সংযোজন প্রক্রিয়ার সার্থক রূপায়নের জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ জানা আণবিক গঠনের পদার্থ নিয়েই কাজ সুরু করেন। সেই মূল পদার্থগুলি সুক্রোজ, সেলুলোজ প্রভৃতি স্বভাবজাত যৌগ হতে পারে, অথবা প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে সহজে যে-সব যৌগ পাওয়া যায়, যেমন—কয়লা, কাঠ প্রভৃতি থেকে বেঞ্জিন, অ্যালকোহল প্রভৃতিও হতে পারে। আবার এ কাজ সুরু করা যায় সাধারণ ও সুপরিচিত মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ নিয়েও ; যেমন—জল থেকে হাইড্রোজেন, বায়ু থেকে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন, কয়লা থেকে কার্বন, অ্যান্থ্রাসিন প্রভৃতি নিয়ে। এ-সব মূল উপাদানের আণবিক গঠন-কাঠামোকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংযোজিত ও পরিবর্তিত করে নতুন আকার-আকৃতির বৃহত্তর অণু গঠন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থের উৎপত্তি ঘটে ; কারণ, আমরা জানি, পদার্থের অণুর গঠনে পরমাণুদের বিভিন্ন সংখ্যা ও পারস্পরিক সংযোগ-বিন্যাসের বিভিন্নতার উপরেই পদার্থের বিভিন্ন গুণ ও ধর্মের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। বস্তুতঃ আণবিক গঠনের বিভিন্নতাই পদার্থের গুণ ও ধর্মের প্রকৃত নিয়ামক।

উনবিংশ শতাব্দীতে আল্‌কাতরার (কোল-টার) বিভিন্ন উপজাত পদার্থকে ভিত্তি করে বহুবিধ কৃত্রিম পদার্থের নানা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-শিল্প গড়ে উঠেছে। কোল-টারের বিভিন্ন উপাদান থেকে সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে বহু প্রয়োজনীয় পদার্থের পরস্পর-নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাদের মূল উপাদান হলো প্রধানতঃ কয়লা, তথা আল্‌কাতরা। পরবর্তীকালে জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ারও দ্রুত প্রসার ঘটেছে, যার ফলে আরও অনেক উৎপাদন-শিল্প ক্রমে গড়ে উঠেছে যাদের কাঁচা মাল সংগৃহীত হয়েছে **পেট্রোলিয়াম** (পৃঃ 221) থেকে। আল্‌কাতরার মত খনিজ পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন উপাদানকে ভিত্তি করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহু গুরুত্বপূর্ণ কৃত্রিম জৈব পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে। রসায়নের এ এক চমকপ্রদ অধ্যায় !

জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষণ

কয়লা থেকে :

অন্তর্ধূম-পাতন প্রক্রিয়ায় খনিজ কয়লা থেকে কেবল বিভিন্ন জ্বালানী গ্যাসের মিশ্রণই নয়, যথেষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাসও পাওয়া যায় ; আর

পাওয়া যায় এক রকম কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘন তরল পদার্থ, যাকে বলে আল্‌কাতরা বা **কোল-টার**। পদার্থটা যতই বিশ্রী হোক না কেন, রাসায়নিক বিচারে এটা মানব-কল্যাণে বহু মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান জুগিয়েছে। কোল-টার সম্পর্কে আমরা 'বিভিন্ন জ্বালানী : তাপ ও আলোক' শীর্ষক অধ্যায়ে আগেই (পৃষ্ঠা 188) আলোচনা করেছি। জিনিসটা দেখতে কুরূপ হলেও এত মূল্যবান যে, একে 'কালো সোনা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রসায়ন-বিজ্ঞানীদের বহু পরিশ্রম ও সাধনার ফলে আল্‌কাতরা থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় অসংখ্য পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে; যেমন, নানা রকম রোগ-নাশক ও প্রতিষেধক **ঔষধ**, অতি শক্তিশালী বিভিন্ন **বিস্ফোরক**, ফটোগ্রাফির কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, স্বভাবজ ফুলের নির্য্যাসের অনুরূপ বিভিন্ন সংশ্লেষিত সুগন্ধী দ্রব্য এবং নানা প্রকার **রঞ্জক** পদার্থ, যাদের বর্ণশোভা ও চাক্‌চিক্য প্রাকৃতিক কোন পদার্থেও মেলে না। কেবল তা-ই নয়, আল্‌কাতরা থেকে পাওয়া যায় **স্যাকারিন**, যার মিষ্টত্ব স্বভাবজ চিনির পাঁচশ' গুণেরও বেশি। আবার নানা রকম সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে কয়লা ও আল্‌কাতরা থেকে উৎপাদিত হয়েছে প্লাস্টিক ও রাবারের অনুরূপ বিভিন্ন পদার্থ; যাদের বিরাট সব উৎপাদন-শিল্প নানা দেশে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে আল্‌কাতরা বা কোল-টার মানুষের প্রয়োজনীয় অসংখ্য পদার্থের উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা মালের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার-স্বরূপ। মানব-কল্যাণের নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য অবদান জুগিয়েছে এই আল্‌কাতরা বা কোল-টার, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও একটা বিশ্রী অকেজো জিনিস বলে লোকে ফেলে দিত। এমন কি, এই মহামূল্য আল্‌কাতরা সে-যুগে কাঁচা-কয়লা থেকে কোল-গ্যাসের (পৃষ্ঠা 199) উৎপাদন-শিল্পে একটা প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাহোক, খনিজ পেট্রোলিয়ামকে বিশেষ পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে পরিষ্কৃত ও বিশোধিত করবার কালে যেরূপ বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যায় (পৃঃ 222), তেমনি আল্‌কাতরাকে পাতিত করলেও বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পদার্থ (পৃঃ 189) নিষ্কাশিত হয়ে বেরিয়ে আসে, আর বিভিন্ন যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সেগুলিকে পৃথক করে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আল্‌কাতরা থেকে এভাবে উপজাত পদার্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

তরল পদার্থ

বেঞ্জিন …… স্ফুটনাংক — 80·5° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড
টলুইন …… " — 111·0° " "

কঠিন পদার্থ

কার্বলিক অ্যাসিড, বা ফেনল … গলনাংক — 41° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড
ন্যাপ্‌থলিন … … " — 80° " "
অ্যান্‌থ্রাসিন … … " — 213° " "

খনিজ কয়লা থেকে নিষ্কাশিত উল্লিখিত উপাদানগুলিকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যে-সব শিল্প-প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছে তার কিছু বিবরণ নিচে সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো :

বেঞ্জিন, C_6H_6 : একটা তরল রাসায়নিক পদার্থ; যাকে শিল্পক্ষেত্রে সাধারণতঃ বলা হয় 'বেঞ্জোল'। এই জৈব পদার্থটি নিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয় **অ্যানিলিন** নামক এক প্রকার বর্ণহীন তৈলাক্ত পদার্থ। এটা বস্তুতঃ বেঞ্জিনের আণবিক গঠনের ছ'টি হাইড্রোজেন-পরমাণুর মধ্যে একটি বিচ্যুত হয়ে তার জায়গায় NH_2-মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে গঠিত হয়; কাজেই অ্যানিলিনের আণবিক গঠন $C_6H_5NH_2$ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই জৈব যৌগটা প্রকৃতিতে উদ্ভিজ্জ নীলের একটি উপাদান হিসাবে পাওয়া যেত। যাহোক, আল্‌কাতরা থেকে পাওয়া বেঞ্জিনকে রূপান্তরিত করা হয় অ্যানিলিনে; আর এই অ্যানিলিনকে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় নানা রকম রং বা রঞ্জক পদার্থ; যাদের ইংরেজীতে বলা হয় **অ্যানিলিন ডাই**। এই অ্যানিলিন-ঘটিত রঞ্জক পদার্থগুলিই সংশ্লেষিত কৃত্রিম রাসায়নিক রং হিসেবে সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়েছিল; ক্রমে আল্‌কাতরার অন্যান্য উপজাত পদার্থ থেকে আরও বহুসংখ্যক কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে। বেঞ্জিন কেবল অ্যানিলিন-রঞ্জক প্রস্তুতির রাসায়নিক শিল্পেই ব্যবহৃত হয় না; মোটর গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে পেট্রলের সঙ্গেও বেঞ্জিন মেশানো হয়। আবার বেঞ্জিনের (C_6H_6) আণবিক গঠন-সংস্থানের (ষড়ভূজ বিন্যাস, পৃঃ 385) দুই বিপরীত প্রান্তস্থ দু'টি হাইড্রোজেন-পরমাণুকে দুটি ক্লোরিন-পরমাণু দিয়ে প্রাতিস্থাপিত করলে পাওয়া যায় **প্যারাডাইক্লোরো-**

বেঞ্জিন ($Cl.C_6H_4.Cl$) নামক একটি নতুন যৌগ, যা একটি শক্তিশালী কীটনাশক (ইন্‌সেক্‌টিসাইড) পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টলুইন, $C_6H_5.CH_3$: কোল-টার থেকে উপজাত এটিও একটি বর্ণহীন তরল পদার্থ; কখন-কখন 'টলুয়ল' নামে পরিচিত। রাসায়নিক গঠনের বিচারে পদার্থটিকে **মিথাইল-বেঞ্জিন** বলা যায়। টলুইন থেকেও নানা রকম রঞ্জক-পদার্থ প্রস্তুত হয়ে থাকে ; আবার একটি অতি উচ্চ শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ **ট্রাইনাইট্রো-টলুইন** (টি. এন. টি) উৎপাদনেও (পৃঃ 311) এর ব্যবহার সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। টলুইনের যে আণবিক সংকেত দেওয়া হয়েছে ($C_6H_5.CH_3$) তা থেকে সহজেই বুঝা যায়, বেঞ্জিনের একটি হাইড্রোজেন-পরাণুর জায়গায় একটি মিথাইল-মূলক (CH_3) প্রতিস্থাপিত হয়ে টলুইন সৃষ্টি হয়, তাই একে মিথাইল-বেঞ্জিনও বলা যেতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক পদার্থের বিপুল চাহিদা মেটাতে কয়লা, তথা আল্‌কাতরা থেকে প্রাপ্ত টলুইনে সম্যক প্রয়োজন মেটে না; তাই এই হাইড্রোকার্বন যৌগটি কখন-কখন খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকেও উৎপাদিত হয়ে থাকে।

ফেনল বা **কার্বলিক অ্যাসিড,** C_6H_5OH : বীজবারক পদার্থ হিসেবে যৌগটি সুপরিচিত, তীব্র ক্ষয়কারী একটি কঠিন পদার্থ। মূলতঃ পদার্থটা বেঞ্জিনের একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি হাইড্রক্সিল (OH)-মূলকের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গঠিত হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই কার্বলিক অ্যাসিড থেকে বিস্ফোরক পদার্থ **পিক্রিক অ্যাসিড,** মেলিনাইট প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদিত হয়ে থাকে। 'পদার্থ ও শক্তি : বিভিন্ন বিস্ফোরক' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ-বিষয়ে আগেই যথোচিত আলোচনা করেছি। আবার রঞ্জক ও প্লাস্টিক পদার্থ উৎপাদনের বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পেও ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিডের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। কোল-টার থেকে আবার **ক্রিসল** নামক একটা যৌগ পাওয়া যায়, যা কার্বলিক অ্যাসিডের একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি মিথাইল (CH_3)-মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গঠিত হয় ; যার রাসায়নিক সংকেত হলো $CH_3.C_6H_4.OH$ । এ থেকে বুঝা যায়, বেঞ্জিনই (C_6H_6) মূল যৌগ, যার একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি হাইড্রক্সিল (OH)-মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে উৎপন্ন হয় ফেনল বা কার্ববিক অ্যাসিড ; পরে আবার আর একটি হাইড্রোজেন-পরমাণু একটি মিথাইল (CH_3)-মূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে গঠিত হয় ক্রিসল। এই দ্বি-মূলক হাইড্রোকার্বনটি বর্ণহীন তরল বা স্ফটিকাকারে কঠিন তিনটি

বিভিন্ন আইসোমেরিক যৌগরূপে পাওয়া যায়। এই তিন রকম ক্রিসলই **লাইসল,** কার্বলিক পাউডার প্রভৃতি বীজবারক ঔষধ উৎপাদনে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার কোন কোন রঞ্জক পদার্থ, বিস্ফোরক ও প্লাষ্টিক পদার্থ উৎপাদনের রাসায়নিক শিল্পেও ক্রিসল ব্যবহৃত হয়।

ন্যাপ্‌থলিন, $C_{10}H_8$: কোল-টারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপজাত পদাথ; জিনিসটা দেখতে সাদা, বিশেষ একটা গন্ধযুক্ত কঠিন পদার্থ। পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে কাপড়-চোপড় সংরক্ষণের জন্যে পদার্থটা ছোট ছোট গোলকের আকারে বাজারে বিক্রয় হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় বেঞ্জিনের দুটা ষড়ভূজাকৃতি অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে ন্যাপ্‌থলিনের বিশেষ আণবিক গঠন-বিন্যাসের উৎপত্তি ঘটায়। আল্‌কাতরা ও পেট্রোলিয়াম উভয়ের থেকেই বিশেষ আংশিক পাতন-পদ্ধতির সাহায্যে ন্যাপ্‌থলিন পাওয়া যায়। বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ, বিশেষতঃ **ইণ্ডিগোটিন** নামক নীল-রং প্রস্তুত করতে ন্যাপ্‌থলিন ব্যবহৃত হয় মূল উপাদান হিসেবে। অনুঘটক হিসেবে নিকেল ধাতুর চূর্ণের উপস্থিতিতে চাপিত অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসের মধ্যে ন্যাপ্‌থলিন উত্তপ্ত করলে তার সঙ্গে হাইড্রোজেনের সংযোগ (হাইড্রোজেনেসন, পৃষ্ঠা 279) ঘটে, যার ফলে **টেট্রালিন**, $C_{10}H_{12}$, ও **ডেকালিন,** $C_{10}H_{18}$, নামক দু'রকম তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়। উৎকৃষ্ট দ্রাবক হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পে এ-দুটি তরল পদার্থের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় ন্যাপ্‌থলিন এক রকম মোমের মত নরম পদার্থে পরিণত হয়; কিন্তু জিনিসটা হয় অদাহ্য।

অ্যান্‌থ্রাসিন, $C_{14}H_{10}$: কোল-টার থেকে নিষ্কাশিত হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যে সব চেয়ে উচ্চগলনাংক-বিশিষ্ট একটি কঠিন পদার্থ। মূল কাঁচামাল হিসেবে একে ব্যবহার করে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বহুবিধ উৎকৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ (ডাই) প্রস্তুত হয়ে থাকে; বিশেষতঃ **অ্যালিজারিন** নামক বিশেষ পরিচিত লাল রং অ্যান্‌থ্রাসিনের অণুর সঙ্গে তিনটি বেঞ্জিন-অণুর পারস্পরিক সংযোগে গঠিত একটি জটিল গঠনের পদার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্‌কাতরা বা কোল-টার থেকে উপজাত উল্লিখিত পদার্থগুলি, দেখা গেল, বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এগুলি আল্‌কাতরার অজস্র হাইড্রোকার্বন-উপাদানের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। আল্‌কাতরা থেকে আরও বহু হাইড্রোকার্বন যৌগিক পাওয়া যায়, যাদের সংখ্যা ও পরিমাণ মূল কাঁচা কয়লার প্রকৃতির উপরেই কেবল নির্ভর করে না, পরন্তু তার

পাতন-ক্রিয়ার তাপমাত্রা ও উপজাত আল্‌কাতরার আংশিক পাতন-ক্রিয়া ঘটানোর নিপুণতার উপরেও বিশেষভাবে নির্ভর করে। কয়লা থেকে জ্বালানী গ্যাস উৎপাদনের কারখানায় যে তাপমাত্রায় কাঁচা কয়লা উত্তপ্ত করা হয় তাতে উপজাত আল্‌কাতরার থেকে বেঞ্জিন ও টলুইন পাওয়া যায় আল্‌কাতরার শতকরা মোট 3 ভাগ মাত্র, ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিড পাওয়া যায় মাত্র এক ভাগ, আর অ্যান্‌থ্রাসিন 0·5 ভাগ। এই হিসেবে এক টন কয়লা থেকে মোটামুটি প্রায় $3\frac{1}{2}$ পাউণ্ড বেঞ্জিন ও টলুইন, $1\frac{1}{4}$ পাউণ্ড ফেনল, 6 পাউণ্ড ন্যাপ্‌থলিন ও মাত্র 10 আউন্স অ্যান্‌থ্রাসিন পাওয়া যায়।

আল্‌কাতরা থেকে রঞ্জক দ্রব্যাদি

আবহমান কাল থেকে মানুষ বিবিধ রঞ্জক পদার্থের জন্যে প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে এসেছে। স্বভাবজ নানা রকম উদ্ভিজ্জ রস ও প্রাণিজ রঙিন পদার্থ দিয়েই মানুষ তার দেহ ও পোষাক-পরিচ্ছদ নানা বর্ণে রঞ্জিত করে সন্তুষ্ট ছিল। নীল রঙ পেত নীলগাছ থেকে, যার এক সময় প্রচুর চাষ হতো; আর তা থেকে নিষ্কাশিত হতো 'ইণ্ডিগোটিন' নামক নীলবর্ণের একটি জৈব পদার্থ। লাল রঙের এক রকম রঞ্জক পদার্থ **অ্যালিজারিন** পাওয়া যেত 'ম্যাডার' নামক এক রকম উদ্ভিদের মূল থেকে। এদেশে শেফালিকা ফুলের ও মেহেদি পাতার রস রঞ্জক-পদার্থ হিসেবে আজও পল্লীঅঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোচিনিল নামক ক্ষুদ্র এক রকম পোকার দেহ-রস থেকে তৈরি হতো উজ্জ্বল লাল রং; আবার 'সেল-ফিস' নামক এক রকম শামুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী থেকে পাওয়া যেত সেকালের বিখ্যাত **টাইরিয়ান পার্পল** বা বেগুনী রং। এরূপ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন রং দিয়ে প্রাচীনকালের মানুষ বস্ত্রাদি রঞ্জনের কাজ চালিয়ে এসেছে 1856 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বছর জন পার্কিন নামক জনৈক জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী প্রথম সংশ্লেষিত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ (নীল) উৎপাদন করেন। আল্‌কাতরা থেকে উপজাত বেঞ্জিন (C_6H_6) থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত করে যে মিথাইল-বেঞ্জিন বা অ্যানিলিন ($C_6H_5.NH_2$) নামক তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত ও জারিত (অক্সিজেন-সংযুক্ত) করে এই কৃত্রিম নীল প্রস্তুত হয়। এর পর থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় **অ্যানিলিন** থেকে আরও শত শত কৃত্রিম

রঞ্জক পদার্থ বিজ্ঞানীরা সংশ্লেষিত করেছেন। কেবল বেঞ্জিন বা অ্যানিলিনই নয়; টলুইন, ন্যাপ্‌থলিন ও অ্যানথ্রাসিনকে ভিত্তি করেও বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বহুবিধ রঞ্জক পদার্থ সংশ্লেষিত হয়েছে। এ-সব কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থগুলির ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণশোভা কোন-কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রঞ্জকগুলির চেয়েও বহুলাংশে সুদৃশ্য ও মনোরম হয়ে থাকে। মাত্র শতাধিক বছর আগেও কয়লা-শিল্পে যে দুর্গন্ধযুক্ত কালো-কুৎসিত থক্‌থকে পদার্থ আল্‌কাতরাকে একটা অকেজো জঞ্জাল বলে মনে করা হতো তা থেকে আজ নানা (পৃষ্ঠা 189) প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদিত হচ্ছে; কেবল রং-ই নয়, নানা রকম ঔষধ, সুগন্ধ দ্রব্যাদির জৈব যৌগিক প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ও সংশ্লেষিত হচ্ছে। মানব-কল্যাণে রসায়নের এ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাশ্চর্য অধ্যায়!

কোল-টারের বিভিন্ন উপাদান থেকে যে-সব কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে তাদের রাসায়নিক গঠন ও প্রস্তুত-প্রণালীর বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়; এদের অধিকাংশই বিশেষ জটিল গঠনের জৈব যৌগিক পদার্থ। এ-সব জটিল যৌগের রাসায়নিক আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে। তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এ-যুগের কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থগুলির রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতি ও উৎপাদিত যৌগগুলির গঠন-বৈচিত্র্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান আজ রসায়ন-বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হয়েছে। যে-কোন বর্ণ ও আভাযুক্ত কৃত্রিম রঞ্জক দ্রব্য উৎপাদনের সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীরা আজ অতি দক্ষতার সঙ্গে অবলম্বন করতে পারেন। যাহোক, শত শত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ যদিও সংশ্লেষিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এগুলি মূলতঃ প্রাকৃতিক পদার্থেরই কৃত্রিম বিকাশ মাত্র। কয়লা মূলতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিকৃত রূপ; আর তাই কয়লা বা আল্‌কাতরা থেকে উপজাত পদার্থ সবই প্রকৃতির দান, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আল্‌কাতরা থেকে যে অ্যালিজারিন, ইণ্ডিগোটিন প্রভৃতি উৎপাদিত হয় তা মূলতঃ প্রাকৃতিক বা উদ্ভিদ-জাত পদার্থই। অবশ্য সম্পূর্ণ রাসায়নিক উপাদানে ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে অনেক কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের এমন সব জৈব যৌগও সংশ্লেষিত হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক পদার্থের কোন সুদূর সংস্রবও নেই। জৈব রসায়নের এ এক কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিভিন্ন রসায়ন-বিজ্ঞানীর নিরলস গবেষণার ফলে নানা রকম স্বভাবজ যৌগের রাসায়নিক উপাদান ও আণবিক গঠন-বিন্যাসের সম্যক পরিচয় জানা গেছে; আর সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে

পরে বিজ্ঞানীরা সেই সব উপাদানকে অনুরূপভাবে সংযোজিত করে সম্পূর্ণ কৃত্রিম যৌগ উৎপাদন করতেও সক্ষম হয়েছেন। এরূপ সংশ্লেষিত যৌগগুলি প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থগুলির কেবল হুবহু বিকল্প বা অনুরূপই নয়, অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর হয়ে থাকে। আবার তাদের উৎপাদন-ব্যয়ও প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে নিষ্কাষিত রঞ্জকগুলির চেয়ে অনেক কম পড়ে। এ থেকে বলা যায়, আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান প্রকৃতিকে হার মানিয়েছে!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এক সময় হাজার হাজার একর জমিতে ম্যাডার নামক এক রকম উদ্ভিদের চাষ হতো। সেই ম্যাডারের মূল পিষে-থেত্‌লে পঁচানো হতো, আর তা থেকে পাওয়া যেত 'অ্যালিজারিন' শ্রেণীর একটা প্রাকৃতিক জৈব পদার্থ; যার জলীয় দ্রবণে বস্ত্রাদি উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত হতো। এটা প্রাচীন যুগের বহুল প্রচলিত লাল রঙ, যাকে বলা হতো **'টার্কি রেড'**। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ম্যাডারের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে; সে-সব জমি এ-যুগে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কোল-টার অর্থাৎ আল্‌কাতরার বিশেষ উপাদান **অ্যানথ্‌রাসিন** থেকে বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় ঐ অ্যালিজারিন উৎপাদন করেছেন। হাইড্রো-কার্বন অ্যানথ্রাসিনকে ($C_{14}H_{10}$) প্রথমে রূপান্তরিত করা হয়েছে **অ্যানথ্রাকুইনোন** ($C_{14}H_8O_2$) যৌগে; তার পরে সেই অ্যানথ্রাকুইনোন থেকে গঠিত হয়েছে ডাইহাইড্রক্সি-অ্যান্‌থ্রা-কুইনোন [$C_{14}H_6O_2(OH)_2$], যার বিশেষ নাম **অ্যালিজারিন**। পরবর্তী-কালে অ্যালিজারিন উৎপাদনের জন্যে আরও সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। কোল্‌-টার থেকে উপজাত হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যে **ন্যাপ্‌থলিন** পাওয়া যায় প্রচুর; আর তা থেকে উৎপাদিত হয় থ্যালিক

ঘোড়ার সাহায্যে ম্যাডার-মূল পিষে তার রস নিষ্কাশিত করা হতো

অ্যান্‌হাইড্রাইড। অনুঘটক হিসাবে অ্যালুমিনিয়াম-ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে বেঞ্জিন (C_6H_6) ও এই থ্যালিক আন্‌হাইড্রাইড এক সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যানথ্রাকুইনোন উৎপন্ন হয়, যাকে সহজেই ডাইহাইড্রক্সি-অ্যান্‌থ্রাকুইনোন, বা অ্যালিজারিনে রূপান্তরিত করা যায়। এই পদ্ধতিতে অ্যালিজারিনের শিল্প-উৎপাদন যথেষ্ট সহজসাধ্য হয়েছে; আর 'ম্যাডার' থেকে নিষ্কাশিত উদ্ভিজ্জ বা প্রাকৃতিক অ্যালিজারিনের চেয়ে এই **কৃত্রিম অ্যালিজারিন** দামে অনেক সস্তা হয়েছে। এর ফলে অল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীতে ম্যাডার উদ্ভিদের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে।

একই অবস্থা হয়েছে 'ইণ্ডিগোফেরা' বা নীল-উৎপাদক উদ্ভিদ চাষের ক্ষেত্রেও। বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নীলের চাষ হতো; অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে এই নীল-চাষের জন্যে বিদেশী নীলকর বণিকদের প্রজা-পীড়ন ও সামাজিক বিপর্যয়ের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়ে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার নীল এ-দেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হতো; বস্তুতঃ ভারতীয় নীলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর চাহিদা বহুলাংশে মিটতো। জার্মান বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘ গবেষণার ফলে 1897 খৃষ্টাব্দে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল সংশ্লেষিত হয়ে রঞ্জন-শিল্পে যুগান্তর ঘটে যায়। উদ্ভিজ্জ নীলের চেয়ে এই কৃত্রিম নীল দামে অনেক সস্তা হওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই উদ্ভিজ্জ নীলের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। রাসায়নিক বিচারে অবশ্য (উদ্ভিজ্জ) প্রাকৃতিক নীল ও সংশ্লেষিত কৃত্রিম নীলের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। প্রাকৃতিক নীল বা 'ইণ্ডিগো' হলো একটা রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ, যার নীল-রঙের মুখ্য উপাদান হলো **ইণ্ডিগোটিন** নামক প্রকৃতিজাত একটা রাসায়নিক যৌগ; আর সংশ্লেষিত কৃত্রিম নীল হলো বিশুদ্ধ ইণ্ডিগোটিন। কাজেই রঞ্জন-শিল্পে কৃত্রিম নীলের উপযোগিতা উদ্ভিজ্জ নীলের থেকে কিছুটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নততর।

কৃত্রিম নীল বা ইণ্ডিগোটিনের শিল্প-উৎপাদনে নানা রকম জটিল রাসায়নিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্রভৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কাজেই সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতির দ্রুত সম্পাদন ও রাসায়নিক উপাদান-গুলির বিশুদ্ধতা ও মূল্যের উপরে কৃত্রিম নীলের শিল্প-উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে। মূলতঃ আলকাতরা থেকে উপজাত হাইড্রোকার্বন **ন্যাপ্‌থলিন**

($C_{10}H_8$) থেকে ইণ্ডিগোটিনের সংশ্লেষণ-পদ্ধতির কাজ সুরু হয়। পোকা মাকড়ের আক্রমণ থেকে বস্ত্রাদি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত একান্ত পরিচিত সাদা এই হাইড্রোকার্বনটি হলো কৃত্রিম নীলের মূল উপাদান, এ-কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ন্যাপ্থলিনকে প্রথমে **থ্যালিক অ্যাসিড** ($C_6H_4.COOH.COOH$) নামক একটা যৌগে রূপান্তরিত করা হয়, যা শেষে থ্যালিক অ্যান্হাইড্রাইড ($C_6H_4.CO.CO.O$) যৌগে পরিণত হয়। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতরে ন্যাপ্থলিন উত্তপ্ত করলে এই রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে থাকে ; কিন্তু রূপান্তরটা সহজে ঘটে না, দীর্ঘ সময় লাগে। কাজেই প্রক্রিয়াটা যথেষ্ট ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ বলে এভাবে কৃত্রিম নীল বা ইণ্ডিগোটিনের শিল্প-উৎপাদন নিরর্থক হয়ে পড়ে। কিন্তু সহসা এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় একান্ত দৈবক্রমে। ন্যাপ্থলিনের উল্লিখিত রূপান্তর-ক্রিয়ার সময়ে উত্তপ্ত পাত্রের মধ্যে দৈবাৎ একটা থার্মোমিটার ভেঙ্গে গিয়ে তার পারা বা **মার্কারি** ভিতরের মাল-মশলার সঙ্গে মিশে যায় ; আর দেখা যায় যে, আকাঙ্খিত রূপান্তর-ক্রিয়াটা অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়ে গেল ! এভাবে দৈবানুগ্রহে আবিষ্কৃত হয়ে যায় যে, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ন্যাপ্থলিন থ্যালিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে মার্কারি একটি উৎকৃষ্ট অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট, পৃঃ 269) কাজ করে। যাহোক, কৃত্রিম নীল বা ইণ্ডিগোটিন উৎপাদনের এই প্রাথমিক বিক্রিয়াটা সহজসাধ্য হওয়ায় ন্যাপ্থলিন থেকে স্বল্পব্যয়ে প্রচুর থ্যালিক অ্যাসিড ও পরে থ্যালিক অ্যান্হাইড্রাইড উৎপাদিত হয়, যার সঙ্গে ক্রমে অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন প্রভৃতির নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপাদিত হয় **ইণ্ডিগোটিন**। এ-সব প্রক্রিয়ার বিশদ রাসায়নিক আলোচনা এখানে সম্ভব ও সমীচীন হবে না। মোট কথা, অল্প কালের মধ্যেই অল্প মূল্যের এই সংশ্লেষিত কৃত্রিম নীলে বাজার ছেয়ে যায় এবং মূল্যের প্রতিযোগিতায় উদ্ভিজ্জ নীলের প্রচলন বন্ধ হয়।

অবশ্য কৃত্রিম নীলের উল্লিখিত উৎপাদন-পদ্ধতি পরে পরিত্যক্ত হয়েছে। আরও সহজ ও স্বল্প-ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়ে এই রাসায়নিক শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে কৃত্রিম নীল আরও সস্তা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে উত্তাপের সাহায্যে ন্যাপ্থলিনকে বাষ্পীভূত করে বায়ুর অক্সিজেনের সংযোগে তাকে জারিত করে সরাসরি থ্যালিক অ্যান্হাইড্রাইডে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। ন্যাপ্থলিনের এই রূপান্তর-ক্রিয়ায় **ভ্যানাডিয়াম-পেণ্টক্সাইড** অনুঘটক

হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য এর পরবর্তী রাসায়নিক পদ্ধতিগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি; কিন্তু মোটের উপর এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীলের উৎপাদন-ব্যয় অনেক কমেছে।

রঞ্জন-শিল্পের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলির বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই; তথাপি প্রাকৃতিক নীল বা ইণ্ডিগো ব্যবহারের একটা বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা যেতে পারে। আমরা জানি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রেশম ও পশমের আঁশগুলিতে রঞ্জক পদার্থ সরাসরি লেগে গিয়ে রঙ্‌ ধরে যায়; কিন্তু সূতীবস্ত্রে রঙ ধরাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রঞ্জক পদার্থ ব্যবহারের আগে বস্ত্রাদিকে কোন-কোন রাসায়নিক ক্ষার লবণের (অ্যাল্‌কালি সল্ট) জলীয় দ্রবণে ভিজিয়ে নিতে হয়; রঞ্জন-শিল্পে এ-সব লবণকে বলে **মর্ড্যাণ্ট।** কিন্তু প্রাকৃতিক নীলের রঞ্জক-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের জন্য এক পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। পদার্থটা প্রকৃতপক্ষে জলে অদ্রাব্য বলে স্থায়ী নীল-রঙ (ফাস্ট কালার) ধরাতে ইণ্ডিগোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিজারিত করে একটা বর্ণহীন যৌগে রূপান্তরিত করা হয়, যাকে বলে **'সাদা নীল'**। এই সাদা-ইণ্ডিগো ক্ষারীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণে বস্ত্রাদি ভিজিয়ে নিয়ে খোলা হাওয়ায় শুকোতে দিলে বায়ুর অক্সিজেন ঐ সাদা-ইণ্ডিগোকে জারিত করে গাঢ় নীল বর্ণে রঞ্জিত করে। এই প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম আঁশগুলির অভ্যন্তরে সর্বত্র সমভাবে রঞ্জক-কণিকা প্রবেশ করে বস্ত্রাদি স্থায়ী নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়। অ্যালকালি বা ক্ষারীয় 'মর্ড্যাণ্ট' ব্যবহার করলে বস্ত্রাদি, বিশেষতঃ রেশম ও পশমের আঁশগুলি অনেক সময় বিকৃত বা বিনষ্ট হয়ে যায়; কাজেই আধুনিক রঞ্জন-শিল্পে প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ নীলের ব্যবহার-কালে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বিত হয়; মর্ড্যাণ্ট ব্যবহারের আর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য উদ্ভিজ্জ নীলের ব্যবহার আজকাল একান্ত সীমাবদ্ধ; সংশ্লেষিত রাসায়নিক নীল বা ইণ্ডিগোটিন অন্যান্য কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থের মত আজকাল সবিশেষ প্রচলিত হয়েছে; প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থের যুগ আর নেই।

রাসায়নিক ধর্মে উদ্ভিজ্জ নীলের সমগোত্রীয় হলো প্রাণিজ এক রকম বেগুনী রঙ, যাকে সেকালে বলা হতো **'টাইরিয়ান পার্পল'** এবং এটি একটি অতি মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই বেগুনী পদার্থটা এক রকম সামুদ্রিক শামুকের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব-রস মাত্র। কয়েক হাজার শামুক থেকে সামান্য কয়েক গ্রেন মাত্র এই রঞ্জক-পদার্থ সংগৃহীত

হতো, কাজেই এর দাম ছিল অত্যধিক ; কিন্তু এর দ্রবণের দু'-এক ফোঁটাতেই উজ্জ্বল বেগুনী বর্ণের রঞ্জন-শক্তি ছিল বিস্ময়কর। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, জিনিসটা ইণ্ডিগোটিনের সঙ্গে ব্রোমিনের মিলনে গঠিত একটা রাসায়নিক যৌগ এবং অপেক্ষাকৃত সহজেই যৌগটা সংশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। আজকাল উক্ত প্রাণিজ বেগুনী রঞ্জক-পদার্থটার অনুরূপ কৃত্রিম রঞ্জক প্রচুর পরিমাণে সংশ্লেষিত হচ্ছে ইণ্ডিগোটিনের প্রায় অনুরূপ প্রক্রিয়ায়। রঞ্জন-শিল্পে এ-ও রসায়নের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান।

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই অসংখ্য কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে ; বর্ণ-মাধুর্যে ও রঞ্জন-শক্তিতে যেগুলি বিশেষ কার্যকরী ও মূল্যবান বলে সর্বত্র স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এ-সব কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ প্রায় সবই কয়লা, তথা আল্‌কাতরা (কোল-টার) থেকে উপজাত বেঞ্জিন, টলুইন, অ্যান্‌থ্রাসিন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষিত হয়েছে। অ্যান্‌থ্রাসিনকে জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড) করে পাওয়া যায় আনথ্রাকুইনোন, এ-কথা আমরা আগেই বলেছি। এই অ্যান্‌থ্রাকুইনোন থেকে নানা রকম রঞ্জক পদার্থ উৎপাদিত হয়, রাসায়নিক বিচারে যেগুলি **ইণ্ড্যানথ্রিন** শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর সংশ্লেষিত রঞ্জকগুলি বর্ণোজ্জ্বলতায় ও স্থায়িত্বে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং এগুলিতে রঞ্জিত বস্ত্রাদি দীর্ঘ ব্যবহারেও অনুজ্জ্বল হয় না। অ্যান্‌থ্রাসিন-ঘটিত আর এক শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ কৃত্রিম রেশম বা 'অ্যাসিটেট রেয়ন' (পৃষ্ঠা 321) রঞ্জিত করতে বিশেষ উপযোগী। কোল-টার বা আল্‌কাতরা থেকে অ্যান্‌থ্রাসিন সামান্যই পাওয়া যায় ; তাতে রঞ্জন-শিল্পের প্রয়োজন মেটে না। কিন্তু রঞ্জন-শিল্পে প্রয়োজনীয় অ্যানথ্রা-কুইনোন যৌগটি আজকাল রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় সহজেই উৎপন্ন হচ্ছে। ন্যাপ্‌থলিন ও বেঞ্জিনকে জারিত করে প্রথমে থ্যালিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করা হয়, তারপরে তা থেকে ক্রমে সংশ্লেষিত হয় **অ্যানথ্রাকুইনোন**। আল্‌কাতরা থেকে অ্যান্‌থ্রাসিন পাওয়া যায় অতি সামান্য ; কিন্তু ইণ্ড্যানথ্রিন শ্রেণীর সংশ্লেষিত রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে সে-অভাব উল্লিখিত রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে দূর হয়েছে। আল্‌কাতরা থেকে উপজাত প্রধান হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যে কোন্‌টি কি পরিমাণে সাধারণতঃ পাওয়া যায় তার মোটামুটি হিসেব আমরা আগেই দিয়েছি। যাহোক, এই আলোচনা থেকে বুঝা গেল, সংশ্লেষিত কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থগুলির উৎপাদন-শিল্পে কোল-টারের হাইড্রোকার্বনগুলি এক বিরাট অবদান জুগিয়েছে, যার ফলে মানুষের

অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, তার তুলনা নেই।

সংশ্লেষিত ঔষধপত্র

মানব-কল্যাণে রসায়নের বহুমুখী অবদানের মধ্যে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ের জন্যে জীবাণুনাশক ও প্রতিষেধক ঔষধপত্র হিসাবে বিবিধ গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের আবিষ্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন যুগের অ্যাল্‌কেমিস্টরা প্রাকৃতিক পদার্থাদির রাসায়নিক গুণাগুণ নির্ধারণ ও রূপান্তর সাধনের উদ্দেশ্যে রসায়নের চর্চা করে আসছিলেন; কিন্তু ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রসায়নের চর্চা প্রধানতঃ ঔষধপত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। সে-যুগে মানবদেহে বিভিন্ন ভেষজ পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়া নির্ধারণ ও রোগ-নিরাময়ের জন্যে ধাতব ও উদ্ভিজ্জ ঔষধপত্রের প্রস্তুতিকে রসায়নের একমাত্র কাজ বলে মনে করা হতো। প্রকৃতপক্ষে সেকালের অ্যাল্‌কেমিস্টরা **আয়েট্রো-কেমিস্ট** বা চিকিৎসা-রসায়নবিদ বলে আখ্যাত হয়ে রয়েছেন। রসায়নের এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন **প্যারাসেল্‌সাস** নামক একজন গ্রীক অ্যাল্‌কেমিস্ট। বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতার রস ও নির্যাসাদির রোগনাশক গুণের রাসায়নিক চর্চা অবশ্য আজ সেকেলে-হাতুড়ে ব্যাপার; আধুনিক যুগের রাসায়নিকরা বিবিধ ঔষধপত্রের আবিষ্কারে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন প্রাচীন আয়েট্রো-কেমিস্টরা তার সহস্রাংশের একাংশও করতে পারেন নি; এমন কি, তা তাদের কল্পনারও অতীত ছিল। আজকাল কেবল গাছ-গাছড়ার নির্যাস ও তা থেকে পাওয়া কুইনিন, মর্ফিয়া প্রভৃতি প্রকৃতিজাত ঔষধ-গুণসম্পন্ন অবক্ষার (অ্যাল্‌কালয়েড)-গুলির নিষ্কাশন-পদ্ধতির প্রভূত উন্নতিই নয়, পরন্তু রাসায়নিক পদ্ধতিতে নূতন নূতন ঔষধ সংশ্লেষিত হয়েছে, যাদের সঙ্গে প্রকৃতির সংস্রব মাত্র নেই; একান্তভাবে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও তৎপরতার ফলে উৎপাদিত বিভিন্ন সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ। গাছ-গাছড়া থেকে সে-কালের ঔষধপ্রস্তুত-কারকরা এ-যুগে উন্নত ঔষধাদির উৎপাদক ও গবেষক বিজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছেন। তাই এ-যুগে বেদনানাশক, সংজ্ঞাহারী, নিদ্রাদায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও নানা রোগের নিরাময়-কারী ও রোগ-জীবাণু নাশক ঔষধপত্রের আবিষ্কার ও প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছে এবং তা মানুষের অশেষ কল্যাণকর ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিরাট

রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এখানে আমরা এ-সব রাসায়নিক ঔষধপত্রের উৎপাদন ও গুণাগুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক) **ঔষধাদি** : উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর অদৃশ্য বীজাণু বা **ব্যাকটিরিয়া** আবিষ্কার করেন, যাদের প্রভাবে জীবদেহে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় এবং জৈব পদার্থে পচন-ক্রিয়া ঘটায়। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী লর্ড লিস্টার কার্বলিক অ্যাসিড বা ফেনলের (পৃঃ 189) জলীয় দ্রবণ বীজবারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে শস্ত্র-চিকিৎসায় পচন-ক্রিয়ার আশঙ্কা দূর করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর পর থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বীজবারক বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের গঠন বা সংশ্লেষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ব্যাকটিরিয়া-নাশক বহু নতুন নতুন যৌগ উৎপাদন করতে সক্ষম হন। এ-সব বীজবারক পদার্থ এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে বীজাণুরা ধ্বংস হবে, অথচ রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলির স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হবে না। যদিও বীজবারক হিসেবে ক্লোরিনের কার্যকারিতা আগে থেকেই জানা ছিল, পানীয় জলে ক্লোরিন দিয়ে পরিশোধিত ও বীজাণুমুক্ত করা হতো; কিন্তু রোগীর দেহের ক্ষতে পচন নিবারণের জন্যে বীজবারক হিসেবে ক্লোরিন ব্যবহারোপযোগী নয়। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, **ক্লোর‍্যামাইন** প্রভৃতি ক্লোরিনের বিভিন্ন যৌগ ব্যবহার করলে শাস্ত্র-চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়। কোল্‌-টার থেকে উপজাত ক্রিসল ও ক্লোরিনের রাসায়নিক বিক্রিয়া-ঘটিত বিভিন্ন যৌগের দ্রবণ (যেমন **লাইসল**, লিস্টারিন, ডেটল প্রভৃতি) বিশেষ শক্তিশালী বীজবারক বা অ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে। আবার দেখা গেছে, আল্‌কাতরা বা কোল-টারের অন্যতম উপাদান অ্যাক্রিডিন থেকে উৎপাদিত **অ্যাক্রিফ্লেভিন** প্রভৃতি রঞ্জক-পদার্থেরও বীজাণুনাশক ক্ষমতা যথেষ্ট প্রবল; অথচ এগুলির ব্যবহারে ক্ষতস্থানের স্বাভাবিক নিরাময়-শক্তিও কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না।

বীজবারক রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে যে-সব অ্যান্টিসেপ্‌টিক ঔষধের কথা বলা হলো ক্ষতের পচন নিবারণের জন্যে সেগুলির প্রয়োগ প্রধানতঃ বাহ্যিক; বাইরের বায়ু-বাহিত বীজাণুদের ধ্বংস ও আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগুলি ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ও শ্বাস-বায়ুর মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট রোগ-জীবাণুগুলি ধ্বংস করে বিভিন্ন রোগ নিরাময় করবারও বিভিন্ন রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। 1929 খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

রোগ-বীজাণু (ব্যাক্টিরিয়া)-নাশক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ আবিষ্কার করেন, যার নাম তিনি দেন **পেনিসিলিন**। 'পেনিসিলিয়াম নোটেটাম' নামক এক শ্রেণীর **শ্যাওলা বা ছত্রাক** তাদের দেহ-কোষ বৃদ্ধির কালে এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করে; নানারকম ব্যাক্টিরিয়া ধ্বংস করতে যার ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল। এই রাসায়নিক পদার্থটাই 'পেনিসিলিন' নামে খ্যাত। 1940 সালে বিজ্ঞানী ফ্লোরি উল্লিখিত ছত্রাক থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিনের নিষ্কাশন এবং সংশ্লেষণ
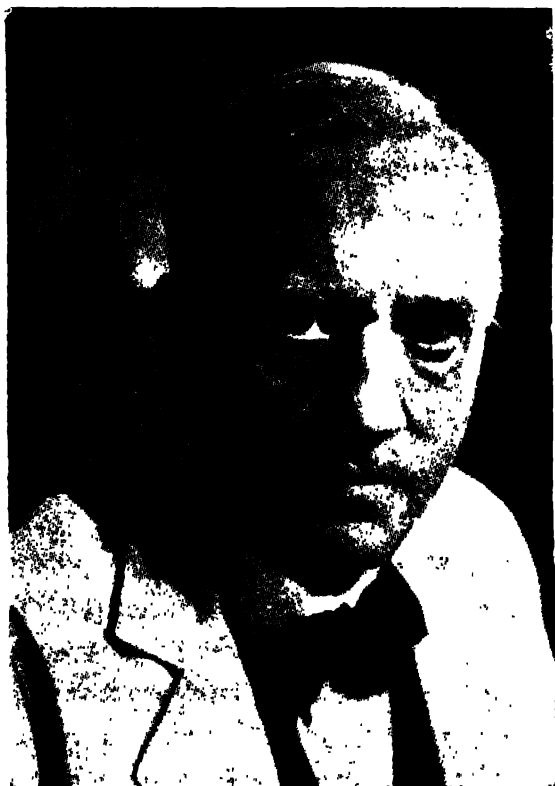
বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে তা উৎপাদনের শিল্প-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর ফলে চিকিৎসা-জগতে একটি অভূতপূর্ব কার্যকরী অ্যান্টিসেপ্টিক ও অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ হিসেবে ইদানিং পেনিসিলিনের ব্যবহার সুলভ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হয়েছে।

উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে রোগীর দেহে পেনিসিলিনের কোন বিষ-ক্রিয়া নেই, অথচ দুরারোগ্য গ্যাংগ্রিন, দূষিত ক্ষত প্রভৃতির জন্য দায়ী আণুবীক্ষণিক বীজাণুদের ধ্বংস করে পেনিসিলিন দূষিত ক্ষত নিরাময় করে, যাতে আগেকার দিনে অধিকাংশ রোগীরই মৃত্যু ঘটতো। কেবল তা-ই নয়, ডিপথিরিয়া, নিমোনিয়া, টিটেনাস প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়া-ঘটিত রোগ পেনিসিলিনে অতি দ্রুত নিরাময় হয়। আজকাল নানারোগে পেনিসিলিন একটি বিশেষ কার্যকরী **অ্যান্টিবায়োটিক** হিসেবে সুলভ ও সস্তা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বহু রসায়ন-বিজ্ঞানীর ব্যাপক গবেষণা ও মিলিত প্রচেষ্টায় পেনিসিলিনের রাসায়নিক গঠন নির্ণীত হয়েছে এবং দেখা গেছে, প্রাকৃতিক এই রাসায়নিক পদার্থটির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর পেনিসিলিন রয়েছে। ক্রমে সেগুলির পৃথক-পৃথক আণবিক গঠন-কাঠামোও বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটন করেছেন এবং জানা গেছে যে, মোটের উপর পেনিসিলিন হলো অ্যাসিড-ধর্মী অত্যন্ত জটিল গঠনের কার্বনঘটিত একটি জৈব রাসায়নিক যৌগ। আশা করা যায়, ক্রমে এর আরও বিস্তৃত রাসায়নিক তত্ত্ব জানা যাবে এবং নতুন নতুন সংশ্লেষিত যৌগও এ থেকে উৎপাদন করা সম্ভব হবে, ফলে এর কার্যকারিতা ও ব্যবহার-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেনিসিলিনের উন্নত গবেষণা চলছে এবং উৎপাদনের বিরাট সব শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের ভারতেও পিম্প্রি নামক স্থানে পেনিসিলিন উৎপাদনের বিশাল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংজ্ঞাহারক বা অ্যানেস্থেটিক ঔষধাবলী: এই শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগের মধ্যে সর্বপ্রথম সংশ্লেষিত হয় **ক্লোরোফর্ম** ($CHCl_3$)। সংজ্ঞাহারক ঔষধ হিসেবে চিকিৎসা-জগতে ক্লোরোফর্মের ব্যবহারই সবচেয়ে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। এই উদ্বায়ী তরল পদার্থের বাষ্প নাকে গেলে মানুষ সংজ্ঞা হারায়, এ-কথা আজ সকলেই জানে। 1832 খৃষ্টাব্দে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী লিবিগ অ্যালকোহলের (C_2H_5OH) উপরে ব্লিচিং পাউডারের (পৃঃ 121) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ক্লোরোফর্ম উৎপাদন করেন; এটা একটা ঘন ও উদ্বায়ী তরল পদার্থ ($CHCl_3$)। সংজ্ঞাহারক ঔষধ হিসেবে 1847 খৃষ্টাব্দে ক্লোরোফর্ম সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী জেম্স সিম্পসন। এর কার্যকারিতায় অস্ত্রোপচার-ই কেবল সহজ হয় নি; মানুষ অশেষ কষ্ট ও যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। ক্লোরোফর্মের এই কার্যকারিতা

প্রমাণিত হওয়ার পরে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই শ্রেণীর আরও সংজ্ঞাহারী রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কারের জন্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। অল্প কালের মধ্যেই **ডাই-ইথাইল ইথার** ও **ইথাইল ক্লোরাইড** নামক অনুরূপ গুণসম্পন্ন পদার্থ উৎপাদিত হয়। ক্লোরোফর্মের মত এ-দু'টা যৌগও অ্যালকোহল থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়েছে।

জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী ভন লিবিগ

কোকা নামক উদ্ভিদ-পত্রের নির্যাস থেকে **কোকেইন** নামক যে অবক্ষার বা অ্যাল্‌কালয়েড যৌগটি নিষ্কাশিত হয়, তার প্রয়োগে দেহের স্থানবিশেষে অসাড়তা আসে, অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে ব্যথা-বেদনার অনুভূতি লুপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শস্ত্র-চিকিৎসকদের মধ্যে অস্ত্রোপচারের সময়ে রোগীর দেহে স্থানীয়ভাবে অসাড়তা আনবার জন্যে কোকেইন ব্যবহারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। এর ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা উদ্ভিতজাত কোকেইনের আণবিক গঠন নির্ধারণ ও অনুরূপ গঠনের রাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষণের গবেষণায় তৎপর হয়ে ওঠেন এবং 1898 খৃষ্টাব্দে কোকেইনের আণবিক গঠন নির্ণীত হয়। এর আণবিক গঠনে পরমাণু-সংযুক্তির ধরন ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে মানব-দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর উপরে কোকেইনের প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য জানা যায়; আর দেখা যায়, যৌগটির সংগঠক

পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠীর অদল-বদল করে বা কোন-কোনটি বাদ দিয়ে নতুন নতুন যৌগ উৎপাদন করাও সম্ভব। এভাবে বিজ্ঞানীরা এমন অনেকগুলি যৌগ সংশ্লেষিত করতে সমর্থ হন, যাদের স্থানীয়ভাবে প্রয়োগ করলে জীবদেহের স্থান বিশেষ অসাড় হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক কোকেইনের অনুরূপ-গুণসম্পন্ন এ-সব সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগের মধ্যে **নোভোকেইন** ও **অ্যামিথোকেইন** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দাঁতের বেদনায় নোভোকেইন ব্যবহারের কথা অনেকেরই জানা আছে। অ্যামিথোকেইন যৌগটি রাসায়নিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই স্বভাবজ কোকেইনের অনুরূপ ; বরং এটা দীর্ঘদিনেও বিকৃত হয় না, আর নিয়মিত ব্যবহারেও উদ্ভিজ্জ কোকেইনের মত এতে লোকে বিশেষ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না।

শস্ত্র-চিকিৎসায় ক্লোরোফর্ম, কোকেইন প্রভৃতির চেয়ে অধিকতর কার্যকরী ও উন্নত ধরনের অ্যানেস্থেটিক ঔষধ হিসেবে **অ্যাড্রিনেলিন** নামক একটি সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার পরে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে মূত্রাশয় বা কিড্‌নীর উপরে সংলগ্ন থাকে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি, যাকে 'সুপাররেন্যাল গ্রন্থি'ও বলে। আকস্মিক ভীতি বা উত্তেজনাকালে এই গ্রন্থি থেকে একটা গ্রন্থি-রস বা **হর্মোন** নিঃসৃত হয়, যার প্রভাবে দেহের রক্ত-চলাচল সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তাতে মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে দেখায়। আগের দিনে এই অ্যাড্রিনেলিন পদার্থটা গরু-ভেড়ার গ্রন্থি থেকে নিষ্কাশিত হতো। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জৈব পদার্থটার আণবিক গঠন নির্ধারিত হয় এবং রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে **কৃত্রিম অ্যাড্রিনেলিন** প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতে থাকে। প্রাণি-দেহের জৈব পদার্থ এভাবে রসায়নাগারে যথেচ্ছ পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এটা বাজারে **সুপ্রারেনাইন** নামে বিক্রয় হয় ; কিন্তু চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এ জিনিসটা প্রাণিজ অ্যাড্রিনেলিনের বিকল্প হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই কৃত্রিম অ্যাড্রিনেলিন অতি সামান্য
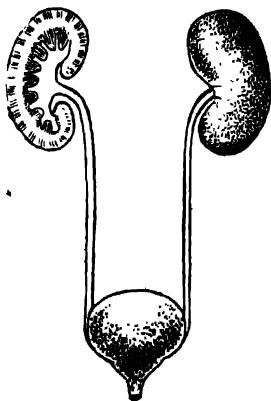
প্রাণিদেহের অভ্যন্তরস্থ মূত্রাশয়

পরিমাণেও রোগীর মাংসপেশীর মধ্যে প্রবেশ করালে (ইঞ্জেকসন) স্থানীয় রক্তবাহী নালি বা আর্টারিগুলির বিশেষ সংকোচন ঘটে, আর সেখানকার পেশীর টিস্যুগুলি থেকে রক্ত-প্রবাহ দ্রুত সরে যায়। এর ফলে ঐ স্থানে অস্ত্রোপচার করলে রোগীর ব্যথা-বেদনা অনুভূত হয় না এবং রক্তপাতও ঘটে না। 'রক্তহীন' অস্ত্রোপচারের এ এক অপূর্ব কৌশল!

ঘুমের ঔষধ, বা হিপ্‌নটিক ঔষধাদি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) আবিষ্কৃত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই অনেকটা অনুরূপ গুণসম্পন্ন **ক্লোর‍্যাল** [$C(CHO)Cl_3$] নামক একটি যৌগ সংশ্লেষিত হয়, যার প্রভাবে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রী শিথিল ও নিস্তেজ হয়ে নিদ্রার উদ্রেক করে। ঘুমের ঔষধ হিসেবে এই ক্লোর‍্যালই প্রথম শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। এই যৌগটা স্ফটিকাকার সাদা পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। মানুষের দেহে জিনিসটার তীব্র জৈব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; পরিমাণ কিছু বেশি হলে স্নায়ুতন্ত্রী চিরতরে শিথিল ও বিকল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। ক্লোর‍্যাল ব্যবহারের এরূপ অসুবিধার জন্যে উন্নত শ্রেণীর **হিপ্‌নটিক** আবিষ্কারের গবেষণা সুরু হয় এবং ক্রমে এই শ্রেণীর নানারকম সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ উৎপাদিত হয়, ঘুমের ঔষধ হিসেবে যেগুলির ব্যবহার ক্লোর‍্যালের চেয়ে অনেকটা নিরাপদ, অথচ সমান কার্যকরী। এগুলির মধ্যে **ভেরোনল** ও **লুমিন্যাল** যথেষ্ট প্রচলিত; এই হিপ্‌নটিকগুলি সাধারণভাবে **বার্বিটিউরেট** নামে পরিচিত; কারণ এগুলি মূলতঃ বার্বিটিউরিক অ্যাসিড থেকে সংশ্লেষিত যৌগ। ইদানিং বাজারে গার্ডিন্যাল, সোনারিল, লার্গ্যাক্‌টিল, ইকোয়ানিল নামে আরও নানারকম হিপ্‌নটিক ঔষধ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করলে স্নায়ুর উত্তেজনা দূর করে রোগীকে নিদ্রার শান্তি দেয়; তাই এগুলিকে আজকাল অনেকে 'ট্রাঙ্কুইলাইজার' বলে। কিন্তু এ সব হিপ্‌নটিক ঔষধ অধিক পরিমাণে খেলে স্নায়ুতন্ত্রী অত্যধিক শিথিল হয়ে মানুষ যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয় সে-ঘুম আর ভাঙ্গে না। ঘুমের মধ্যে শান্তিতে মৃত্যুর আশায় হিপ্‌নটিক ঔষধগুলি এ-যুগে আত্মহত্যার উপকরণ হয়েও দাড়িয়েছে; সংবাদ-পত্রে এরূপ ঘটনা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে।

জীবাণুঘটিত রোগের সংশ্লেষিত ঔষধাদি

ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিবেধক ও নিরাময়কারী ঔষধ **কুইনিন** রাসায়নিক বিচারে অবক্ষার বা অ্যাল্‌কালয়েড শ্রেণীর একটি উদ্ভিজ্জ পদার্থ; সিন্‌কোনা

গাছের ছাল থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যাল্‌কালয়েডটা পাওয়া যায়। জ্বরে কুইনিন ব্যবহারের কথা সকলেই জানেন, চলছেও বহুকাল ধরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা কুইনিনের বিকল্প কোন ম্যালেরিয়া-নাশক ঔষধ আবিষ্কারের জন্যে গবেষণা সুরু করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই 1886 খৃষ্টাব্দে **অ্যান্টিফেব্রিন** নামক একটি সংশ্লেষিত যৌগ উৎপাদিত হয়, শরীরের ব্যথা-বেদনা ও জ্বর উপশম করবার ক্ষমতা যাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে অ্যান্টিফেব্রিন হলো 'অ্যাসিটেনিলাইড' (CH_3. CO. NH. C_6H_5) নামক একটা জটিল যৌগ। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিনের মত অ্যান্টিফেব্রিনও আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই

সিন্‌কোনা গাছ

অ্যাসিটেনিলাইডের অণুর ভিতরে আবার একটি 'এথক্সি' মূলক (C_2H_5O) সংযুক্ত করে 1887 খৃষ্টাব্দেই আর একটা যৌগ উৎপাদিত হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে **ফেনাসিটিন**। জ্বরের বেদনা-নাশক ঔষধ হিসেবে ফেনাসিটিন আরও কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়েছে; অ্যান্টিফেব্রিনের আনুষঙ্গিক বিষ-ক্রিয়াও তাতে থাকে না। আবার স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের [C_6H_4 (OH) COOH] আণবিক গঠন-বিন্যাসের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে 'অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড' [CH_3.CO. C_6H_3 (OH) COOH] নামক একটি নূতন যৌগ গঠিত হয়েছে, যার প্রচলিত নাম **অ্যাস্পিরিন**। জ্বরের ব্যথা-বেদনা, মাথা ধরা, অবসন্নতা প্রভৃতি উপসর্গে এটি বিশেষ ফলপ্রদ ও বহুল প্রচলিত। বস্তুতঃ সংশ্লেষিত রাসায়নিক ঔষধগুলির মধ্যে 'অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড'

অর্থাৎ 'অ্যাস্পিরিন' পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজকাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ও এই শ্রেণীর ঔষধের মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

উল্লিখিত সংশ্লেষিত যৌগগুলি অবশ্য ঔষধ হিসেবে কেবলমাত্র রোগের আনুষঙ্গিক উপসর্গগুলি দূর করে রোগীকে আরাম দেয়; কিন্তু রোগের মূল কারণ দূর করতে পারে না, অর্থাৎ এগুলি প্রকৃত রোগ-নাশক নয়। রোগ-বিনাশী, অর্থাৎ প্রকৃত রোগ-নিরাময়কারী রাসায়নিক ঔষধ-পত্র উৎপাদনের চেষ্টা সফল হতে সুরু করে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। বিশেষ বিশেষ আণবিক গঠনের বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ বিজ্ঞানীরা সংশ্লেষিত করতে সক্ষম হন, যাদের সাহায্যে বিভিন্ন রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণুদের ধ্বংস করা সম্ভব হয়। বিংশ শতাব্দীর আগে এরূপ চিকিৎসা-রসায়নের (কেমোথেরাপি) প্রচলন হয় নি। উদ্ভিজ্জ কুইনিন প্রাকৃতিক একটি রাসায়নিক অ্যাল্‌কালয়েড যৌগ হিসেবে অবশ্য বহুকাল আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যা ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুদের ধ্বংস করে রোগের মূল কারণ দূর করে। জীবাণু-ধ্বংসী ও রোগ-নিরাময়কারী এই শ্রেণীর ঔষধের রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেন জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞানী পল আর্লিক।

শারীরতত্ত্বের গবেষণায় দেখা গেছে, দেহের বিভিন্ন জীবন্ত কোষতন্তু (টিস্যু) ও জীব-কণাগুলি এক-একটি বিশেষ ধরনের রঙীন পদার্থ আত্মস্থ করে নেয়। আবার বিভিন্ন জীবাণুরাও এক রং গ্রহণ করে না, এক-এক রকমের জীবাণু এক-এক রং শোষণ করবার শক্তি রাখে। বিভিন্ন জীব-কোষ ও জীবাণুদের এই শক্তি-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অধ্যাপক আর্লিক মানব-দেহে রোগ-সৃষ্টিকারী প্রোটোজোয়া-শ্রেণীর পরাশ্রয়ী (প্যারাসাইট) জীবাণুদের কাবু করবার জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করবার পরিকল্পনা করেন। পদার্থ-গুলি জীবাণুর কোষে শোষিত হয়ে বিষ-ক্রিয়া ঘটাবে ও তাদের ধ্বংস করবে; কিন্তু রোগীর দেহ-কোষে শোষিত হবে না, কাজেই রোগীর কোন অনিষ্টও করবে না।

প্রোটোজোয়া শ্রেণীর জীবাণু
(1000 গুণ সংবর্ধিত)

বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিফলতার পরে অধ্যাপক আর্লিক 1912 খৃষ্টাব্দে আর্সেনিক-

ঘটিত একটি বিশেষ রাসায়নিক যৌগ প্রয়োগ করে মারাত্মক সিফিলিস রোগের জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম হন। এই আর্সেনিক-যৌগটা **স্যালভার্সান** নামে সিফিলিস-রোগের ঔষধ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে। যৌগটার বিশেষ সাংকেতিক নাম '606'-এর অর্থ হলো, গবেষণা ও পরীক্ষায় 605 বার বিফলতার পরে ঔষধটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এর পর থেকে জীবাণুঘটিত কালাজ্বর, নিদ্রারোগ (স্লিপিং সিক্‌নেস), পীতজ্বর প্রভৃতি নানা রোগের জীবাণুধ্বংসী সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ ঔষধরূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশে ডাঃ ইউ. এন. ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের জীবাণু-নাশক অ্যান্টিমণি-ঘটিত **ইউরিয়া-ষ্টিবামিন** নামক একটি ঔষধ আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। যাহোক, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রসায়ন এরূপ বহু অবদান জুগিয়েছে। মানব-কল্যাণে রসায়নের এ-এক কৃতিত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ম্যালেরিয়ার জীবাণুধ্বংসী উদ্ভিদজাত অবক্ষার কুইনিনও রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয়েছে; কিন্তু এই **কৃত্রিম কুইনিন** শিল্প-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ কুইনিনের চেয়ে তেমন লাভজনক হয় নি। অপর পক্ষে ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসেবে
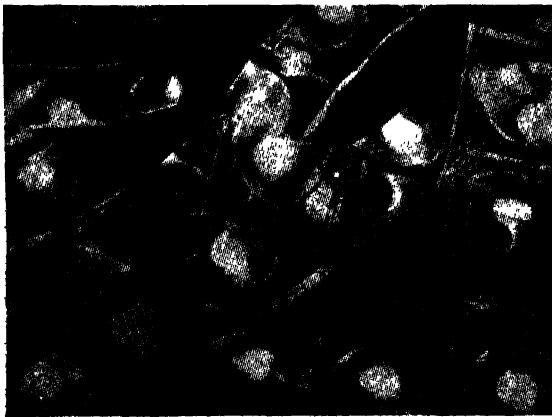
অ্যাটিব্রিন ট্যাবলেট এরূপ স্বচ্ছ প্যাকেটে আজকাল বিক্রয় হয়

কুইনিনের বিকল্প নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়ে প্রাকৃতিক কুইনিনের প্রয়োজন ও চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস করেছে। ম্যালেরিয়ার জীবাণুধ্বংসী এ-সব সংশ্লেষিত ঔষধগুলির মধ্যে প্লাজ্‌মোকুইন, মেপাক্রিন,

পেলুড্রিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য; এগুলি আজকাল কুইনিনের বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। কুইনোলিন নামক একটা রাসায়নিক যৌগ থেকে সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় **প্লাজ্‌মোকুইন** উৎপাদিত হয়ে থাকে; আর **মেপাক্রিন** (মেপাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড) উৎপাদিত হয় অ্যাক্রিডিন থেকে। এই মেপাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড ঔষধটি বাজারে **অ্যাটিব্রিন** নামে বিক্রয় হয়। পলিথিন শ্রেণীর বিশেষ প্লাস্টিকের (পৃঃ 426) স্বচ্ছ কাগজের প্যাকেটে এ-সব ঔষধ ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। উল্লিখিত রাসায়নিক ঔষধগুলি সবই ম্যালেরিয়া-জীবাণুদের (প্যারাসাইট) পক্ষে বিষাক্ত পদার্থ এবং কুইনিনের বিকল্প ঔষধ হিসেবে এগুলি বিশেষ কার্যকরী। ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (আই. সি. আই) 1945 খৃষ্টাব্দে **পেলুড্রিন** নামক আর একটি সংশ্লেষিত যৌগ প্রস্তুত করেছে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু-ধ্বংসী রাসায়নিক ঔষধ হিসেবে এটিই সর্বাধুনিক এবং কার্যকারিতায়ও কুইনিন, মেপাক্রিন প্রভৃতি অনুরূপ শ্রেণীর ঔষধগুলির চেয়ে অধিকতর উপযোগী। অ্যানোফিলিস মশার দংশনে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর দ্বারা রোগের সংক্রমণ নিবারণ করতে পেলুড্রিন যেমন উৎকৃষ্ট প্রতিষেধকের কাজ করে, তেমনি ম্যালেরিয়া-জীবাণু ধ্বংস করতেও এর শক্তি অধিকতর প্রবল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সাল্‌ফার বা গন্ধকঘটিত বিভিন্ন সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ ইদানিং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 1935 খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন রোগের ঔষধ-গুণসম্পন্ন সাল্‌ফার-ঘটিত অনেকগুলি রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি রাসায়নিক বিচারে 'সাল্‌ফানিল্যামাইড' শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর ঔষধগুলিকে সাধারণতঃ এক কথায় **সাল্‌ফা-ড্রাগ** বলা হয়, বাংলায় বলা যায় গন্ধক-ঔষধি। মূল **সাল্‌ফানিল্যামাইড** ($NH_2.C_6H_4.SO_2.NH_2$) যৌগটা সংক্রামক পীতজ্বর, সূতিকা-ক্ষতজনিত জ্বর প্রভৃতি রোগ সৃষ্টিকারী 'স্ট্রেপ্টোকক্কাই' জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে এবং দূষিত ক্ষতের প্রতিষেধক ঔষধ হিসেবে বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
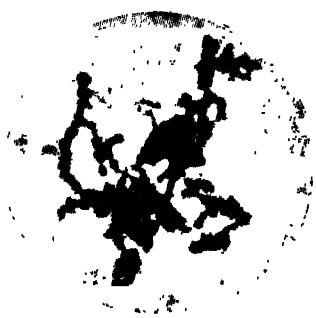
ষ্ট্যাফাইলোকক্কাই জীবাণু (প্রায় 2000 গুণ সংবর্ধিত)

একটা কথা এখানে জানা দরকার, সাল্‌ফার-ঘটিত এই সব রাসায়নিক ঔষধগুলি (সাল্‌ফা-ড্রাগ) রোগের জীবাণুদের ধ্বংস করে না, কেবল তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে; আর তার ফলে রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুরা দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং রক্তের 'লিউকোসাইট' বা শ্বেত-কণিকার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়; যার ফলে রোগের আক্রমণ প্রতিহত হয়। এক কথায় বলা যায়, সাল্‌ফা-ড্রাগগুলি পূর্বোল্লিখিত পেলুড্রিন, মেপাক্রিন প্রভৃতির মত জীবাণু-ধ্বংসী নয়, কেবল জীবাণু-প্রতিরোধী শক্তিসম্পন্ন। যাহোক, বিশেষ রাসায়নিক গবেষণার ফলে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, সাল্‌ফানিল্যামাইডের 'SO_2NH_2' মূলকের একটা হাইড্রোজেন-পরমাণু অপসৃত করে তার জায়গায় পিরিডিন, থায়োজল প্রভৃতির (আল্‌কাতরা, বা কোল-টার থেকে উপজাত) অনুরূপ বিভিন্ন আণবিক গঠনের যৌগ যুক্ত করলে যে-সব জটিল গঠনের নূতন যৌগ উৎপন্ন হয়, সাল্‌ফা-ড্রাগ হিসেবে তাদের কার্যকারিতা বহুমুখী হয়ে বিভিন্ন রোগে বিশেষ সুফল দেয়; যেমন — **সাল্‌ফা-পিরিডিন** ও **সাল্‌ফা-থায়োজল** নামক সংশ্লেষিত ঔষধগুলি নিউমোনিয়া, মেনিন্‌জাইটিস প্রভৃতি রোগের জীবাণুদের আক্রমণ বিশেষ কার্যকরীভাবে প্রতিহত করে। এই শ্রেণীর আর একটা যৌগ **সাল্‌ফা-গুয়ানিডিন** বিশেষতঃ আমাশয় রোগের চিকিৎসায় একটি বিশেষ কার্যকরী ও বহুল প্রচলিত ঔষধ; সাধারণ গৃহ-চিকিৎসায়ও লোকে আজকাল এটা ব্যবহার করে থাকে।

জীবাণুঘটিত বিভিন্ন রোগে সাল্‌ফা-ড্রাগগুলি আশ্চর্য ফল দেয়; নিউমোনিয়া, মেনিন্‌জাইটিস, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি বহু রোগে এগুলি মানুষের রোগ-যন্ত্রণা ও মৃত্যুহার হ্রাস করেছে। মানব-কল্যাণে রসায়নের বিভিন্ন অবদানের মধ্যে জীবাণু-ঘটিত বহু মারাত্মক রোগের নিরাময়কারী সংশ্লেষিত রাসায়নিক ঔষধ-গুলির আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা আধুনিক যুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটিয়েছেন; আর এর অগ্রগতি ঘটেই চলেছে।

কীটনাশক ঔষধাবলী: কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি জীবাণু-ঘটিত রোগের চিকিৎসায় নানারকম জীবাণুনাশক (ব্যাক্‌টিসাইড্যাল) ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েও দেখা গেল, রোগের বিস্তার বা সংক্রমণ রোধ করা কঠিন। গবেষণার ফলে ক্রমে জানা গেছে, এ-সব রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর আণুবীক্ষণিক জীবাণুরা মশা, মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের মাধ্যমে অদৃশ্যভাবে রোগীর দেহ থেকে সুস্থ লোকের দেহে প্রবিষ্ট হয়ে রোগের

বিস্তার ঘটায়। কাজেই বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এ-সব রোগের জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কারের চেয়ে রোগ-জীবাণুর পরিবাহী কীট-পতঙ্গনাশক রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করাও কম গুরুত্বপুর্ণ নয়। অনেক দিন থেকেই মশা-মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্যে লোকে ব্যবহার করতো **পাইরেথ্রাম** নামক এক রকম বিষাক্ত ফুলের নির্যাস, যার কীটনাশক উপাদান হলো **পাইরেথ্রিন** নামক একটি বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ। তামাক পাতার নিকোটিন নামক অ্যাল্‌কালয়েডটিও কীট-পতঙ্গ ধ্বংসে কিছুটা কার্যকরী; তাছাড়া কোন-কোন উদ্ভিদের শিকড়ের বিষাক্ত নির্যাসও কীটঘ্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ কেরোসিন তেল বা **ফ্রিয়ন** নামক একটা তরল রাসায়নিক পদার্থে ভিজিয়ে এ-সব উদ্ভিজ্জ পদার্থের নির্যাস বার করে তার জলীয় দ্রবণ কীট-নাশক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফ্রিয়নের রাসায়নিক নাম হলো ডাইক্লোরো-ডাইফ্লুরোমিথেন, CF_2Cl_2। যাহোক, পঁচা খানা-ডোবার আবদ্ধ জলে শুধু কেরোসিন তেল ছিটিয়েও মশার শুককীট ধ্বংস করে মশার বংশ-বিস্তার রোধ করা যায়। অনেক সময় **প্যারিস গ্রিন** নামক কপার ও আর্সেনিক-ঘটিত একটা রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণও কীটঘ্ন ঔষধ হিসেবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

রোগ-সংক্রামক কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্যে আগের দিনে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হতো; আজকাল বিভিন্ন সংশ্লেষিত রাসায়নিক যৌগ **ডি-ডি-টি, গ্যামাক্সেন** প্রভৃতি বিশেষ কার্যকরী কীটঘ্ন ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ-সব শক্তিশালী কীটঘ্ন রাসায়নিক যৌগগুলি গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 1939 থেকে 1945 সালের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মশা, মাছি ও অন্যান্য রোগ-জীবাণুবাহক কীট-পতঙ্গের উপদ্রবে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন জীবাণু-ঘটিত রোগ সংক্রামক হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ কোন কোন অঞ্চলে ছারপোকা ও উকুনের উপদ্রবে সৈন্যদের মধ্যে মড়ক দেখা দেয়; উকুন টাইফয়েড রোগ-সৃষ্টিকারী **টাইফাস** নামক জীবাণুদের দ্রুত সংক্রমণ ঘটায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে রোগ-জীবাণু পরিবাহী কীট-পতঙ্গ বিনাশের প্রয়োজন গুরুতর হয়ে ওঠে এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন। এর ফলে 1942 খৃষ্টাব্দে অতি শক্তিশালী একটি কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষিত হয়, যার প্রচলিত নাম **ডি-ডি-টি**। এই সংক্ষিপ্ত নামের আড়ালে পদার্থটার প্রকৃত রাসায়নিক পরিচয় হলো 'ডাইক্লোরো-ডাইফিনাইল-ট্রাইক্লোরোইথেন'

বিরাট এই নাম থেকে এর রাসায়নিক সংশ্লেষণের জটিলতার কিছু আভাস পাওয়া যাবে। এর আণবিক সংকেত এভাবে দেখানো যায়: $(Cl.C_6H_4)_2.CH.CCl_3$। এই জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগটার কীট-নাশক শক্তি অত্যন্ত প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পাইরেথ্রিনের মত সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটা কাজ করে না। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণুবাহক মশা-মাছি, উকুন (টাইফাস জীবাণুবাহী), ছারপোকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করতে ডি-ডি-টি বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জীবাণু-ঘটিত নানা রোগের মহামারী নিবারণ করতে এই কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থটা অভূতপুর্ব সাফল্য দেখিয়েছিল; আর তারপর থেকে এর ব্যবহার সাধারণভাবে সর্বত্র চলছে।

ডি. ডি. টি-র চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী আর একটা কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষিত হয়েছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে **গ্যামাক্সেন।** যুদ্ধোত্তর কালে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামক রসায়ন-শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা ওটা আবিষ্কার করেন। গ্যামাক্সেনের রাসায়নিক পরিচয় হলো বেঞ্জিন-হেক্সাক্লোরাইড, $C_6H_6Cl_6$; যার বিশেষ আণবিক গঠনের একটি সমাস্থানিক (আইসোমেরিক, পৃষ্ঠা 379) রূপ হলো এই কীটঘ্ন গ্যামাক্সেন। জিনিসটা ডি. ডি. টি-র মতই কঠিন পদার্থ, দেখতে সাদা; কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্যে পদার্থটির চূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়, অথবা জিপ্‌সাম, কেয়োলিন প্রভৃতির চূর্ণের সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহার করা চলে। কেরোসিন বা অন্য কোন উপযুক্ত দ্রাবকে দ্রবিত করে ডি. ডি. টি. বা গ্যামাক্সেনের দ্রবণ ছড়িয়ে-ছিটিয়েও কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় ধ্বংস করা যেতে পারে। ডি.ডি.টি-র মত গ্যামাক্সেনের বিষ-ক্রিয়া কীট-পতঙ্গের উপরে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হয় না, অনেকক্ষণ ধরে এর ক্রিয়া চলে এবং কীট-পতঙ্গের গায়ে একবার লাগলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়। বিশেষতঃ পঙ্গপালের উপরে গ্যামাক্সেনের বিষ-ক্রিয়া অন্যান্য কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সংশ্লেষণী রসায়ন (দ্বিতীয়াংশ)

প্লাস্টিক : সাধারণ পরিচিতি, থার্মো-প্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিক ; পলিমারিজেসন ও হাইপলিমার, অতিকায় অণু বা লার্জ মলিকিউল : ব্যাকেলাইট, ফিনল-ফর্ম্যাল্ডিহাইড রেজিন, ইউরিয়া-ফর্ম্যাল্ডিহাইড প্লাস্টিক ; পারস্পেক্স বা জৈব কাচ ; পলিথিন ও অ্যাল্কাথিন ; গ্যালালিথ বা কেজিন-ফর্ম্যালিন প্লাস্টিক ; বুটভার, টেরিলিন, নাইলন ও পারলন : কৃত্রিম রাবার — প্রাকৃতিক রাবার, ল্যাটেক্স, ম্যাস্টিকেটেড রাবার ; ভ্যাল্কানাইজেসন, ভ্যালকানাইট বা এবোনাইট ; আইসোপ্রিন, বুটাডিন বা বুনা রাবার, বুনা-এস্ ও বুনা-এন্ রাবার ; নিওপ্রিন, ক্লোরোপ্রিন ও অ্যালোপ্রিন। সংশ্লেষিত সুগন্ধী : প্রাকৃতিক গন্ধদ্রব্যাদির পরিচয় ও নিষ্কাশন ; কৃত্রিম সুগন্ধী কুমারিন ও ভেনেলিন, নাইট্রোমাস্ক ও আয়োনোনের রাসায়নিক সংশ্লেষণ ; কৃত্রিম 'অয়েল অব উইণ্টারগ্রিন'; রাসায়নিক সুগন্ধী —বেঞ্জাল্ডিহাইড, নাইট্রোবেঞ্জিন প্রভৃতি : প্রাকৃতিক কর্পূর বা ক্যাম্ফর, সেলুলয়েড-শিল্পে কর্পূরের প্রয়োজনীয়তা ও দেশে-দেশে প্রতিযোগিতা ; কর্পূরের রাসায়নিক ধর্ম ও গুণাবলী; তারপিন তেল থেকে কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষণ ; কর্পূর উৎপাদনে জাপানের একাধিপত্য হ্রাস, সংশ্লেষিত হয়েও কর্পূর-বৃক্ষের চাষ অব্যাহত।

রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের বহুমুখী প্রয়োজনের বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থাদি উৎপাদিত হয়েছে ; পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ ও ঔষধাদির আলোচনা করেছি। কেবল প্রাকৃতিক পদার্থের বিকল্পই নয় ; বিশেষ গুণ ও ধর্মবিশিষ্ট সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়ে আধুনিক মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন মিটিয়েছে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এরূপ বিভিন্ন সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে প্লাস্টিক, কৃত্রিম রাবার, কর্পূর, ও নানা সুগন্ধী দ্রব্যের বিষয় কিছু আলোচনা করবো।

প্লাস্টিক : আধুনিক যুগে প্লাস্টিক দ্রব্যের সঙ্গে অল্প-বিস্তর সকলেই পরিচিত। প্লাস্টিক-শিল্প আধুনিক জীবনে রসায়নের এক অমূল্য অবদান ; অনন্যসাধারণ গুণ, ধর্ম ও উপযোগিতার জন্যে জিনিসটা এ-যুগে মানুষের নানা প্রয়োজন মেটাচ্ছে। কাঠ, ধাতু ও পাথরের তৈরী জিনিস-পত্রের চেয়ে

প্লাষ্টিকের জিনিস নানাদিক থেকে উৎকৃষ্টতর। বস্তুতঃ, প্লাষ্টিক আজকাল ঐসব প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার বহুলাংশে কমিয়ে তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। কেবল গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, আসবাব, খেলনা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিই নয়; ঘরের দরজা, জানালা প্রভৃতিও আজকাল প্লাষ্টিক দিয়ে তৈরি হয়। এমন কি, পাশ্চাত্য দেশে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতির খোল ও কাঠামো প্লাষ্টিকে তৈরি হচ্ছে। জিনিসটার ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহার ও উপযোগিতার জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্পের মধ্যে প্লাষ্টিক-শিল্প আজ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

প্লাষ্টিক কোন একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের নাম নয়; কাঠিন্য ও তাপে নমনীয়তা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ ধর্মবিশিষ্ট একশ্রেণীর সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে **প্লাস্টিক**। প্লাষ্টিক নানা রকম আছে। যদিও সাধারণ তাপমাত্রায় সব প্লাষ্টিকই সুদৃঢ় কঠিন পদার্থ; কিন্তু বিশেষ তাপ ও চাপে পদার্থটা নমনীয় হয়ে পড়বে এবং তাকে ছাঁচে ফেলে যে-কোন আকার দেওয়া যাবে ও ঠাণ্ডা হলে পুনরায় কঠিন হবে। এই নমনীয়তা ধর্মের বিচারে প্লাষ্টিককে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—**থার্মোপ্লাস্টিক** ও **থার্মোসেটিং প্লাস্টিক**। যে-সব প্লাষ্টিক পদার্থ উত্তপ্ত করলে নরম ও নমনীয় হয়, আর বিশেষ তাপ ও চাপে তাকে যে-কোন আকার দেওয়া যায় ও শক্ত হয় এবং তাকে বার-বার এভাবে কাজে লাগানো যায়, সেগুলিকে বলা হয় থার্মোপ্লাষ্টিক; যেমন **সেলুলয়েড** (পৃঃ 324)। পক্ষান্তরে কোন কোন প্লাষ্টিক পদার্থকে উপযুক্ত তাপ ও চাপে নমনীয় করে যে-কোন আকার দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তাপ ও চাপের প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে জিনিসটা এমন একটা কঠিন পদার্থে পরিণত হয় যাকে দ্বিতীয় বার আর নরম করা যায় না; তাকে বলা হয় থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক, অর্থাৎ কোন রকম তাপ ও চাপেই আর তার আকার-আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায় না, এক বারই কাজ চলে। এরূপ থার্মোসেটিং প্লাষ্টিকের দৃষ্টান্ত হলো **বেকেলাইট**।

যে-কোন শ্রেণীরই হোক না কেন, সব প্লাষ্টিকই বৃহদাকার অণুর যৌগ; এগুলি যেমন অতিকায় অণুর সমবায়ে গঠিত পদার্থ, তেমনি এদের আণবিক ওজনও অত্যধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচা মালের বৃহৎ অণুগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়, যেমন সেলুলোজের অণু। এ বিষয় আমরা 'সেলুলোজ ও সেলুলোজ-শিল্প' শীর্ষক

অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করেছি। যাহোক, প্লাষ্টিক-শিল্পের অনেক ক্ষেত্রেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৃহৎ অণু (লার্জ মলিকিউল) গঠন করা হয়। অনেক সময় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু রাসায়নিক সংযোজনের ফলে একসঙ্গে জুড়ে এক-একটি বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **পলিমারিজেসন** ; আর সেই নূতন অতিকায় অণুকে বলে **হাইপলিমার**। আবার অনেক সময় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুটি সরল ও ক্ষুদ্র অণুর সংযোজনের বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের থেকে একটি করে জলীয় অণু (H_2O) অপসৃত হয়ে অংশগুলি শৃঙ্খলাকারে ক্রমাগত জুড়ে যায়। এরূপ পলিমারিজেসন প্রক্রিয়াকে রসায়নের ভাষায় বলা হয় **কণ্ডেন্সেসন** ; আর সেই নির্জল ও নবগঠিত অণুগুলি আবার পরস্পর জুড়ে এক-একটি অতিকায় অণু গঠন করে। এরূপ 'পলিমারিজেসন' পদ্ধতিতে উৎপন্ন প্লাষ্টিকের দৃষ্টান্ত হলো 'পলিথিন' নামক বিশেষ শ্রেণীর প্লাষ্টিক ; আর 'নাইলন' হলো কণ্ডেন্সেসন পদ্ধতির একটি বিশেষ উদাহরণ। এ-সব বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়েই পরে আলোচনা করবো।

বেকেলাইট প্লাস্টিক

প্লাষ্টিক-শিল্পের গোড়া পত্তন করেন আমেরিকার রসায়ন-বিজ্ঞানী বেক্‌ল্যাণ্ড ; সে 1908 খৃষ্টাব্দের কথা। তিনি কার্বলিক অ্যাসিডের (ফিনল) সঙ্গে ফর্ম্যাল্ডিহাইড মিশিয়ে ও অনুঘটক হিসেবে তাতে সামান্য অ্যামোনিয়া দিয়ে উত্তপ্ত করেন। অ্যামেনিয়ার অনুঘটনে কার্বলিক অ্যাসিড ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক রকম ঘন আঠালো পদার্থের সৃষ্টি হয়। সদ্য-তৈরী এই আঠালো পদার্থটা অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন প্রভৃতি দ্রাবক পদার্থে দ্রবীভূত হয় ; আর সেই দ্রবণটা ভার্নিস বা ল্যাকার হিসেবে ব্যবহার করা চলে। পক্ষান্তরে, বিশেষ চাপে ঐ আঠালো পদার্থটাকে 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কিছু অধিক তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তার অনেকগুলি অণু পরস্পর জুড়ে গিয়ে এক-একটি অতিকায় অণু গঠিত হয়। এই 'পলিমারিজেসন' প্রক্রিয়ার ফলে জিনিসটা রজনের মত শক্ত কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। পদ্ধতিটির আবিষ্কারক বেক্‌ল্যাণ্ডের নামানুসারে পদার্থটার নাম দেওয়া হয়েছে **বেকেলাইট**। বেকেলাইট একটি 'থার্মোসেটিং প্লাষ্টিক' পদার্থ ; উত্তাপে গলে না, সাধারণ কোন দ্রাবকে দ্রবীভূতও হয় না। এ-সব গুণ ও ধর্মের জন্যে রজন জাতীয় সংশ্লেষিত পদার্থ হিসেবে বেকেলাইট নানা কাজে প্রচুর ব্যবহৃত

হয়ে থাকে ; বিশেষতঃ, তড়িৎ-অপরিবাহী বলে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদন-শিল্পে এর ব্যবহার দ্রুত বেড়ে গেছে। ছুরির বাঁট, বোতাম, নানা রকম হাতল, টেলিফোন-যন্ত্র প্রভৃতি যে-সব জিনিস আগে জীবজন্তুর হাড়, সেলুলয়েড, এবোনাইট (ভ্যাল্‌কানাইজ্‌ড রাবার, পৃঃ 431) প্রভৃতি দিয়ে তৈরি করা হতো তা আজকাল বেকেলাইট দিয়ে তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন উৎপাদন-শিল্পে ব্যবহারোপযোগী রজনজাতীয় একটি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক বিকল্প পদার্থ হিসেবে বেকেলাইটের চাহিদা আজকাল প্রচুর।

থার্মোসেটিং শ্রেণীর প্লাষ্টিক বলে বেকেলাইট প্রথমে নমনীয় থাকে এবং সেই নরম অবস্থায় ছাঁচে ফেলে তাকে যে-কোন আকার দেওয়া যায় ; কিন্তু একবার শক্ত হলে আর তাকে নমনীয় করা যায় না। প্লাষ্টিক হিসেবে এটা অবশ্য বেকেলাইটের একটা ত্রুটি বটে ; কিন্তু জিনিসটা দীর্ঘস্থায়ী ও এর উৎপাদন-ব্যয়ও কম। আবার সেলুলয়েড শ্রেণীর প্লাষ্টিকের মত এটা দাহ্য নয়। রাসায়নিক বিচারে বেকেলাইট হলো একটা **ফিনল-ফর্ম্যাল্‌ডিহাইড রেজিন** ; সুদৃঢ় কঠিন পদার্থ, সেলুলয়েডের মত নমনীয় নয়। কোন উদ্বায়ী জৈব দ্রাবকে বেকেলাইট দ্রবীভূত করে তাতে তুঁলোর ছাঁট, কাঠের গুঁড়ো, অ্যাস্‌বেস্টস প্রভৃতি মিশিয়ে ছাঁচে ফেলে ও বিশেষ তাপ ও চাপে শক্ত করে ফেললে জিনিসটা আরও কার্যকরী হয়। এভাবে তৈরী জিনিস বিশেষ ঘাত-সহ হয় ও তার ঘর্ষ-ক্ষয় হ্রাস পায় ; এ জন্যে বিভিন্ন যন্ত্রের চাকার বল-বেয়ারিং, গিয়ার প্রভৃতি এ-দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে। আবার সদ্য-উৎপাদিত বেকেলাইটের দ্রবণ কাঠের জিনিসে মাখিয়ে উত্তপ্ত করলে কাঠের গায়ে 'এনামেল'-এর মত বেকেলাইটের একটা শক্ত আবরণ পড়ে। জাপানে এরূপ এক রকম কাঠের ল্যাকার তৈরি করা হয়। এভাবে ধাতব জিনিসের গায়েও বেকেলাইটের আবরণ দেওয়া যায়, যার ফলে কাঠ বা ধাতু দীর্ঘস্থায়ী হয় ও চক্‌চকে থাকে।

বেকেলাইট শ্রেণীর প্লাষ্টিক পদার্থ উৎপাদনের জন্যে ফিনলের বদলে **ক্রিসল**-ও (এটাও কোল-টার বা আল্‌কাতরা থেকে উপজাত এবং রাসায়নিক বিচারে ফিনলের-ই অনুরূপ) ব্যবহার করা চলে ; আবার ফর্ম্যাল্‌ডিহাইড ছাড়া অন্যান্য অ্যাল্‌ডিহাইড নিলেও অনুরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন শস্যাদির খোসা, তুষ প্রভৃতির সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ফার্ফুর্‌্যাল্‌ডিহাইড নামক যে অ্যাল্‌ডিহাইড পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ফিনলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বেকেলাইটের মতই আর এক রকম

সংশ্লেষিত রজন পাওয়া যায়; যা থার্মোসেটিং প্লাস্টিকধর্মী হয় এবং তাকে বেকেলাইটের মতই নানা কাজে ব্যবহার করা চলে।

ইউরিয়া-ফর্ম্যাল্ডিহাইড প্লাস্টিক

প্লাস্টিক পদার্থের রাসায়নিক গবেষণার অগ্রগতির ফলে ক্রমে জানা গেছে, **ইউরিয়া** ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক রকম স্বচ্ছ ও বর্ণহীন কঠিন পদার্থ উৎপন্ন হয়, যা প্লাস্টিকধর্মী ও দেখতে কাচের মত স্বচ্ছ। প্রকৃত কাচের উপাদান সিলিকা ও সোডার সংস্রবহীন সম্পূর্ণ জৈব রাসায়নিক উপাদানে গঠিত এই স্বচ্ছ প্লাস্টিককে সাধারণ কাচের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা অবশ্য সম্ভব হয় না; কারণ, এর পাতলা সিট আভ্যন্তরীণ টানে (internal strain) সহজেই ফেটে যায়। পদার্থটা উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সময়ে স্বাভাবিক সংকোচনের টান সহ্য করতে পারে না। যাহোক, অল্পকালের মধ্যেই বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী রোসিটার এর একটা প্রতিকারের উপায় আবিষ্কার করেন। ইউরিয়ার $[CO(NH_2)_2]$ বদলে **থায়ো-ইউরিয়া** $[CS(NH_2)_2]$ নিয়ে ফর্ম্যাল্ডিহাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালেও রজনজাতীয় এক ধরনের বর্ণহীন প্লাস্টিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তারপরে দেখা গেল, ইউরিয়া ও থায়ো-ইউরিয়ার মিশ্রণের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থায় ফর্ম্যাল্ডিহাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক রকম মিশ্র থার্মোসেটিং-প্লাস্টিক পদার্থ পাওয়া যায়, যার গুণ ও ধর্ম এককভাবে ইউরিয়া বা থায়ো-ইউরিয়া থেকে সংশ্লেষিত প্লাস্টিকের চেয়ে উন্নততর হয়; আর তা ফেটেও যায় না। এই **মিশ্র প্লাস্টিক** কাচের মত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হয়; বিভিন্ন জিনিসের শিল্প-উৎপাদনে এটা আজকাল প্রচুর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন রঙে একে রঞ্জিত করা যায় এবং গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, ল্যাকার প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-উৎপাদনে এই মিশ্র প্লাস্টিক যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই **ইউরিয়া-ফর্ম্যাল্ডিহাইড** প্লাস্টিক কার্পাস-বস্ত্রাদির কোঁচকানো ভাব দূর করবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। আলাদাভাবে ইউরিয়া ও ফর্ম্যাল্ডিহাইডের দ্রবণে সুতোগুলিকে ভিজিয়ে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় উত্তপ্ত করলে সুতোর গায়ে উৎপন্ন প্লাস্টিকের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে যায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর থার্মো-প্লাস্টিক

পারস্পেক্স: ইংল্যাণ্ডের 'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ' নামক রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ জৈব রাসায়নিক উপাদানে

গঠিত কাচের মত স্বচ্ছ এক রকম প্লাষ্টিক উৎপাদন করেছেন, যার ব্যবসায়িক নাম দেওয়া হয়েছে 'পারস্পেক্স'। মিথাইল-মিথাক্রাইলেট নামক একটা জটিল জৈব যৌগ থেকে এই প্লাষ্টিক পদার্থটা উৎপাদিত হয়েছে। অ্যাসিটোন, হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ও মিথাইল অ্যালকোহলের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় মিথাইল মিথাক্রাইলেট যৌগ উৎপন্ন হয়। এই তরল যৌগটা অক্সিজেন বা কোন জৈব পারক্সাইডের অনুঘটনের ফলে **পলিমারিজেসন** পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে কাচের মত স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এক রকম প্লাষ্টিকে রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ ওই তরল যৌগটার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অণুগুলি পরস্পর জুড়ে বৃহৎ অণুতে পরিণত হয়, যার ফলে তার উপরোক্ত রূপান্তরটা ঘটে।

পারস্পেক্স প্লাষ্টিকের স্বচ্ছতা যে কোন সাধারণ কাচের চেয়ে বেশি; এমন কি, সর্বাধিক স্বচ্ছ কোয়ার্টজ কাচের (পৃঃ 137) প্রায় সমান। স্বচ্ছতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন বিকল্প-কাচ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর উৎপাদিত হয় নি; একে সার্থক **'জৈব কাচ'** বলা যায়। এই স্বচ্ছ প্লাষ্টিক পদার্থ ছাঁচে ঢেলে চশমা ও ক্যামেরার লেন্স প্রভৃতি তৈরি করা হয়। বিশেষতঃ, জিনিসটা **থার্মো-প্লাস্টিক** শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে উত্তাপে নমনীয় করে বার-বার একে ছাঁচে ফেলে বিভিন্ন আকার দেওয়া চলে। অবশ্য সাধারণ কাচকেও গুঁড়িয়ে গলিয়ে পুনরায় অন্য আকার দেওয়া যায়; কিন্তু পারস্পেক্স প্লাষ্টিক-কাচের বেলায় সেই গুঁড়ানোর খরচটাও বাঁচে। সাধারণ কাচ আঘাতে ফেটে-ভেঙ্গে টুকরাগুলি ছিট্‌কে বিপদ ঘটায়, পারস্পেক্স-কাচে সে আশঙ্কা নেই। এরোপ্লেনের জানালায় তাই এই বিকল্প-কাচ আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে; এর কাঠিন্য এত বেশি যে বুলেটের গুলিও এতে প্রতিহত হয়। এই **বুলেট-প্রুফ কৃত্রিম কাচ** আবার ওজনেও হাল্‌কা, সাধারণ কাচের ওজনের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র; অথচ পারস্পেক্সের সিট্ সমান মোটা কাচের সিটের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশী কঠিন ও সুদৃঢ়।

এ-সব গুরুত্বপূর্ণ গুণ ও ধর্মের জন্য পারস্পেক্স-কাচের ব্যবহার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আজকাল অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় পারস্পেক্স প্লাষ্টিকের ব্যবহারিক বিশেষ নাম **লুসাইট**।

পলিথিন ঃ অসম্পৃক্ত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন ইথিলিন (C_2H_4) থেকে উৎপাদিত এক রকম প্লাস্টিক পদার্থ **পলিথিন** নামে পরিচিত। সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনের অনুঘটন-প্রভাবে ইথিলিন গ্যাস অতি উচ্চ চাপিত অবস্থায়

পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ায় 'পলি-ইথিলিন' বা পলিথিন প্লাস্টিকে রূপান্তরিত হয়। ইথিলিনের CH_2-মূলকগুলি দীর্ঘ শৃঙ্খলাকারে পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিথিনের এক-একটি বৃহৎ অণু (লার্জ মলিকিউল) গঠন করে ; এই সংশ্লেষিত পালমার হাইড্রোকার্বন পলিথিনের এক-একটি অণুর গঠনে প্রায় 1500—2000 'CH_2' মূলক পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে থাকে।· পলিথিন-প্লাস্টিকের প্রচলিত ব্যবসায়িক নাম হলো **অ্যাল্কাথিন**। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বর্ণ ও কাঠিন্যের অ্যাল্কাথিন উৎপাদিত হয়। পলিথিন বা অ্যাল্কাথিন সবচেয়ে হাল্কা প্লাস্টিক, জলে ভাসে। এর বৈশিষ্ট্য অনেক,—জলে দ্রবিত বা সিক্ত হয় না, ক্ষার বা অ্যাসিডে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না; তাছাড়া থার্মো-প্লাস্টিক পদার্থের বিশেষ দৃঢ়তা ও নমনীয়তাও এর রয়েছে। উত্তাপে গলানো ও ঠাণ্ডায় কঠিন হলেও পলিথিন শ্রেণীর প্লাস্টিক এমন নমনীয় থাকে যে তাকে যথেচ্ছ বাঁকানো-চোরানো যায়। তড়িৎ-অপরিবাহী বলে বৈদ্যুতিক তারে অ্যাল্কাথিনের আবরণ ধরানো হয়; আবার এ-দিয়ে পাইপ, টিউব, অ্যাসিড-জার, তৈজস-পত্র প্রভৃতি নানা জিনিস তৈরি হয়ে থাকে।

গ্যালালিথ ঃ দুধের প্রোটিন-উপাদান **কেজিন** (ছানা ও চিজ) থেকে এই শ্রেণীর প্লাস্টিক উৎপাদিত হয়। সেলুলয়েড-প্লাস্টিকের মূল উপাদান সেলুলোজ (তুলা, কাঠের তন্তু প্রভৃতি) যেমন অত্যুচ্চ আণবিক ওজনের বৃহৎ-অণুবিশিষ্ট প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ, কেজিনের প্রোটিন উপাদানও তেমনি অতিকায় আণবিক গঠনের একটি প্রাণিজ পদার্থ। কেজিনের সঙ্গে কিছুটা ফ্রেঞ্চ চক্ বা কোন মিহি পদার্থ এবং ইচ্ছা হলে সামান্য কোন রং মিশিয়ে উপযুক্ত উত্তাপে গলিয়ে-মিশিয়ে, তারপরে চাপ দিয়ে সেই নরম পদার্থটাকে লম্বা দণ্ডের আকার দেওয়া হয়, অথবা দু'খানা ধাতব পাতের মধ্যে চেপে তাকে পাতে পরিণত করা হয়। তারপর ঐ দণ্ড বা পাত্‌কে **ফর্ম্যাল্ডিহাইডের** (ফর্ম্যালিন) জলীয় দ্রবণে সিক্ত করে শুকিয়ে শক্ত করা হয়। ফর্ম্যালিন শোষিত হয়ে কেজিনের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ ও বৃহত্তর অণু গঠনের ফলে জিনিসটা হাড়ের মত শক্ত প্লাস্টিকে পরিণত হয় ; এর ব্যবহারিক নাম গ্যালালিথ। এই **কেজিন-ফর্ম্যালিন** বা গ্যালালিথ প্লাস্টিককে উপযুক্ত ব্যবস্থায় হাড়, গজদণ্ড (আইভরি), মোষের শিং, প্রবাল (কোরাল) প্রভৃতির মত বিভিন্ন বর্ণ ও কাঠিন্য দেওয়া যায়, আর তা দিয়ে বোতাম, চিরুণী, ছাতার বাট প্রভৃতি নানা জিনিস প্রস্তুত হয়। সেলুলয়েডের মত এই **গ্যালালিথ** প্লাস্টিক দাহ্য নয় ; কিন্তু সেলুলয়েডের মত এ দিয়ে

আলোকচিত্র বা চলচ্চিত্রের ফিল্মের অনুরূপ সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করা যায় না। কোন কোন দেশে এই শ্রেণীর প্লাস্টিক **ইরিনয়িড** নামেও পরিচিত।

এই কেজিন-ফর্ম্যালিন প্লাস্টিক আবিষ্কৃত হয় একান্ত আকস্মিকভাবে। এক বৃটিশ রসায়ন-বিজ্ঞানী গবেষণাগারে কাজে তন্ময় ছিলেন; বাড়ী থেকে খাবার দিয়ে গেছে পাশের টেবিলে। খাবারের লোভে একটা বেড়াল টেবিলের উপরে লাফিয়ে উঠতে পাশের একটা বোতল ভেঙ্গে উল্‌টে পড়ে চিজের বাটিতে। বোতলটায় ছিল ফর্ম্যালিন। খেতে গিয়ে বিজ্ঞানী দেখলেন, নরম চিজ শক্ত জমাট বেঁধে গেছে। পরীক্ষা সুরু হলো, আর উল্লিখিত গ্যালালিথ প্লাস্টিকটার রাসায়নিক তথ্যাদি জানা গেল।

যাহোক, যে-সব প্লাস্টিকের কথা বলা হলো সেগুলি ছাড়া আরও নানা রকম প্লাস্টিক আবিষ্কৃত হয়েছে; তাদের মধ্যে বুটভার, টেরিলিন, নাইলন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুটির‍্যাল্‌ডিহাইড নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে বহুগুণিত (পলিমারাইজ্‌ড) ভিনাইল অ্যালকোহলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎপন্ন হয় দীর্ঘ শৃঙ্খলাকার আণবিক-গঠনের বৃহৎ অণুবিশিষ্ট একটি যৌগ, বিশেষ শ্রেণীর এক রকম প্লাস্টিক পদার্থ। একে বলা হয় **ভিনাইল প্লাস্টিক,** ব্যবহারিক নাম **বুটভার**। আমেরিকায় নিরাপদ কাচ (পৃঃ 146) তৈরি করবার জন্যে দু'খানা কাচের পাতের মাঝে স্বচ্ছ বুটভার-প্লাস্টিকের আস্তরণ লাগিয়ে জোড়া দেওয়া হয়। এ ছাড়া সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত **টেরিলিন**-প্লাস্টিক এ-যুগে যথেষ্ট প্রচলিত হয়েছে, টেরিলিনের সৌখীন জামা-কাপড় আজকাল বেশ জনপ্রিয়। জিনিসটা উৎপাদিত হয় ইথিলিন-গ্লাইকল নামক রাসায়নিক পদার্থ থেকে; কোন-কোন ক্ষেত্রে খনিজ কয়লা ও তেল থেকে উপজাত টেরাথ্যালিক অ্যাসিডের পলিমারিজেসন-প্রক্রিয়ায়ও টেরিলিন-প্লাস্টিক সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্লাস্টিকের মধ্যে **নাইলন** এ-যুগে সবচেয়ে পরিচিত ও সর্বাধিক ব্যবহৃত প্লাস্টিক পদার্থ। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতার জন্যে বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পে নাইলন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। জিনিসটা অতি-বৃহৎ অণুবিশিষ্ট একটা রাসায়নিক যৌগ, যার সংশ্লেষণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার এক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা 1940 খৃষ্টাব্দে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিক পদার্থটার বিষয় কিছু আলোচনা করে আমরা প্লাস্টিক-প্রসঙ্গ শেষ করবো।

'নাইলন' প্লাস্টিক

আমরা আগেই বলেছি, একটি অতি জটিল ও বৃহৎ আণবিক গঠনের রাসায়নিক যৌগ হলো নাইলন; এটা কোন বিশেষ রাসায়নিক নাম নয়, বিশেষ এক রকম প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক নাম মাত্র। যৌগটার আণবিক গঠন অনেকটা প্রোটিন-অণুর মত। নাইলনের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামাইন $[NH_2.(CH_2)_6.NH_2]$ নামক একটি রাসায়নিক যৌগের সঙ্গে এ্যাডিপিক অ্যাসিডের $[COOH.(CH_2)_4.COOH]$ বিক্রিয়ায় নাইলন-প্লাস্টিকের উৎপত্তি হয় কণ্ডেন্সেসন (পৃঃ 423) প্রক্রিয়ায়। উক্ত রাসায়নিক পদার্থ দুটির জলীয় দ্রবণকে কাঠ-কয়লা বা কার্বনের গুঁড়োর সাহায্যে বিশুদ্ধ ও বর্ণহীন করে নিয়ে তাদের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থকে **অটোক্লেভ** যন্ত্রের ভিতরে রেখে বিশেষ চাপ ও তাপে বহুগুণিত (পলিমারাইজ্‌ড) করা হয়। পলিমারিজে-সনের ফলে উৎপন্ন যৌগটা একটা বিশেষ ঘনত্বে এলে বুঝা যায়, নাইলনের দীর্ঘ শৃঙ্খলাকার বৃহৎ অণুর উৎপত্তি ঘটেছে। এভাবে উৎপন্ন নাইলন অত্যধিক উজ্জ্বল ও চক্‌চকে হয় বলে এর সুতোর বস্ত্রাদি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে; তাই এর চক্‌চকে ভাব কমাবার জন্যে উৎপাদন-কালে টাইটেনিয়াম-ডাইঅক্সাইড নামক একটি পদার্থ মেশানো হয়, যার ফলে নাইলনের চাকচিক্য কিছুটা কমে। এই ব্যবহারযোগ্য উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট নাইলনকে বলা হয় **ম্যাট নাইলন**। উত্তপ্ত তরল অবস্থায় পদার্থটাকে যান্ত্রিক কৌশলে চাপের সাহায্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে চালালে জিনিসটা শক্ত ও কিছুটা স্থিতিস্থাপক সূত্রাকারে বেরিয়ে আসে; নাইলনের
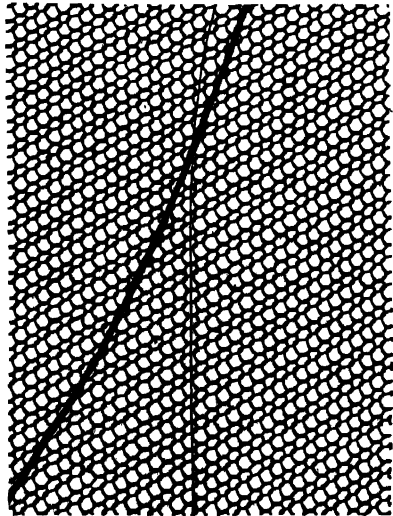
নাইলন-সূত্রের সঙ্গে চুলের সূক্ষ্মতার তুলনা (আড়াআড়ি কালো রেখাটি একগাছা চুল)

এই সুতোগুলি রেশম-সুত্রের মত শক্ত ও চকচকে হয়। নাইলনের সুতো টানলে তার দৈর্ঘ্য প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম সূত্রে পরিণত হয়। এর কারণ, পদার্থটার শৃঙ্খলাকার অণুগুলি দীর্ঘায়ত হয়ে যায়, আর তার ফলে সুতোর **টান-শক্তি** যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্র থেকে নাইলন-সূত্রের সম্ভাব্য সূক্ষ্মতার একটা ধারণা করা যাবে। নাইলন-সূত্রের দৃঢ়তা ও টান-শক্তি এত বেশি যে, সম-ওজনের ইস্পাতের তারের চেয়েও তা অধিকতর টান সহ্য করতে পারে। মাত্র আধ ইঞ্চি মোটা নাইলনের দড়িতে তিন টনেরও বেশী ওজনের জিনিস স্বচ্ছন্দে ঝুলিয়ে রাখা যায়; নাইলনের সুতো দিয়ে তাই প্যারাসুটের কাপড়, দড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। তা ছাড়া নাইলন-প্লাষ্টিকের ব্যবহার এ-যুগে বহুমুখী ;—সুদৃশ্য সৌখিন বস্ত্রাদি বয়নে এর ব্যবহার প্রচুর। নাইলনের শাড়ী, মোজা, জামার কাপড় প্রভৃতিতে আজকাল বাজার ছেয়ে গেছে। আবার নাইলনের পাতও তৈরি হয়; তাছাড়া এর শক্ত কুঁচি দিয়ে দাঁত মাজবার ও রং লাগাবার ব্রাস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে।

আমরা আগেই বলেছি, নাইলন হলো অতিকায় অণুবিশিষ্ট একটা সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ; উৎকৃষ্ট নাইলনের **আণবিক ওজন** সাধারণতঃ 12 থেকে 20 হাজারের মধ্যে থাকে। আণবিক ওজন এর কম হলে নাইলনের সুতো হয় খস্‌খসে ও কম টান-সহ; আবার বিশ হাজারের বেশী আণবিক ওজনের নাইলনকে তাপ প্রয়োগে গলানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পলিমারিজেসন বা অণু-সংযোজনের সংখ্যা বাড়িয়ে-কমিয়ে নাইলনের সান্দ্রতা, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পরিবর্তন করা যায়। কাজেই একটা নির্দিষ্ট আণবিক ওজনে পৌঁছুলেই পলিমারিজেসন-প্রক্রিয়া বন্ধ করলে নির্দিষ্ট মানের নাইলন পাওয়া যায়। প্রয়োজনানুরূপ নির্দিষ্ট স্তরে পলিমারিজেসন বন্ধ করবার জন্যে জিনিসটা উৎপাদনের সময় সাধারণতঃ অ্যাসিটিক অ্যাসিড মেশানো হয়। এভাবে একই নাইলন-যৌগের বিভিন্ন আণবিক ওজনবিশিষ্ট অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর নাইলন উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর কোন-কোনটাকে বলা হয় **পারলন।**

বস্ত্র-শিল্পে নাইলনের বহুল প্রচলনের যথেষ্ট কারণ আছে; এটা কোন অম্ল বা ক্ষার পদার্থে আক্রান্ত হয় না, সূত্রগুলি হয় বিশেষ সূক্ষ্ম এবং রেশমের মত কোমল ও চাকচিক্যবিশিষ্ট। কিন্তু মনে রাখা দরকার, নাইলন একটা বিশেষ দাহ্য পদার্থ; সেলুলোজের মত সহজেই এতে আগুন ধরে যায়, কাজেই এর বস্ত্রাদি ব্যবহারে সাবধানতা দরকার।

কৃত্রিম রাবার

আধুনিক যুগের শিল্প-সভ্যতায় রাবার একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ; বিশেষতঃ মোটর গাড়ীর টায়ার প্রস্তুতিতে রাবার অপরিহার্য। এক শ্রেণীর উদ্ভিদের কাণ্ডদেশ কাটলে যে সাদা ও আঠালো রস নির্গত হয় তা-ই হলো কাঁচা রাবার; এই রসকে বলা হয় **ল্যাটেক্স**। ল্যাটেক্সের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় তার রাবার-অংশ ঘনীভূত হয়ে জমাট বাঁধে। সিংহল, মালয়, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের জঙ্গলে রাবারের গাছ জন্মায়; আর আমাদের দেশের খেজুর-গাছের কাণ্ড কেটে রস-সংগ্রহের মত রাবার-গাছের ল্যাটেক্স সংগৃহীত হয়। ইদানিং আর স্বভাবজ বন্য গাছ নয়, রাবার-গাছের সুপরিকল্পিত চাষের প্রবর্তন হয়েছে এবং তা থেকে অধিকতর পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ল্যাটেক্স পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুসম্বদ্ধ রাবার-শিল্পের প্রবর্তন করেন ইংলণ্ডের **টমাস হ্যান্‌কক** নামক এক বিজ্ঞানী। ল্যাটেক্স থেকে পৃথকীকৃত ঘনীভূত কাঁচা রাবারকে রোলারের ভিতর দিয়ে পিষে বার করে তিনি এক রকম প্লাস্টিকের মত রাবার-পিণ্ড প্রস্তুত করেন, যাকে বলা হতো **ম্যাস্টিকেটেড রাবার**। তারপরে রাবারের সঙ্গে সাল্‌ফার (গন্ধক) বা কোন সাল্‌ফার-যৌগ মিশিয়ে আঠালো-ভাবশূন্য অপেক্ষাকৃত শক্ত রাবার তৈরি করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়। এরূপ সাল্‌ফার-যুক্ত রাবারকে বলা হয় **ভ্যাল্‌কানাইজ্‌ড রাবার;** আর রাবারের সঙ্গে সাল্‌ফার সংযোগের এই পদ্ধতিটাকে বলে **ভ্যাল্‌কানাইজিং।** এই প্রক্রিয়ায় রাবারের সঙ্গে যুক্ত সাল্‌ফারের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (50%) হলে এক রকম শক্ত রাবার উৎপন্ন হয়, যা **ভ্যাল্‌কানাইট** বা **এবোনাইট** নামে পরিচিত। আগের দিনে এই পদার্থটাকে উত্তাপে নরম করে প্লাস্টিকের মত ছাঁচে ফেলে নানা জিনিস তৈরি করা হতো।

আজকাল মোটরের টায়ার ও রাবারের অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভ্যাল্‌কানাইজ্‌ড রাবারই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; অবশ্য উৎপাদনের শিল্প-পদ্ধতির সুবিধার জন্যে ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক সময় সাল্‌ফার ছাড়া আরও বিভিন্ন পদার্থ রাবারের সঙ্গে মেশানো হয়। 1915 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, ভ্যাল্‌কানাইজিং পদ্ধতিতে সাল্‌ফারের

সঙ্গে কতকটা ভুসাকালিও রাবারের সঙ্গে মেশালে সেই ভ্যাল্‌কানাইজ্‌ড রাবারের টান-শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং ঘর্ষণজনিত ক্ষয়ও বহুলাংশে নিবারিত হয়। এভাবে শতকরা প্রায় 28 ভাগ কার্বন-ব্ল্যাক বা ভুসাকালি মিশিয়ে যে ভ্যাল্‌কানাইজ্‌ড রাবার উৎপন্ন হয় তা দিয়ে মোটর-গাড়ীর টায়ার তৈরি করা হলে তা সাধারণ ভ্যালকানাইজ্‌ড রাবার-টায়ারের চেয়ে দ্বিগুণ দীর্ঘস্থায়ী হয়, ঘর্ষণে ক্ষয়ও হয় যথেষ্ট কম।

বিভিন্ন শিল্প-প্রয়োগের জন্যে রাবারের চাহিদা প্রচুর; কিন্তু প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন সীমিত এবং তার জন্যে আবার কয়েকটি মাত্র দেশের উপরেই নির্ভর করতে হয়। এজন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরে কৃত্রিম রাবার বা অনুরূপ কোন বিকল্প পদার্থ উৎপাদনের চেষ্টা করছিলেন। গবেষণার ফলে শেষে জানা গেল, প্রাকৃতিক রাবারকে বিশেষ উত্তাপে বিয়োজিত করলে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাইড্রো-কার্বন যৌগ পাওয়া যায়, যাকে বলে **আইসোপ্রিন**, $CH_2 : C(CH_3).CH : CH_2$; জিনিসটা হলো উদ্ভিজ্জ রাবারের প্রধান উপাদান। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই জৈব যৌগটা স্থিরভাবে রেখে দিলে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে তার অণুগুলি বহুগুণিত (পলিমা-রাইজ্‌ড) হয়ে রাবারের অনুরূপ একটা স্থিতিস্থাপক পদার্থে পরিণত হয়; বহুসংখ্যক আইসোপ্রিন-অণু পরস্পর জুড়ে এক-একটা অতিকায় জটিল অণু গঠিত হয়। আইসোপ্রিনের এই **পলিমারিজেসন**-প্রক্রিয়া এত ধীরগতি যে, শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা মূল্যহীন। পরে অবশ্য ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে 1910 খৃষ্টাব্দে; দেখা গেছে, ধাতব সোডিয়ামের অণুঘটনে আইসোপ্রিনের পলিমারিজেসন-প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়।
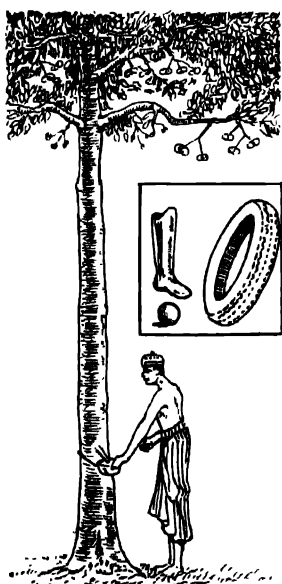
রাবার-গাছের 'ল্যাটেক্স' রস সংগ্রহ করা হচ্ছে

বহুগুণিত বা পলিমারাইজ্‌ড আইসোপ্রিনের তেমন শিল্প-সার্থকতা না থাকলেও তার চেয়ে সরল একটা হাইড্রোকার্বন **বুটাডিনকে** ($CH_2 : CH.$

$CH : CH_2$) অপেক্ষাকৃত সহজে বহুগুণিত করে রাবারের একটা বিকল্প পদার্থ উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতির উন্নতি সাধন করে বিভিন্ন দেশে সংশ্লেষিত কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের রাসায়নিক প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বুটাডিন থেকে সংশ্লেষিত এই কৃত্রিম রাবার সাধারণতঃ **বুনা-রাবার** নামে পরিচিত। এর-ও পলিমারিজেসন প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম (Na) অনুঘটকের কাজ করে; তাই বুটাডিনের 'বু' ও সোডিয়ামের প্রতীক 'Na' বা 'না' মিলিয়ে 'বুনা' শব্দটা গঠিত হয়েছে, যদিও আজকাল আর সোডিয়াম অনুঘটক হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। যাহোক, এই কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় বুটাডিন যৌগটা সাধারণতঃ অ্যাসিটিলিন (পৃঃ 209) গ্যাস থেকে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে ; তাছাড়া আবার অ্যালকোহলকেও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বুটাডিনে রূপান্তরিত করা হয়। খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে উপজাত বুটেন ও বুটিলিন গ্যাস থেকেও বুটাডিন কোথাও-কোথাও উৎপাদিত হয়ে থাকে। এ-সব সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়া রসায়নের বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচায়ক। যাহোক, এই হাইড্রোকার্বন বুটাডিনের অতিকায় অণু গঠন, অর্থাৎ পলিমারিজেসন পদ্ধতিতে বুটাডিন থেকে কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের জন্যে আজকাল সোডিয়াম ছাড়া অনেক সময় বেঞ্জোইল-পারক্সাইড প্রভৃতি অন্যান্য অনুঘটকও ব্যবহৃত হয়।

বুটাডিন বা 'বুনা' রাবারের উৎকর্ষ সাধনের জন্যে অনেক সময় বুটাডিনের সঙ্গে স্টাইরিন ($C_6H_5.CH : CH_2$), অথবা অ্যাক্রিলিক নাইট্রাইল ($CH_2 : CH.CN$) নামক অপর কোন একটি জৈব যৌগ মেশানো হয়, আর সেই মিশ্রণটা সহজে ও অল্পসময়ে বহুগুণিত হয়ে থাকে। বুটাডিন ও সেই অপর যৌগটি একসঙ্গে পলিমারাইজ্‌ড হয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর কৃত্রিম রাবারের অতিকায় অণু গঠন করে। বুটাডিনের সঙ্গে প্রথমোক্ত যৌগ (স্টাইরিন) মিশিয়ে যে কৃত্রিম রাবার পাওয়া যায় তাকে বলে **'বুনা-এস'**, আর অপর যৌগটা (অ্যাক্রিলিক নাইট্রাইল) মিশিয়ে উৎপাদিত রাবার **'বুনা-এন'** নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে 1944 খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সংশ্লেষিত কৃত্রিম রাবারের যে উৎপাদন-শিল্প আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তখনই বছরে প্রায় সাত লক্ষ টন 'বুনা-এস' রাবার উৎপাদিত হতো। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এর উৎপাদন আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। রাসায়নিক সংশ্লেষণ-শিল্পে এই কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবন মানুষের এক আশ্চর্য রাসায়নিক কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সংশ্লেষিত বুনা-রাবার আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই রাবারের বিকল্প পদার্থ হিসেবে **নিওপ্রিন** নামক আর একটা কৃত্রিম রাবার আবিষ্কৃত হয়েছিল। ক্লোরোপ্রিন ($CH_2 : CCl.CH : CH_2$, ক্লোরিনেটেড বুটাডিন) নামক একটি জৈব যৌগের অণুকে বহুগুণিত (পলিমারাইজ্‌ড) করে নিওপ্রিনের অতিকায় অণু গঠন করা হয়েছে। আণবিক গঠনের বিচারে যদিও অন্যান্য সংশ্লেষিত রাবারের চেয়ে নিওপ্রিনই প্রাকৃতিক রাবারের অধিকতর অনুরূপ, তাহলেও একে কেবল একটা সংশ্লেষিত রাবার-বিকল্প মনে করা ঠিক নয়; বরং নিওপ্রিনকে একটা নূতন সংশ্লেষিত যৌগ মনে করা যায়, যেহেতু কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যে এটা প্রকৃত রাবারের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী। নিউপ্রিন রাবারের মত স্থিতিস্থাপক, দৃঢ় ও ঘর্ষক্ষম তো বটেই; উপরন্তু এটা অধিকতর তাপসহ, সাধারণ কোন দ্রাবক পদার্থে গলে না এবং পেট্রল, খনিজ তেল প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আবার প্রাকৃতিক রাবারের চেয়ে নিওপ্রিন দিয়ে তৈরী আধারের গ্যাস চলাচল রোধ করবার ক্ষমতাও বেশি। অধিক উত্তাপে নিওপ্রিন গলে নষ্ট হয়ে যায় সত্য, কিন্তু জিনিসটা জ্বলে না। এ-সব নানা বৈশিষ্ট্যের জন্যে অনেক কাজে স্বাভাবিক রাবারের চেয়েও নিওপ্রিন অধিকতর উপযোগী হয়ে থাকে।

প্রাকৃতিক রাবারের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় এক রকম ক্লোরিন-সংযুক্ত (ক্লোরিনেটেড) রাবার পাওয়া যায়, যা **অ্যালোপ্রিন** নামে পরিচিত। জিনিসটার সঙ্গে জাইলিন প্রভৃতি কোন উপযুক্ত দ্রাবক পদার্থ মিশিয়ে ও তাতে কিছুটা ডেকালিন (ডেকাহাইড্রো-ন্যাপ্‌থলিন) মেশালে একটা আঠালো মিশ্রণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে আবার কিছু ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন মেশালে সব মিলিয়ে জিনিসটা অনেকটা প্লাস্টিক-ধর্মী হয়ে পড়ে। অ্যালোপ্রিনের এই আঠালো অর্ধ-তরল মিশ্রণটা কাঠ বা ধাতব জিনিসের গায়ে রং-ভার্নিসের মত লাগালে এমন একটা কঠিন আবরণ পড়ে, যা সাধারণ কোন অ্যাসিড, ক্ষার, বা লবণের বিক্রিয়ায় কিছুমাত্র আক্রান্ত হয় না।

সংশ্লেষিত সুগন্ধি

আধুনিক রসায়ন যেমন প্রকৃতিজ বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের বিকল্প যৌগ ইণ্ডিগোটিন, অ্যালিজারিন প্রভৃতি (পৃঃ 399) বিভিন্ন কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত করে প্রকৃতিকে জয় করেছে, তেমনি প্রাকৃতিক সুগন্ধ দ্রব্য-

গুলির অনুরূপ গন্ধবিশিষ্ট বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে উৎপাদন করে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রকৃতি-নির্ভরতা বহুলাংশে দূর করেছেন। আজ আর গোলাপ, বকুল, চামেলি, যুঁই, অগুরু, চন্দন প্রভৃতির সুগন্ধ উপাদানের সন্ধানে বনে-বাগানে না গেলেও চলে, রসায়নাগারেই এ-সব উদ্ভিজ্জ গন্ধ-দ্রব্য নিছক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হচ্ছে। এক সময় লোকের ধারণা ছিল, প্রাকৃতিক পদার্থের বর্ণ, গন্ধ প্রভৃতির অনুকরণ বা বিকল্প পদার্থ গঠন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই প্রকৃতির রাসায়নিক রহস্য ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণী বিদ্যা। বিভিন্ন উদ্ভিদের ফুল, ফল, শিকড়, লতাপাতা প্রভৃতিতে সঞ্জাত উদ্বায়ী সুগন্ধ উপাদানগুলির রাসায়নিক গঠন-তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, আর তাদের সংগঠক জৈব উপাদানগুলি সংশ্লেষিত করে প্রকৃতির অনুরূপ কৃত্রিম সুগন্ধিসমূহ উৎপাদন করেছেন। বস্তুতঃ সুগন্ধি মাত্রই উদ্বায়ী জৈব পদার্থ; যা স্বভাবতঃই উবে বাতাসে মিশে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে আমাদের ঘ্রানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে গন্ধের সুখানুভূতি জাগায়। যুগ-যুগ ধরে মানুষ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে সঞ্জাত স্বভাবজ উদ্বায়ী জৈব পদার্থগুলি পাতন, উর্ধপাতন, দ্রবণ প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করতো, পরিমাণে পাওয়া যেত অতি সামান্য। কাজেই সে-কালে, এমন কি, এ-কালেও প্রাকৃতিক গন্ধ-দ্রব্য এসেন্স, আতর প্রভৃতির মূল্য পড়ে যায় অত্যধিক। আর আজ গোলাপ, চন্দন প্রভৃতির অনুরূপ সুগন্ধি, অথবা আপেল, আনারস প্রভৃতি ফলের অনুরূপ গন্ধযুক্ত সংশ্লেষিত কৃত্রিম নির্যাস অতি অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং তা এক বিরাট রাসায়নিক শিল্পে পরিণত হয়েছে। এর ফলে প্রকৃতির অনুরূপ বিভিন্ন গন্ধ-দ্রব্য আজকাল যেমন সুলভ হয়েছে, তেমনি সুগন্ধ তেল, সাবান, ক্রিম, সিরাপ, চকলেট প্রভৃতির উৎপাদন-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

যদিও অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংশ্লেষিত সুগন্ধিগুলি ও বিশিষ্ট গন্ধযুক্ত কৃত্রিম নির্যাসসমূহ কেবল প্রকৃতিজ গন্ধ-দ্রব্যের রাসায়নিক অনুকরণ মাত্র; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল, ফল প্রভৃতির প্রাকৃতিক গন্ধদ্রব্যাদির অবিকল অনুরূপ বা উৎকৃষ্টতর পদার্থও বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। এরূপ সংশ্লেষিত সুগন্ধি-শিল্পের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলির মধ্যে কৃত্রিম **কুমারিন** ও ভেনিলিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য দেশে 'উড্রাফ' নামক এক রকম উদ্ভিদের স্বভাবজ সুগন্ধী তৈলাক্ত পদার্থ 'কুমারিন' নামক গন্ধদ্রব্যটি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ও মূল্যবান ছিল। 1875 খৃষ্টাব্দে পার্কিন নামক এক রসায়ন-বিজ্ঞানী এই জৈব কুমারিনের অনুরূপ পদার্থ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত করেন।

কৃত্রিম গন্ধদ্রব্যাদি

সোডিয়াম অ্যাসিটেট, স্যালিসিল্যাল্ডিহাইড ও অ্যাসিটিক অ্যান্হাইড্রাইড় নিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বিক্রিয়ার মাধ্যমে পার্কিন কৃত্রিম কুমারি সংশ্লেষিত করেন। এর অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানী টিম্যান সংশ্লেষণ করে কৃত্রিম **ভেনিলিন**, যা প্রকৃতিতে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায় এ জাতীয় বিন (কলাই) থেকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত ভেনিলিন ছাড়াও পাইন কাঠ থেকে নিষ্কাশিত 'কনিফেরিন' নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ক্রোমিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে পাওয়া গেল গ্লুকোভেনিলিন নামক একটি জৈব যৌগিক পদার্থ, যা থেকেও ভেনিলিন পৃথক করা হয়। পরে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ভেনিলিন প্রস্তুত করা হয় **ইউজিনল** থেকে, যা লবঙ্গের তেলের একটি প্রধান রাসায়নিক উপাদান। আজকাল আবার কোল-টার থেকে উপজাত টলুইনকে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কৃত্রিম ভেনিলিনের সংশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশেষ সহজসাধ্য ও লাভজনক হয়েছে। সুগন্ধি-শিল্পে ভেনিলিনের ব্যবহার বহুমুখী ও ব্যাপক; আজকাল লজেন্স, আইসক্রিম প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যবস্তুতেও ভেনিলিনের ব্যবহার প্রচুর। সুগন্ধী দ্রব্যের রাসায়নিক শিল্পে ভেনিলিন এ-যুগে একটি অতিপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ।

সংশ্লেষিত সুগন্ধি-শিল্পে আয়োনোন ও নাইট্রো-মাস্ক নামক দু'টি রাসায়নিক সুগন্ধ-দ্রব্যের আবিষ্কারও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক রকম রজনজাতীয় উদ্ভিজ্জ তেলের উপরে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় মৃগনাভি বা কস্তুরীর অনুরূপ সুগন্ধী পদার্থ উৎপাদিত হয়েছে 1838 খৃষ্টাব্দে। এই কৃত্রিম গন্ধদ্রব্যটির আবিষ্কর্তার নামানুসারে এটি 'বাওর মাস্ক' বা **নাইট্রো-মাস্ক** নামে পরিচিত। নাইট্রো-মাস্কের চেয়েও উন্নততর কস্তুরী-গন্ধী সুরভি মস্‌কিন, মাস্ক-টিবেটিন প্রভৃতিও পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত হয়েছে। ভায়োলেট ফুলের স্বভাবজ সুগন্ধের অনুরূপ কৃত্রিম সুরভি সংশ্লেষিত করতে গিয়ে বিজ্ঞানী

টিম্যান 'আয়োরোন' নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ পান, যা বস্তুতঃ গন্ধহীন ; কিন্তু সামান্য অ্যাসিডের সংস্পর্শে তা এমন একটি উদ্বায়ী পদার্থে রূপান্তরিত হয়, যার সুগন্ধ ভায়লেট ফুলের সুগন্ধকেও হার মানায়। এই রাসায়নিক পদার্থ টার নাম দেওয়া হয় **আয়োনোন।** সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কৃত্রিম সুগন্ধি-শিল্পে এই আয়োনোনের অবদান অতি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী কালে অবশ্য আরও নানা শ্রেণীর আয়োনোন সংশ্লেষিত হয়েছে।

উল্লিখিত সংশ্লেষিত সুগন্ধিগুলি ছাড়াও নানা রকম রাসায়নিক যৌগ উৎপাদিত হয়েছে, যাদের সুগন্ধ বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ সুগন্ধী উপাদানের অনুরূপ ; যেমন **মিথাইল-স্যালিসিলেট** হলো উইণ্টারগ্রীন নামক উদ্ভিজ্জ তেলের সুগন্ধের অনুরূপ। রাসায়নিক পদার্থ বেঞ্জাল্ডিহাইড, অ্যাসিট্যাল্ডিহাইড, নাইট্রো-বেঞ্জিন প্রভৃতিও বিভিন্ন স্বভাবজ সুগন্ধ তেলের অনুরূপ সুগন্ধবিশিষ্ট। কৃত্রিম সুগন্ধি উৎপাদনের রাসায়নিক তত্ত্বাদির বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, বিশেষতঃ এ-সবের রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতি যেমন অত্যন্ত জটিল তেমনি বিশেষ সূক্ষ্ম তাৎপর্যপূর্ণ। মোট কথা, প্রাকৃতিক সুগন্ধিগুলি মুখ্যতঃ উদ্ভিদ-দেহে সঞ্জাত বিভিন্ন উদ্বায়ী তৈল-জাতীয় জৈব পদার্থ। এগুলির অনুরূপ গন্ধবিশিষ্ট উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞান প্রকৃতিকে বস্তুতঃ হার মানিয়েছে। এ-সব সংশ্লেষিত কৃত্রিম সুগন্ধী দ্রব্যগুলির উৎপাদন-ব্যয় স্বভাবজ উদ্ভিজ্জ সুগন্ধিগুলির নিষ্কাশন-ব্যয়ের নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। এর ফলে আধুনিক যুগে বিভিন্ন সুগন্ধি উৎপাদনে রসায়ন-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, দামে সস্তা হওয়ায় ব্যবহারও বেড়েছে। বিশেষতঃ কৃত্রিম সুগন্ধী দ্রব্যাদি সুলভ হয়ে সাবান, ক্রিম প্রভৃতি প্রসাধন-শিল্পেরও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে।

সংশ্লেষিত কৃত্রিম কর্পূর

উদ্ভিদজাত প্রাকৃতিক গন্ধ-দ্রব্যের মধ্যে কর্পূর বা **ক্যাম্ফর** একটি অতি পরিচিত ও প্রয়োজনীয় জৈব উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ ; এর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে আমরা এ-প্রসঙ্গ শেষ করবো। পুর্ব এশিয়ার জাপান, বর্ণিয়ো, ফরমোজা দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের এক জাতীয় গাছের প্রধানতঃ পাতা থেকেই কর্পূর পাওয়া যায়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এই গাছকে বলে 'লরাস ক্যাম্ফোরা'। আবদ্ধ পাত্রে এর পাতা ও ডালপালা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করলে উদ্বায়ী কর্পূর পাতিত হয়ে বেরিয়ে আসে। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে কর্পূর

মিশে ঊর্ধ্বপাতিত হয়ে বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা পাত্রের মধ্যে জমে। কর্পূরের কিছুটা রোগনাশক, বীজবারক, সুগন্ধদায়ী ও অন্যান্য গুণের জন্যে পদার্থটা বহুকাল থেকেই নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এর ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যেহেতু **সেলুলয়েড** (পৃঃ 324) উৎপাদনে কর্পূর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সিনেমার ফিল্ম, ফটোগ্রাফির নেগেটিভ প্লেট ও কোন কোন প্লাস্টিকের উৎপাদন-শিল্পে সেলুলয়েডের ব্যবহার বেড়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে কর্পূরের চাহিদাও বাড়তে থাকে। যে-সব অঞ্চলে কর্পূর-বৃক্ষ জন্মায় তার অধিকাংশই সেকালে ছিল জাপানের অধিকারে; আর বিজ্ঞান-সম্মতভাবে এর চাষ বাড়িয়ে জাপান পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে অতি উচ্চমূল্যে কর্পূর সরবরাহ করে বিশেষ লাভবান হচ্ছিল। এই পর-নির্ভরতা দূর করবার জন্যে পাশ্চাত্যের রসায়ন-বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদনের জন্যে গবেষণা সুরু করেন।

কর্পূর বা ক্যাম্ফর একটা **হাইড্রোকার্বন** শ্রেণীর জৈব রাসায়নিক যৌগ; দেখতে সাদা, একটা বিশেষ গন্ধবিশিষ্ট উদ্বায়ী ও দাহ্য পদার্থ। পদার্থটার রাসায়নিক গঠন অতি জটিল বলে এর আণবিক গঠন-বিন্যাস নির্ণয় করতে বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। যাহোক, বহু গবেষণার পরে শেষে উদ্ভিদজাত কর্পূরের আণবিক গঠন নিরূপিত হয় এবং 1903 খৃষ্টাব্দে কৃত্রিম কর্পূর রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই কৃত্রিম কর্পূরের শিল্প-উৎপাদন সফল হয়ে জিনিসটা বাজারে বিক্রয় হতে সুরু করে। এই সংশ্লেষিত কর্পূর বিভিন্ন গুণ ও ধর্মে সর্বাংশে প্রাকৃতিক কর্পূরের অনুরূপ হয়ে শিল্পক্ষেত্রে প্রচুর ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংশ্লেষিত কৃত্রিম কর্পূর উৎপাদিত হয়েও কিন্তু প্রাকৃতিক কর্পূরের বাজার তেমন কিছু ব্যাহত হয় নি; জাপানী কর্পূরের চাহিদা আজও যথেষ্ট রয়েছে। কৃত্রিম নীল সংশ্লেষিত হওয়ার পরে উদ্ভিজ্জ নীলের চাষ যেমন বন্ধ হয়ে গেছে, পূর্ব-এশিয়ায় কর্পূর বৃক্ষের চাষের সে বিপর্যয় ঘটে নি এবং অদূর-ভবিষ্যতে ঘটবে বলেও মনে হয় না। চলচ্চিত্র ও আলোক-চিত্রের ফিল্ম প্রস্তুতির জন্যে সেলুলয়েড-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং তার ফলে কর্পূরের চাহিদাও বেড়েছে; কিন্তু তদনুপাতে কৃত্রিম কর্পূরের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয় নি। এর কারণ হলো এই যে, **কৃত্রিম কর্পূর** সংশ্লেষণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল তারপিন বা টার্পেণ্টাইন তেলের দাম যথেষ্ট বেশি,

পাওয়াও যায় কম। কাজেই কৃত্রিম কর্পূর চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এবং তা দিয়ে সেলুলয়েডের উৎপাদন-শিল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও চলে না। পাইন-জাতীয় উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত তারপিন তেলের কোন বিকল্প কাঁচা মাল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লেষিত কর্পূর প্রাকৃতিক কর্পূরের স্থান অধিকার করতে পারবে না। তবে কৃত্রিম কর্পূর সংশ্লেষিত হওয়ায় প্রাকৃতিক কর্পূরের অত্যধিক মূল্য অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মানব-কল্যাণে রসায়নের অসংখ্য অবদানের মধ্যে সংশ্লেশিত বা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত বহুবিধ রঞ্জক পদার্থ, ঔষধ-পত্র, প্লাস্টিক, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি এ-যুগে মানুষের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। সংশ্লেষণী-রসায়ন মানুষের হাতে প্রকৃতির রাসায়নিক কলা-কৌশল ও নৈপুণ্যের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছে; এ-যুগে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ রসায়নাগারে নিছক রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত কি হবে! হয়তো ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন মানুষ কোন রাসায়নিক পদার্থের জন্যেই আর প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না।

ষোড়শ অধ্যায়

হর্মোন ও ভিটামিন

বায়োকেমিস্ট্রি বা জীবন-রসায়ন: প্রাণিদেহে হর্মোন ও ভিটামিনের গুরুত্ব; বিভিন্ন গ্রন্থি-রস বা হর্মোন — থাইরয়েড গ্রন্থি ও থাইরক্সিন, রাসায়নিক গঠন ও কার্যকারিতা; অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড ও অ্যাড্রিনেলিন — উৎস, রাসায়নিক গঠন, কার্যকারিতা ও সংশ্লেষিত অ্যাড্রিনেলিন; ইন্‌সুলিন ও প্রাণিদেহে তার কার্যকারিতা, কৃত্রিম ইনসুলিন; পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড ও বিভিন্ন হর্মোন; স্বাস্থ্যরক্ষায় বিভিন্ন হর্মোনের গুরুত্ব। ভিটামিনের আবিষ্কার ও বিভিন্ন রোগের প্রতিকার; প্রাণিদেহে বিভিন্ন ভিটামিনের কার্যকারিতা ও খাদ্যের উৎকর্ষতা; ভিটামিনের প্রাকৃতিক উৎস ও কৃত্রিম ভিটামিন; ভিটামিনের অনুঘটন-ক্রিয়া; খাদ্যের বিপাক-ক্রিয়ায় বিভিন্ন এঞ্জাইম—টায়ালিন, পেপ্‌সিন, রেনিন প্রভৃতি; বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক গঠন ও তাদের কৃত্রিম উৎপাদন; ভিটামিন-ডি ও আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি; প্রাণিদেহে লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতব পদার্থের প্রয়োজনীয়তা।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে উৎপন্ন বিভিন্ন শর্করা, প্রোটিন, জৈব তেল, চর্বি প্রভৃতির রাসায়নিক সংযুতি ও আণবিক গঠন নিরূপিত হয়; এমন কি, প্রাণী-দেহে সঞ্জাত কোন কোন জৈব যৌগের রাসায়নিক সংশ্লেষণও সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ফরাসী রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্থোলেট এক সময় বলেছিলেন, জৈব রসায়নের মূল সমস্যাই হলো জীবদেহে সঞ্জাত বিবিধ জটিল যৌগের রাসায়নিক সংযুতি নির্ধারণ এবং অজৈব পদার্থাদির রাসায়নিক সংযোগে সেগুলির অনুরূপ যৌগ সংশ্লেষণ করা। জৈব রসায়নের উদ্দেশ্য কেবল এ-ই না হলেও বহু খ্যাতনামা রসায়ন-বিজ্ঞানী বার্থোলেটের এই মন্তব্যের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁদের অনলস গবেষণার ফলে বহু উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ যৌগের উৎপত্তি ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন জৈব যৌগের উৎপত্তির তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এতটা তৎপর হয়ে ওঠেন যে, কেবল জীবদেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সম্বন্ধীয় চর্চা নিয়েই রসায়নের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা গড়ে ওঠে, যাকে বলা হয় **বায়োকেমিস্ট্রি (bio-chemistry),** বাংলায় বলা যায় 'জীবন-রসায়ন'।

শারীরবিজ্ঞান ও জৈব রসায়নের বিভিন্ন জ্ঞান ও তথ্যাদির ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে ক্রমে রসায়নের এই 'বায়ো-কেমিষ্ট্রি' শাখার প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। আজ আমরা প্রাণিদেহের, বিশেষতঃ মানব-দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ও দেহজ জটিল জৈব যৌগগুলির উৎপত্তি ও উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেছি। সেই সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ-প্রতিরোধে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃস্থত বিভিন্ন জৈব রস বা **হর্মোন** এবং ভুক্ত খাদ্যের **ভিটামিন** শ্রেণীর উপাদানগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এ-সব তথ্যের সামান্য কিছু আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করতে চেষ্টা করবো।

দেহের স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে সকলেরই সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং তার জন্যে দেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অবশ্যই দরকার। কেবল পুষ্টিকর খাদ্য খেলেই স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় না, যদি দেহাভ্যন্তরে তার খাদ্যোপাদানগুলির রাসায়নিক বিপাকজনিত রূপান্তর-ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে না চলে। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, দেহের আভ্যন্তরীণ এ-সব জৈব ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন গ্রন্থি-রস বা হর্মোন; আবার ভুক্ত খাদ্যের ভিটামিন-উপাদানগুলিরও এ-বিষয়ে বিশেষ রাসায়নিক গুরুত্ব রয়েছে। দেহের বিবিধ জৈব প্রক্রিয়ায় হর্মোনগুলি দেহাভ্যন্তরেই স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়; আর বিভিন্ন ভিটামিন ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে। বিভিন্ন হর্মোন ও ভিটামিন উভয়ই বিভিন্ন গঠনের রাসায়নিক পদার্থ এবং তাদের কার্যকারিতাও বিভিন্ন। জীব-দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে দেহাভ্যন্তরে এগুলির রাসায়নিক তাৎপর্য ও উপযোগিতা অপরিসীম। এদের মধ্যে বিভিন্ন হর্মোন বা গ্রন্থি-রসের মোটামুটি কিছু আলোচনাই আগে করা যাক্।

হর্মোন বা গ্রন্থি-রস

মানব-দেহ একটি অতি জটিল ও রহস্যময় যন্ত্র বিশেষ; এর আভ্যন্তরীণ গঠন ও ক্রিয়া-কলাপ অতি বিচিত্র। দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলির গঠন-তত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অবশ্য শারীর-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়; আমরা এখানে কেবল দেহের স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্য বজায় রাখতে

দেহাভ্যন্তরের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন গ্রন্থি-রস বা হর্মোন সম্পর্কে মোটামুটি কিছু আলোচনা করবো। দেহাভ্যন্তরে যে-সব জটিল যন্ত্রাংশ রয়েছে তাদের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অংশে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের ক্রিয়াই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক প্রয়োজনের সময়ে এ-সব **গ্ল্যাণ্ড** থেকে স্বতঃনিঃসৃত বিভিন্ন জৈব-রস বা **হর্মোন**গুলির রাসায়নিক তাৎপর্য ও কার্যকারিতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। দেহাভ্যন্তরে বিবিধ বিপাক-ক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম) স্বাভাবিক ও সুষ্ঠুভাবে চলে এবং দেহের সর্বাঙ্গীন স্বাভাবিকতা বজায় থাকে বিভিন্ন হর্মোনের রাসায়নিক প্রভাবে। মানব-দেহের বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড সন্নিবিষ্ট রয়েছে, যেগুলি থেকে প্রয়োজনের সময় বিশেষ বিশেষ হর্মোন বা জৈব-রস স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষরিত হয়ে দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ডের পরিচয় ও কার্যকারিতার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; প্রদত্ত চিত্র থেকে দেহের প্রধান প্রধান হর্মোনগুলির নিঃসরণকারী কয়েকটি গ্ল্যাণ্ডের অবস্থিতি জানা যাবে।
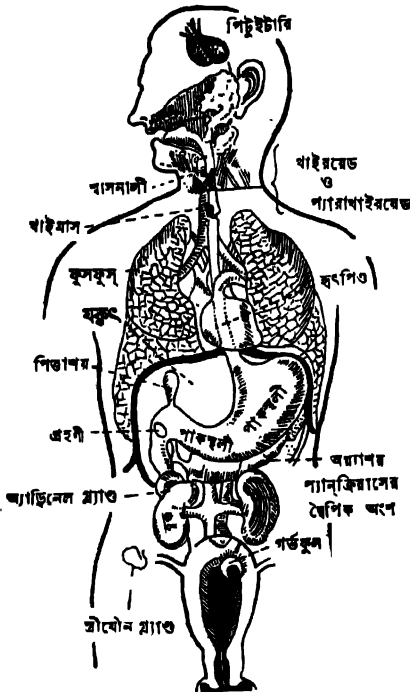
মানব-দেহের প্রধান কয়েকটি গ্ল্যাণ্ডের অবস্থান

হর্মোনগুলি হলো অতি জটিল গঠনের জৈব যৌগিক পদার্থ। বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড থেকে এ-সব পদার্থ প্রয়োজনের সময় নিঃসৃত হয়ে দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে উদ্বোধিত বা উত্তেজিত করে তোলে। ইংরেজী 'হর্মোন' কথাটি একটি গ্রীক শব্দ 'হর্মাও' থেকে গঠিত; যার অর্থ হলো 'জাগিয়ে তোলা' বা 'উত্তেজিত করা'। বাংলায় তাই হর্মোনকে **উত্তেজক রস** বলা হয়। গ্ল্যাণ্ডের

ভিতরকার সজীব কোষগুলি থেকে যথাসময়ে এক রহস্যময় জৈব প্রক্রিয়ায় হর্মোন-রসগুলি উৎপন্ন হয় এবং সাধারতঃ গ্ল্যাণ্ডের অন্তর্নালি-পথে সরাসরি রক্ত-স্রোতে মিশে যায়। রক্তের লসিকা-স্রোতে বাহিত হয়ে নির্দিষ্ট হর্মোন নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে তাদের উত্তেজিত ও সক্রিয় করে তোলে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন হর্মোনের প্রভাবে জীব-দেহের বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে চলে এবং দেহের স্বাভাবিকতা ও বিভিন্ন কর্মক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকে। মানব-দেহে দু'রকম গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড আছে; কতকগুলি **প্রণালীযুক্ত**, যেমন— অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি বা প্যান্‌ক্রিয়াস্-গ্ল্যাণ্ড, লালা-গ্রন্থি, ঘর্ম-গ্রন্থি, টেষ্ট্রিস বা অণ্ডকোষ-গ্রন্থি প্রভৃতি থেকে নিঃসৃত হয়ে বিভিন্ন হর্মোন দেহাভ্যন্তরের এক-একটি সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এগুলি হলো গ্ল্যাণ্ডের নালী-পথে বহিঃক্ষরিত হর্মোন-রস, যা রক্ত বা লসিকা-স্রোতে মেশে না। এ জন্যে অনেকে এই শ্রেণীর গ্রন্থি-রসকে প্রকৃত হর্মোন পর্যায়ভুক্ত মনে করেন না। প্রকৃত হর্মোন হলো পিটুইটারি, থাইরয়েড, থাইমাস, প্রভৃতি **প্রণালীহীন** গ্রন্থিগুলি থেকে অন্তঃক্ষরিত বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক গঠনের জৈব রস; রক্তস্রোতের মাধ্যমে যেগুলি গিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে নানা চমকপ্রদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিভিন্ন হর্মোনের ক্ষরণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি হলে দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং তার ফলে নানা রোগ ও শারীরিক বিকৃতি দেখা দেয়।

যাহোক, দেহের বিভিন্ন গ্ল্যাণ্ড ও তাদের থেকে ক্ষরিত হর্মোনগুলির বিভিন্ন কার্যকারিতা শারীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আমরা কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটি হর্মোনের রাসায়নিক স্বরূপ ও তাদের দেহতত্ত্বীয় প্রভাব সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে কিছু আলোচনা করবো।

থাইরক্সিন: মানুষের গ্রীবাদেশে শ্বাস-নালীর দু'পাশ জুড়ে যে গ্ল্যাণ্ডটি রয়েছে তার নাম থাইরয়েড; এর দু'টি প্রধান অংশ সরু যোজকের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এই **থাইরয়েড** গ্ল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে উৎপন্ন 'থাইরোগ্লোবুলিন' নামক হর্মোনের সক্রিয় উপাদান হলো **থাইরক্সিন**। এই হর্মোনটির প্রধান কাজ হলো দেহের আভ্যন্তরীণ বিপাক-ক্রিয়ার (মেটাবলিক চেঞ্জ) সমতা রক্ষা করে ভুক্ত খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের দহন বা অক্সিডেসনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং দেহের প্রয়োজনীয় তাপ বজায় রাখা। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপরেও এই হর্মোনটির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ড থেকে ক্ষরিত মূল হর্মোনটির আয়োডিন-ঘটিত সক্রিয় উপাদান থাইরক্সিনই দেহের উল্লিখিত

ক্রিয়াগুলির মুখ্য নিয়ামক। আবার এ-ও প্রমাণিত হয়েছে যে, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত একটি বিশেষ হর্মোন থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ডকে উত্তেজিত করে তার হর্মোন-ক্ষরণের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। যাহোক, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে ক্ষরিত হর্মোনের স্বল্পতা বা অভাব ঘটলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি স্তব্ধ হয় এবং শিশুরা ক্ষুদ্রাকৃতি বামনাকার হয়ে থাকে। শৈশবে দেহ-মনের এরূপ অপূর্ণ ও বিকৃত অবস্থাকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে **ক্রেটিনিজ্‌ম** বলে। আর যৌবনে বা তৎপরবর্তী কালে থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ডের হর্মোন ক্ষরণ যথোপযুক্ত না হলে দেহের বিভিন্ন জৈব ক্রিয়া ব্যাহত হয়ে দেহ মেদবহুল হয়ে ওঠে, বুদ্ধি-বৃ ও কর্ম-শক্তি হ্রাস পায়; এ-সব লক্ষণযুক্ত রোগ **মিক্সিডিমা** নামে পরিচিত আবার থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ অত্যধিক হলে গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের কার্যকারিতার হ্রাস-বৃদ্ধি জনিত এ-সব রোগ মুখ্যতঃ তার থাইরক্সিন নামক হর্মোন ক্ষরণের স্বল্পতা বা আধিক্যের ফলেই উদ্ভূত হয়ে থাকে।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে 1919 খৃষ্টাব্দে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড থেকে নিঃসৃত 'থাইরোগ্লোবুলিন' হর্মোনের সক্রিয় উপাদানটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্ফটিকাকারে (ক্রিষ্টাল বা দানা অবস্থায়) পৃথক করা সম্ভব হয়েছে এবং তার রাসায়নিক নাম দেওয়া হয়েছে **থাইরক্সিন**। এর কয়েক বছর পরে 1926 খৃষ্টাব্দে পদার্থটির আণবিক সংযুতি নির্ধারিত হয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তার রাসায়নিক সংশ্লেষণও সম্ভবপর হয়ে ওঠে। দেখা গেছে, থাইরক্সিন হলো একটি জটিল জৈব যৌগ, যার প্রতিটি অণুতে চারটি **আইয়োডিন**-পরমাণু সংবদ্ধ রয়েছে। থাইরক্সিন অণুর রাসায়নিক সংকেত হলো: $CH.C_6H_2.I_2.O.I_2.C_6H_2.CH_2.CH(NH_2).COOH.$; আজকাল শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে যৌগটা প্রচুর পরিমাণে সংশ্লেষিত হচ্ছে। জীবজন্তুর থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ড থেকে প্রাণিজ থাইরক্সিন নিষ্কাষণের চেয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই কৃত্রিম থাইরক্সিন দামে সস্তা পড়ে এবং তা পূর্বোল্লিখিত ক্রেটিনিজম্ ও মিক্সিডিমা রোগের চিকিৎসায় মোটামুটি একই রকম ফল দেয়। থাইরক্সিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার আইয়োডিন উপাদান; প্রাণিদেহের নানা জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় এই মৌলিক পদার্থটির অপরিহার্য প্রয়োজন রয়েছে। আইয়োডিন বা আইয়োডিন-ঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ দেহে সরবরাহ হয় প্রধানতঃ বিভিন্ন ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে; শরীরে এর অভাব ঘটলে যথোপযুক্ত পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপাদিত হতে পারে না। এরূপ অবস্থায় অনেক সময় গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়। এর মূল কারণ হলো,

দেহের স্বাভাবিকতা বজায় রাখবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাইরক্সিন উৎপাদনের চেষ্টায় থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডটা আকারে বেড়ে যায়। কাজেই গলগণ্ড রোগের চিকিৎসায় আইয়োডিন-ঘটিত ঔষধাদি আশু ফল দেয়। আগের দিনে সামুদ্রিক স্পঞ্জ, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতির ভস্ম-চূর্ণ গলগণ্ড রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এর ঔষধ-গুণের কারণ সেকালে জানা ছিল না বটে, কিন্তু আজ আমরা জেনেছি, জলজ আগাছা, শাকপাতা, শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতিতে বিভিন্ন যৌগিকের আকারে কিছু আইয়োডিন থাকে, আর তা-ই দেহাভ্যন্তরে থাইরয়েড-গ্ল্যাণ্ডের থাইরক্সিন উৎপাদনে সহায়তা করে। দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় জলের মাধ্যমে আমরা অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে আইয়োডিন পেয়ে থাকি। সাধারণ খাদ্যে আইয়োডিনের প্রধান উৎস হলো বিভিন্ন মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি এবং বিভিন্ন কলাই, শিম ও শাক-সব্‌জি।

অ্যাড্রিন্যালিন : মানুষের তলপেটে অবস্থিত কটিদেশস্থ বৃক্কদুটির উপরিভাগে সংলগ্ন গ্ল্যাণ্ড দুটিকে বলে **অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ড,** বাংলায় বলে অধিবৃক্ক-গ্রন্থি। অন্যান্য গ্ল্যাণ্ডের মত এর থেকেও বিভিন্ন হর্মোন-রস ক্ষরিত হয়ে থাকে। গ্ল্যাণ্ডদুটির বহিরংশ থেকে অন্তঃক্ষরিত রসের একাংশ দেহগঠনে প্রয়োজনীয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতব উপাদানগুলির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে ; আর এক অংশ ভুক্ত খাদ্যের শর্করা-বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। এর তৃতীয় আর একটি হর্মোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে যৌন গ্ল্যাণ্ড-গুলি সক্রিয় ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের ভিতরকার মজ্জাংশ থেকে অন্তঃক্ষরিত একটি বিশেষ হর্মোনকে বলে **অ্যাড্রিন্যালিন।** দেহের স্নায়ুতন্তুগুলির উপরে এই হর্মোনটির রাসায়নিক প্রভাব বিস্ময়কর। আকস্মিক সংকটে মানসিক বিপর্যয়কালে অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোন অন্তঃক্ষরিত হয়ে রক্তে মিশে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হয়, গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে যায়, রক্তের চাপ বাড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়। এ সবই সহসা ভীতি, বিপদাশঙ্কা, আতঙ্ক প্রভৃতি সংকটকালীন মানসিক ক্রিয়ার ফল। এর জন্যে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের আকস্মিক উত্তেজনা-জনিত অতিরিক্ত হর্মোন-ক্ষরণই দায়ী, যার প্রভাবে স্নায়ুগুলি সাময়িকভাবে বিকল হয়ে পড়ে। অবশ্য অল্প সময়েই আবার এরূপ শারীরিক বিপর্যয় কেটে গিয়ে হর্মোনটির পরবর্তী ক্রিয়ার প্রভাবে মানুষের বিপন্মুক্তির প্রেরণা ও সাহস সঞ্চারিত হয়। যাহোক, কেবল বিপদকালেই নয়, স্বাভাবিক-

স্বাস্থ্যের পক্ষেও রক্তস্রোতে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে অ্যাড্রিন্যালিন-হর্মোনের উপস্থিতিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

'সংশ্লেষণী রসায়ন' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা দেহের স্থানীয় অসাড়তা সৃষ্টিকারী ঔষধাদির আলোচনা প্রসঙ্গে (পৃঃ 412) অ্যাড্রিন্যালিনের উল্লেখ করেছি। এই হর্মোনটি মাংসপেশীতে অতি সামান্য পরিমাণে প্রবেশ (ইন্‌জেক্‌সন) করালেও তার নিকটবর্তী শিরা-উপশিরাগুলি বিশেষ সংকুচিত হয়ে রক্ত-চলাচল স্থানীয়ভাবে বন্ধ করে এবং জায়গাটা অসাড় ও রক্তশূন্য হয়ে রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার সম্ভব করে তোলে। শস্ত্র-চিকিৎসার এটা একটা বিশেষ সুবিধা-জনক আধুনিক 'অ্যানেস্থেটিক' ব্যবস্থা। অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোনটির রাসায়নিক সংযুতি ও আণবিক গঠনের সংকেত হলো : $(OH)_2 : C_6H_3.CH.(OH).CH_2.NH.CH_3$। এরূপ একটি জটিল গঠনের যৌগও রাসায়নিক পদ্ধতিতে সংশ্লেষিত হয়েছে 'ক্যাটাচোল', $C_6H_4(OH)_2$, নামক এক প্রকার উদ্ভিদজাত জৈব যৌগ থেকে। এই কৃত্রিম অ্যাড্রিন্যালিন আজকাল শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। অ্যাকাসিয়া শ্রেণীর এক রকম গাছের আঠালো রস শুকিয়ে পাওয়া যায় 'ক্যাটাচু', বাংলায় যাকে বলে খয়ের। শুষ্ক পাতন-ক্রিয়ার (ড্রাই ডিস্টিলেসন) সাহায্যে এ থেকে পাওয়া যায় উল্লিখিত 'ক্যাটাচোল' যৌগটা ; আর তা থেকে সংশ্লেষিত হয় কৃত্রিম অ্যাড্রিন্যালিন।

ইন্‌সুলিন : প্রাণিদেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় অত্যাবশ্যক হর্মোনগুলির মধ্যে ইন্‌সুলিন অন্যতম ; পাকস্থলীর নিম্নভাগে সংলগ্ন **প্যান্‌ক্রিয়াস** বা অগ্ন্যাশয়-গ্রন্থির বিশেষ জৈব ক্রিয়ায় এই হর্মোনটি উৎপন্ন হয়। এর প্রধান কাজ হলো ভুক্ত খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট (শ্বেতসার) উপাদানের বিপাক-ক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম) নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত রাখা, অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের শ্বেতসার (স্টার্চ) ও শর্করার যথাযথ রূপান্তর সাধন ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ। প্যান্‌ক্রিয়াস গ্ল্যাণ্ডে ইন্‌সুলিন রসের উৎপাদন ও ক্ষরণ হ্রাস পেলে দেহের সজীব কোষগুলির অভ্যন্তরে ভুক্তখাদ্যের সারাংশের দহনক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং যকৃতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ শর্করা (গ্লাইকোজেন) সঞ্চিত হতে পারে না। এ-সবের ফলে দেহের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গিয়ে **'ডায়েবিটিস'** বা মধু-মেহ রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থায় ইন্‌সুলিনের অভাব দূর করবার জন্যে কোন প্রাণিদেহে সঞ্জাত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ইন্‌সুলিন উপযুক্ত পরিমাণে রোগীর মাংসপেশীর মধ্যে প্রবেশ করালে (ইন্‌জেক্‌সন) সুফল পাওয়া যায়।

অবশ্য এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক ; অতিরিক্ত ইন্‌সুলিন দেহের আভ্যন্তরীণ বিপাক-ক্রিয়ায় নানা রকম গোলযোগ ঘটাতে পারে।

ইন্‌সুলিন হলো প্রোটিন উপাদানে গঠিত একটি জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়। এর রাসায়নিক গঠন মোটামুটি নির্ধারিত হয়েছে এবং স্ফটিকাকারে পদার্থটা পৃথক করাও সম্ভব হয়েছে। গত 1923 খৃষ্টাব্দে জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর ব্যাণ্টিং ভেড়া, ষাড় প্রভৃতির প্যান্‌ক্রিয়াস থেকে উল্লিখিত গুণসম্পন্ন ও সক্রিয় একটি জৈব-রস নিষ্কাশনের শিল্প-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই নিষ্কাশিত জৈব পদার্থটিকে **'ইন্‌সুলিন'** নাম দেওয়া হয়েছে এবং ঔষধ হিসেবে বাজারে চলছে 'ডায়েবিটিস' রোগের একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধরূপে। কৃত্রিম উপায়ে নিষ্কাশিত এই প্রাণিজ হর্মোন 'ইন্‌সুলিন' উপযুক্ত পরিমাণে রোগীর দেহের রক্তে প্রবেশ করালে তার অতিরিক্ত শর্করার ভাগ কমিয়ে রোগের উপশম ঘটায়।

উল্লিখিত হর্মোনগুলি ছাড়া জীবদেহে আরও নানা রকম হর্মোনের উৎপত্তি ও তাদের ক্রিয়া-কলাপের বিবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং দেখা গেছে, দেহের স্বাভাবিক ও সুস্থ ক্রিয়া-বিক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য। বিশেষতঃ স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যাদি কতকগুলি বিশেষ হর্মোনের ক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয়। জীবের বিভিন্ন যৌন লক্ষণ ও ক্রিয়া-বিক্রিয়ার তথ্যাদি জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা অতি সাফল্যের সঙ্গে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। জীবদেহের বিভিন্ন সেল বা কোষের অভ্যন্তরস্থ 'কোলেস্টেরল' ও চর্বির বিশেষ উপাদান 'এর্গোস্টেরল' নামক জৈব যৌগিক পদার্থ দু'টির উপর যৌন-হর্মোনগুলির উৎপত্তি ও কার্যকারিতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন এবং তাদের রাসায়নিক তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেছেন। এই কোলোস্টেরল ও এর্গোস্টেরল যৌগ দু'টি সম্বন্ধে আমরা পরে ভিটামিনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলবো। যাহোক, জীবদেহের প্রধান যৌন-গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড হলো টেষ্টিস (পুং-প্রজনন গ্রন্থি) ও ওভারি (স্ত্রী-গর্ভাশয়)। এ-দুটি যৌন-গ্রন্থির স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও বহিঃক্ষরণের উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত হয় **প্রোলোন-এ** ও **প্রোলোন-বি** নামক দু'রকম হর্মোনের প্রভাবে। যৌন-গ্রন্থির উত্তেজক এই হর্মোন দু'টি নিম্ন-মস্তিষ্কে অবস্থিত **পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড** থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন মিশ্র-হর্মোনের অংশ বিশেষ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জীবদেহের বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের মূল নিয়ামক ও সর্বাধিনায়ক হলো

নিম্ন-মস্তিষ্কে অবস্থিত ঐ পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড ও তার বিভিন্ন অংশ থেকে ক্ষরিত বিভিন্ন হর্মোন-রস। হর্মোন-উৎপাদক যতগুলি গ্ল্যাণ্ড দেহাভ্যন্তরে রয়েছে তাদের মধ্যে পিটুইটারি-ই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ; অনেকগুলি হর্মোন এই গ্ল্যাণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনের সময়ে অন্তঃক্ষরিত হয়ে হর্মোন-ঘটিত বিভিন্ন ক্রিয়া-কাণ্ড সম্পাদন করে অন্য সব গ্ল্যাণ্ডের মাধ্যমে। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড যেন মানব-দেহের সকল গ্ল্যাণ্ডগুলির নিয়ামক বা সর্বাধিনায়ক। যাহোক, এ-সব জটিল তথ্যের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; জীবদেহের স্বাভাবিক সক্রিয়তা ও বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের সুনিয়ন্ত্রণে প্রধান কয়েকটি গ্রন্থি-রস বা হর্মোনের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সামান্য আভাস মাত্র দেওয়া হলো। দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকাণ্ডে হর্মোনের রাসায়নিক তাৎপর্য জীবন-রসায়ন বা বায়ো-কেমিস্ট্রির একটি অতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যাহোক, জীব-দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপের বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড থেকে ক্ষরিত হর্মোন-রসগুলির রাসায়নিক গঠন ও কার্যকারিতা সম্বন্ধীয় জটিল তথ্যাদিই কেবল জানা যায় নি, রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এদের অনেকগুলির রাসায়নিক সংযুতিও নির্ধারণ করেছেন এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে কোন-কোন হর্মোনের বিকল্প যৌগ সংশ্লেষিত করতেও সক্ষম হয়েছেন। এ-সব কৃত্রিম হর্মোন দেহের বিভিন্ন জৈব-ক্রিয়ায় স্বাভাবিক হর্মোনের অনুরূপ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইদানিং এরূপ সংশ্লেষিত কোন-কোন কৃত্রিম হর্মোন শিল্পগতভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। স্বাভাবিক হর্মোন ক্ষরণের স্বল্পতা বা অভাব-জনিত বিভিন্ন রোগে এ-সব **কৃত্রিম হর্মোন** যথেষ্ট ফলপ্রদ; এমন কি, কোন-কোন ক্ষেত্রে জীবদেহে উৎপন্ন স্বাভাবিক হর্মোনের চেয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃত্রিম হর্মোনগুলি অনেক সময় অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকর ও নিরাপদ হয়ে থাকে।

জীবদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সক্রিয়তা বজায় রাখতে বিভিন্ন হর্মোন বা উত্তেজক-রসের কার্যকারিতা অতি বিচিত্র ও দেহ-তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন হর্মোনের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই দেহ-যন্ত্রের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সুনিয়ন্ত্রিত থাকে ও স্বাভাবিক ধারায় চলে। কেবল হর্মোনই নয়, জীবদেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে নানা প্রকার **ভিটামিন** বা খাদ্য-প্রাণের প্রয়োজনীয়তাও অসাধারণ। বিভিন্ন হর্মোন দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনের সময় স্বতঃই ক্ষরিত হয়; আর

ভিটামিনগুলি ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে বাইরে থেকে দেহাভ্যন্তরে সরবরাহ করতে হয়। ভিটামিন ও হর্মোন উভয়ই জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ; দেহাভ্যন্তরের স্বাভাবিক বিপাক-ক্রিয়া ও বিবিধ জৈবিক কর্মকাণ্ডের সুপরিচালনার জন্যে প্রাণিদেহে এদের প্রয়োজন অপরিহার্য; কিন্তু পরিমাণে লাগে অতি সামান্য। বস্তুতঃ এ দু'টি রাসায়নিক পদার্থ জীবদেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় নিজেরা অংশ গ্রহণ করে না, অনুঘটকের (ক্যাটালিস্ট) কাজ করে মাত্র। এ বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে বিশদভাবে আলোচনা করবো; এখন ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু আলোচনা করা যাক্।

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও মানুষের ধারণা ছিল, বিভিন্ন খাদ্য-বস্তু যথোপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলেই দেহের পুষ্টি ঘটে ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থ (ফ্যাট) জাতীয় বিবিধ উপাদান ও তার সঙ্গে কিছু লবণ ও জল পেলেই প্রাণিদেহের পেশী-তন্তু গড়ে ওঠে, দেহের ক্ষয় পূরণ হয় এবং দেহের স্বাভাবিক তাপ ও কর্মশক্তি বজায় থাকে। এই ছিল সে-কালের প্রচলিত ধারণা; তাই মানুষের প্রধান খাদ্যো-পাদান কার্বোহাইড্রেট, অর্থাৎ শ্বেতসার ও শর্করা শ্রেণীর কৃষিজ খাদ্যের অভাবে মানবজাতি যাতে পুষ্টিহীন হয়ে না পড়ে তার জন্যে স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স 1898 খৃষ্টাব্দে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন (পৃষ্ঠা 101); এর ফলে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে বিভিন্ন রাসায়নিক সারের উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে কৃষিকার্যে কৃত্রিম সার ব্যবহারের ফলে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য-শস্যের অভাব মোটামুটি দূর হয়েছে; মাছ-মাংসের প্রোটিন-খাদ্য ও তেল-ঘি-চর্বি জাতীয় স্নেহ-খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হয়েছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মানুষের সাধারণ খাদ্যের অভাব এক রকম মিটে যায়; কিন্তু তার পরেও দেখা যায়, বিবিধ খাদ্যোপাদান যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করেও মানুষের আশানুরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, পুষ্টির অভাব ঘটে, নানা রোগ দেখা দেয়। এ থেকে ক্রমে বুঝা গেল, খাদ্যের কেবল পরিমাণই নয়, পুষ্টি-মূল্যের উপরেই **খাদ্যের উৎকর্ষতা** নির্ভর করে; বিশেষ বিশেষ খাদ্যের কোন-কোন সূক্ষ্ম উপাদানই হয়তো দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সহায়ক। এর পরে

বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো, পরিমাণের চেয়ে খাদ্যের প্রকার-ভেদ ও সুনির্বাচনই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের প্রধান তিনটি উপাদান কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট যথোপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে সত্য, কিন্তু কেবল তাতেই দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্যক রক্ষিত হয় না, এ-কথা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়। মানুষের খাদ্য সম্বন্ধীয় এই নূতন ধারণার সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের জন্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে রসায়ন ও দেহ-তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন।

এ-সব গবেষণার ফলে ক্রমে জীবের দেহাভ্যন্তরে ভুক্ত খাদ্যের বিপাক-জনিত রূপান্তর-ক্রিয়া (মেটাবলিজ্‌ম) ও তার ফলে দেহের পুষ্টি সম্পর্কিত নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব ক্রমে জানা গেছে। পাচন-তন্ত্রে খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক রূপান্তরের তাৎপর্য ও বিবিধ কার্যকারিতা সহ পুষ্টিবিজ্ঞানের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একে-একে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে ভুক্ত খাদ্যকে প্রধানতঃ দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষার জ্বালানী হিসাবেই গণ্য করা হতো। কাজেই সে-যুগে জীবদেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হতো তার মোট ক্যালরি-মূল্যের বিচারে, অর্থাৎ যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করলে দেহাভ্যন্তরে তা দগ্ধ হয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্যালরি (পৃঃ 186) উৎপাদিত হবে এবং তাতে দেহের স্বাভাবিক তাপ ও কর্মশক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে। দেহাভ্যন্তরের বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপে ভুক্ত খাদ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে সে-কালের মানুষ এই মতবাদেই মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন যে কেবল তাপোৎপাদনেই নিবদ্ধ নয়, উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করেও যে দেহের সম্যক পুষ্টি ঘটে না, নানা রোগের সৃষ্টি হয়, — দেহ-তত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ক্রমে এ-বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠেন এবং প্রকৃত তথ্য নিধারণের জন্যে তৎপর হন। খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার ফলে অল্পকালের মধ্যেই মানুষের খাদ্য-বিচার ও পুষ্টি-বিজ্ঞানের এক নূতন দিগন্তের সন্ধান পাওয়া যায়।

কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে স্কার্ভি নামক এক রকম মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। বিশেষতঃ দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রায় জাহাজের নাবিকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায়ই মারা যেত; এমন কি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে (1914-1918) মধ্য-এশিয়ায় যুদ্ধরত হাজার হাজার সৈনিক এই স্কার্ভি রোগে মারা যায়। জাহাজের নাবিক ও যুদ্ধরত

সৈন্যগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ একমাত্র সংরক্ষিত খাদ্য খেয়েই দিন কাটাতে বাধ্য হয়। তাজা খাদ্যের অভাবে দীর্ঘ দিনের সংরক্ষিত খাদ্য গ্রহণই যে স্কার্ভি রোগের মূল কারণ; — এ-কথা ক্রমে শেষে বুঝা গেল। কৌটা-ভরতি সংরক্ষিত খাদ্যে দেহের তাপ-রক্ষা, অর্থাৎ ক্যালরি-মূল্যের অভাব হয় না; কিন্তু দেহ তাতে সুস্থ থাকে না; অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগ, বিশেষতঃ স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। প্রকৃত তথ্য না জেনেই অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতেও লোকে নিছক অভিজ্ঞতার ফলে তাজা পাতি লেবু বা কমলা লেবুর রস দিয়ে স্কার্ভি রোগ নিরাময় করতো বলে জানা যায়। এভাবে সামান্য একটু খাদ্য-রসের ব্যবস্থায়, প্রকৃত কোন ঔষধ ব্যতিরেকেই এই মারাত্মক রোগ দূরীভূত হয় দেখে লোকে বিস্মিত হতো। ক্রমে আরও জানা গেল, কেবল স্কার্ভিই নয়, বেরিবেরি, রিকেট প্রভৃতি অন্যান্য কোন কোন কঠিন রোগেও বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে, অর্থাৎ রোগীর সাধারণ খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন করে রোগ নিরাময় করা যায়। এ-সব ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা শেষে বুঝলেন, উল্লিখিত রোগগুলির উৎপত্তির মূলে খাদ্যের কোন বিষ-ক্রিয়া বা রোগ-জীবাণুর প্রভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে ভুক্ত খাদ্যে জীবের আভ্যন্তরীণ বিপাক-ক্রিয়ায় অত্যাবশ্যকীয় কোন বিশেষ উপাদানের অভাবেই এই শ্রেণীর বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি ঘটে বলে বুঝা গেল।

বিভিন্ন খাদ্যের উপযোগিতা ও দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষায় তাদের কার্য-কারিতা সম্পর্কে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করেন। বিশেষতঃ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হপ্‌কিন্স 1906 খৃষ্টাব্দে এবং তার কিছুকাল পরে আমেরিকার অধ্যাপক ম্যাক্‌কোলাম তাঁদের গবেষণার ফলে সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে, ভুক্ত খাদ্যে কেবল কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ও লবণ থাকলেই মানুষের স্বাস্থ্য পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না। মানুষের খাদ্যে এমন কতকগুলি অত্যা-বশ্যকীয় উপাদান অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকা দরকার, যাদের অভাবে দেহের বিশেষ বিশেষ আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ ব্যাহত হয় এবং নানা রোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন খাদ্যে এ-সব উপাদান থাকে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে; কিন্তু দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষায় এগুলির প্রয়োজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। খাদ্যের এ-সব অত্যাবশ্যকীয় সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকে সাধারণভাবে **ভিটামিন** নাম দেওয়া হয়েছে। ভিটামিনকে বাংলায় বলা হয় **খাদ্য-প্রাণ,** যেহেতু এগুলি বস্তুতঃ খাদ্যবস্তুর

প্রাণ-স্বরূপ মুখ্য উপাদান। বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন ভিটামিনের অস্তিত্ব নির্ধারিত হওয়ার পরে বিশেষ বিশেষ ভিটামিন-বহুল খাদ্য দিয়ে বিশেষ কতকগুলি রোগের নিবারণ ও নিরাময় আশ্চর্যজনকভাবে সম্ভব হয়েছে, যে-সব রোগের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে আগে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না।

যাহোক, ক্রমে জানা গেছে, বিশেষ কোন রোগ না থাকলেও সুস্থ দেহে বিভিন্ন ভিটামিন-বহুল খাদ্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ করলে কেবল রোগের আক্রমণ প্রতিরোধই নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটে; দেহের শক্তি ও উদ্যম বাড়ে। আজ আমরা জানি, বিশেষ বিশেষ ভিটামিনযুক্ত সুনির্বাচিত খাদ্য গ্রহণ না করলে সাধারণ স্বাস্থ্যহীনতা, দন্তরোগ (কেরিস), বেরিবেরি, শিশুদের কর্কট বা রিকেট প্রভৃতি নানা রোগ জন্মায়। এক-এক রকম ভিটামিনের অভাবে দেহে এক-এক বিশেষ ধরনের রোগের উৎপত্তি ঘটে। আজকাল তাই খাদ্যের পরিমাণের চেয়ে তার ভিটামিন-সম্পর্কিত উৎকর্ষতা ও গুণাগুণ, অর্থাৎ কোন্ খাদ্যে কোন্ ভিটামিন কতটা রয়েছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক; বিশেষতঃ যখন এ-যুগে খাদ্যে নানা রকম কৃত্রিমতা ও খাদ্য-সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন ব্যাপকভাবে সুরু হয়েছে।

খাদ্যে ভিটামিনের অস্তিত্ব ও মানুষের দেহে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পরে বিভিন্ন ভিটামিনের উৎস ও সেগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয় বর্তমান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। এর ফলে ক্রমে আরও নানা রকম নূতন ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া যায় এবং প্রাণিদেহে তাদের কেবল ক্রিয়া-বিক্রিয়াই নয়, কোন-কোন ভিটামিনের রাসায়নিক সংযুতি ও গঠন-প্রকৃতিও জানা যায়। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এতটা সাফল্য অর্জন করেন যে, রাসায়নিক সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে কোন-কোন ভিটামিন রসায়নাগারে প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হয়। পরীক্ষায় এরূপ সংশ্লেষিত কৃত্রিম ভিটামিন অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিষ্কাশিত স্বাভাবিক ভিটামিনের অনুরূপ গুণসম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। ক্রমে এরূপ সংশ্লেষিত **কৃত্রিম ভিটামিন** উৎপাদনের বিরাট রাসায়নিক শিল্প নানা দেশে গড়ে উঠেছে; আজকাল তাই বিভিন্ন কৃত্রিম ভিটামিন স্বল্পমূল্যে বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদান হিসাবে বিভিন্ন ভিটামিন এভাবে সহজলভ্য হওয়ায় এ-যুগে সাধারণ খাদ্যের পুষ্টিগুণ

সহজেই বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ কোন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে নির্দিষ্ট ভিটামিন নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে সাধারণ স্বাস্থ্যহীনতা ও বিশেষ বিশেষ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া আজকাল সহজসাধ্য হয়েছে। মানব-কল্যাণে রসায়নের এ এক বিরাট সাফল্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান যুগে তাই দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিগুণ ও ভিটামিন-তত্ত্বের মোটামুটি কিছুটা জ্ঞান থাকা সকলের পক্ষেই নিতান্ত প্রয়োজন।

আজ আমরা জানি, ভিটামিনগুলি সবই কার্বন-ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ এবং বিভিন্ন খাদ্য-বস্তুতে স্বভাবতঃই এগুলি অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে থাকে। পরীক্ষায় জানা গেছে, সদ্য-দোয়া দুধে প্রায় চল্লিশ কোটি ভাগে এক ভাগ মাত্র ভিটামিন-ডি থাকে; এ এক অবিশ্বাস্য সূক্ষ্ম পরিমাণ,—সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। যাহোক, বিশেষ বিশেষ খাদ্যে আবার একাধিক ভিটামিনও থাকে; কাজেই যে খাদ্যে বিশেষ কোন ভিটামিনের আনুপাতিক আধিক্য রয়েছে তাকে সেই ভিটামিন-প্রধান খাদ্য বলা হয়। দুধে প্রায় সব রকম ভিটামিনই বর্তমান, তাই দুধকে অনেকে বলেন সর্বার্থ-সাধক **পূর্ণ খাদ্য** (whole meal)। সে যাই হোক, সাধারণ খাদ্যের মুখ্য উপাদান কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট প্রভৃতি সহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ভিটামিন প্রকৃতির রসায়নাগারে প্রস্তুত হয়ে স্বভাবতঃই মিশে থাকে এবং খাদ্যকে বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও প্রাণবন্ত করে রাখে। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ তাজা খাদ্যমাত্রেই তাই কোন-না-কোন ভিটামিন কম হোক, বেশি হোক কিছুটা থাকেই।

ভিটামিন আবিষ্কারের প্রথম দিকে বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক প্রভেদ ও নির্দিষ্ট স্বরূপ জানা যায় নি; সাধারণভাবে ভিটামিনের বিভিন্ন কার্যকারিতা আবিষ্কৃত হয়েছিল মাত্র। তাই বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর বিভিন্ন রোগ-নিবারক গুণ ও দেহের পুষ্টি-লক্ষণ বিচার করে তাদের পার্থক্য নির্ধারণের জন্যে ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষরগুলি দিয়ে বিভিন্ন **ভিটামিনের নামকরণ** করা হয়েছিল। আজ আমরা ভিটামিনগুলির রাসায়নিক স্বরূপ ও গঠন-রহস্য জেনেছি; কিন্তু বিভিন্ন ভিটামিনের প্রভেদসূচক সেই ইংরেজী অক্ষরের নামকরণ আজও চলছে; যেমন ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি প্রভৃতি। প্রথম দিকে আবার এর কোন-কোন ভিটামিনকে রাসায়নিক বিচারে একক পদার্থ বলে মনে করা হতো; কিন্তু ক্রমে সেগুলি বিভিন্ন ভিটামিনের সংমিশ্রণ, অর্থাৎ

সমগোত্রীয় বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণ বলে প্রমাণিত হয়েছে ; যেমন—ভিটামিন-বি$_1$, ভিটামিন-বি$_2$, ভিটামিন-বি$_3$ প্রভৃতি। এরূপ বিভিন্ন ভিটামিনের রাসায়নিক স্বরূপ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা পরে যথোচিত আলোচনা করবো।

মানব-দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকতা রক্ষায় ভিটামিনগুলির মত দেহের বিভিন্ন 'উত্তেজক-রস' বা হর্মোনের কার্যকারিতা সম্পর্কে আমরা আগেই সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে প্রাণিদেহে বিভিন্ন এঞ্জাইমের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু না বললে পুষ্টি-বিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপে বিভিন্ন **এঞ্জাইম** অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষায় ভিটামিনের কার্যকারিতার সঙ্গে এঞ্জাইমগুলির কার্যকারিতার তুলনা করা চলে। দেহাভ্যন্তরে খাদ্যবস্তুর বিপাক-ক্রিয়ায় এ দুটি পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু এদের অভাবে দেহ-যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। উভয়েরই প্রয়োজন দেহের পক্ষে অপরিহার্য ; প্রভেদ এই যে, হার্মোনের মত এঞ্জাইমগুলি দেহাভ্যন্তরেই স্বতঃ উৎপন্ন হয়। আর বিভিন্ন ভিটামিন ভুক্ত খাদ্যের মাধ্যমে বাইরে থেকে দেহাভ্যন্তরে সরবরাহ করতে হয়। মানব-দেহে বিভিন্ন ভিটামিন কি ভাবে কাজ করে বাস্তব প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার নানা তথ্য জানা গেলেও ভিটামিনগুলির রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপের সঠিক তথ্যাদি আজও অনেকটা রহস্যময় রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন এঞ্জাইমের রাসায়নিক তাৎপর্য ও মানব-দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপে সেগুলির কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ণীত হয়েছে।

বায়োকেমিষ্ট্রি বা জীবন-রসায়নের গবেষণায় জানা গেছে, জীব-দেহের জীবন্ত কোষগুলি থেকে এঞ্জাইম শ্রেণীর বিভিন্ন জৈব পদার্থ উৎপন্ন হয়, আর এরা দেহাভ্যন্তরে ভুক্ত খাদ্যের বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় বস্তুতঃ **ক্যাটালিস্ট** বা অনুঘটকের কাজ করে। ছত্রাক-জাতীয় এক শ্রেণীর ক্ষুদ্র জীব-কোষকে বলা হয় **ঈস্ট**, এরা এক রকম এঞ্জাইম উৎপন্ন করে যার অনুঘটন-প্রভাবে শর্করা বা চিনির রস গেঁজে গিয়ে এক রকম রাসায়নিক রূপান্তরের ফলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে, ঈস্টের (yeast) দেহ-কোষ থেকে উৎপন্ন এঞ্জাইমের উপস্থিতির ফলে নানা রকম জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া দ্রুততর হয়, অথচ সেগুলি নিজেরা অবিকৃত (ক্যাটালিসিস) থাকে। তাছাড়া মুখের লালা থেকে **টায়ালিন** (ptyalin) নামক আর এক রকম এঞ্জাইম উৎপন্ন হয়,

যার অনুঘটন-কার্যকারিতায় ভুক্ত খাদ্যের শ্বেতসার উপাদান রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে শর্করায় (মল্টোজ) রূপান্তরিত হয়। এঞ্জাইমের প্রভাবে ভুক্ত খাদ্যের রাসায়নিক বিপাক-ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হয়ে দেহের রক্ত, মাংস প্রভৃতি গঠিত হয়, দেহের তাপ ও জীবনীশক্তি রক্ষিত হয় ; এ এক অতি রহস্যময় ও জটিল ব্যাপার। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এ-সব জটিল জৈব ক্রিয়া সবই বিভিন্ন এঞ্জাইমের প্রভাবে স্বভাবতঃই দেহাভ্যন্তরে নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে। মুখ-গহ্বরে লালার সঙ্গে মিশে তার টায়ালিন নামক এঞ্জাইমের প্রভাবে চর্বিত খাদ্য-বস্তুর শ্বেতসার (স্টার্চ) উপাদান আংশিক-ভাবে মল্টোজ শ্রেণীর শর্করায় রূপান্তরিত হয়। ভুক্ত খাদ্য এই অবস্থায় ক্রমে পাকস্থলীতে পৌঁছায়, আর সেখানে তা বিভিন্ন জারক রসে জারিত ও বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। পাকস্থলীর বিভিন্ন কোষ থেকে নির্গত এই জারক-রসে **পেপ্‌সিন, রেনিন** প্রভৃতি বিভিন্ন এঞ্জাইমের সঙ্গে সামান্য কিছুটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও থাকে। পেপ্‌সিন-এঞ্জাইমটি খাদ্যের প্রোটিন-উপাদানকে ভেঙ্গে নাইট্রোজেন-ঘটিত 'পেপ্‌টোন' ও 'প্রোটিওস' নামক জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে ; আর রেনিন-এঞ্জাইমের ক্রিয়ায় দুধের প্রোটিন-উপাদান **কেজিন** বিশ্লিষ্ট হয়ে জলের সঙ্গে এক রকম হাল্‌কা অবদ্রব (ইমাল্‌সন) গঠন করে, যা ধীরে ধীরে রক্তস্রোতে মিশে যায়। এ সব ছাড়া খাদ্যের বিপাক-ক্রিয়ায় আরও নানা রকম এঞ্জাইমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অগ্ন্যাশয় বা **প্যান্‌ক্রিয়াস** গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জারক-রসে থাকে ট্রিপ্‌সিন, লাইপেস ও অ্যামাইলেস নামক তিন রকম এঞ্জাইম ; এগুলির রাসায়নিক প্রভাবে খাদ্যের প্রোটিন, ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন অ্যামাইনো-অ্যাসিড, গ্লিসারল, মল্টোজ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেগুলির জলীয় অবদ্রব রক্তস্রোতে মিশে দেহের পুষ্টি সাধন করে।

যাহোক, ভুক্ত খাদ্যের বিপাক-ক্রিয়ায় বিভিন্ন এঞ্জাইমের সঠিক প্রকৃতি ও কার্যকারিতার নিগূঢ় তথ্যাদি আজও অনেকটা রহস্যাবৃত। দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের রাসায়নিক রূপান্তর ও দেহের পুষ্টি সাধনে তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশেষ জটিল ও রহস্যময় ; তার সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমরা কেবল বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় এঞ্জাইমগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে সামান্য আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ গবেষণায় জানা গেছে, দেহের সংগঠক বিভিন্ন জৈব কোষের

অভ্যন্তরস্থ **প্রোটোপ্লাজ্‌ম** (জীব-পঙ্ক) থেকে এঞ্জাইমগুলি উদ্ভূত হয় এবং বিশেষ গঠনের এঞ্জাইম কেবল বিশেষ শ্রেণীর পদার্থের (খাদ্যোপাদানের) উপরে রাসায়নিক অনুঘটন-প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং তার রূপান্তর-ক্রিয়ার সহায়ক হয়। কোন কোন এঞ্জাইমের অনুঘটনে খাদ্যোপাদানের রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ায় আবার দ্বি-মুখী বিক্রিয়ারও পরিচয় পাওয়া গেছে; যেমন **ডায়েস্টেস** নামক এঞ্জাইম খাদ্যের শ্বেতসারকে শর্করায়, আবার প্রয়োজন কালে কখন বা শর্করাকে শ্বেতসারে রূপান্তরিত করে থাকে। এঞ্জাইমগুলি দেহাভ্যন্তরে অতি সামান্য পরিমাণে উদ্ভূত হয়েও প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপাদানের রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়; কিন্তু এঞ্জাইমটির কোন রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে না। দেহাভ্যন্তরের জৈব ক্রিয়ায় এ এক বিস্ময়কর অনুঘটনের ব্যাপার।

যাহোক, মানব-দেহের পুষ্টি-বিজ্ঞানে বিভিন্ন ভিটামিনের কার্যকারিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন এঞ্জাইমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা হলো। এখন প্রধান প্রধান ভিটামিনগুলির কার্যকারিতা ও রাসায়নিক পরিচয়াদি সম্পর্কে পৃথক-পৃথকভাবে কিছু আলোচনা করা যাক।

ভিটামিন-এ ঃ রাসায়নিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ খাদ্য-বস্তুর **ক্যারোটিন** নামক একটি অতি জটিল হাইড্রোকার্বন থেকে জীবদেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক রূপান্তরের মাধ্যমে ভিটামিন-এ উদ্ভূত হয়। ক্যারো-টিনের অতিকায় অণুর গঠন $C_{40}H_{56}$ সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। এই জটিল হাইড্রোকার্বনটি উদ্ভিদ-রাজ্যে বিভিন্ন ফল-শস্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে; যেমন—কলা, টমেটো, বাদাম প্রভৃতি ফলে, গাজর, কচু, বিট প্রভৃতি মূলজ ফসলে এবং নানা শ্রেণীর ঘাস ও সামুদ্রিক শৈবালে। ক্যারোটিন-সমৃদ্ধ এ-সব ফল-শস্য জীবের দেহাভ্যন্তরে জলের বিক্রিয়ায় (হাইড্রোলিসিস) বিয়োজিত হয়ে আর একটি বিশেষ গঠনের অতিকায় অণুবিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনে পরিণত হয়, যাকে বলা হয় **ভিটামিন-এ**। বস্তুতঃ হাইড্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় ক্যারোটিনের অণু দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে দুটি হাইড্রোজেন-পরমাণু ও একটি অক্সিজেন-পরমাণু (জলের একটি অণু) যুক্ত হয়ে ভিটামিন-এ যৌগের অণু গঠিত হয়।

দেহের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষায়, বিশেষতঃ শৈশবকালে, ভিটামিন-এ'র প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেহের চামড়া ও শ্বাস-নালির উপরেও এর যথেষ্ট কার্যকারিতা আছে, যার প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহে রোগ-জীবাণু

সংক্রমণের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ দিন ধরে ভুক্ত খাদ্যে ভিটামিন-এ'র অভাব ঘটলে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, রাত-কানা রোগ দেখা দেয়; ক্রমে চোখের মণিরও বিকৃতি ঘটে। উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের ক্যারোটিন উপাদান থেকে মানুষ প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ পেতে পারে; অথবা দুধ, মাখন, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্য থেকেও দেহে এর সরবরাহ হতে পারে। অবশ্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মাধ্যমেই ক্যারোটিন প্রাণিদেহে আসে এবং তা থেকেই ডিম, দুধ প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হয়। ভিটামিন-এ'র প্রাণিজ উৎসের মধ্যে মাছের তেল, বিশেষতঃ হ্যালিবাট, কড্ প্রভৃতি মাছের যকৃতের তেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামুদ্রিক শৈবালজাতীয় খাদ্যের ক্যারোটিন থেকে জলচর প্রাণীদের দেহে ভিটামিন-এ উৎপাদিত হয় এবং তাদের যকৃতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। সমুদ্রের কোন কোন মাছ ও শুশুক প্রভৃতি প্রাণীদের যকৃত থেকে আজকাল ভিটামিন-এ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত করা হয় এবং নির্দিষ্ট মানানুযায়ী ঔষধরূপে বাজারে বিক্রয় হয়। এর ফলে দেহে ভিটামিন-এ'র অভাব পূরণ করা এ-যুগে অতি সহজেই সম্ভব; এ-সব মিশিয়ে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুও সহজেই ভিটামিন-সমৃদ্ধ করে নেওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মার্গারিন (পৃষ্ঠা 278) শ্রেণীর খাদ্যে বহুদিন থেকেই ভিটামিন-এ যথোপযুক্ত পরিমাণে মেশানো হচ্ছে। দাল্‌দা জাতীয় উদ্ভিজ্জ ঘৃতে আজকাল এই ভিটামিনটা আমাদের দেশেও মেশানো হয়। উদ্ভিদজাত ক্যারোটিন যৌগটার রাসায়নিক গঠন নির্ধারিত হয়ে রসায়নাগারে তার কৃত্রিম সংশ্লেষণও সম্ভবপর হয়েছে। কোন কোন দেশে শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম ক্যারোটিন বা ভিটামিন-এ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে।

ভিটামিন-বি$_1$ ঃ এই ভিটামিনটির রাসায়নিক গঠন, এমন কি, আণবিক সংযুতি-বিন্যাসও রাসায়নিক গবেষণায় নির্ধারিত হয়েছে। অন্যান্য ভিটামিনের মত এটাও একটি জটিল গঠনের যৌগ; সাধারণ রাসায়নিক নাম **অ্যানিউরিন** (আমেরিকায় বলে **থায়ামিন**)। পদার্থটার ক্লোরাইড-হাইড্রোক্লোরাইড লবণের রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{12}H_{17}ClN_4OS.HCl$; যতই জটিল গঠনের হোক না কেন, যৌগিকটা আজকাল বিভিন্ন দেশে শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে।

ভিটামিন-বি$_1$-এর অভাবে দেহের পুষ্টি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং ভুক্ত খাদ্যে দীর্ঘ দিন এর অভাব ঘটলে অপুষ্টিজনিত মারাত্মক বেরি-বেরি রোগ হতে পারে। বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশগুলিতে এই রোগের আক্রমণ

প্রায়শঃ দেখা যায়; এর কারণ, প্রাচ্য দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ মাছ ও ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে। মাছে ভিটামিন-বি$_1$ প্রায় থাকে না; চালের দানার উপরিভাগে স্বভাবতঃ যে লাল-রঙের আবরণ থাকে তাতে এই ভিটামিন যথেষ্ট রয়েছে। আগের দিনে যখন ঢেঁকি-ছাটা লাল চালের ভাতই লোকে খেত তখন বেরি-বেরি রোগ এক রকম ছিলই না; কলে-ছাটা ধব্‌ধবে চালের প্রচলন হওয়ার পরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। চাল ছাড়া গম, বার্লি প্রভৃতি শস্যদানায়, ডিমের কুসুমে, পাঠা-ছাগলের যকৃতে ও গরুর দুধে ভিটামিন-বি$_1$ যথেষ্ট থাকে। এই ভিটামিনটার একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটা আমাদের দেহে সঞ্চিত হয়ে থাকে না; দৈনন্দিন খাদ্যের সঙ্গে যথোপযুক্ত পরিমাণে এটা প্রত্যহ গ্রহণ করতে হয়।

ভিটামিন-বি$_2$ ঃ এই ভিটামিনটা যথেষ্ট রয়েছে টমেটো, ঈষ্ট, দুধ, ডিমের সাদা অংশ, বাঁধাকপি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে। রাসায়নিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অনেকটা একই জাতীয় কয়েকটি ভিটামিনের সংযোগে এটা গঠিত। এর মুখ্য উপাদানটিকে বলা হয় **রিবোফ্লাভিন,** যার রাসায়নিক গঠনের সংকেত হলো $C_{17}H_{20}N_4O_6$। দুধে যে অতি সামান্য রিবোফ্লাভিন থাকে তা-ও সূর্যালোকের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-বি$_2$'এর এই অংশ দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। রাসায়নিক পরীক্ষায় এর অপর একটি অংশ **নিকোটিনিক** অ্যাসিডের অনুরূপ গঠনের যৌগ বলে জানা গেছে। অবশ্য ভিটামিন-বি$_2$'এর একটি সংগঠক উপাদান হিসাবে এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার অনেক আগেই নিকোটিনিক অ্যাসিডের রাসায়নিক পরিচয় বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। ভিটামিন হিসাবে অ্যাসিডটার কার্যকারিতা সম্প্রতি জানা গেছে। খাদ্যের মাধ্যমে বা ঔষধ হিসাবে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে এটা গ্রহণ করলে দেহে কোন কোন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মায়।

ভিটামিন-সি ঃ এর রাসায়নিক নাম **অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড,** যার রাসায়নিক গঠন $C_6H_8O_6$; খাদ্যে এর দীর্ঘস্থায়ী অভাব ঘটলে স্কার্ভি রোগ হয়। তাজা শাক-সব্‌জি ও কমলা লেবু, পাতিলেবু প্রভৃতি সাইট্রিক অ্যাসিড-সমৃদ্ধ বিভিন্ন ফলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-সি (অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড) থাকে। গত 1932 খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরি দেশের এক রকম ফল থেকে এই হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর অ্যাসিড-যৌগটা বিশুদ্ধ স্ফটিকাকারে নিষ্কাশিত হয় এবং পরবর্তী বছরেই এর রাসায়নিক সংযুতি নির্ধারিত হয়ে সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে কৃত্রিম

অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর সংশ্লেষণে মূল পদার্থ নেওয়া হয়েছিল গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) ; গ্লুকোজ থেকে সংশ্লেষিত এই কৃত্রিম অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের আণবিক গঠনে বিভিন্ন সংযুতি-বৈচিত্র্যের ফলে কয়েক রকম আইসোমেরিক অ্যাসিড-যোগ গঠিত হয়ে থাকে। যাহোক, কৃত্রিম ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড আজকাল সংশ্লেষণ-পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে এবং স্বল্প মূল্যে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

ভিটামিন-ডি ঃ খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন-ডি'এর অভাব ঘটলে প্রধানতঃ রিকেট রোগ হয় ; বিশেষতঃ শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত হয়। এ-রোগের আক্রমণে দেহের হাড় ও দাঁত শক্ত ও পরিপুষ্ট হয় না, শিশু শীর্ণকায় থেকে যায়। খাদ্যের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত লবণ না পেলেও অবশ্য দেহের হাড় পরিপুষ্ট ও সুগঠিত হয় না সত্য ; কিন্তু দেহের হাড় গঠনে ভিটামিন-ডি'এর কার্যকারিতা অন্যান্য দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফস্‌ফরাস ও ক্যালসিয়াম উপযুক্ত পরিমাণে পেলেও এই ভিটামিনের অভাবে দেহের অস্থি-সংগঠনে ঐ দু'টি উপাদানের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় না, হাড়ের সংগঠন-ক্রিয়া ব্যাহত হয়। **রিকেট** রোগের প্রধান লক্ষণ দেহ-কাঠামোর শীর্ণতা ও বক্রতা প্রভৃতি দেখা না দিলেও আপাতদৃষ্টে স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর মধ্যেও অনেক সময় রিকেট-রোগের লক্ষণ ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এমন কি, ভিটামিন-ডি'এর ক্রমাগত অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বয়স্কদের মধ্যেও ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস-ঘটিত লবণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না ; যার ফলে তাদের দেহের হাড় থাকে নরম ও অপুষ্ট। চিকিৎসা-শাস্ত্রে একে 'অস্টিওম্যালাসিয়া' নামক এক প্রকার রোগ বলা হয়।

গবেষণার ফলে জানা গেছে, রিকেট-রোগের সঙ্গে সূর্যালোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। রিকেট শিশুকে খোলা রোদে প্রত্যহ কিছুক্ষণ রাখলে রোগটা প্রতিহত হয় ; অনেক সময় সেরেও যায়। সূর্যালোকের অতি-বেগুনি বা **আলট্রাভায়োলেট রশ্মির** ক্রিয়ায় জীব-দেহের চামড়ার উপরে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং তা দেহের অভ্যন্তরে শোষিত হয়ে গিয়ে দেহের হাড় সংগঠনে ক্রিয়াশীল হয়। এই জৈব রাসায়নিক তথ্যটা মাত্র গত 1919 খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। পরে দেখা গেছে, কেবল সূর্যালোকই নয়, **মার্কারি-ভেপার ল্যাম্প** থেকে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির যে হ্রস্ব তরঙ্গমালা নির্গত হয় তার ক্রিয়ায়ও জীবদেহে ভিটামিন-ডি উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং

তাতেও রিকেট-রোগ সারে। এই তথ্যটার রাসায়নিক ব্যাখ্যা মেলে 1927 খৃষ্টাব্দে, যখন পরীক্ষায় দেখা যায়, আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির (সূর্যালোকেরই হোক, বা মার্কারি-ভেপার ল্যাম্পেরই হোক) প্রভাবে গাত্র-চর্মের 'আর্গোস্টেরল' নামক একটি জৈব পদার্থ বিশেষ একটি সক্রিয় যৌগে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে **ক্যাল্‌সিফেরল**। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদ, ঈস্ট প্রভৃতিতেও যথেষ্ট আর্গোস্টেরল থাকে, সূর্যালোকের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে যা স্বভাবতঃই ক্যাল্‌সিফেরলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটা জীবদেহের অস্থি গঠনে ও রিকেট-রোগের প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ভিটামিন-ডি বলতে আজকাল বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সংমিশ্রণ বুঝায়, যাদের সবগুলিরই জীবদেহের অস্থির গঠন ও পুষ্টি-ক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে। তাই ভিটামিন-বি'এর মত ভিটামিন-ডি'র বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতার প্রভেদ বুঝাবার জন্যে ভিটামিন-ডি$_1$, ভিটামিন-ডি$_2$ ও ভিটামিন-ডি$_3$ নামকরণ করা হয়েছে। প্রথম দিকে ক্যালসিফেরলকে কড্‌মাছের যকৃতের তেলে যে স্বাভাবিক ভিটামিন-ডি থাকে তারই অনুরূপ রাসায়নিক যৌগ বলে মনে করা হয়েছিল। পরে দেখা গেছে, রিকেট-রোগে ক্যাল্‌সিফেরলের কার্যকারিতা কড্‌-লিভার অয়েলের, বা জীবদেহের চামড়ার উপরে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে উৎপন্ন ভিটামিনের চেয়ে কম। তাই ক্যাল্‌সিফেরলকে অনেকে ভিটামিন-ডি$_2$ বলেন, আর কড্‌-লিভার অয়েলের বা সূর্যরশ্মির প্রভাবে প্রাণিদেহে উৎপন্ন ভিটামিনকে বলা হয় ডি$_3$।

এখানে একটা কথার উল্লেখ করা দরকার, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র 1910 খৃষ্টাব্দে রিকেট-রোগে সূর্যালোকের কার্যকারিতা ও ভিটামিন-ডি সম্পর্কিত তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে বহু শতাব্দী আগে থেকেই শিশু-দেহের হাড় পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় করতে সূর্যালোকের বিশেষ প্রভাবের কথা জানা ছিল। এদেশে শিশুদের তেল মেখে প্রত্যহ কিছু সময় খোলা রোদে রাখবার ব্যবস্থা প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় যুগ থেকেই প্রচলিত আছে। ব্যাপারটার রাসায়নিক ব্যাখ্যা না জানলেও ভারতীয় ঋষিরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও ভূয়োদর্শনের বলে মূল তথ্যটা জেনেছিলেন।

যাহোক, 1932 খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য রসায়ন-বিজ্ঞানীরা ভিটামিন-ডি বা ক্যাল্‌সিফেরল যৌগটি রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ ও স্ফটিকাকার

অবস্থায় প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। আজকাল এটা শিল্পভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে এবং প্রয়োজন হলে ঔষধ হিসাবে বা প্রাত্যহিক খাদ্যে ভিটামিন-ডি'এর অভাব দূর করতে এই কৃত্রিম ক্যাল্‌সিফেরল সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে গ্রহণ করা যায়। আজকাল বিভিন্ন সংরক্ষিত (টিনে-ভরতি) খাদ্যবস্তুতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যবহৃত কৃত্রিম স্নেহ-খাদ্য মার্গারিনে (পৃষ্ঠা 278) উপযুক্ত পরিমাণে ক্যাল্‌সিফেরল মিশিয়ে ভিটামিন-ডি'এর অভাব পূরণ করা হয়ে থাকে।

উল্লিখিত প্রধান প্রধান ভিটামিনগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে; যেমন—ভিটামিন-ই, ভিটামিন-এইচ, ভিটামিন-কে প্রভৃতি। **ভিটামিন-ই** হলো একটি বিশেষ জটিল গঠনের জৈব যৌগ, যার রাসায়নিক নাম দেওয়া হয়েছে **টেকোফেরল**; তুলা-বীজের তেলে এটা প্রধানতঃ পাওয়া যায়। দেহে এর অভাবে অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সন্তান-ধারণের ব্যাপারে নানা গোলযোগ ঘটে। মানব-দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের পক্ষে **ভিটামিন-এইচ,** যার রাসায়নিক নাম **বায়োটিন,** কম গুরুত্বপূর্ণ নহে; কারণ এর অভাবে বিভিন্ন চর্মরোগ দেখা দেয়। প্রাণী-দেহের যকৃতে ও ঈস্টে এটা পাওয়া যায়। **ভিটামিন-কে** একটা বিশেষ গঠনের রাসায়নিক পদার্থ, যা প্রয়োজনের সময়ে স্বভাবতঃই দেহাভ্যন্তরে প্রস্তুত হয়; আবার উদ্ভিদের সবুজ পাতায়ও এর সন্ধান পাওয়া যায়। এর অভাব ঘটলে দেহের কোথাও কেটে গেলে সহজে রক্ত জমাট বাঁধে না, প্রচুর রক্তপাত হয়। এর কারণ, কাটা জায়গা থেকে নির্গত রক্তের 'প্রোটোথ্রম্বিন' উপাদানটি ভিটামিন-কে'এর অভাবে সহজে 'থ্রম্বিনে' পরিবর্তিত হয় না। এই থ্রম্বিনই রক্তের 'ফ্রাইব্রিনোজেন' উপাদানকে জমিয়ে সূক্ষ্ম সূতার মত পদার্থের সৃষ্টি করে, যার ফলে রক্ত জমাট বাঁধে। এ-সব ছাড়া ভিটামিন-বি$_6$ (রাসায়নিক নাম পাইরোডক্সিন), ভিটামিন-বি$_{12}$ প্রভৃতি আরও নানা রকম ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। **ভিটামিন-বি$_{12}$** হলো কোবাল্ট ধাতুঘটিত একটি লাল স্ফটিকাকার পদার্থ, যার রাসায়নিক নাম **ফলিক অ্যাসিড**। এর অভাবে দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন জীবকোষ (সেল), বিশেষতঃ রক্তকোষের গঠন-ক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। রক্তহীনতা (অ্যানিমিয়া) রোগে তাই ভিটামিন-বি$_{12}$ বিশেষ ফলপ্রদ বলে প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন ভিটামিনের প্রভাবে সংঘটিত বিভিন্ন জৈব ক্রিয়ার ও তার ফলে দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতার সূক্ষ্ম ও জটিল তথ্যাদির বিশদ

আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। বিভিন্ন হর্মোন ও ভিটামিনের রাসায়নিক তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধীয় গবেষণা ও বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি অতি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবদেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাভাবিকতা রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য এই জৈব উপাদানগুলির উৎস ও কার্য-কারিতা সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনা করা হলো মাত্র। দেহের আভ্যন্তরীণ বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ায় হর্মোন ও ভিটামিন ছাড়াও আয়োডিন, আয়রন (লৌহ), ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্ম কার্যকারিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এগুলিও দেহের রাসায়নিক বিপাক-ক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করে এবং দেহ-যন্ত্রকে স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম রাখে। এ সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করবো।

পুষ্টি-বিজ্ঞানের কয়েকটি কথা

রাসায়নিক ক্রিয়ায় অনুঘটক পদার্থের প্রভাব সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা 262) আমরা যথোচিত আলোচনা করেছি। আমরা জেনেছি, অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে কোন-কোন পদার্থের উপস্থিতির ফলে রাসায়নিক রূপান্তর-ক্রিয়ার গতিবেগ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ায় এরূপ অনুঘটন-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর। জীবদেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়া-কলাপে বিভিন্ন হর্মোন ও ভিটামিন বস্তুতঃ বিশেষ বিশেষ অনুঘটকের অনুরূপ কাজ করে; প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া এদের **অনুঘটন**-প্রভাবেই যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় এবং আভ্যন্তরীণ বিবিধ জৈব ক্রিয়া স্বাভাবিক ধারায় চলে। অতি সামান্য পরিমাণে হলেও দেহমধ্যে বিভিন্ন হর্মোন ও ভিটামিন শ্রেণীর জৈব পদার্থের উপস্থিতি জীবদেহের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেহাভ্যন্তরে স্বতঃনিঃসৃতই হোক, বা বাইরে থেকে ঔষধরূপে বা খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করা হোক, এ-সব জৈব পদার্থের অভাবে আভ্যন্তরীণ বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হয় ও দেহ-যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে হলেও বিভিন্ন হর্মোন ও ভিটামিনের অভাবে প্রাণী-দেহের স্বাস্থ্য কেন ও কিভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধান বস্তুতঃ একটি অতি বিস্ময়কর রাসায়নিক তৎপরতার বিষয়। মানব-কল্যাণে রসায়নের বিবিধ অবদানের মধ্যে দেহ-তত্ত্বীয় এ-সব রাসায়নিক গবেষণা এ-যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

গবেষণার ফলে জানা গেছে, ভিটামিন ছাড়াও আমাদের ভুক্ত খাদ্যে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে কিছু আইয়োডিন (অবশ্য যৌগিকের আকারে) থাকা একান্ত আবশ্যক। এর অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড (পৃষ্ঠা 443) থেকে **থাইরক্সিন** নামক হর্মোনের নিঃসরণ ব্যাহত হয়। সাম্প্রতিক কালে আরও জানা গেছে যে, কেবল আইয়োডিন নয়, খাদ্যের মাধ্যমে আরও কতকগুলি মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হওয়া চাই, যেগুলি হর্মোন ও ভিটামিনের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরস্থ বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং যেগুলির উপস্থিতি প্রাণী-দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় অপরিহার্য। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষেও এরূপ বিভিন্ন অজৈব মৌলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা 113)। এ-সব অজৈব পদার্থ উদ্ভিদ-দেহের রাসায়নিক ক্রিয়ায়ও বস্তুতঃ অনুঘটকের কাজ করে থাকে।

প্রাণিদেহে সামান্য পরিমাণে লৌহের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুকাল আগেই জানা গেছে ; দেহের রক্তের **হিমোগ্লোবিন** বা লোহিত-কণিকাগুলির সংগঠনে লৌহ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তাই জীবদেহে লৌহের প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা গত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন ; কিন্তু ভারতে আয়ুর্বেদীয় যুগ থেকেই এ-কথা জানা ছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধহিসাবে জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড) লৌহের উল্লেখ রয়েছে। যাহোক, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জানা গেছে, কেবল লৌহই নয়, দেহের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক ক্রিয়ায় অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে তামার অস্তিত্বেরও প্রয়োজন রয়েছে। রাসায়নিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষতঃ তামার অনুঘটন-প্রভাবেই (পৃষ্ঠা 275) প্রাণিদেহে রক্তের হিমোগ্লোবিন-কণিকার সংগঠনে লৌহ সক্রিয় ও কার্যকরী হয়ে ওঠে। দেখা গেছে, রক্তহীনতা (অ্যানিমিয়া) রোগে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর দেহে তামার অভাবই মূলতঃ দায়ী। অবশ্য এদের প্রয়োজন এত সামান্য যে, বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্যের মাধ্যমেই আমাদের দেহাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে এ-সব ধাতব উপাদান স্বভাবতঃই সরবরাহ হয়ে থাকে। এক জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে দৈনন্দিন খাদ্যের সঙ্গে মোটামুটি 4—5 মিলিগ্র্যাম **তামা** গ্রহণ করা প্রয়োজন হয় ; নতুবা হিমোগ্লোবিনের গঠন-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়ে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। জীবজন্তুদের স্বাস্থ্যহীনতা ও ক্ষয়রোগে অনেক সময় খাদ্যের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে তামা-ঘটিত কোন দ্রাব্য লবণ দিলে রোগের

উপশম হয় বলে দেখা গেছে। মানুষের পক্ষে অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা সমীচীন নয়।

প্রাণিদেহে সামান্য পরিমাণে **ম্যাঙ্গানিজ** ও **কোবাল্ট** ধাতুরও প্রয়োজন রয়েছে বলে জানা গেছে। ম্যাঙ্গানিজ-ঘটিত লবণের অভাবে বিশেষতঃ মাতৃগর্ভে ভ্রূণের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; আর কোবাল্টের অভাবে গৃহপালিত পশুদের এক রকম 'ঝিমানো' রোগ হতে দেখা যায়। এর প্রতিকারের জন্যে পশুদের চারণ-ভূমিতে কোবাল্ট-ঘটিত লবণের জলীয় দ্রবণ ছড়িয়ে দিতে হয়, যা থেকে সে-জমির ঘাস-তৃণে কোবাল্ট এসে যায়। কোবাল্ট-লবণের জল খেতে দিলেও উক্ত পশু-রোগ নিবারিত হয়ে থাকে। প্রত্যহ মাত্র এক মিলিগ্র্যাম কোবাল্ট পেলেই প্রাণিদেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে। একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, ধাতব পদার্থের এরূপ অতি সূক্ষ্ম অস্তিত্ব, বিশেষতঃ জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি, জীবদেহে কোন-কোন ভিটামিনের স্বাভাবিক কার্যকারিতার সঙ্গেও বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর সঠিক তাৎপর্য সম্যক জানা না গেলেও দেখা যায়, প্রকৃতিজাত কোন-কোন ভিটামিনে স্বভাবতঃই অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান মেলে; কৃত্রিম বা সংশ্লেষিত ভিটামিনে যা দেখা যায় না।

যাহোক, মানব-কল্যাণে রসায়নের অসংখ্য অবদানের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা এই পুস্তকে মোটামুটিভাবে কিছু আলোচনা করলাম। সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের মধ্যে রাসায়নিক জ্ঞানের উদ্ভব, প্রাচীন দার্শনিকদের অবাস্তব মতবাদ ও অ্যাল্‌কেমিস্টদের বহু ভ্রমাত্মক চিন্তাধারা থেকে যুগ যুগ ধরে ক্রমবিকাশের ধারায় আজ এক সুসম্বদ্ধ রসায়ন-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। পার্থিব পদার্থের গঠন-রহস্য সম্যক উদ্‌ঘাটিত করে মানুষ আজ প্রকৃতিকে জয় করেছে, নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অজস্র উপকরণ উৎপাদন করেছে। রসায়ন-বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় অগ্রগতির কাহিনী যেমন কৃতিত্বপূর্ণ, তেমনই বিস্ময়কর। এই পুস্তকের বিবিধ আলোচনা থেকে প্রকৃতির গঠন-রহস্যের ও মানুষের রাসায়নিক তৎপরতার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণ যদি কিছুটা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহলে আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

বিষয়-সূচী : নির্ঘণ্ট

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে-সব পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি ঃ

1. Hindu Chemistry—Acharya P. C. Roy.
2. বিজ্ঞানের ইতিহাস—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন
3. History of Chemistry—Sir Edward Thorpe.
4. Chemistry in the Service of Man—Alexander Findlay
5. The Atom and its Energy—Prof. E. N. Andrade
6. Dictionary of Scientific & Technological Words—W. E. Flood & Michel West.
7. Science of Nutrition—H. C. Sherman
8. হর্মোন বা উত্তেজক রস—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
9. The Atomic Nucleus—M. Korsunsky
10. What Industry owes to Chemical Science—Heffer Cambridge
11. কাচ ও কাচশিল্প—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু